ভারতী

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত

৭ম ষষ্ঠ খণ্ড।

১৮০৫ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

মূল্য ৩৷৷০ মাশুল সমেত ৪ টাকা

ভারতী

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত

৭ম ষষ্ঠ খণ্ড।

১৮০৫ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

মূল্য ৩॥০ মাশুল সমেত ৪ টাকা।

ভারতী।

বর্ষ-মঙ্গল।

"প্রভাত, প্রভাত!"
কার তুরী ঘোষে অকস্মাৎ,—
"প্রভাত প্রভাত!"
কোন্ মহাজাগরণে জাগাইতে বিশ্বজনে
কার হেন আনন্দ উৎপাত!
সে ইঙ্গিতে গ্রহ-তারা আচম্বিতে গতিহারা
চমকি চাহিল পরস্পরে;
ক্রীড়াশীল বিশ্ব-যন্ত্রে যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে
অবসাদ এল ক্ষণতরে;
কালের অক্লান্ত রথ চলিতে চলিতে পথ
ফিরিয়া দাঁড়াল সন্ধিস্থলে;
ধরি' নববর্ষ-ছবি উঠি এল রক্তরবি
জগতের উদয়-অচলে!

এ আলোক-ছটা,
এ ত নহে মাধবীর ঘটা!
এ আলোক-ছটা
স্বর্গের ধিক্কার এসে কাল-বৈশাখীর বেশে
আবরিবে মেলি নীল-জটা!
এবার, স্বপন-মেশা যে লঘু সুখের নেশা,
যাদু মাই-তোদের কুহকে;

এ ... কার অগ্নিবাণে ধরণীর মর্ম্ম হানে,
রক্ত টানে ঝলকে ঝলকে।
উন্মোচিয়া অন্তরাল দাঁড়ায়েছে মহাকাল
যাত্রাপথে ক্ষণেক উধাও,
হের, রুদ্র মূর্ত্তিখানি, শুন হুহুঙ্কারবাণী,
নর-নারী, সম্ভ্রমে লুটাও!

ডাকি' ফিরে তূরী!
কাঁপে শব্দে ভীত মর্ত্ত্য পুরী!
ডাকি' ফিরে তূরী!
কি দুশ্চর পুণ্য-ব্রতে কীর্ত্তির দুর্গমপথে
ডাকে ধ্বনি ঘরে ঘরে ঘুরি'!—
কোন্ মহারণাঙ্গনে যুঝিবারে প্রাণপণে,
ফলাফল দিতে বিসর্জ্জন;
কোন্ অগ্নিপরীক্ষায় ক্ষমা-তপ-তিতীক্ষায়
ধর্ম্ম-ধন করিতে রক্ষণ!—
উত্তরিতে কোন্ পারে মরণের সিংহদ্বারে,
বিপদের কোন্ অগ্নি-চূড়ে!
উঠুক্ তূরীর তান ছুটুক্ জাগায়ে প্রাণ
তাপিত পতিত বিশ্বজুড়ে'!

এস হে প্রবাসী,
জগতের মোহজালনাশি!
এস হে প্রবাসী!
হানাহানি হাহারব শান্ত করি দাও সব
বরষিয়া তব শুভরাশি;
মাতিয়া বিদ্বেষ-ধূমে নাচে নর প্রেতভূমে;
স্নেহ-মায়া হয়ে গেছে ছাই!

ষাণ্মাষিক সূচীপত্র।

১৩০৯।

(বৈশাখ হইতে অশ্বিন)

3499

রায়জী ওরফে সীতা নাথ রায় বাবুর বাল্যসখা। জমীদারী কার্য্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ;—এই ক্ষুদ্র বিশালাক্ষী রাজ্যের সলস্‌বরী। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ; চক্রান্ত বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। আপাততঃ একটা বিশেষ পরামর্শেই তাঁহাকে বাবুর প্রয়োজন।

কান্তিচন্দ্র তাঁহার একমাত্র পুত্র ও বংশধরের মতি গতির জন্য চিন্তিত। ভাবিতেছেন কলিকাতায় রাখিয়া ইংরেজ মাষ্টার নিযুক্ত করাটা ভুল হইয়াছিল। ইংরেজি সংসর্গে মিশিয়া তার মেজাজ ইংরেজি হইয়া উঠিয়াছে। শিকারের বাতিকটার জন্য ভাবেন না। শিকারের নেশাটা তাঁহাদের বংশে বংশাবলী ক্রমে নামিয়া আসিতেছে। তিনিই কখনও ও বিষয়ে বড় একটা মাতেন নাই। নহিলে তাঁহার ঠাকুর, খুড়ারাও খুব শিকারপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার মধ্যম খুল্লতাত ত অল্পবয়সে কতবার ভাগ্যে ভাগ্যে বাঘের মুখ হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছেন গল্প শুনা গিয়াছে।—ওটা তিনি ধরেন না। তবে আজকাল যে দিন্ ক্ষণ পড়িয়াছে কোন্ দিন শুনিবেন ছেলে ব্রাহ্মই হইয়াছে না খৃষ্টানই হইয়া গেছে।

কান্তিচন্দ্রের দুর্ভাবনা স্রোতে বাধা দিয়া সীতা নাথ রায়ের শুভাগমন হইল। যে লোকটি আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার আকার খর্ব্ব, দেহখানি স্থূল, বর্ণটি ঘোর কৃষ্ণ, মুখমণ্ডল কেশলেশহীন, মস্তকের সম্মুখভাগও তদ্রূপ। রায়জীর চরণযুগল, একটি ছোট একটি বড়, সুতরাং একটু খোঁড়াইয়া চলিয়া থাকেন। সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া তাঁর খ্যাতি আছে, কথোপকথনে সাধু ভাষাই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই তাঁর আগমন সংবাদ স্বরূপ বলিলেন—

"আঃ—গ্রীষ্মটা আজ কি প্রচণ্ডভাবই ধারণ করেছে।" কান্তিচন্দ্র অন্য দিকে মুখ করিয়াছিলেন। ফিরিয়া সীতা রায়ের প্রতি মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—

"সে কথায় আর কায কি ! আহারের পর একটু বিশ্রামের চেষ্টা করা গেল,—তা নিদ্রা আদৌ এল না।"

সীতা রায় বলিলেন—"চেষ্টা আমিও করেছিলাম। আমিও কৃতকার্য্য হতে পারিনি। যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।"—বলিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

হাসি থামার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—"আজ অসময়ে স্মরণ করেছে যে দাদা !"

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"বোসো অনেক কথা আছে।" সীতা রায় উপবেশন করিলেন।

বাবু বলিলেন—"সূর্য্যপুরের সেই সম্বন্ধটার কথা ভাবছিলাম।"

সীতা রায় সম্মুখস্থিত পানের ডিবা হইতে একটা পান লইয়া, আঙ্গুলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন—"কি স্থির করলে ?"

"স্থির এখনও কিছু করিনি। ভাবছি কি জবাব দিই।"

"আমার পরামর্শ যদি চাও,—তবে স্থির করে ফেল। হরিহর চাটুর্য্যের ঐ এক মেয়ে। অগাধ সম্পত্তি। আখেরে তোমারি ঘরে আসবে।"

কান্তিচন্দ্রেরও তাহাই বিশ্বাস। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার ঘরে আসবে কি করে ? হরিহর চাটুর্য্যে কি পোষ্যপুত্র নেবে না ?"

সীতা রায় বলিলেন—"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পার। সে আমি বেশ ভাল রকমই সন্ধান নিয়েছি। পোষ্যপুত্র নেবে না। হরিহর চাটুর্য্যে হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিল। মেজাজটা ইংরিজি। বলে আমার যা বিষয় আছে আমার মেয়ে জামাই ভোগ করবে, পরের ছেলেকে এনে দিতে যাব কেন ?"

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"হ্যাঁ, সে কথা আমিও শুনেছি, কিন্তু যা দিতে চাচ্চে, তাতে কেমন করে রাজি হই ? আমাকে যদি সুন্দরবনে ওর জমিদারীর অংশটা পণস্বরূপ লেখা পড়া করে দেয়, তা হলে এখনি ওখানে ছেলের বিয়ে দিতে পারি।"

সীতানাথ একটু ভাবিয়া বলিলেন—"তা যা বলেছ তা ঠিক বটে।

কিন্তু একটা কথা এই হচ্চে, বেশী টানাটানিতে আবার ছিঁড়ে না যায়। সুন্দরবনের ও জমিদারী আজ না হয় কাল তোমারি হবে।"

কান্তিচন্দ্র উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"কাল নয়, আমি আজই চাই। আমার জমিদারীর পাশেই ওই জমিদারী। ঐটীর উপরই আমার বেশী লক্ষ্য। নইলে টাকা বা গহনা পাঁচ হাজারই দিক আর দশ হাজারই দিক আমি গ্রাহ্য করিনে। ঐটিকে আমি জলের মাছ রাখতে চাইনে, ডাঙ্গায় তুলতে চাই।"

"একদিন ত উঠবেই।"

"কে বল্লে একদিন উঠবেই? মানলাম না হয় পোষ্যপুত্র নেবে না। মানলাম ওর স্ত্রীর আর সন্তান হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তা ছাড়াও কি আর কিছু আশঙ্কা নেই? আর কিছু দেখছ না কি?"

সীতানাথ বিলক্ষণ দেখিতেছিলেন। কিন্তু বাবুর অপেক্ষা নিজেকে মধ্যে মধ্যে অল্প তীক্ষ্ণতাশালী দেখাইয়া তোষামোদ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। সুতরাং বলিলেন—"কৈ না। আর ত কিছু দেখছিনে।"

বাবু বলিলেন—"দেখছ না? আচ্ছা, হরিহর চাটুর্য্যের বয়স কত?"

"যুবা বয়স,—তোমাদেরই বয়স হবে বোধ করি।"

"তার স্ত্রীর যদি আজ মৃত্যু হয়, তবে কাল সে বিবাহ কর্‌বে না?"

সীতানাথ তখন মুখে একটা বিস্ময়দীপ্ত ভাব আনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"তা বটে, তা বটে। ওটা আমার মনেই হয় নি।"

কান্তিচন্দ্র ঠকিলেন। এই মিথ্যা চাটুতে ভুলিলেন। একটু গর্ব্বিত ভাবে দ্রুত ধূমপান করিতে লাগিলেন। সীতানাথ একটু পরে বলিলেন, "তা যদি বল, তবে আমি স্বয়ং সূর্য্যপুরে গিয়ে কথা কই।"

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"বেশ ত। ঘটকালি কর,—দু হাজার টাকা দক্ষিণা পাবে।" বলিয়া হাস্য করিলেন।

সীতা রায় মনে মনে হিসাব করিতে লাগিলেন—"দু হাজার,—আর ও পক্ষে থেকেও কোন্ দুহাজার নয়।. চার হাজার।"

কান্তিচন্দ্র আর একটা পাণ মুখে দিয়া বলিলেন—"আচ্ছা. সূর্য্য

পুরের ওঁরা কি রকম কুলীন? আমাদের সঙ্গে ত আগে কখনও ক্রিয়াকর্ম্ম হয় নি।”

সীতানাথ বলিলেন—“সূর্য্যপুরের ওঁরা লক্ষ্মীপাশার কুলীন আর কি। ওঁদের আদি বাস হল গিয়ে তোমার লক্ষ্মীপাশায় কি না। লক্ষ্মী-পাশার কুলীনদের ইতিহাস জান ত?”

“ওঁরা রামানন্দ চক্রবর্ত্তীর সন্তান না?”

“হ্যাঁ। রামানন্দ চক্রবর্ত্তী বাকরগঞ্জ জেলার সরমঙ্গল গ্রাম থেকে বাস তুলে আসেন। নিজের কুলমর্য্যাদা বাঁচাবার জন্যে একরকম পালিয়েই আসেন বলতে গেলে। তারপর লক্ষ্মীপাশার নিকটবর্ত্তী হয়ে,—কি গ্রামটা হে?”—

বলিয়া সীতানাথ মাথা নীচু করিয়া চক্ষু বুজিয়া মুখ শিটকাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বামহস্তের তর্জ্জনীটি সদ্যোধৃত নদপুর মৎস্যের মত নড়িতে লাগিল। মনে পড়িবামাত্র বলিলেন—“হ্যাঁ। ধোপাদহ। ধোপাদহে এসে তিনি অনেক অনুরোধে মজুমদারের মেয়েকে বিবাহ করেন। মজুমদারের মেয়ের পাণিগ্রহণ করে কুলগর্ব্ব কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হল বটে, কিন্তু তবুও মরা হাতির লাখটাকা রে ভাই, বুঝলে কি না। সেই থেকে লক্ষ্মীপাশার কুলীনদের উৎপত্তি আর কি। তা সে বিষয়ে সূর্য্যপুরের চাটুর্য্যেদের কেউ হটাতে পারবে না।”

কান্তিচন্দ্র একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিলেন—“হুঁ। নবুর বিয়েটা দুই এক মাসের মধ্যেই দেব স্থির করেছি। বয়স হয়ে উঠল, আর বিলম্ব করা ঠিক নয়।”

সীতানাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“তা পৌত্রমুখ দেখবার ইচ্ছে হয়েছে—ছেলের বিয়ে দাও। বয়স হল বোলোনা। কুড়ি বছর বয়স আর বয়স কি! বালক বৈ ত নয়।”

গুড়গুড়ির নলটি মুখ হইতে খুলিয়া, সীতানাথের হাতে দিয়া কান্তি-চন্দ্র বলিলেন—“না না তা নয়। দুই এক বিষয়ে আমার একটু ভাবনা হয়েছে। ছোঁড়ার ভাবসাব কেমন ইংরিজি গোছ হয়েছে দেখছনা।

সীতানাথ বলিলেন—"তার জন্য চিন্তা কোরো না, তাতে কোনও আশঙ্কার কারণ নেই। এখন বয়সদোষে প্রকৃতিটা একটু উচ্ছৃঙ্খল। ও বয়সে নিজের কথা ভেবে দেখ না।"—বলিয়া কান্তিচন্দ্রের প্রতি একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সীতানাথ মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"আমার কি পরামর্শ জান? আর ওকে কলকাতায় পাঠাব না। লেখা পড়া যা শিখেছে, কায চলা মত যথেষ্ট শিখেছে। ইংরিজি বলতে পারে—সে দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ওর সঙ্গে কথা কয়ে কত খুসি। আমায় বল্লে—'বাবু তোমার ছেলে ইংরিজি কয় যেন ইংরেজের মতন।' এখন ওকে ঘরে রেখে জমিদারী সংক্রান্ত কাযকর্ম্ম একটু একটু শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায় আমার। তাই একটি ডাগর মেয়ে খুঁজছি।"

সীতানাথ বলিলেন—"তাইত! বাবাজীবনের জন্যে ফাঁদ পাত দেখছি সাংঘাতিক রকমের। তা যে রকম ইংরিজি ভাবাপন্ন হয়েছে বলছ, বিয়ে করতে রাজি হবে ত? আজকালকার ছেলেরা নাকি শুনতে পাই স্বেচ্ছামত বিবাহাদি করতে চায়।"

"কান্তিচন্দ্র একটু অবজ্ঞাপূর্ণ মৃদুহাস্য করিলেন। বলিলেন—কান্তি বাঁড়ুয্যের অভিপ্রায় মত কায হল না,—এ কথা শুনে কখনও?" বলিয়া দাবাবড়ের বাক্স টানিয়া লইয়া, ইঙ্গিতে সীতানাথকে নিজ সৈন্য রচনা করিতে আদেশ করিয়া খেলিতে বসিলেন।

কান্তি বাঁড়ুর্য্যে মনে করিলেন না যে এ ক্ষেত্রে যাহার প্রতিকূলত আশঙ্কা রহিয়াছে, সে কান্তি বাঁড়ুর্য্যেরই ছেলে। পাথরে পাথ ঠোকাঠুকি হইলেই তবে আগুন উঠে।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

দেবকৌতুক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—নন্দনকানন।

(নারদোক্তি)।

ইন্দ্রানীর সভাতলে নন্দন কাননে
সমাগত দেবীগণ নিমন্ত্রণে আজি,
করিতে মন্ত্রণা সবে, ভব নাট্যালয়ে
কি নাটক অভিনব হবে অভিনীত
এ নবীন যুগে।
এসেছেন সরস্বতী
রমা রতি দিগঙ্গনা যত, মৃগশিরা
রোহিণী, ভরণী, চিত্রা, নক্ষত্র ললনা
ভাগ্যদেবীগণ, যাঁদের কৌতুক লাগি
জন্ম মৃত্যু দুঃখে সুখে মানব পুত্তলী
অনাঙ্গ অভঙ্গ রঙ্গ সাধিছে বিষম
সংসার অঙ্গন তলে অক্লান্ত আয়াসে।
দেবীগণে জনে জনে করিয়া নির্দ্দেশ
প্রতিভা-প্রভাব-যোগ্য মর্য্যাদা আসন,
শচীদেবী নিবেদিলা—
অয়ি বরণীরা
বর সখিগণ মম, কাটাইছ কাল
স্বর্গালয়ে দিব্য সুখে, দৃষ্টি দাও এবে
ধরাধামে; শুনিছনা উঠে সেথা কিবা
ব্যাকুল প্রার্থনা নিত্য নূতনের লাগি?
যেজন মগন সুখে তাহারো ক্রন্দন
"নূতন নূতন" বলি! লিখিতেই হবে

সবার প্রথমে ; বাণীর আসন তাই
উর্দ্ধে কমলার ; ইন্দিরার নাহি তাহে রোষ।
বাসব বিচার করি নিজে সযতনে
দেবীদের সিংহাসন করিলা সজ্জিত।
অবিচার নাহি ইথে নাহি অপমান।”
“নাহি অবিচার ! হে ইন্দ্রাণি কহ দেখি
আমার প্রভাব ন্যূন কিসে লক্ষ্মী হতে ?
ধরণী কি চলিতেছে ধনে ধান্যে শুধু
প্রেম কি কিছুই নহে ?”
                                        নীরব রহিলা
শতাবরী, উত্তর কি আছে এ কথার !
সত্য কহিছেন রতি, এ কথা কেমনে
ভুলিলেন দেবরাজ এ বড় বিস্ময়।
দেবীর মনের দ্বিধা ব্যক্ত হোল ভাবে,
চাহিলা করুণ নেত্রে সুরাঙ্গনাগণ
কমলার মুখ পানে, হেরি সভামাঝে
অপমান তাঁর। লজ্জা অভিমানতাপে
ইন্দিরার মুখকান্তি হ’ল ম্লানচ্ছবি,
সুবর্ণ কিরণদীপ্ত ললিত লোহিত
মন্দার স্তবকফুল্ল নন্দনের শোভা
সহসা হইল ব্যাপ্ত ক্ষণিক তিমিরে।
সবারে নীরব হেরি দেবী পদ্মাসনা
কহিলা কম্পিত কণ্ঠে—
                                        “মর্ত্ত্য ধরাতলে
আমার কি দান শুধু মণি মুক্তা হীরা—
তুচ্ছ রত্ন ধন ? শ্রীসৌন্দর্য্য শোভা
ধীরতা শীলতা লজ্জা বিনয় নম্রতা
সে কার প্রসাদ ? যে রূপ গুণের ফাঁদে

লুব্ধ প্রেম বাঁধা পড়ে সে কাহার মায়া?"
"তাই বটে!" কহিলা গর্ব্বিতা রতি রোষে,
"আমি যারে দয়া করি সেই সম্মোহিনী,
তোমার বিনয়শীলা তোমার শ্রীমতী
আমার সে গর্ব্বিণীর সৌভাগ্য নেহারি
ঈর্ষায় ফাটিয়া মরে দগ্ধ মনোবিষে।
স্মরের প্রভাবে রূপ কুরূপের পদে
লাজে করে নতশির, পুণ্য বয়ে পাপে,
ধনী নির্ধনের কাছে হারায় সম্মান।"
সঙ্কটে পড়িলা শচী, রতিরে সম্ভাবি
কহিলেন হাসি হাসি মৃদু ব্যঙ্গ ভরে
"সংহর সংহর তেজ, মরি ত্রাসে সতি
রোষানল হেরি তব, মনে পড়ে যায়
পুরাকালে মদন তোমার, ঘটাইলা
কি বিপ্লব! মদন মোহিনী হতে বুঝি
ঘটে আজ পরমাদ সেইরূপ কোন!
শান্ত হও হে কোপনে, কলহ বিবাদে,
ঈর্ষা গর্ব্বে, নাশিও না ত্রিদিব মহিমা।
অশান্তি ঘটাতে চাও আছে বসুন্ধরা,
যাও তথা। অয়ি লক্ষ্মি, অয়ি শ্রীদায়িনি
কে না জানে তোমার মহিমা। তবু যবে
স্পর্দ্ধে তোমা রতি, বলি শুন সদুপায়,
দুইজনে গিয়া মর্ত্ত্যে দুই কন্যা বাছি
মনোমত রূপেগুণে ভূষিত করিয়া
রঙ্গক্ষেত্রে দোঁহাকারে কর উপনীত
দেখা যাক তারা দোঁহে কে খেলে কেমন।
স্থির হবে তোমাদের দোঁহার প্রভাব
তাহাদের দুজনার জয় পরাজয়ে।

"অনল পরীক্ষা এযে, বেশ সেই ভাল!
শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা!" কহিলা কমলা।
রতি উত্তরিলা রোষে—"বেশ বেশ দেবি
জগতে প্রমাণ হবে রতির প্রতাপ।"
সুগন্ধ ঝটিকা তুলি অঞ্চল হিল্লোলে
ঝটিতি চলিয়া গেলা রতি। দেবী সবে
শান্তি লভি কহিলেন—"ত্রাণ পাইলাম।"
লক্ষ্মী কহিলেন হাসি—"তোমরা বাঁচিলে,—
আমারে ফেলিলে দায়ে! ভাল তাই হোক
দেবের বিরোধ ফল ভুঞ্জুক ধরণী।"
ডুবায়ে কলহ স্মৃতি বীণার ঝঙ্কারে
ভারতী ধরিলা গান। দেববধূ সবে
ভুলিয়া মন্ত্রণা যুক্তি মুগ্ধকর্ণ মেলি
শুনিতে লাগিলা তাহা। শচীর সভায়
সঙ্গীতে হইল সাঙ্গ, সেদিনের মত
নরভাগ্য প্রসঙ্গের স্বর্গীয় কৌতুক।

(নারদের অন্তর্দ্ধান দেবীগণের প্রবেশ)

গান।

ত্রিদিবের মোরা ললনা,
নরনারী আমাদের প্রিয় খেলনা।
আশা তৃষা সুখ রঙ্গে
খেলাই কত কি ভঙ্গে
ভুলে যাই সঙ্গে সঙ্গে
তাহা, শুধু ছলনা।
হাসিলে কৌতুকে তারা আমরা হাসি,
হেরিলে নয়নে অশ্রু দুখেতে ভাসি।
রচি যাহা সাবধানে
ছিঁড়ে ফেলি এক টানে

বরে শাপ, শাপে করি বর ক্ষালণা।
ত্রিদিবের মোরা ললনা।
মানবে ছলিতে শেষে ছলি আপনা,
নানা ছাঁদে মায়া গাঁথি,
মাতাইতে গিয়া মাতি,
স্বপ্নে সত্যে দিবা রাতি
আনি তুলনা।
শত রাগ রাগিণী সুরে,
মোহন মূর্চ্ছনা তুলি মৃদু মধুরে,
সপ্তমে চড়ায়ে তান,
গাও বীণা গাও গান
কর স্বর্গ গর্ব্বমান
মর্ত্ত্যে চালনা।

(ইতি প্রস্তাবনা।)

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

হিন্দুর নারীমর্য্যাদা।

নির্ভীকতার সহিত জাতি বর্ণনির্ব্বিশেষে দুর্ব্বলের রক্ষা ও তাহাদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের ভাব হইতে মধ্যযুগে ইউরোপীয় 'শিভাল্‌রি' অনুষ্ঠানের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ক্রমে এইভাব সঙ্কীর্ণতর হইয়া বিপন্ন নারীদিগের অন্বেষণ ও তাহাদিগের উদ্ধারসাধনের ভাবটি (Knight-Errantry) তে পরিণত হয়। শেষে এই ভাবটি আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া ইংরাজি 'শিভাল্‌রি' বলিতে এখন আর দুঃস্থ অবলাগণের উদ্ধারসাধনের নিমিত্ত একটি সচেতন সচেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ পায় না, এখন 'শিভাল্‌রি' বলিতে সোজাসুজি 'গ্যালান্ট্রি'ই বুঝায়। একজন

বিখ্যাত ইংরাজ লেখক শেষোক্ত শব্দটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—নারীজাতিকে নারী বলিয়াই তাহাদের প্রতি আমরা যে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করি এইরূপ একটি কথা আছে, তাহাকেই গ্যালাণ্ট্রি বলে।*

গোড়াতেই একটি কথা বলিয়া লওয়া ভাল। মধ্যযুগের ইউরোপীয় নাইট সম্প্রদায়ের শিভাল্‌রি সম্বন্ধে এই উন্নত আদর্শ দেখিয়া আমরা যেন না ভাবি যে ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনেও উহাদের আচরণ সর্ব্বদাই তাদৃশ উন্নত ছিল। অধিকাংশ লোকের নিকট আদর্শ চিরকালই আদর্শ থাকিয়া যায়, অত্যল্পসংখ্যক লোকই কেবল তাহা স্বীয় জীবনে প্রতিপালন করিতে পারে।† ডন কুইক্সোটের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে নাইটসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চকর্ত্তব্যজ্ঞান অপেক্ষা হুজুগের ভাবটাই বেশী প্রবল ছিল, এবং শিভাল্‌রির নামে পাশ্চাত্যজগতে অনেক পাগ্‌লামীর অনুষ্ঠান হইয়াছে। তথাপি কোন জাতিকে বিচার করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান উচ্চ আদর্শরাজিদ্বারাই বিচার করিতে হয়, কারণ আদর্শের উচ্চতা দ্বারাই কেবল প্রচলিত অনুষ্ঠানের মহত্ত্ব অনুমান করা যায়। সকল প্রাচীন ও নবীন সভ্য জাতির সাহিত্যেই নারী জাতির প্রতি যেরূপ সম্মানসূচক কথা পাওয়া যায়, সেইরূপ তদ্বিপরীত বাক্যেরও অভাব নাই। খ্রীষ্টানদিগের ওল্ড টেষ্টমেণ্টে জ্ঞানী সলমনের

* Charles Lamb—Essays of Elia S. V. Modern Gallantry.

† The rigid treatment shown to prisoners of war in ancient times strongly marks the ferocity and uncultivated manners of our ancestors, and that even to ladies of high rank ; notwithstanding the homage said to have been paid to the fair sex in those days of chivalry.—Grose's Military Antiquities, Vol. II., p. 114. Buckle তাঁহার ইতিহাসে (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৩ পৃঃ পাদটীকা) বলেন 'It (the fact that the institution of chivalry had a tendency to improve manners) has been greatly exaggerated.' John Stuart Mill (Subjection of Women, Chap. III.) বলেন 'The practice of chivalry fell even more sadly short of its theoretic standard than practice generally falls below theory.'

বাক্যগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া, মধ্যযুগের ধর্ম্মযাজকগণ, ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্ষপীয়র, মিল্টন, বায়রণ, এবং উইডা, জোলা প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসলেখক ও লেখিকাগণ পর্য্যন্ত কেহই নারীজাতির প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মানুসারে স্ত্রীলোকেই মানবের পতনের কারণ, এইজন্য ইবের কন্যাগণ চিরকালই একটু সন্দেহের চক্ষে দৃষ্ট হইয়া আসিতেছেন। তথাপি ইহা হইতে পাশ্চাত্য-জগতে নারীজাতির প্রতি আচরণ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে তাহার প্রতি অন্যায় করা হইবে। আমাদের আলোচ্য হিন্দু-জাতি সম্বন্ধেও আমরা এই সতর্কতা অবলম্বন করিব। হিন্দুদিগের শাস্ত্র ও সাহিত্যে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে সকল উন্নত ধারণা ও আদর্শ লক্ষিত হয়, তাহা হইতেই স্ত্রীজাতিকে হিন্দুগণ চিরকাল কি ভাবে দেখিয়া আসিতেছেন তাহার একটি আভাস দিতে এবং হিন্দুদিগের সামাজিক রীতিনীতিদ্বারা সেই চিত্রের যাথার্থ্য প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিব।

জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দুর্ব্বলের রক্ষণ ও দুর্ব্বলের প্রতি সম্মান,—শিভাল্‌রির এই উচ্চতম আদর্শ প্রাচীন ভারতে যতদূর প্রতিপালিত হইত, এরূপ আর কোন প্রাচীন জাতির মধ্যে নহে। একথার ভূরি ভূরি প্রমাণ হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থ মহাভারত ও রামায়ণ হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে। সকলেই জানেন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে দূত অবধ্য। সূত্রগ্রন্থ সমূহেও ইহার বহুল প্রমাণ আছে। আপস্তম্ব বলেন যাহারা পলাতক, অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে এবং যাহারা উন্মুক্তকেশে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহারা অবধ্য। বোধায়ন বলেন, ভীত, সুরাবিহ্বল, উন্মত্ত, শস্ত্রহীন, স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধের সহিত যুদ্ধ অবৈধ। বশিষ্ঠ বলেন, যুদ্ধে নিহত সৈন্যদিগের পরিবার রাজা কর্ত্তৃক পালনীয়। বিখ্যাত গ্রীক ভ্রমণকারী মিগাস্থেনিস্ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তিন শতাব্দীতে বলিয়াছেন, "অন্যান্য জাতির মধ্যে যুদ্ধকালে ক্ষেত্রসমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলার রীতি

প্রচলিত, কিন্তু হিন্দুগণ যুদ্ধকালে পরস্পরকে বিনাশ করিতে তৎপর থাকিলেও কৃষকগণের প্রতি কোন অত্যাচার করে না।" অন্যত্র, "আর্য্যগণ শত্রুদিগকেও দাসত্বে পরিণত করিতেন না, স্বদেশীদিগের সম্বন্ধেত কথাই নাই।" সুসভ্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দাসত্ব প্রথার ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা হিন্দুদিগের এই ঔদার্য্যে মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।* মনুসংহিতায় এবিষয়ে যে নিয়মসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে আমাদের বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হইবে। "রথস্থ ব্যক্তি রথ ত্যাগ করিয়া স্থানস্থিত শত্রুর হিংসা করিবেন না, কৃতাঞ্জলি শত্রুকে মুক্তকেশ ও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আসনে আসীন ব্যক্তি-দিগকে, এবং "তোমার আমি" বলিয়া আত্মসমর্পণকারীকে নষ্ট করিবেন না। যাহার অস্ত্রশস্ত্রাদি ভগ্ন হইয়াছে, যাহারা যুদ্ধে পুত্রাদির শোকে কাতর হইয়াছে, অস্ত্রাঘাতে যাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, এবং যে ভীত হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, এ সকলকে রাজা হিংসা করিবেন না। যে নিদ্রিত বা বর্ম্মহীন অথবা উলঙ্গ কিম্বা নিরস্ত্র, যে অযুধ্যমান কেবল দর্শনার্থ আগত, এ সকলকে বধ করিবেন না।" অতিথিসম্বন্ধে মহাভারতে আছে—উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ। পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ॥ দুর্ব্বলের

* "As is well known, when a town was captured, the noblest and fairest ladies, whether married or not, became the property of the victors as their concubines. But a still more significant fact has not been adequately noted—that such a fact, though felt as a lamentable misfortune, was in no sense a dishonour to the Greek lady of which she need afterwards be ashamed." Prof. Mahaffy, Social Life in Greece, Chap. II., p. 33. দার্শনিক প্লেটো তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রে দাসত্বের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও যুক্তরাজ্যের দক্ষিণভাগে দাসত্ব ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। Old Testament এ পরাজিত শত্রুর নারীদিগকে বলপূর্ব্বক দখল করার বিধি আছে। (Denteronomy, XXI., 10-14.)

প্রতি সবলের সম্মাননীতির এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি থাকিতে পারে?

যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কুরুপক্ষীয় বীরগণের পাদ বন্দনা করিয়া যুদ্ধারম্ভ করেন। ভীষ্ম এবং দ্রোণ পাণ্ডবদিগের জয় হউক এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং যুধিষ্ঠিরকে স্ব স্ব মরণোপায় বলিয়া দেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোরতর সংগ্রাম করিলেও কুরু পাণ্ডবগণ বিশ্রাম সময়ে বিপক্ষশিবিরে গমনাগমন করিয়া কথোপকথন ও উপদেশ গ্রহণ করিতেন। রামায়ণে দেখা যায় রাবণ নিহত হইলে বিভীষণ পরস্ত্রী-হারীকে অগ্নি দিতে অস্বীকৃত হন, কিন্তু রাম রাবণের গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক মরণান্তে শত্রুতা নাই বলিয়া বিভীষণকে রাবণের অগ্নিসংস্কার করিতে সম্মত করেন। রাজস্থানের মারবারের ইতিহাসে টড একটি সুন্দর ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। পৃথ্বীরাজ এবং তাঁহার খুল্লতাত জয়মল্ল সমগ্রদিন বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া রাত্রে একত্র পানভোজন করেন। এই-সবগুলিই শিভাল্‌রিক ভাবের উচ্চতম নিদর্শন।

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় উচ্চতম ও উদার-তম অর্থে শিভাল্‌রি নহে, উহার অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ প্রয়োগ—নারী-জাতির প্রতি সম্মান। দেখা যাউক এই হিসাবে হিন্দুজাতি সভ্যজগতে কীদৃশ স্থান অধিকারের যোগ্য।

হিন্দুশাস্ত্রের ইহা একটি মূল নীতি যে স্ত্রীলোক মাত্রের দেহ পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, এবং সে যুদ্ধে অবধ্য। পরাশর সংহিতায় আছে বালিকাই হউক, বৃদ্ধাই হউক, স্ত্রীজাতি কখন অপবিত্র হয় না। মহাকবি ব্যাস ও বাল্মীকির অমর কাব্যদ্বয় হইতে এ বিষয়ে বহুদৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে হিন্দুর প্রাধান্য চির-প্রসিদ্ধ, দেহের বন্ধন হইতে আত্মার মুক্তি প্রত্যেক হিন্দুরই চরম লক্ষ্য। এই মহান্ লক্ষ্য অনুসরণে স্ত্রী তাহার প্রধান সহায়। বৈদিক সূক্ত-

সমূহের অনেক স্থানে আমরা দেখিতে পাই স্ত্রী স্বামীর দেবার্চ্চনার সঙ্গিনী হইয়া তাহার সহিত স্বর্গলাভেচ্ছু।* বৈদিক কালে কন্যা পতি-নির্ব্বাচন করিতে পারিত।+ সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ শাস্ত্রের এই বিধানটি সকলেই অবগত আছেন। রামায়ণে রাম সীতার হৈমী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, কারণ ভার্য্যা ব্যতীত যজ্ঞ অসিদ্ধ। ইহার সহিত পাঠক রোমান ক্যাথলিক দেশে ধর্ম্মযাজক-গণের অবিবাহিত থাকার নিয়ম তুলনা করিয়া দেখিবেন। শতপথ ব্রাহ্মণে স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে।‡ ঋগ্বেদে বিশ্ববারা প্রভৃতি রমণী ঋষি ঋত্বিকের কার্য্য করিতেছেন; ইহা হইতে তৎকালে স্ত্রীজাতি কতদূর শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্না ও পূজনীয়া ছিলেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।§ একটি সূক্ত হইতে অবগত হওয়া যায় স্বামিগৃহে তাহারা যথেষ্ট প্রভুত্ব করিত। "গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও; তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর।" "এই স্বামীর সহিত আপন শরীর সম্মিলিত কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিজগৃহে প্রভুত্ব কর।" "তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও।"‖ যাবজ্জীবন পিতা-মাতার সহিত অবস্থিতা রমণী পিতৃধনে অধিকারিণী ছিলেন, এবং পুত্র না থাকিলে বৈদিক সময়ে দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হইত। পুত্র থাকিলে কন্যা উত্তরাধিকারিণী হইত না বটে, কিন্তু সম্মানিত হইত।¶

* ঋগ্বেদ, ১ মণ্ডল, ১৩১ সূক্ত, ৩ ঋক্; ৫, ৪৩, ১৫; ইত্যাদি।

+ ১০, ২৭, ১২।   ‡ ৫, ২, ১, ১০।

§ ঋগ্বেদের অন্যান্য মহিলা ঋত্বিকের নাম:—রোমশা (১।১২৬।৭), লোপামুদ্রা (১।১৭৯।১-২), বাক্ (৮ মণ্ডল, ৭ অধ্যায়, ১১-১২ বর্গ), অদিতি (৪।১৮।৫-৭), অপালা (৮।৯১), যমী (১০।১০), উর্ব্বশী (১০।৯৫), মমতা (১০।২), শাশ্বতী (৮।২।৩৪), উশিজ (১।১১৬-২১), ঘোষা (১০।১৩৯-৪০), সূর্য্যা (১০।৮৫)। শেষোক্ত সূক্তের ২১।২২ ঋক্ হইতে জানা যায় বৈদিককালে কন্যা বিবাহলক্ষণযুক্তা হইলে বিবাহিত হইত।

‖ ১০, ৮৫, ২৬-২৭, ৪৬।   ¶ ২, ১৭, ৭ এবং ৩, ৩১, ১-২

বৃহদারণ্যক উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি ও তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীর কথোপকথনের উল্লেখ আছে, তাহাতে দেখা যায় যে নিগূঢ়তম আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের আলোচনাও তৎকালীন রমণীগণের অধিকার বহির্ভূত ছিল না। ঐ উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির সহিত রাজর্ষি জনকের সভায় বহুপণ্ডিত সমীপে গার্গীর যে বিচারের উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারা তৎকালে স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার অনুমিত হয়। গ্রীক ভ্রমণকারী মিগাস্থেনিস বলিয়াছেন বেদ ও দর্শনশাস্ত্র সমালোচনা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিলনা। মনু বলিয়াছেন, 'কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।' শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "প্রাচীন ভারতের সাহিত্যজ্ঞ ভারতের ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করিবেন যে গ্রীস ও রোমের সভ্যতার চরমোন্নতির দিনেও তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে স্ত্রীজাতির যেরূপ সম্মান ছিল তদপেক্ষা অধিক ছিল না।"*

বশিষ্ঠ বলেন, "পিতা জাতিচ্যুত হওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে পরিত্যক্ত হইবেন, কিন্তু পুত্রের নিকট মাতা কখন ত্যজ্য হইতে পারেন না।" ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, "উপাধ্যায় হইতে আচার্য্য দশগুণ, পিতা শিক্ষক হইতে একশতগুণ, মাতা পিতা হইতে সহস্রগুণ মাননীয়।"† মাতৃভক্তি স্বরূপ হিন্দুর এই মহান্‌গুণ সম্বন্ধে পরে আমাদের আরও বক্তব্য রহিল। পত্নীত্যাগী সম্বন্ধে আপস্তম্ব বলেন, যে অন্যায়রূপে পত্নীত্যাগ করে, সে গর্দ্দভ চর্ম্ম পরিধানান্তর ছয়মাস পর্য্যন্ত সপ্তগৃহে এই বলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে 'ভার্য্যাত্যাগীকে ভিক্ষা দাও'।‡ বশিষ্ঠ ও মনু উভয়েই

* সাধারণ সংস্করণ, ১৮৪ পৃঃ।

† ১৩, ৭-৪৮ ও মনু ২, ১৪৫।

‡ ১, ১০, ১৮-১৯।

গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* গার্হস্থ্য জীবনের পরিপূর্ণতা ও রমণীয়তা বিধানের পক্ষে গৃহিণীর আবশ্যকতা তাঁহারা যে সম্যক্ উপলব্ধি করিতেন, ইহা হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। মনু বলেন, 'স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।'† হিন্দুর ব্যবহার শাস্ত্র দায়ভাগ গৃহিণীর গৌরব স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছে—ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।

বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত, এবং বুদ্ধ হিন্দুদিগের নবমাবতাররূপে কীর্ত্তিত। সুতরাং হিন্দুদিগের নারীজাতির প্রতি সম্মানের দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিগুলির উল্লেখ অসমীচীন হইবে না। সতীধর্ম্মের বিরুদ্ধাচার বুদ্ধের আটটি আদেশের অন্যতম দ্বারা নিবারিত। সিগলোবাদ সূত্তে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—(১) ভার্য্যার প্রতি সসম্মান ব্যবহার করিতে হইবে, (২) ভার্য্যার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে হইবে, (৩) ভার্য্যার প্রতি অনন্যাসক্ত প্রেম থাকিবে, (৪) সকলের নিকট হইতে ভার্য্যার ন্যায্য সম্মান আদায় করিবে, (৫) ভার্য্যাকে উপযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার দিবে।

বেদ, উপনিষদ, সূত্র ও বৌদ্ধযুগের পর মনুর কাল। মনুসংহিতার দুই এক স্থলে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে নিন্দোক্তি আছে বটে, কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সেগুলির উল্লেখ করিব না। মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পড়িলে পাঠক জানিতে পারিবেন তৎকালে নারীজাতি সর্ব্বতোভাবে কিরূপ সম্মানার্হা বিবেচিত হইতেন, এবং তাঁহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সংহিতাকারের কতদূর

* বশিষ্ঠ, ৮, ১৫ ও মনু, ৩, ৭৭-৭৮।
†৯, ২৬।

আগ্রহ ছিল। "যে স্থলে নারীগণ পূজিত হন তথায় দেবগণ প্রসন্ন থাকেন। যে স্থলে তাঁহারা পূজিত হন না তথায় সমুদয় ক্রিয়া নিষ্ফল হয়। যে কুলে মহিলাগণ দুঃখভোগ করেন, তাহা শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে কুলে তাঁহারা দুঃখ পান না, তাহা সর্ব্বদা সমৃদ্ধিশালী হয়। যে গৃহে মহিলাকুল অপূজিত হইয়া শাপ প্রদান করেন, তাহা অভিচার-হতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।* নবোঢ়া স্ত্রী, স্নুষা, দুহিতা, বালক, রোগী, ও গর্ভবতী ইহাদিগকে কিছু বিচার না করিয়া অতিথিসেবার পূর্ব্বেই ভোজন করাইবে।† পত্নীর ভোজন সময়ে, হাঁচিবার সময়ে, কিম্বা জৃম্ভনকালীন, অথবা যথাসুখে অসংযত-রূপে বসিয়া থাকিলে তাহাকে দেখিবে না। পত্নী যখন আপন নেত্রদ্বয়ে কজ্জল প্রদান করেন, বা তৈলাদি ম্রক্ষণ করেন, অনাবৃত-শরীরা থাকেন, বা সন্তান প্রসব করেন, যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ আপনার তেজ ইচ্ছা করেন, তিনি এই সকল সময়ে তাহাকে অবলোকন করিবেন না। কন্যা একান্ত স্নেহের পাত্র, তাহারা তিরস্কার করিলেও অসন্তপ্ত মনে তাহা সহ্য করিবে, কোন মতে বিবাদ করিবে না।‡ বন্ধ্যা, অপুত্রা, নিষ্কুলা অথচ পতিব্রতা, বিধবা ও আতুরা স্ত্রীলোকদিগকে রাজা রক্ষা করিবেন। স্ত্রীলোকের রক্ষার নিমিত্ত দ্বিজাতিগণ শস্ত্র গ্রহণ করিবেন।§ পরস্ত্রী ও যে নারী পিতৃবংশীয়া নহেন, তাঁহাদিগকে ভবতি বা সুভগে অথবা ভগিনি বলিয়া সম্বোধন করিবে।‖ রথাদি যানারূঢ, নবত্যধিক বয়স্ক, রোগার্ত্ত, ভারবাহক, স্ত্রীজাতি, রাজা ও বিবাহ জন্য প্রস্থিত বরকে দেখিলে পথ ছাড়িয়া দিবে। স্ত্রীলোকের নাম সুখোচ্চার্য্য, অক্রূর, সুস্পষ্টার্থ, মনোহর, মঙ্গল্য, দীর্ঘবর্ণান্ত, আশীর্ব্বাদসূচক হওয়া কর্ত্তব্য।¶ সন্তান লাভ, ধর্ম্মকার্য্য, শুশ্রূষা, পবিত্র প্রণয়, নিজের এবং পিতৃকুলের

---

* ৩, ৫৬, ৫৭, ৫৮। † ৩, ১১৪। ‡ ৪, ৪৩, ৪৪, ১৮৫।
§ ৮, ২৮, ৩৪৯। ‖ ২, ১২৯, ১৩৮। ¶ ২, ৩৩।

স্বর্গলাভ সকলই দারাধীন।* পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর সকলেই বহুকল্যাণ বাঞ্ছা করিলে কন্যাকে ভূষণ দান ও পূজা করিবেন। যে কুলে স্বামী স্ত্রীতে এবং স্ত্রী স্বামীতে সন্তুষ্ট থাকেন, তথায় নিশ্চয়ই নিত্য কল্যাণ অবস্থান করে।† অতি নীচ শূদ্রজাতিও কন্যার শুল্ক গ্রহণ-করিবে না, শুল্ক গ্রহণকারী পিতাকে গোপনে দুহিতৃবিক্রয়ী বলা যায়।"‡ মহানির্ব্বাণতন্ত্রে নিম্নলিখিত সুন্দর শ্লোক কয়টি পাওয়া যায়—"ন ভার্য্যাস্তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা। ন ত্যজেৎ ঘোর কষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥ ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষনৈঃ। সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ॥ যস্মিন্নরে মহেশানি! তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা। সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃতস্তেন, ভবতি প্রিয় এব সঃ॥§ প্রাণতোষিণীতন্ত্রে ভার্য্যার আবশ্যকতা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্। ভার্য্যাহীনে গৃহং কস্ত তস্মাৎ ভার্য্যাং সমাশ্রয়েৎ॥" ॥

---

* ৯, ২৮। † ৩, ৫৫, ৬০।

‡ ৯, ৯৮ ও ৩, ৫১ বাইবেলের ওল্ড টেষ্টেমেণ্টে কন্যাবিক্রয়ের উল্লেখ আছে (Exodus, XXI ; 7).

§ ৮, ৩৯, ৪২, ৪৪।

॥ এস্থলে তন্ত্রোক্ত ভৈরবীচক্রের সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না। ৺অক্ষয়কুমার দত্ত ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় এবং Indo-Aryans গ্রন্থে ভৈরবীচক্রের যেরূপ নিন্দাবাদ করিয়াছেন, মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত বিধানাদিদ্বারা তাহা সমর্থিত হয় না। কলিযুগে মদ্যের পরিবর্ত্তে মধুরত্রয় (মধু, দুগ্ধ ও শর্করা) পান বিধেয় (মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৮ম উল্লাস ১৭১ শ্লোক)। রমণীগণ কেবল পানীয় আঘ্রাণ করিবেন, তাহার নাম গন্ধাঙ্গীকরণ। ভদ্রমণ্ডলী পরিমিত মাত্রায় পান করিবেন,—অতিপানাৎ কুলীনানাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে (৬, ১৯৪-৯৫)। পুরুষ অধুনা এত কামুক যে রমণীকে শক্তিরূপে জ্ঞান করিতে পারেনা, অতএব তাহারা মৈথুনতত্ত্বের পরিবর্ত্তে দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে (৮, ১৭২-৭৩)। অনির্ণিত ব্যক্তি ভৈরবীচক্রে প্রবেশ করিলে পরস্ত্রীগমন-দোষে দুষ্ট হইবে (৮, ১৭৮)। কুলার্ণব, শ্যামারহস্য প্রভৃতি তন্ত্রসমূহে অবশ্য এই অপেক্ষাকৃত পবিত্রভাব অনেক পরিমাণে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং রোম নগরে খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ১৮৬ অব্দে যেরূপ Bacchanalian Orgies প্রভৃতি ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মা-চরণার্থ গুপ্তসমিতি সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তন্ত্রোক্ত ভৈরবীচক্র প্রভৃতিও শেষে তাদৃশ দশাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

এপর্য্যন্ত আমরা হিন্দুর শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা হিন্দুদিগের ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং কাব্য ও নাট্যসাহিত্য হইতে বক্তব্য বিষয়ের উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করিব। বৈদিক-কালে রমণীগণ নিজ পতি মনোনীত করিতে পারিতেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। মনুসংহিতাতে অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে যে কয় প্রকার ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ অন্যতম।* কন্যা ও বর উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে।† ইহা অনেকটা আধুনিক পাশ্চাত্যবিবাহ প্রণালীর অনুরূপ। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে এইরূপেই বিবাহ করেন। মহাভারতে দ্রৌপদীর ও রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরের বিবরণ পাঠে তৃতীয় একপ্রকার বিবাহের কথা জানা যায়, এবং তৎকালে রমণীগণের যে স্বামী নির্ব্বাচন বিষয়ে অনেকটা স্বাধীনতা ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। স্বয়ম্বরেচ্ছু কন্যার বরমাল্য যাঁহার গলদেশে অর্পিত হইত তিনি আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিতেন এবং অনেক সময় প্রত্যাখ্যাত রাজন্যমণ্ডলীকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাঁহাকে স্বয়ম্বৃতার নির্ব্বাচনের যুক্তিযুক্ততার পরিচয় দিতে হইত। ঈদৃশ বিবাহোপলক্ষ্যে রাষ্ট্রবিপ্লবঘটাও অসম্ভব ছিল না। এই স্বয়ম্বর প্রথা অনেকটা ইউরোপীয় শিভাল্‌রির লুপ্ত 'টুর্ণামেন্ট' প্রথার ন্যায়। স্বয়ম্বরেচ্ছু কন্যা Queen of Beauty স্বরূপ এবং নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলী রঙ্গভূমে অবতীর্ণ যুদ্ধার্থী নাইটবৃন্দের সহিত তুলনীয়। রমণীগণ বহুমানাস্পদা না হইলে তাহাদের বিবাহের নিমিত্ত এতাদৃশ সমারোহ ও এতটা মনোমালিন্য ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। রঘুবংশের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি হইতেই স্বয়ম্বরেচ্ছু রমণীলাভে রাজন্যবর্গের আগ্রহাতিশয্য উপলব্ধি হইবে। "নিশীথে সঞ্চারিনী

* ৩, ২৫। † ৩, ৩২।

দীপশিখা রাজপথবর্ত্তী অট্টালিকাসমূহ অতিক্রম করিয়া গেলে তাহারা যেরূপ তমসাবৃত হয়, পতিংবরা ইন্দুমতী যে যে নৃপতিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের মুখশ্রীও তাদৃশ আকার ধারণ করিয়াছিল।"* দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির ভ্রাতাগণ ও আপনাকে পণ করিয়া অবশেষে শকুনির নিগ্রহবাক্যে প্ররোচিত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ করেন, পূর্ব্বে নহে।† বস্তুতঃ যুধিষ্ঠির জানিতেন যে নিতান্ত অদৃষ্টপরিচালিত হইয়াই তিনি এরূপ দ্যুতক্রীড়ায় প্রবর্ত্তিত হইতেছেন।‡ তথাপি তিনি যখন দ্রৌপদীকে পণ করিলেন তখন "ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সভাসদ্ বৃদ্ধগণ তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। সভা একেবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভূপতিগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের কলেবর হইতে ঘর্ম্মবারি নির্গত হইতে লাগিল। বিদুর মস্তকধারণপূর্ব্বক পন্নগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ গতসত্বের ন্যায় অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন।"§ এই দ্রৌপদীপণকেই ব্যাসদেব মহাভারতরূপ মহা নাটকের কেন্দ্রীভূত ঘটনাস্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা হইতেই কুরুক্ষেত্রের মহাহব অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, নিয়তিচক্রের এই ঘোরতর আবর্ত্তনেই কবি ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় বিকাশের সুযোগ পাইয়াছেন। সুতরাং এই হিসাবে এই দ্রৌপদীপণরূপ গুরুতর ঘটনা মহাভারতের বিপুল কলেবরেও আর নাই। অন্যত্র যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীসম্বন্ধে বলিতেছেন "আমাদের প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যা দ্রৌপদী জননীর ন্যায় পালনীয়া এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় পূজনীয়া।"॥ সমগ্র রামায়ণের মূলে দুটি

---

* রঘুবংশ, ৬, ৬৭।

† চন্দ্রনাথ বাবুর 'হিন্দুত্ব' দেখ।

‡ সভাপর্ব্ব, দ্যূত পর্ব্বাধ্যায়, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

§ ঐ, ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

॥ বিরাটপর্ব্ব, পাণ্ডবপ্রবেশ পর্ব্বাধ্যায়, তৃতীয় অধ্যায়।

নারী,—কৈকেয়ী ও সীতা স্ত্রীজাতির অপকর্ষও উৎকর্ষের চরম দৃষ্টান্ত। সীতাকে এতকাল নিকটে রাখিয়া অসহ্য কামোন্মত্ততা সত্ত্বেও রাবণ যে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার পাপাচরণ করিতে সাহস পায় নাই, ইহা কি পুরাকালে নারীমর্য্যাদাজ্ঞানের বিশিষ্ট প্রমাণ নহে? বাল্মীকির সুন্দর ভাষায় বলিতে গেলে,* সিন্ধু যেরূপ বেলাভূমি লঙ্ঘন করিতে পারে না, জানকীর সতীত্বধর্ম্মকে কামুক রাবণ সেইরূপ লঙ্ঘন করিতে অশক্ত হইয়াছিল। দীপ্ত অগ্নিশিখা যেরূপ স্বতেজে অস্পৃশ্য, জানকী সেইরূপ রক্ষঃপুরে অস্পৃশ্যা ছিলেন। তাঁহার পাতিব্রত্য তেজই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন; প্রভা যেমন ভাস্করের, তিনিও সেইরূপ রামেরই ছিলেন। বৈদেহীর জন্য রামের কতখানি মমত্ব ছিল, তাহা জানিতে হইলে পাঠক অযোধ্যাকাণ্ড, পঞ্চনবতিতম সর্গ পড়িয়া দেখিবেন। রাম বলিতেছেন "হে দেবি, যদি তোমার দুঃখ হয়, তবে আমি স্বর্গও অভিলাষ করিনা।···আমি অরণ্যেও তোমাকে রক্ষা করিতে পারি, কিন্তু তোমার অভিপ্রায় অবগত না হইয়া তোমাকে অরণ্যবাসিনী করিতে অভিলাষ করি নাই।" অন্যত্র, "আমি তোমার সহিত এই স্থানে (চিত্রকূট পর্ব্বতে) ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া মধু ও ফলমূল আহার করতঃ অযোধ্যা ও রাজ্যের বাঞ্ছা করি না।"† সীতা কতখানি স্বামী সোহাগিণী ছিলেন, নব্যপাঠিকার তাহা জানিতে ঔৎসুক্য থাকিলে অরণ্যকাণ্ডের সপ্তচত্বারিংশ ও ষট্‌পঞ্চাশ সর্গে রাবণের প্রতি তাঁহার গর্ব্বদৃপ্ত ভর্ৎসনা পড়িবেন, বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। হিন্দু যেরূপ সতীত্বের গৌরব বুঝিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক কোন পাশ্চাত্য জাতি বুঝেন নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলিতেছেন "সতীনাং পাদরজসাসদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা। পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে

---

* যুদ্ধকাণ্ড, বিংশাধিকশততম সর্গ।

† অযোধ্যাকাণ্ড, পঞ্চনবতিতম সর্গ।

পাতকান্নরঃ॥"* বরাহপুরাণ বলেন "বীতরাগ ব্রতীদিগের দেবতা আকাশে থাকেন, কিন্তু যাহাদের ভার্য্যা আছে তাহাদের দেবতা গৃহেই আছেন।"‡ সাবিত্রীসম্বন্ধে মহাভারতকার বলিতেছেন, "তান্তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা: ন কশ্চিৎ বরয়ামাস তেজসা প্রতিবাধিতঃ।" সতীত্ব তেজের মাহাত্ম্য এইরূপই বটে, মনে মনে যাহাকে বরণ করা যায়, তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় পতিগ্রহণ সাবিত্রীর পক্ষে অসম্ভব ছিল, কারণ "মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে। ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ, প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥" শোকতপ্ত নলরাজা ভার্য্যাকেই পরমঔষধ জ্ঞান করিয়াছিলেন—"ন চ ভার্য্যাসমং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে ভিষজাং শতং। ঔষধং সর্ব্বদুঃখেষু সত্যমেতদ্‌ব্রবীমিতে॥" "ভার্য্যা ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, পরম বন্ধু ও ত্রিবর্গলাভের মূল কারণ। ভার্য্যাবান লোকেরাই ক্রিয়াশালী হয়; ভার্য্যাবান লোকেরাই গৃহী বলিয়া পরিগণিত হয়; ভার্য্যাবান লোকেরাই সর্ব্বদা সুখী হয় এবং ভার্য্যাবান লোকেরাই সৌভাগ্য সম্পন্ন হয়; প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা অসহায়ের সহায় স্বরূপ, ধর্ম্মকার্য্যে পিতাস্বরূপ, আর্ত্তব্যক্তির জননীস্বরূপ, এবং পথিকের বিশ্রামস্থানস্বরূপ। ভার্য্যাবান ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাসভাজন। মরণান্তে আর কিছুই অনুগামী হয় না, কেবল পতিব্রতা পত্নীই সহগামিনী হইয়া থাকেন।... পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্রনামধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অতএব পুত্রপ্রসবিণী ভার্য্যাকে সাক্ষাৎ মাতা বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য।...মনুষ্য শারীরিক বা মানসিক পীড়াদ্বারা যতই কেন কাতর হউক না, প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অবলোকন করিলে সুশীতল জলে প্রগাঢ় আতপতাপিত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইয়া পরমপরিতোষ

---

† ৮৩ অধ্যায়।

‡ ব্রতিণাং বীতরাগাণাং দৃশ্যন্তে দিবিদেবতাঃ। মনুষ্যাণাং তু ভার্য্যা বৈ তত্র দেশে চ দৃশ্যতে॥

লাভ করে। ভার্য্যা কর্ত্তৃক সাতিশয় ভর্ৎসিত হইলেও তাহার অপ্রিয় কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে। কারণ রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম এই তিন সুখ সাধনই ভার্য্যার আয়ত্ত।"* পুনশ্চ, "গৃহস্থের গৃহ পুত্র, পৌত্র, বধূ ও ভৃত্যগণে পরিপূর্ণ থাকিলেও ভার্য্যাবিরহে শূন্য প্রায় হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা গৃহিণীশূন্য গৃহকে গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। গৃহিণীই গৃহস্বরূপ কথিত হইয়া থাকে। গৃহিণীশূন্য গৃহ অরণ্যপ্রায়।...এই পৃথিবীতে যাহার ভার্য্যা এইরূপ পতিহিতৈষিণী ও পতিপরায়ণা, সেই ধন্য।...সস্ত্রীক ব্যক্তির বৃক্ষমূলও গৃহস্বরূপ ও ভার্য্যাহীন পুরুষের অট্টালিকাও অরণ্য তুল্য বোধ হয়, সন্দেহ নাই। ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থকামসাধন সময়ে একমাত্র সহায় ও বিদেশ গমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্য্যার তুল্য পরমধন আর কেহই নাই। ধর্ম্মসংগ্রহ বিষয়ে ভার্য্যাই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে। পতিব্রতা প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা যাহার গৃহে নাই, তাহার অরণ্যে গমন করাই কর্ত্তব্য। তাহার গৃহ ও অরণ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।"† মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে বিদুলা নামক 'রাজসমাজবিশ্রুত বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞ কামিনী'র, উল্লেখ পাওয়া যায়। পুত্র সৈন্ধবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলে তিনি যেরূপ তেজোগর্ব্বিত বাক্যে পুত্রকে কর্ত্তব্যসাধনে প্ররোচিত করিয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও এস্থলে তাহা উদ্ধার করিয়া দেওয়ার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বিদুলা বলিতেছেন, "হা অরাতিহর্ষবর্দ্ধন কুসন্তান! তুমি আমার গর্ভে বা তোমার পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ কর নাই।

* আদিপর্ব্ব, সম্ভব পর্ব্বাধ্যায়, চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় (উপরোক্ত অনুবাদ সমূহ কালী প্রসন্ন সিংহের বাঙ্গালা মহাভারত হইতে গৃহীত)।

† শান্তিপর্ব্ব, আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়, চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। অনুশাসনপর্ব্ব, ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়েও স্ত্রীজাতির প্রভূত প্রশংসা আছে, বাহুল্যবোধে উদ্ধৃত হইল না।

...অরিপরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিওনা; জীবনে নিরপেক্ষ হইয়াও পরাক্রম প্রকাশ কর।...হয় স্বীয় প্রভাব উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ প্রাণ পরিত্যাগ কর। লোকে যাহার অদ্ভুত মহৎ চরিত্রের বিষয় জল্পনা না করে, সে স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়, তাহার জন্ম কেবল সংখ্যা-বর্দ্ধনের নিমিত্ত।...কোন কামিনী যেন ক্রোধশূন্য নিরুৎসাহ নির্বীর্য্য শত্রুকুলের আনন্দজনক পুত্র প্রসব না করে; আর ধূমায়িত হইও না, প্রজ্বলিত হইয়া শত্রু সংহার কর।...যে নর স্ত্রীলোকের ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করে, তাহার পুরুষ নামের কিছুই সার্থকতা থাকেনা ...তুমি ভৃত্যবর্গ কর্তৃক পরিত্যক্ত পরপিণ্ডোপজীবী সত্বশূন্য দীনগণের বৃত্তির অনুবর্ত্তন করিও না।...আমি মহাকুল প্রসূতা; এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে গমনের ন্যায় এই বংশে সমাগত হইয়াছি। আমি সকলের কর্ত্রী ছিলাম। ভর্ত্তা আমাকে পরম সমাদর করিতেন। পূর্ব্বে তুমি আমাকে মহার্হ বসন, আভরণ ও মাল্যে বিভূষিত ও সুহৃদ্গণে পরিবৃত দেখিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমাকে এবং তোমার ভার্য্যাকে সাতিশয় দীনভাবাপন্ন দেখিবে, তখন তোমার জীবনধারণ ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইবে।...হে সঞ্জয়! যদি দাস, কর্ম্মকর, ভৃত্য, আচার্য্য, ঋত্বিক ও পুরোহিতগণ জীবিকা প্রাপ্ত না হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তোমার জীবনধারণের প্রয়োজন কি? আমি যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ন্যায় তোমার যশস্য ও শ্লাঘনীয় কার্য্য না দেখিব, তদবধি কখনই আমার শান্তিলাভ হইবেনা। ব্রাহ্মণের নিকট 'না' এই কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি বা আমার ভর্ত্তা আমরা কেহই কখন ব্রাহ্মণের নিকট 'না' বলি নাই। আমরা লোকের আশ্রয়; কখন পরের আজ্ঞাকারী হই নাই; এক্ষণে যদি আমাকে অন্যের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা হইলে, আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।...

এই কুলসম্ভূত কোন ব্যক্তিই কখন পরের অনুগমন করেন নাই। অতএব তোমারও পরের অনুগামী হইয়া জীবনধারণ করা কর্ত্তব্য নহে।...যে ব্যক্তি উদ্যোগশূন্য অবিনীত দুর্ব্বুদ্ধি পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হয়, তাহার জন্ম বৃথা।...হে পুত্র! সমুদায় সৈন্ধবকে নিহত করিয়া যখন তোমাকে জয়লাভ করিতে দেখিব, তখন তোমাকে সম্মান করিব।" বলা বাহুল্য, বিদুলার বাক্যে লজ্জিত ও উৎসাহিত হইয়া সঞ্জয় যুদ্ধে সম্মত ও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বিদুলার ভর্ৎসনার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে বংশাভিমানিনী তেজোদৃপ্তা বীর মহিলার তীব্র অপমান জ্ঞান বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। যতদিন ভারতে ঈদৃশী মাতা ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের পুত্রগণও বীরজগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ এই মহাকাব্য দুখানির পাঠকমাত্রেরই এক সংযমী, শূরী, তেজঃপুঞ্জ সমন্বিত, উদারহৃদয়, আর্ত্তসহায়, ও অবলাজাতির প্রতি ভক্তি প্রীতি সম্পন্ন জাতির কথা মনে পড়ে। যাহাদের সহিত বর্ত্তমান অধঃপতিত দুর্ব্বল ভীরু হিন্দুদিগের অল্পই সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক যুগের পরবর্ত্তী-কালে হিন্দুর নারীমর্য্যাদা কিরূপভাবে ছিল আমরা তাহা আগামীবারে আলোচনা করিব।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দক্ষিণাফ্রিকায় ভারতোপনিবেশ।

যদিও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গভূমিই বহুকাল অসাধারণ প্রতিভাশালীত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও-বিদ্যাগৌরবের পরিচয় দিয়া আসিতেছে, কিন্তু বৈদেশিক উপনিবেশ বিষয়ে বঙ্গবাসী, বিশেষতঃ বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়, অন্যান্য জাতির বহু নিম্নস্তরে অবস্থিত। বঙ্গীয় যুবকগণ যে আজ 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া সামান্য চাকরীর জন্য অশেষবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন, পিতৃপুরুষের ভিটা ত্যাগ করিয়া দূরদেশে যাইতে অনিচ্ছা ও ঔপনিবেশিক বিষয়ের অনাস্থা তাহার অন্যতম কারণ। পরলোকগত মাননীয় জষ্টিস রাণাড়ে বলিতেন, ভারতবাসীর ভাবী উন্নতি বহুল পরিমাণে বৈদেশিক উপনিবেশের উপর নির্ভর করে। হণ্টারও আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক উভয়বিধ উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যদ্যপি শিক্ষিত ভারতবাসীর মজ্জাগত বিদেশবিতৃষ্ণা না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা আজ দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রকৃষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিতেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে এখন ছয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে (১) নাতাল (২) কেপ কলোনী (৩) ত্রান্সভাল (৪) অরেঞ্জ রাজ্য (৫) রোডেশিয়া এবং (৬) দিলাগোয়া। প্রথমোক্ত পাঁচটি প্রদেশ এখন ইংরাজরাজ্যভুক্ত। ইংরাজীভাষী ইউরোপীয় অধিবাসীর সংখ্যা তথায় দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। দিলাগোয়া উপসাগরান্তর্গত প্রদেশ পর্ত্তুগীজদিগের অধীন এবং পর্ত্তুগীজ জাতিদ্বারা অধ্যুসিত। এতদ্ভিন্ন সমগ্র দক্ষিণাফ্রিকায় তদ্দেশজ বহুবিধ আদিমজাতি বাস করিয়া থাকে।

ইংরাজাধিকৃত দেশসমূহে বিশেষতঃ নাতাল প্রদেশে অসংখ্য ভারতবাসী আছে—ইহাদের আদিস্থান—মধ্য ভারত, বোম্বাই বা মান্দ্রাজ প্রদেশ। অধিকাংশ ভারতবাসীকে তথায় মুছলকা বা অঙ্গীকারপত্র দিয়া থাকিতে হইয়াছে। তাহারা কৃষীক্ষেত্রে বা গৃহভৃত্যের কার্য্যে পাঁচ বৎসরের জন্য আইনানুসারে 'প্রতিশ্রুত' হইয়া মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে কার্য্য করিয়া থাকে। প্রত্যেক বৎসর মাসিক ১৲ টাকা হারে বেতন বৃদ্ধি পায়। তাহাদের নিয়োগকর্ত্তা প্রভুরা তাহাদের যাতায়াতের খরচ ও খোরাকপোষাকের ভার লইয়া থাকেন। সেদেশে স্বাধীন ভারতীয়গণ অধিকাংশ বোম্বাই প্রদেশবাসী—তাহারা ফেরীওয়ালা বা সামান্য দোকানদারের কার্য্য করিয়া থাকে; কেহ কেহ শিল্পব্যবসায়ী, এবং অতি অল্প সংখ্যক লোক ভারতীয় সওদাগরী আপিসে কেরাণিগিরি কার্য্য পাইয়াছে। কিন্তু কোন ইউরোপীয় কারবারে ভারতবাসীকে কেরাণী রাখা হয় না। পর্ত্তুগীজাধিকৃত দিলাগোয়া প্রদেশ ভিন্ন সমগ্র দক্ষিণাফ্রিকায়, ভারতবাসীমাত্রেই আজি পর্য্যন্ত, সাধারণতঃ কুলির ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সুতরাং আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত লোকও যদি এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন, তাঁহাদিগকে কুলির ন্যায় ব্যবহার করিবে, এমন কি হোটেলে বাসস্থান দিতে অস্বীকৃত হইবে, ইহাও বিচিত্র নহে!

যাহারা কোন প্রকার ইউরোপীয় ভাষায় একখানি নির্দ্দিষ্ট ফারম পূর্ণ করিতে না পারে, নাতালে তাহাদিগকে আদৌ প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। তথাকার লাইসেন্স বিভাগের কর্ম্মচারীগণকে এরূপ অসীম ক্ষমতা দিয়া রাখা হইয়াছে, যে তাহারা বাৎসরিক লাইসেন্স দিবার সময়, অতি কঠোর নিয়মাবলী প্রয়োগ করিয়া থাকে। ভারতবাসীদিগকে কোনপ্রকার ব্যবসায়ের লাইসেন্স দিবার বিরুদ্ধে, এবং তাহাদিগের প্রসার হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যেই বিশেষতঃ এই সকল

আইনের সৃষ্টি। ট্রান্সভালে ভারতবর্ষীয়েরা ব্যবসায় করিতে বা (স্থান বিশেষ ভিন্ন) ভূমিসম্পত্তির অধিকারী হইবার উচ্চাকাঙ্খা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। ভারতবাসী তথায় রাজবর্ত্মের ফুট-পাথের উপর দিয়া চলিয়া যাইবার উপযুক্ত নহে; এবং অরেঞ্জরাজ্যে গৃহভৃত্যরূপে ভিন্ন প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে না।

অবস্থা এইরূপ। এখন স্বজাতিবৎসল, আত্মশ্রদ্ধাসম্পন্ন প্রত্যেক শিক্ষিতাভিমানী ভারতবাসী একবার ভাবিয়া দেখুন। দরিদ্র ও অশিক্ষিত ভারতবাসীর পশ্চাতে যদি শিক্ষিতসম্প্রদায় দক্ষিণাফ্রিকায় পদার্পণ করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষীয়েরা তথায় এরূপ হেয় ও জঘন্যভাবে ব্যবহৃত হইতে পারিত না, এবং ভারতবিরোধীভাব চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া ভারতবিদ্বেষসম্ভূত আইনকানুনের প্রচলন হইতে পাইত না। এখন যদি শিক্ষিত ভারতবাসীগণ, দক্ষিণাফ্রিকাকে কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়া, তথায় উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে লণ্ডনস্থ ঔপনিবেশিক মন্ত্রীগণের ও ভারত গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ও স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মাগণের ও সভাসমিতির সহৃদয় চেষ্টায় উল্লিখিত অসুবিধা অযোগ্যতা, ও ব্যাঘাতের কারণ সমূহ ন্যায়ানুগত উপায়ে নিরাকৃত হইয়া যাইবে। তথায় ভারতাবমাননার প্রতিকারের উপায়, একমাত্র ভারতীয় শিক্ষিতসম্প্রদায়ের হস্তে। ব্যারিষ্টার, ডাক্তার প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ, যদি ফার্গুসন কালেজের অধ্যাপকগণের ন্যায়, আগ্রহ ও ঔৎসুক্যে উত্তেজিত হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, এবং স্ব স্ব অর্জ্জিত জ্ঞানরাশি, স্বদেশের গৌরব-কল্পে উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে কখনই উল্লিখিত কঠোর নিয়মাবলী প্রচলিত থাকিতে পারিবে না।

যদি এইরূপে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত ভদ্রলোক, হৃদয়ের নবীন উৎসাহে বলীয়ান্ হইয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন, তাহা হইলে স্বদেশের প্রভূত উপকার হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পদোচিত

উপযুক্ত জীবিকানির্ব্বাহের জন্যও নিরাশ হইতে হয় না। হিন্দুগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহারা এই বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক হইতে পারেন। কারণ তাঁহাদের মহিলারা শিক্ষিতা, এবং সামাজিক প্রতিবন্ধক তাঁহাদিগের অল্প। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যেও অত্যধিক প্রতিবন্ধক এখন আছে তাহা অনুমান হয় না। অতি প্রাচীনকালে হিন্দুরা আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ সরস্বতীও দৃষদ্বতীর মধ্যভাগস্থ প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলে সমাজে নিন্দার্হ হইতেন। আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন স্থান তাঁহাদের চক্ষে অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। ক্রমশঃ আর্য্য-জাতি যেমন ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের যাতায়াতেরও প্রসার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে মুষলমানদিগের শাসনকাল পর্য্যন্ত পশ্চিমে সিন্ধু ও পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং অন্যান্যদিকে আসমুদ্র পর্য্যন্ত প্রদেশ হিন্দু ভ্রমণকারী ও তীর্থযাত্রীর গণ্ডির মধ্যগত ছিল। সিন্ধুর ওপারে ম্লেচ্ছদেশ ও ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইলেই পাণ্ডব বর্জ্জিতদেশ বলিয়া ঘৃণার্হ ছিল। কিন্তু ইংরাজাধিকারের সময় হইতে এই কূপমাণ্ডুকীত্বভাব তিরোহিত হইয়া, গত শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ সময় পর্য্যন্ত, কাবুল বেলুচিস্থান, মরিচশহর (মরিশাস), সিংহল, আন্দামানদ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণোদ্দেশে বা জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য গমন করিলে আর হিন্দুসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয় না। আবার সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে আফ্রিকায় মোম্বাসা রেলওয়ে খোলা পর্য্যন্ত, ও চীনদেশে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে, বহুসংখ্যক হিন্দু বিশেষতঃ বাঙ্গালী আফ্রিকা ও চীনদেশে গিয়া চাকরী করিতেছেন। তাহাতে এখন আর বাঙ্গালী গোঁড়া হিন্দুর জাতি যায় না।

যাঁহারা স্বদেশের কর্ত্তব্যসাধনার্থ, মাতৃভূমি পুণ্যভূমি হিন্দুস্থানের নষ্টগৌরব উদ্ধারার্থ দক্ষিণাফ্রিকায় যাইবেন প্রথম প্রথম কিছুদিন তাঁহাদের অসুবিধা সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু স্বদেশহিতকর কার্য্য

বলিয়া, ও ধর্ম্মপথে থাকিয়া স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জনদ্বারা, সে ক্ষতি অত্যধিক পরিমাণে পূরণ হইয়া যাইবে। ইউরোপীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যারিষ্টার, ডাক্তার প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ীগণ, দক্ষিণ আফ্রিকায়, ন্যায়ানুগত উপায়ে, ভালরকম জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবেন কি না? আমি হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে সতেজে উত্তর করিতেছি যাঁহারা আদর্শ জীবনের কর্ত্তব্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ নহেন, তাঁহারা অবশ্য পারিবেন। যথার্থ সত্য (যদিও বাহ্যিকদৃশ্যে তদ্রূপ অনুমিত হয়) কখনও ত্রিজগতে অশুভ ফল প্রসব করিতে পারে না। দক্ষিণাফ্রিকায় আর্থিক উন্নতির পথ সুগম। কিন্তু সে পথের পথিককে উত্তেজিত করা আমার এখানে উদ্দেশ্য নহে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত লোক কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, যে মানবজাতি কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রতিপালন করিবার জন্য ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রতিপালনে মানব মনে যে সুবিমল আনন্দধারা প্রবাহিত হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়। কোন প্রকার পার্থিব ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, বা পদমর্য্যাদা, তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় যে অন্যান্য ভারতবাসীর ন্যায় বিবিধ উপনিবেশ সমূহে পদার্পণ করেন নাই, তাহা তাঁহাদের একটি জাতীয় মহাভ্রম। এই ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য প্রথম প্রথম অসুবিধা ভোগ করিয়াও, আমাদের কতক কতক যাইতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। আর দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবেশ করা আদৌ আত্মবলিদান নহে। সংসারে সুখ বা দুঃখ আর কিছুই নহে, মানসিক অবস্থার ভাবান্তর মাত্র। একজনের পক্ষে যাহা সুখ, অপরের পক্ষে তাহা দুঃখ। দরিদ্রের পক্ষে যাহা ঐশ্বর্য্য, বিলাসীর পক্ষে তাহা দারিদ্র্য, সুতরাং আনন্দ বা নিরানন্দ বহুল পরিমাণে আমাদের মানসিক বল বা দুর্ব্বলতার উপর নির্ভর করে, সেইজন্য আমার মত যে, কাহারও নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। এবং সেই

কারণেই আমি 'ভারতী'র পাঠকবর্গের নিকট এই কথা উত্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। যাঁহারা দক্ষিণাফ্রিকায় যাইবেন, উপযুক্ত ধন ও পদমর্য্যাদা তাঁহাদের স্বতঃই আশ্রয় করিবে। তাই বলিয়া উহাকে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য করিয়া যাইতে আমি আহ্বান করিতেছি না। যদ্যপি উহা কাহাকেও আশ্রয় করে, উহা সভয়ে ও কম্পিত হস্তে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কারণ উহাতে মানুষকে কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলে। প্রধান উদ্দেশ্য থাকিবে, স্বদেশের উপকার, স্বজাতির লুপ্তগৌরব উদ্ধার। নিজে কিছুদিন অপমান সহ্য করিয়া চিরতরে জাতীয় সম্মানের প্রতিষ্ঠা করা। যদ্যপি দক্ষিণাফ্রিকায় যাইবার এখন উপযুক্ত লোকের অভাব হয়, তাহা হইলে যত দিন সেরূপ লোক অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক না হয়েন, সেই দিনের জন্য আমাদিগকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। যদ্যপি ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় তথায় কেবল ধনতৃষ্ণা নিবারণ করিতে যাইতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলে এক দিকে তাহাতে মাতৃভূমির ক্ষতি, পক্ষান্তরে তথাকার ভারতীয় ঔপনিবেশিকদিগের কোন লাভের আশা নাই।*

এম, কে, গান্ধি।

---

* যে গুজরাটী বীরপুরুষ তাঁহার বঙ্গবাসী ভ্রাতাদের তাঁহার বীরত্বের পদাঙ্কানুসরণ করিতে আহ্বান করিতেছেন, দক্ষিণাফ্রিকায় তাঁহার কীর্ত্তি কতদূর অসাধারণ, 'ভারতী'র পাঠকেরা সম্বাদপত্রের স্তম্ভে তাহার বিবরণ যথাকালে পাঠ করিয়াছেন আশা করা যায়। ১৩০৭ সালের ভাদ্র মাসের 'ভারতী'তে "বুয়র ও ভারতবাসী" নামক প্রস্তাবে ইহার সবিশেষ উল্লেখ ছিল।

এই প্রবন্ধটি মি, গান্ধি 'ভারতী'র জন্য ইংরাজীতে লিখিয়া আমাদের উপর ভাষান্তরের ভারার্পণ করিয়াছেন। ভাঃ সং।

বাঙ্গালী পাড়ায়।

বহুদিন পরে বাঙ্গালী পল্লীতে প্রবেশ করিলাম। পরস্পর-ব্যবহিত সমুচ্চ প্রাসাদ, মর্ম্মর বারান্দা ও ফিট্‌ফাট্ টেনিসকোর্ট নাই। ঝক্‌ঝকে রাজপথে, টম্‌টমে, ক্রহামে, বাইসিক্লে ও ঠিকা বগিতে পুং ও স্ত্রী শ্বেতমুখের অবিরাম অনুবৃত্তি নাই। শুধু গায়ে-গায়ে-সংলগ্ন, ছোট বড়-মাঝারি, নূতন-পুরাতন, সুন্দর-কুৎসিৎ শত শত শত গৃহ আর পোড়া মাটীর মত মোলায়েম, কাঁচা সোনার মত সুন্দর শ্যামবর্ণের শত শত সহস্র মনুষ্যমুখ। এই সকল গৃহগুলি যেমন বিলাস ঐশ্বর্য্যের চিহ্নশূন্য, এই সকল মুখগুলিও তেমনি তেজস্বিতার দৃপ্ত দীপ্তিহীন। হায়! এ গৃহগুলির শাদ্বলগৌরব বিকাশের সামর্থ্য কোথায়? কেহ এক কাঠা, কেহ দুই কাঠা, কেহ তিন কাঠা মাত্র জমির উপর কষ্টে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই মধ্যে কত অসংখ্য সুকুমার বালক ও বালিকা, পুরুষ ও রমণীর আশ্রয় সংস্থান করিতে হইবে। রৌদ্র, বৃষ্টি ও শীতের দুরন্ত প্রকোপ হইতে রক্ষা করিয়া সস্নেহে কত অগণিত প্রাণীকে বক্ষে স্থান দিয়া ইহারা গৃহজন্ম সার্থক করিতেছে;—কানন উপবনের শোভা যে ধারণ করিতে পারে না তাহাতে লজ্জার কোন কারণ নাই। আর এই মনুষ্য সব? ইহাদের মধ্যে কটী প্রাণী নিশ্চিন্ত?—কোন অতিমাত্রিক সুখসম্পদ সম্বন্ধে নহে—শুধু প্রতিদিনের অন্নবস্ত্র সম্বন্ধে? পনেরো বিশ ত্রিশটি মাত্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট মাসিক আয়—এমন ভদ্র গৃহস্থ পরিবার এই কলিকাতা মহানগরীতে কত সংখ্যাহীন? মুখে চক্ষে তেজোদপ্ত দীপ্তির সামর্থ্য ইহাদেরই বা কোথায়?

কিন্তু তাই কি? স্বভাবে যদি তেজ থাকে দারিদ্র্যের পীড়নে কি তাহা লুপ্ত হয়? আমাদের সহিত তুলনায় জাপানের কথাটা আজকাল

সর্ব্বদাই মনে পড়ে। জাপান আমাদেরই মত দরিদ্র ছিল, আমাদেরই মত পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপে প্রপীড়িত। কিন্তু জাপান সেই চাপ দুইদিন নিঃশব্দে সহ্য করিয়া, ঠেলিয়া, মাথা তুলিয়া উঠিল, প্রতিপক্ষকে কুস্তির এক প্যাঁচে শত হস্ত দূরে ফেলিয়া দিল। আর আমরা? আমাদের লালসা আছে, সাধনা নাই; সাধ আছে, কৌশল নাই; কষ্ট আছে, কষ্ট অতিক্রমের দৃঢ় অধ্যবসায় নাই। কিন্তু থাক্; কি নাই তাহা এখন ভাবিব না, কি আছে তাহাই একবার দেখি, একবার খুঁৎ ধরিতে বসিলে খুঁতের আর অন্ত থাকে না। আছে;—এই সকল গৃহের মধ্যেও শোভা সম্পদ আছে এবং এই সকল মনুষ্য মধ্যেও দুর্লভ মনুষ্যত্ব আছে। যদি উভয়কে ভাল করিয়া জানিতে চাই তবে উভয়েরই ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই পাইলাম—অঙ্গন। বহিরঙ্গন ও অন্তরঙ্গন। বাঙ্গালী-গৃহের অঙ্গনে যে মাধুর্য্য, যে মনোরমতা, আমি ইংরাজী পল্লীর টেনিসকোর্টে তাহা দেখিতে পাই না। গৃহের প্রাচীরে বদ্ধ হইয়াও এতখানি মুক্ত আকাশ মাথার উপর। গৃহের সব কক্ষগুলি ইহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রহিয়াছে। প্রতিকক্ষবাসী নরনারী ইহার নিকট অপক্ষপাতে সমান আলোক ও বায়ু লাভ করিতেছে। সূর্য্য এইখান দিয়া অসূর্য্যম্পশ্যাগণের নয়নগোচর হইতেছেন, চন্দ্র এইখান দিয়া তাঁহার সমস্ত জ্যোৎস্নাসম্পদ উপঢৌকন আনিতেছেন, বৃষ্টির টাপুর টুাপুর এইখানেই প্রথম অমৃতবর্ষণ করিতেছে। এই অঙ্গনে রোপিত গুটিকত বেল, মল্লিকা, যূঁই ও চাঁপার ডালে যে ফুল ফুটিতেছে, সেই ফুলের বোঁটাতে, সেই ফুলের পাপড়িতে, সেই ফুলের গন্ধে পুষ্প-জগৎ ও সৌন্দর্য্য-জগতের সহিত শিশুগণের প্রথম সপ্রেম পরিচয় হইতেছে।

আজকাল আমাদের দেশের ধনকুবেরগণ যখনই নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন য়ুরোপীয় কুৎসিৎ আদর্শে করিয়া থাকেন। আমাদের

রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কলাভিজ্ঞান, সৌন্দর্য্যানুভূতিও কি লোপ পাইয়াছে? সে দিন আর্ট স্কুলে যে শিল্প প্রদর্শনী হইল তাহাতে দেখিলাম কত বিরাট ভারতীয় স্থাপত্যের প্রতিকৃতি, তাহার এক একটা অবয়বে, একটা স্তম্ভে বা খিলানেই কত মহত্ত্ব, কত কারুকার্য্য, কত সৌন্দর্য্য। দুই এক খানা বর্ত্তমান পারস্য প্রদেশের দ্বার ও গবাক্ষথও দেখিলাম—টাইলের উপর আগাগোড়া খুদিয়া তোলা কাজ—কি বিচিত্র, কি জমকাল, কি বর্ণের ঘটা! গালিচা বল, মাদুর বল, সাড়ী বল, দেওয়ালাঙ্কন বল, চিত্র বল,—সকলেরই মধ্যে কি বর্ণসম্পদ! কি নয়নাভিরামতা! আমাদের প্রাচ্যশিল্পের যা কিছু ত্রুটি চিত্রবিন্যায়—তাহার বর্ণবিন্যাস অংশে নহে, কিন্তু রেখাপাতাংশে—ঐ বিষয়ের অস্বাভাবিকতায়। কোন মানুষটাই স্বাভাবিক মানুষ নহে, তাহাদের স্থিতি-গতির ভঙ্গী স্বভাবানুকূল ভঙ্গী নহে, দেখিলেই ভ্রম হয় না জীবন্তের প্রতিরূপ দেখিতেছি। যুদ্ধের দৃশ্যে যেখানে হত ও আহত যোদ্ধারা মাটিতে শায়িত রহিয়াছে অনুমান করিতে হইবে, চোখ সেখানে প্রকৃত পক্ষে দেখিতে পায় আকাশ হইতে অনেকগুলা মানুষ যেন ভূমিতে অবতীর্ণ হইবার প্রয়াস পাইতেছে। যেখানে মেঝেতে গালিচা বিস্তীর্ণ রহিয়াছে জানিতে হইবে, চোখ সেখানে দেখিতে পায় দেওয়ালের গায়ে গালিচা ঝুলিতেছে। এ সকলই "পার্‌স্‌পেক্টিভ্‌"—দৃষ্টিবিজ্ঞান বা রেখাবিজ্ঞানের অজ্ঞতাজনিত। য়ুরোপীয় চিত্রকরদের নিকট এই কৌশলটুকু শিখিয়া লইলেই আর আমাদের কোন ত্রুটিই থাকে না।

সেদিন এই সকল দেখিতে লাগিলাম আর ভাবিলাম—আমাদের স্বকীয় শিল্পের এত প্রাচুর্য্য থাকিতে, এবং অন্য দেশের অপেক্ষা সেই শিল্পের এত উৎকর্ষ থাকিতে, আমাদের ধনীরা পরদেশের নিকৃষ্ট শিল্পাপেক্ষী হন, এ কি লজ্জার কথা। কেন এরূপ হয়, নিজেকে প্রশ্ন করিতে করিতে একটা অনুমান প্রথমে মনে উদয় হইল যে, চোখের

সম্মুখে একাধারে আমাদের সমস্ত শিল্পজাত দেখিবার সুযোগ সর্ব্বদা হয় না, আমাদের দেশে য়ুরোপের ন্যায় কোন কলাভবন নাই—সেই জন্য চোখের অনুশীলন হয় না, মনও সেই জন্যই গৃহনির্ম্মাণের সময় বা গৃহসজ্জার সময় ভাবিয়া চিন্তিয়া দেশীয় স্থাপত্য ও দেশীয় শিল্পজাতের প্রবর্ত্তনে প্রস্তুত হয় না। কিন্তু এই কৈফিয়ৎটা যথেষ্ট মনে হইল না। আমাদের যাদুঘরের একাংশে সর্ব্বপ্রকার প্রাচ্যকলার পরিচয় ত স্থায়ীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। আর অধিকাংশ বড় লোকেরাই ত কখন না কখন দেশভ্রমণার্থে বা তীর্থদর্শনার্থে পশ্চিম যাত্রা করেন,—একবার নয়, দুইবার নয়, বহুবার। পশ্চিমে—এমন কি কাশীর অতি সামান্য সামান্য গৃহেও যে স্থাপত্যের, যে কারুকার্য্যের নিদর্শন চাক্ষুষ করা যায়, যাহাতে শিক্ষিত য়ুরোপীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অশিক্ষিত দেশীয় সাধারণেরও চক্ষের পরিতৃপ্তি হয়, তাহা কি কেবল তাঁহাদেরই চক্ষের তৃপ্তিসাধনে অক্ষম?—এমনি অস্বাভাবিক চক্ষু তাঁহাদের? সেই সৌন্দর্য্যের চাক্ষুষদ্বারা মনের তটে যে আনন্দের তরঙ্গাঘাত হয় সে আনন্দ শুধু তাঁহারাই অনুভবে অক্ষম! এতই আধ্যাত্মিক দৈন্য তাঁহাদের? তাই বটে; ইংরাজ আমাদের উপর শুধু শারীরিক জয়লাভ করে নাই, আমাদের আত্মার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে—সেইখানেই তাহাদের যথার্থ বিজয়।

কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী—এই সকল সহরে রাজপথের দুই ধারে গৃহস্থের সুন্দর কারুকার্য্যসম্পন্ন গৃহাবলী যখনই দেখিয়াছি, মনে হইয়াছে, ইহার এক একটি আমার মাতৃভূমি কলিকাতায়—সমগ্র বঙ্গদেশে, কবে উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারিব, কবে স্থাপনা করিতে পারিব? এই স্থাপত্যের সহিত অঙ্গনে অঙ্গনে বিভক্ত কত মহলের বাহার আবার খুলিয়া যাইবে।

* * * * *

সন্ধ্যা হইল। প্রতিবেশীদের গৃহে শুনিলাম গৃহিণী ডাকিলেন—"বৌমা, সন্ধ্যাটা একবার দেখাও।" তারপর একটি অবগুণ্ঠনবতী বালিকা প্রদীপ হস্তে প্রতি অন্ধকার কক্ষে কক্ষে একবার 'সন্ধ্যা দেখাইল,' মঙ্গলশঙ্খ বাজিল। কি সুন্দর!

হিন্দুর গৃহে 'সন্ধ্যা দেখানর' মূলতত্ত্বটি কি জানি না, তাহা অনুসন্ধেয়। কিন্তু ইহার ভিতর যে একটি প্রকৃষ্ট কবিত্ব রহিয়াছে তাহা অনুভূতিতেই জানিলাম। ইহা কি সন্ধ্যাদেবীর শুভাগমন জন্য আরতি? ইহা কি সন্ধ্যাতিমিরভয়নাশন অনুষ্ঠান? সকল গৃহে সারারাত্রি প্রদীপ জ্বালানর সামর্থ্য নাহি, তাই কি প্রতি কক্ষের আলোকতৃষ্ণা ক্ষণতরেও মিটাইয়া যাওয়া হইল?

একবার 'সন্ধ্যা দেখানর' পর আর কক্ষে কক্ষে আলো জ্বলিল না। তারপর সমস্ত নীরব, সমস্ত অন্ধকার। দীপহীন গৃহে গৃহিণী গৃহকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন; দীপহীন গৃহে, দুয়ারের ধারে বসিয়া, রাজবর্ত্মের দূরাগত কিঞ্চিৎ আলোকে বালক ও যুবাপুত্রেরা আহার করিয়া গেল, কেবল গৃহকর্ত্তার আহারকালীন কক্ষ পুনর্ব্বার উজ্জ্বলিত হইল—নিশ্চয়ই গৃহিণীর অনুবন্ধে। পরদিন যাহা শুনিলাম তাহাতে মন বিগলিত হইল। কিসে? বোধ হয় ভক্তিতে। পিতা সামান্য বেতনে কোথাও অন্নোপার্জ্জন করেন। সংসারে আর সকল বিষয়ে মিতব্যয়িতা করিয়া পুত্রদের প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদ্যাদানের আয়োজন তিনি করিয়াছেন। তাই বালকগণের আহারের সময়ও কক্ষে আলো জ্বলে না, কিন্তু নীচের তলায় পাঠগৃহে আলোর অসদ্ভাব হয় না। আমার একটা কথা মনে হইল। রাজবর্ত্মের আলোতেই যদি কাজ চলে, তবে তাহাতেই কাজ চালাইয়া সংযমশিক্ষা, বালক ও যুবাগণের এই সহিষ্ণুতার চর্চ্চা আদর্শ ব্যবহার ও অনুকরণীয়।

আর একদিনের ঘটনা মনে পড়িল। আমাদের বিশ্বাস ছিল

সেকালের ভারতেই শুধু পর্ণকুটীরে গভীর জ্ঞানানুশীলনের পরিচয় পাওয়া যাইত, একালে সে সব উঠিয়া গিয়াছে।—কোন জ্ঞানী পণ্ডিত-পরিবারের সহিত আমাদের দৈবাৎ পরিচয়সৌভাগ্য ঘটে। প্রথম যেবার তাঁহাদের গৃহে যাইলাম, গৃহকর্ত্রী সাদরে অভ্যথনা করিয়া মাটিতে মাদুর ও সতরঞ্চ বিছাইয়া আমাদের বসিতে দিলেন, তাঁহার দেবরপত্নী তৈলপাত্রে আর একটু তৈল আনিয়া সনাতন দীপাধারে ঢালিয়া প্রদীপ উস্কাইয়া দিলেন। পণ্ডিত পরিবারে স্ত্রীলোকেরাও প্রায়ই মূর্খ হয় না, ইহাঁরাও নহেন। ইহাঁদের নানা সরল সরস জল্পনায়, এবং পণ্ডিতগণের জ্ঞানগর্ভ কথাপ্রসঙ্গে, সেই প্রাচীন প্রদীপালোকিত মেঝের উপর ঝুঁকিয়া দুর্ম্মূল্য দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও গ্রন্থের সহিত পরিচয়সাধনে ধন্যমনে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। বহু সাজসজ্জা সুশোভিত বিদ্যুতালোকোদ্ভাসিত রাজগৃহে এমন পরমানন্দ উপভোগ করি নাই। কেবল এখানে নিরানন্দ ও লজ্জা তখনই অনুভব করিয়াছিলাম, যখন গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রী একবার ইংরাজী উচ্চাসন আনিয়া আমাদের তাহাতে বসাইবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের গৃহে আধুনিক নব্য ল্যাম্পের অভাবে আমার নিকট ছোট হইতেছেন অনুভব করিয়াছিলেন। লজ্জা এই যে—হিন্দুজাতির এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এতই জাতীয় কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, জাতীয়ভাব হইতে স্খলিত হইয়াছে, বস্তুগত ভোগবিলাস তাহাদের জীবনযাত্রার এতই চরম লক্ষ্য হইয়াছে, যে তাহাদের স্বজাতীয় অবশিষ্ট সমস্ত লোকেরই মনে এই ধারণা উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে যে বিদেশীয়গণের ন্যায় বৈদেশিক বিলাসিতার আয়োজনে ছাড়া আর কিছুতেই এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের তৃপ্তিসাধন হয় না।

এইখানে আর একটা কথা মনে হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার আধিপত্যে উপার্জ্জনের পূর্ব্বেই আমাদের ভোগাভ্যাস জন্মিয়া যাইতেছে। ইহার

মত জাতীয় সঙ্কট আর কিছু নাই। আগে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি হউক, তবে ভোগাসক্তিকে আমল দখল দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমেই ভোগের দাস হইলে উদ্যমের সহিত চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়া যাইবে, আমরা চিরকালই পরপদানত জাতি থাকিব। সেইজন্যই আমার মনে হয় যতদিন না সমস্ত দেশ ধনী হয়, গড়ে প্রত্যেকেরই আয়ের হার বৃদ্ধি না হয়, ততদিন কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের অনাবশ্যক-ব্যয়সঙ্কুল বৈদেশিক জীবনযাত্রাপ্রণালী গ্রহণ করা জাতীয় জীবনের পক্ষে একেবারে মারাত্মক।

ভোগীপ্রকৃতি সকল দেশে সকল অবস্থাতেই থাকিবে, যেখানেই ঐশ্বর্য্য সেইখানেই ভোগ। কিন্তু সেই ভোগটাও স্বদেশীয় ব্যাপারেই হউক, মার্জ্জিত স্বদেশীয় রকমেই হউক, জাতীয়তার অনুকূলে হউক, অন্যজাতি হইতে আমাদের যে স্বাতন্ত্র্য তাহা রক্ষা করিয়া হউক,—কাহারও অনুকরণের দুর্নিবার উত্তেজনায় না হউক—এই আমার বক্তব্য। "হিন্দুমতে মুর্গী খাওয়া," "হিন্দুমতে বিলাত যাত্রা"—কথাগুলা শুনিতে যত হাস্যকর, বস্তুতঃ ততটা উপহাসের ও অবজ্ঞার উপাদান উহার ভিতর নাই। উহার ভিতর কিছু গভীর কথা আছে, কিছু সারবত্তা আছে, ইংরাজের নিকট আধ্যাত্মিক দাসত্ব হইতে মুক্তি চেষ্টার ইঙ্গিত উহাতে আছে। যাহা কিছু করিব তাহা ইংরাজের অন্ধ অনুকরণে নহে, নিজেরা জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া বিচারপূর্ব্বক, স্বাবলম্বনে, ব্যক্তিগত বুদ্ধির অনুসরণে এবং পূর্ব্বপুরুষাগত অভিজ্ঞতার অনুমোদনে করিব—এই ভাবের বীজ ঐ কথাগুলার মধ্যে নিহিত আছে। যে দিন এই বীজ অঙ্কুরিত হইবে, এবং অঙ্কুর শাখাপল্লবিত বৃক্ষে পরিণত হইবে সেই দিন আমাদের দাসত্বপাশও ছিন্ন হইবে।

* * * * * *

প্রত্যূষে গীতস্বরে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আধুনিক স্প্রিং বেডে, সভ্যতার

হালতম আসবাবে বেষ্টিত হইয়া নিদ্রা যাই নাই। মাতা ধরিত্রীর স্নেহক্রোড়ে-আস্তৃত শয্যায়, যেন কি অলব্ধপূর্ব্ব শান্তিরসাস্বাদে সুপ্তিমগ্ন ছিলাম। গানের স্বরে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মন যখন অর্দ্ধচেতনার ও অচেতনার মধ্যরাজ্যে রহিয়াছে তখন গানের সুর কত মধুর কেহ অনুভব করিয়াছ কি? সম্পূর্ণ সচেতন হইলে, কাণ পাতিয়া প্রথম চরণ শুনিলাম,

"উঠ উঠ ভাই, হরিগুণ গাই,
সবে মিলি মন উল্লাসে"!

কেহ গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল না। দ্বিতীয় তৃতীয় চরণও গীত হইল। শব্দ একই স্থান হইতে স্থিরভাবে আসিতে লাগিল। বিস্মিত হইয়া উঠিয়া জানালার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম। তখনও রজনী সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই, রাজপথে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে। আমাদের বাতায়নের ঠিক নীচে গ্যাসপোষ্টের নিকট দাঁড়াইয়া এই বাড়ীর প্রতি সম্মুখীন হইয়া তিনটি গৃহস্থ যুবক যেন, মাথায় কাপড় মুড়ি দিয়া, মন্দিরা হাতে তাল রাখিতে রাখিতে ভৈরোঁতে গাহিতেছে—

"উঠ উঠ ভাই, হরিগুণ গাই,
সবে মিলি মন উল্লাসে"।

একটি বালিকা ও একটি উলঙ্গবালক সম্মুখের বাড়ীর রোয়াকে দাঁড়াইয়া ভারি আগ্রহের সহিত উর্দ্ধমুখে গান শুনিতেছে। তাহাদের মুখে গ্যাসের আলো পড়িয়াছে। গায়কদের মধ্যে একজন মধ্যে মধ্যে গানে ভঙ্গ দিয়া, তাহাদের লক্ষ্য করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিতেছে—"যা যা—তোরা বাড়ী যা, ঠাণ্ডা লাগবে"। বালকবালিকা একপদও নড়িল না। গানটি একবার সম্পূর্ণ হইলে, গায়কেরা পাশের বাড়ীতে সরিয়া গেলেন। প্রতি বাড়ী বাড়ী উহা গীত হইতে লাগিল। আমি শুইয়া শুইয়া অনেক দূর হইতে তাহার ধ্বনি পাইলাম।

আজ প্রত্যূষে ভৈরোঁরাগের সুরকম্পনে জাগ্রত বাঙ্গালী জনপদের প্রথম হৃৎস্পন্দন অনুভব করিলাম। ভৈরোঁ শুনিয়াছি ইতিপূর্ব্বে দরবারী সঙ্গীতে, হিন্দি এবং বাঙ্গালা উভয় ভাষায়। দুই একটি বিশেষ গানের পদে মূর্ত্তিমান হইয়া প্রভাতীরাগ ভৈরব এতদিন আমার স্মৃতিতে স্থান পাইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে যে দরবারে, যে সভায় সে গান গীত ও শ্রুত হইয়াছিল সেই সভার একটি সসম্ভ্রম গম্ভীর ছায়াও সর্ব্বদাই অনুসরণ করিয়াছে। আজ আর এক ভাবে ভৈরোঁর সহিত পরিচয় হইল। গায়কেরা চলিয়া গেলে পল্লীর প্রতি জাগ্রত গৃহস্থ বাড়ী হইতে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভৈরোঁর নানারকম টুক্‌রা কানে আসিল। কেহ শিষ দিল, কেহ গুণ গুণ করিল, কেহ আলাপ করিয়া উঠিল। ভৈরোঁ মন্ত্রে সেদিনকার জীবনযাত্রা খুলিয়া গেল। এমন সহজ সুন্দর পৌরমূর্ত্তিতে ভৈরোঁরাগকে পূর্ব্বে কখন দেখি নাই।

অপরাহ্নে আমাদের গৃহসন্নিধানে পাড়ার যুবকদের জটলা হইল। তাহাদের ক্বচিৎশ্রুত কথাবার্ত্তার অংশ হইতে জানিতে পারিলাম, প্রভাতে যাহারা গান করিয়াছিল তাহারা গৃহস্থই বটে, ভিক্ষুকও নহে সন্ন্যাসীও নহে; এই পাড়ারই ছেলে,—হয়ত কলেজের ছাত্র, হয়ত আফিসের চাকুরে। তাহারা প্রতি প্রত্যূষে এইরূপে হরিনাম গাহিয়া গৃহস্থদের জাগাইবার ব্রত লইয়াছে। ইহা শিক্ষিত ছেলেদের একটা 'এক্সপেরিমেণ্ট' জানিতে পারিয়া আহ্লাদ হইল। এবং মনে হইল এই চেষ্টাটি ঠিক পথেই চালিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীসরলা দেবী।

বাস্তুসাপ।

(১)

বৈঠকখানার ঘড়িতে চারিটা বাজিবা মাত্র দিদিমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বিছানার উপর বসিয়া বলিলেন "দুর্গা দুর্গা দুর্গা"। পাশে বিধবা নাতিনী সুরবালা ঘুমাইতেছে, তাহাকে ডাকিলেন "সুরি, ও সুরি, ওঠ, আজ যে অমাবস্তে।"

জ্যৈষ্ঠমাস, সারারাত্রি খুব গ্রীষ্ম গিয়াছিল। এখন খোলা জানালা দিয়া অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। সুরবালা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কিন্তু দিদিমা আর অপেক্ষা করিতে পারেন না; সূর্য্যোদয় হইয়া গেলে আর গঙ্গাস্নানের পূর্ণফল হইবে না। তাই আবার ডাকিলেন—"সুরি, ও সুরি।"

সুরবালা উঠিয়া বলিল—"ওমা তাইত, ভোর হয়েছে যে।" দিদিমা বলিলেন—"সব জিনিষপত্তর গোছান আছে, চল্ শিগ্‌গির বেরিয়ে পড়ি।"

কাপড়, গামছা, নামাবলী ইত্যাদি লইয়া দুইজনে বাহির হইলেন। তখন অল্প আলো হইয়াছে। উঠানে নামিয়া দিদিমা অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন; সুরবালা তাঁহার পশ্চাতে চলিল।

খিড়কী দরজার কাছে যে আতাগাছ আছে, তাহার নিকটে আসিয়াই দিদিমা "ওগো মাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সুরবালা সভয়ে বলিল—"কি দিদিমা ?"

দিদিমা বলিলেন—"হায় হায় হায়, সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

সুরবালা বলিল—"কি ! কি হয়েছে দিদিমা ?"

দিদিমা অঙ্গুলি দিয়া আতাগাছের তলা দেখাইয়া দিলেন। ভয়ে ভয়ে নিকটে সরিয়া গিয়া সুরবালা দেখিল, একটি ছোট মোটা কালো সাপ রক্তাক্তকলেবরে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

সুরবালা বলিল—"হ্যাঁ দিদিমা, বাস্তু?"

দিদিমা বলিলেন—"বাস্তু বৈ কি? দেখ্‌ছিস নে? আহাহা! এমন কায কে করলে! বাবা, কে তোমায় এমন করে বধ করলে! এ দুর্ম্মতি কার হল!"

দিদিমার চক্ষু দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গঙ্গাস্নানে যাওয়া আর হইল না। রান্নাঘরের বারান্দায় উঠিয়া হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাত ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, হাতের মালা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

দিদিমার ভাবগতিক দেখিয়া সুরবালা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—"কি হবে দিদিমা?"

দিদিমা বলিলেন—"হবে আর কি—আমার মাথা হবে! ভিটেয় ব্রহ্মহত্যে হল। এ বংশ কি আর থাকবে! নির্ব্বংশ হয়ে যাবে। লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে, লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে। কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে কোথায় দাঁড়াব হে নারায়ণ। হে মধুসূদন! হায় হায় হায়!"

একটা ঘোর আশঙ্কারাহুতে সুরবালার মন গ্রস্ত হইল। সে চলৎশক্তি রহিত হইল। পিতামহীর জানু জড়াইয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িল। এই সময় উঠানে দূরে শ্বেতবস্ত্র পরিহিত একটি নারীমূর্ত্তি দেখা গেল।

দিদিমা বলিলেন—"কেও, বউমা?"

"হ্যাঁ, কেন মা?"

"এদিকে এস।"

সুরবালার মা তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভীত হইলেন। কাছে আসিয়া বলিলেন—"এখনো গঙ্গাস্নানে যাওনি মা!"

"আর মা, গঙ্গাস্নানে যাব! মা গঙ্গা এখন শিগ্‌গির নিলে বুঝ্‌তে পারি। সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

"কি? কি হয়েছে মা?"

দিদিমা সব খুলিয়া বলিলেন। বধূ শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বেশ করে দেখেছ, বাস্তুবাবাই ?"

"বাস্তুবাবা বৈকি ! ঐ দেখ না, আতাতলায় পড়ে রয়েছেন। আজ তিন পুরুষ ধরে অধিষ্ঠান করে রয়েছেন, বাবার কৃপায় কোনও বিপদ আপদ হয়নি ! এইবার সংসার ছারখার হয়ে যাবে।"

ক্রমে বাড়ীর সকলে উঠিল। বাড়ীতে একটা বিভীষিকার আবির্ভাব হইল। সকলের মুখ শুষ্ক। কর্ত্তা উঠিয়া আসিলেন। তিনি দেখিয়া রাগে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। বলিলেন—"কে এ কায করেছ বল, নইলে ঘরে দুয়ারে আগুন লাগিয়ে দেব।"

এ কথা শুনিয়া সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। এমন সময় একজন বলিল—"ঐ দেখ আতাগাছের তলায় রক্তমাখা লাঠি পড়ে রয়েছে। ভোজুয়ার লাঠি। আর কিছু নয় সেই বেটার কায।"

সকলে বলিল—"নিশ্চয় ওরি কায।"

এই কথা বলিতে বলিতে ভোজুয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একজন খোট্টা,—কয়েকদিন হইল এবাটীতে চাকর নিযুক্ত হইয়াছে। দেহের বর্ণটা মহিষের মত কালো। মাথার অগ্রভাগ কামানো। বয়স আন্দাজ কুড়ি বৎসর। এই নূতন বাঙ্গালা দেশে চাকরি করিতে আসিয়াছে।

কর্ত্তা তাহাকে বলিলেন—"ভজুয়া ইধার আও।" ভজুয়া তাঁহার কাছে গিয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল।

তিনি বলিলেন—"তোম্ সাপ মারা হ্যায় ?"

ভোজুয়া সগর্ব্বে বলিল—"হাঁ, হাম্ মারা হ্যায়।"

"কাহে মারা ?"

"সাঁপ আদমিকা দুষমণ হ্যায়, মারেগা নেই? মারা ত ক্যা হুয়া ?"

কর্ত্তা বলিলেন—"ক্যা হুয়া রে শালা ? তোর বাবার সাপ ?"

ভোজুয়া পিছু হটিয়া উদ্ধতভাবে বলিল—"মু সামালকে বাত করনা বাবু।"

এই কথা শুনিবামাত্র কর্ত্তা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া পাগলের মত ভোজুয়ার উপর পড়িলেন। পা হইতে চটিজুতা খুলিয়া পটাপট তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। গলা ধরিয়া "নিকাল যাও শালা নিকাল যাও" বলিতে বলিতে তাহাকে দরজার বাহির করিয়া দিলেন।

(২)

ক্রমে বেলা হইল, রৌদ্র উঠিল। প্রতিবেশীরা একে একে আসিয়া সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন।

সংবাদ পাইয়া পুরোহিত আসিলেন। দিদিমা তাঁহার কাছে গিয়া বলিলেন—"বাবা এ বিপদে রক্ষে কর। আমার সংসার যাতে বজায় থাকে, বাবা তাই কর।"

পুরোহিত বলিলেন—"ভয় কি মা, কোনও ভয় নেই। তোমরা ত আর করনি,—তোমাদের কোনও অপরাধ নেই। তবে ভিটেয় ব্রহ্ম-রক্তপাত হল, এইটেই বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।"

একজন প্রতিবেশী বলিলেন—"পুরুত মশায়, এখন কর্ত্তব্য কি ?"

"কর্ত্তব্য এখন,—প্রথম কর্ত্তব্য সৎকার করা—ব্রাহ্মণোচিত সৎকার করতে হবে। শাস্ত্রানুসারে সর্পের মুখে একটা তাম্রখণ্ড দিয়ে গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে দাহ করতে হবে।"

পাড়ার ছেলেরা যাই শুনিল গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া মৃত সর্পকে -করা হইবে, তৎক্ষণাৎ স্থির করিল সেদিন আর ইস্কুল যাইবে না।

র্পকে বহন করিবার জন্য খাটুলি প্রস্তুত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ন, "তোমরা কোনও চিন্তা কোরো না। সর্পযোনিতে কষ্ট

পাচ্ছিলেন, মুক্ত হয়ে গেলেন। তোমরা তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ কর। ভাদ্রমাসে নাগপঞ্চমীর দিন ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান আর একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ফেলো, তা হলেই সর্ব্বপাপ থেকে মুক্ত হবে। বাস্তুসাপ হচ্চেন কুলদেবতা কিনা। শাস্ত্রে প্রমাণ রয়েছে—

"সর্ব্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্ব্বং বাস্তুময়ং জগৎ
পৃথ্বীধরস্ত বিজ্ঞেয়োর্বাস্তুদেব নমোস্তুতে।"

এদিকে খাটুলি তৈয়ারি হইল। সর্পের মুখে তাম্রখণ্ড দিয়া খাটুলিতে তুলিয়া রাখা হইল। কিন্তু কোনও বয়স্ক লোক তাহা বহন করিতে রাজি হইল না। সকলেই বলিল, "সাপকে বিশ্বাস নেই, মরে আবার বেঁচে ওঠে শুনেছি।" ছেলেরা বলিল, "কুছ পরোয়া নেই, আমরা নিয়ে যাব।"

ক্ষুদ্র খাটুলিখানি দুইদিকে দুইজনে ধরিয়া লইয়া চলিল। পরিবারস্থ পুরুষগণ সকলেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পথে ক্রমশঃ লোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যখন শ্মশানঘাটে পৌঁছিল, তখন এত লোক জমিয়াছে যে গ্রামের জমিদার মরিলেও তত লোক জমিত কিনা সন্দেহ।

যথারীতি শবদাহ সম্পন্ন হইল। চিতাভস্ম গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।*

(৩)

এই অস্বাভাবিক শোকের মধ্যে সারাদিন কাটিল। সন্ধ্যাবেলায় বড়ঘরের বারান্দায় বসিয়া কর্ত্তা ধূমপান করিতেছেন। দেওয়ালে একটি বাতি জ্বলিতেছে। সদর দরজা খোলা ছিল। আস্তে আস্তে ভোজুয়া

* আজকাল বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র এরূপ অনুষ্ঠান দেখা যায় না, প্রায় পুরা সামিল হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এখনও কোন কোন পল্লীগ্রামে, উপরে যে অঙ্কন করিলাম তাহা অবিকল ঘটিয়া থাকে।—লেখক।

আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে একটা বৃহৎ হাঁড়ি। মুখে ময়দা দিয়া সরা আঁটা।

সে আসিয়া বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইল। দিদিমা দূর হইতে বলিলেন, "কেরে, ভোজুয়া নাকি?" সে প্রথমতঃ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। নিকটে কেহ কোথাও নাই। দেখিয়া বলিল,—"বাবু, হাম তুম্‌হারা একঠো সাঁপ মার ডালা,—উস্‌কা বদ্‌লা দোঠো সাঁপ লায়া ইয়ে লেও।" বলিয়া হাঁড়িটা দড়াম করিয়া কর্ত্তার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। হাঁড়ি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে দুইটা সাপ বাহির হইয়া পড়িল। কর্ত্তা মহাভীত হইয়া "ওরে বাপ্‌রে" বলিয়া লাফাইয়া পলাইতে গেলেন, কিন্তু সাপ দুইটা তাঁহার পায়ে দুই তিন ছোবল বসাইয়া দিল। কর্ত্তার চীৎকারে বাড়ীসুদ্ধ লোক আসিয়া জড় হইল। আসিয়া দেখিল তিনি মাটিতে পড়িয়া চক্ষু অর্দ্ধমুদিত অবস্থায় কেবল বলিতেছেন—"হরে নারায়ণ ব্রহ্ম, হরে নারায়ণ ব্রহ্ম।"

দিদিমা আকুল হইয়া তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে দূর হইতে তিনি তাহা সকলই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মনে করিলেন বাস্তুহত্যার প্রতিফল হাতে হাতেই আরম্ভ হইল। সুরবালা ও সুরবালার মা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কেহ বলিল পুরোহিত ঠাকুরের স্বস্ত্যয়নে কোন ত্রুটি হইয়া থাকিবে, নয়ত বাস্তু বাবা তুষ্ট হইলেন না কেন?

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ছিল, সকলের কথা অনুসারে সে রোজা ডাকিতে ছুটিল। গ্রামের প্রান্তভাগে একজন বেদিয়া বাস করে, সে চারি পাশের বহু গ্রামের সর্প বৈদ্য। দাহ র কথায় প্রকাশ হইল তাহারই নিকট হইতে একটা খোট্টা ্কা দিয়া এক জোড়া সাপ কিনিয়াছিল।

বলিদ্যিা আসিয়া বলিল—"সেই খোট্টা শালারই এই কাজ। এমন

জানলে কি আমি তাকে সাপ বেচি মশাই! পাঁচ টাকা ছেড়ে পঞ্চাশ টাকা দিলেও দিতাম না। সে বল্লে আমি সাপ মেরে ওষুধ তৈরি করব। হায় হায় হায়।"

নাড়ী টিপিতে টিপিতে তাহার মুখ কিন্তু ক্রমে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল—"কোনও ভয় নেই, আপনাদের ও আমার পুণ্যির জোরে তাকে ভুলক্রমে দুটো বিষদাঁত ভাঙ্গা সাপ দিয়েছিলাম দেখছি। আঃ বাঁচলাম। নরহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হলাম। বিষের কোন লক্ষণই নেই—শুধু একটু রক্তপাত হয়েছে, আর ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। কোনও চিন্তা নেই।"

দিদিমা বলিয়া উঠিলেন "জয় মা দুর্গা।"

কর্ত্তা বলিলেন—"নিশ্চয় জান বিষ ছিল না?"

বেদিয়া রাগিয়া বলিল—"আমি আর জানিনে মশাই! আমি হলাম গিয়ে সাপের রোজা।"

সে যাত্রা কর্ত্তা রক্ষা পাইলেন। কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, খোট্টা চাকর আর বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসিতে দেন নাই।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালীর বিবাহক্ষেত্রের প্রসারতাবৃদ্ধি।

জাতিভেদ নানাকারণজনিত। তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান কারণ শোণিতভেদ সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৈবর্ত্ত ও চণ্ডাল এই দুই জাতির উল্লেখ করা যায়। ইহারা দুইটী আদিম অনার্য্য জাতি বলিয়াই রমেশবাবু অনুমান করিয়াছেন। জাতিভেদের দ্বিতীয় কারণ ব্যবসায়ভেদ; বৈদ্য, গোপ, বণিক্, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। মহামতি ম্যাক্সমূলার সাহেব পুরোহিত ও যোদ্ধার মধ্যে

রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্য বিবাদ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতি সৃষ্টির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সার আল্‌ফ্রেড লায়াল ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতাকে জাতিভেদের চতুর্থ কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আধুনিক বৈরাগীদের অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে সার আল্‌ফ্রেডের মতের সমর্থন করে।

হিন্দুজাতির অধঃপাতের সহিত ভারতের নানাপ্রদেশের অধিবাসী-দিগের মধ্যে নানাবিষয়ক আদানপ্রদান বন্ধ হইতে থাকে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বাণিজ্যবহুল সমাজের ন্যায় কৃষিজীবী-দিগের নিরন্তর ইতস্ততঃ গমনাগমন আবশ্যক হয় না; দেশের অতি বিস্তৃতি নিবন্ধন তাদৃশ গমনাগমন বিলক্ষণ ক্লেশকরও ছিল। তাই ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন দেশবাসী একজাতীয় ব্যক্তির মধ্যেও বিবাহ ও আহার নিষিদ্ধ হইয়া উঠিল। এইরূপে প্রধানতঃ বাসস্থানের পার্থক্য-হেতুই এক এক জাতির বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি হয়। দেশভেদে শাখা-ভেদের কিছু আভাস মনুসংহিতায়ও পাওয়া যায়। বিভিন্নবর্ণের উৎপত্তি প্রসঙ্গে মনু বলেন—

ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধরঃ শৈখ এব চ॥
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥

কুল্লুকভট্ট প্রথম শ্লোকের টীকায় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন 'একস্যৈতানি দেশভেদ প্রসিদ্ধানি নামানি।' দ্বিতীয় শ্লোকের টীকাও তদ্বৎ।

কিন্তু শাখাবিভাগ অতি প্রাচীন নহে; তাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থেই তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। স্কন্দপুরাণকার সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্মণা দশধা প্রোক্তাঃ পঞ্চগৌড়াশ্চ দ্রাবিড়াঃ।
ব্রাহ্মণা দশধা চৈব ঋষিবুৎপত্তি সম্ভবাঃ॥

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিল উৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
অন্ধ্রাঃ কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জ্জরা দ্রাবিড়াস্তথা।
মহারাষ্ট্রা ইতিখ্যাতা বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥

বঙ্গবাসী উচ্চবর্ণসমূহের শাখাভেদ অতি আধুনিক; কোনও প্রাচীন শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ দেখি না। আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্ব পুরুষ। এই দুই শ্রেণীর বিভাগ সম্বন্ধে কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে মতভেদ দৃষ্ট হয়; কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশে বাসহেতুই এই দুই শাখার উৎপত্তি, সকল গ্রন্থ হইতেই এই সারোদ্ধার করা যায়। রাঢ়ী ও বঙ্গজ বৈদ্য, উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজকায়স্থ প্রভৃতি নামেই বাসস্থানভেদ প্রতিভাত। নিম্নবর্ণসমূহেও বাসস্থানভেদে শাখা-ভেদের উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়। মাননীয় রিজলীসাহেব স্বপ্রণীত জাতিভেদ সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে এক নোয়াখালী জিলাতে ভুলুয়া, সরাইল, হাতিয়া ও অমরাবাদ, এই চারি পরগণার নামানুসারে ভূঁই-মালীদিগের চারিটী শাখার উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু শুধু বাসস্থানভেদই শাখাভেদের কারণ নহে। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' হিন্দু জাতির 'অসংখ্য শ্রেণী ও শাখা প্রশাখার উৎপত্তির' সাতটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটীর কোন না কোনটী স্থল-ভেদে বঙ্গবাসী বর্ণসমূহের শাখাভেদের হেতুভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তন্মধ্যে প্রথম কারণ বিভিন্ন স্থানে বাস; দৃষ্টান্ত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ভেদ। দ্বিতীয় কারণ কৌলিকমত ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ এবং ভিন্নমত ও গুরু গ্রহণ; দৃষ্টান্ত বৈরাগী সম্প্রদায়। তৃতীয় কারণ ভিন্ন আচার ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান; দৃষ্টান্ত আচার্য্য ও ভট্ট ব্রাহ্মণ। চতুর্থ কারণ স্ব স্ব সমাজে প্রভুত্ব লইয়া বিবাদ; দৃষ্টান্ত রাঢ়ীয় কুলীনের মেলবন্ধন।

পঞ্চম কারণ বৈবাহিক আদান প্রদান; দৃষ্টান্ত বৈদ্যজাতির শ্রীহট্ট-বাসী শাখা।

বর্ণগুলির শাখা প্রশাখার উৎপত্তি আলোচনা করা গেল। বঙ্গদেশের জাতিসমূহের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার বৈবাহিক আদানপ্রদানই এই প্রবন্ধের বিষয়। আমরা ক্রমে শাস্ত্র, অর্থনীতি, শারীরনীতি প্রভৃতির দিক্ দিয়া বিচার করিয়া আমাদের বিবাহক্ষেত্রের তাদৃশ প্রসারবৃদ্ধির ঔচিত্য প্রদর্শন করিব।

শাস্ত্র।

প্রাচীনকালে একবর্ণের বিভিন্ন শাখা দূরে থাকুক, বিভিন্নবর্ণের মধ্যেও বিবাহ প্রচলিত ছিল। মহাভারতকার বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের মুখে বলাইয়াছেন—

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বান্যপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মিথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥

মনু অনুলোম বিবাহের তত পক্ষপাতী নহেন, তথাপি ব্যবস্থা দিয়াছেন—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানাং ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥ ইত্যাদি।

প্রতিলোম বিবাহ মনুর নিতান্তই অনভিমত বোধ হয়; কিন্তু তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—

শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥

অধিকন্তু দায়াধিকার প্রসঙ্গে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরায় সঙ্করসন্তান বিষয়ক আলোচনা হইতেই প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন কালে অসবর্ণবিবাহ

বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। কাজেই তখন বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ কোন ক্রমেই নিষিদ্ধ হইতে পারিত না।

ইদানীং অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত নাই। স্মার্ত্তকুলচূড়ামণি রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে বলিতেছেন—

সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপয়মস্তথা।

* * *

ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥

এস্থলে অসবর্ণবিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। মদনপারিজাতকার বলিতেছেন—'অনুলোমক্রমেণ দ্বিজাতীনাং সবর্ণাপাণিগ্রহণসমনন্তরম্ ক্ষত্রিয়াদি কন্যা পরিণয়ো বিহিতস্তত্র চ সবর্ণাবিবাহো মুখ্যঃ ইতরস্তু অনুকল্পঃ।'

পুনশ্চ—

'স্নাত্বা সমুদ্বহেৎ কন্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।'

বীরমিত্রোদয়ধৃতব্যাসবচন।

'সজাতিমুদ্বহেৎ কন্যাং সুরূপাং লক্ষণান্বিতাম্।'

বৃহৎপরাশরসংহিতা।

অতএব সর্ব্বত্র সবর্ণাকন্যাবিবাহের বিধি দৃষ্ট হইতেছে। স্বজাতির মধ্যে শাখাভেদ কোন স্মার্ত্তই বিবাহের অন্তরায় স্বরূপ গণ্য করেন নাই। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রেমবিলাস হইতে বিশেষ ভাবে বঙ্গদেশের প্রতি প্রযুজ্য নিম্নলিখিত তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম।
মাধব আচার্য্যে প্রভু কৈলা কন্যাদান॥
রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিও আন।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান॥

রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিয়ে হইয়াছে অনেক।
দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক ॥

ইহা হইতে অনুমান হয় যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেও সময়ে সময়ে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের আদানপ্রদান হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে শাস্ত্র বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ প্রচলনের বিরোধী নহে; শাস্ত্রানুসারে আমাদের বিবাহক্ষেত্র প্রসারিত হইতে পারে।

অর্থনীতি।

আজকাল ব্যবসায়ভেদ উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যখন ব্যবসায়ভেদ প্রবল ছিল, তখন অধিকাংশ জাতিরই শাখাগুলি এক-ব্যবসায়ী ছিল। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, আচার্য্য, অগ্রদানী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণের ব্যবসায় মোটের উপর যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি; সমুদয় বৈদ্যই চিকিৎসক; সমুদয় কায়স্থই মসীজীবী; এইরূপ বণিক, তেলী, বাড়ৈ, ভূঁইমালী প্রভৃতি। এরূপ জাতিসমূহের বিভিন্ন শাখার বৈবাহিক আদান প্রদানে সমাজের অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রত্যক্ষ কোনও ইতর বিশেষ ঘটিতে পারে না।

জাতিভেদ এক প্রকারের শ্রমবিভাগ; একব্যবসায়ে রত শ্রমজীবি-সংখ্যাও এক এক জাতির লোক সংখ্যাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট। যদি একজাতীয় জনসমষ্টি বিভিন্ন শাখাভুক্ত হইয়াও একই ব্যবসায় অনুসরণ করে, তবে সেই বিভিন্ন শাখার সংমিশ্রণে শ্রমবিভাগনীতি বা ব্যবসায়বিশেষলিপ্ত শ্রমজীবিসংখ্যার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। অধিকন্তু পুরুষপরম্পরায় পৈত্রিকব্যবসায় অবলম্বনজনিত তদ্ব্যবসায়ানুকূল স্বাভাবিক সংস্কার যে নৈপুণ্য প্রদান করে, উক্ত বিভিন্ন শাখাগুলির সেই সংস্কারের একত্ব বশতঃ তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান এ বিষয়েও কোন পরিবর্ত্তন সংঘটন করিবে না। কাজেই বাঙ্গালীর বিবাহক্ষেত্রের

প্রস্তাবিত প্রসারবৃদ্ধি অর্থনীতির হিসাবে প্রত্যক্ষ কোনও উপকার বা অপকারের হেতু নহে; পরন্তু বক্ষ্যমাণ শারীরনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির বিষয়ীভূত উপকারের ফলে পরোক্ষভাবে আমাদের আর্থিক উন্নতির সহায় হইতে পারে।

একথা যথার্থ যে ব্যবসায়ভেদেও শাখাভেদের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের কৈবর্ত্তেরা মৎস্যজীবী; কৃষ্ণনগর অঞ্চলে কৈবর্ত্তগণ সুশিক্ষিত, সমুন্নতশ্রেণী; মেদিনীপুর অঞ্চলে তাহারা প্রধানতঃ কৃষক। বাগ্দীদিগের মধ্যে শিবিকাবাহক, মৃত্তিকাখনক, বাদ্যকর প্রভৃতি নানাশ্রেণী আছে। এরূপ স্থলে বিভিন্ন শাখার মিশ্রণে ব্যবসায়ে মুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিয়ৎ-পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হইবে, এবং শ্রমজীবিসংখ্যাও নির্দ্দিষ্ট না থাকিয়া প্রয়োজন দ্বারা নিয়মিত হইবে। কিন্তু এই দুইটীর যুক্তিবত্তা ইদানীং সর্ব্বত্র স্বীকৃত। সুতরাং যেস্থলে ব্যবসায়ভেদ শাখাভেদের কারণ, তথায়ও প্রস্তাবিত সংস্কার অপকারক না হইয়া উপকারক হওয়ারই আশা করা যায়। যাহা হউক শাখাভেদে ব্যবসায় ভেদের অল্পতা এবং আজকাল স্বতঃই ব্যবসায়ভেদের ক্রম বিলোপবশতঃ এবিষয়ে উপকার সম্ভাবনা বেশী নাই; কিন্তু অপকার সম্ভাবনার সম্পূর্ণ অভাব। অতএব বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহের অর্থ-নৈতিক অযৌক্তিকতা বিন্দুমাত্রও নাই; প্রত্যুত অল্প পরিমাণ সার্থকতা দেখা যায়।

শারীরনীতি।

পাত্রপাত্রীর শোণিতের সাম্য বা বৈষম্যের ফলাফল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ অভিন্নমত নহেন। কিন্তু মোটের উপর তাঁহারা বৈষম্যেরই পক্ষপাতী। সুযোগ্য চিকিৎসকগণ দৃষ্টান্তদ্বারা দম্পতির শোণিতসাম্য অর্থাৎ নিকট সম্পর্কের অনিষ্টকারিতা এবং বৈষম্য অর্থাৎ শোণিত সম্পর্ক-বিহীনতার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্পেন ও পর্টুগালের

রাজকুমারগণ প্রায়ই অতি নিকট সম্পর্কীয়া মহিলাদের পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সকল বিবাহ কখনও নিষ্ফল হয়; কখনও বা শারীরিক ও মানসিক হীনতাগ্রস্ত সন্তান প্রদান করিয়া থাকে। ইয়ুরোপের অন্যান্য রাজবংশের বিবাহক্ষেত্রও অতি সঙ্কীর্ণ; অনেকস্থলে তাঁহাদেরও শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা বাঞ্ছনীয় রূপ নহে। তুরস্কের প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়ে তাদৃশ বিবাহ অতি কুফল প্রসব করিয়াছে বলিয়া ডাক্তার কুষ লিখিয়াছেন। নেস্‌বিট সাহেবের মতে ইংরেজ অভিজাতগণ পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচনক্ষেত্র স্বশ্রেণীতে নিবদ্ধ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

প্রাণিজগতে যতই উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করা যায়, ততই স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য স্ফুটতর হইতে থাকে। স্ত্রীগর্ভকোষ এবং পুরুষ বীজ-কোষের আধার; বংশরক্ষায় স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুইয়ের আবশ্যকতা হইতেই বৈষম্যের আবশ্যকতা বোধগম্য হয়।

উদ্ভিজ্জগতে বীজোৎপাদনার্থ কোন পুষ্পের গর্ভকেশরে তাহারই পরাগসংযোগ সুবিধাজনক নহে; এক পুষ্পের গর্ভকেশরে অপর পুষ্পের পরাগ সংযোগই প্রাকৃতিক নিয়ম সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অধিকন্তু দুই বৃক্ষের মধ্যে যৌনসম্পর্কস্থাপন ব্যতীত চিরকাল বৃক্ষের উর্ব্বরতা রক্ষা পায় কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। ইতর জন্তুদিগের মধ্যেও স্ত্রী পুরুষের জন্মসম্বন্ধীয় নৈকট্য বংশের অবনতি সংঘটন করে, এরূপ দেখা গিয়াছে। এই সকল হইতেই নিকট আত্মীয়দিগের মধ্যে বিবাহের অবিধেয়ত্ব প্রমাণিত হয়। ফলতঃ স্ত্রী পুরুষের শোণিত সাম্য বন্ধ্যাত্ব অথবা সন্তানের নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিকারণ হইতে পারে। অতএব পাত্রপাত্রীনির্ব্বাচনক্ষেত্র সুপ্রশস্ত হওয়া আবশ্যক; অন্যথা সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল আদান প্রদান দ্বারা শোণিত সাম্য

ঘটিয়া বংশের অবনতি হইতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের প্রাচীন ব্যবস্থাই ভাল—

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রাশ্চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥ মনু।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালার বর্ণসমূহ বহুশাখায় বিভক্ত হওয়াতে আমাদের বিবাহক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটী বর্ণের জনসংখ্যা ও শ্রেণীসংখ্যা হিসাব করিলেই তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, গণক, ভট্ট, অগ্রদানী ও বর্ণব্রাহ্মণ, এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত। কৌলীন্যের কৃপায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের বহু শাখাপ্রশাখা; সকলের মধ্যে যথেচ্ছ বিবাহাদি চলে না। বিবাহ বিষয়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরও পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। বৈদিকদের দুই শ্রেণী; পরস্পরে বিবাহ নিষিদ্ধ। বর্ণব্রাহ্মণদের অসংখ্য শ্রেণী; প্রত্যেকের বিবাহক্ষেত্র স্ব স্ব শ্রেণীতে নিবদ্ধ। ১৮৮১ সনে নিজ বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ সংখ্যার প্রায় ১১ লক্ষ ছিল। যদি এগার লক্ষ লোক এত শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়, তবে বংশদ্বয়ে পুনঃ পুনঃ আদানপ্রদানদ্বারা অতি নিকটসম্পর্কীয়া পাত্রপাত্রীর বিবাহ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; তাই ইহাতে বংশের অবনতি সম্ভাবনা।

১৮৮১ সনে এদেশে কায়স্থ সংখ্যা ব্রাহ্মণ সংখ্যাম প্রায় সমান ছিল। কিন্তু তাঁহাদের তিন শাখা; তদ্ব্যতীত কৌলীন্যজনিত ভেদও আছে। বৈদ্যসংখ্যা ঐ বৎসরের সেন্সাসে প্রায় ৮০ হাজার বলিয়া নির্ণীত হয়; কিন্তু রাঢ়ী ও বঙ্গজবৈদ্যে আদান প্রদান নাই। উক্ত সেন্সাস অনুসারে সমগ্র বাঙ্গালার ভুঁইমালী সংখ্যা ৫২ হাজার; কিন্তু এক নোয়াখালী জিলাতেই তাহাদের চারিটী শাখা। পুনশ্চ বাগ্দীসংখ্যা ঐ সেন্সাসে ৭ লক্ষ দেখা যায়; কিন্তু রিজলীসাহেবের গ্রন্থে তাহাদের চৌদ্দটী শাখার উল্লেখ আছে। আর অধিক দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন।

এরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বিবাহ যে শারীরিক অবনতির কারণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ?

দম্পতির শোণিতবৈষম্যের আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইল। কিন্তু কেহ কেহ বলেন শিক্ষা, সভ্যতা, চিন্তাস্রোত প্রভৃতিতে যাহারা অতি দূরবর্ত্তী, তাহাদের মধ্যে বিবাহও সুফল প্রদান করে না। প্রমাণ-স্বরূপ সার জন লাবক সাহেব স্পানিয়ার্ড ও পর্টুগীজদিগের সহিত নিগ্রো ও ইণ্ডিয়ানদের সংযোগোৎপন্ন দক্ষিণ আমেরিকার জাতি সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। তথাকার একটী দেশও সুশাসিত নহে; নিরন্তর রাজদ্রোহ ও গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকার সকল রাজ্য গুলিই প্রায় দেউলিয়াগ্রস্ত। ফলতঃ তথাকার সঙ্কর জাতি সমূহ হীনগুণ বলিয়াই বোধ হয়। প্রসিদ্ধ পর্য্যটক লিভিংষ্টোন সাহেব আফ্রিকাতে এই প্রবাদটী শুনিয়াছিলেন—'শ্বেত ও কৃষ্ণলোক ঈশ্বরের সৃষ্ট; কিন্তু সঙ্কর জাতির স্রষ্টা সয়তান'। ইহা হইতে আফ্রিকার সঙ্কর জাতিদেরও নৈতিক দুর্দ্দশা অনুমিত হয়।

স্ত্রীপুরুষের অতিবৈষম্যস্থলে সন্তানের অপকর্ষের কারণ দুর্বোধ নহে। একজন সাহারাবাসিনীর গর্ভে একজন রুষের সন্তান জন্মিলে সে সন্তান পিতামাতা উভয় হইতেই কিছু কিছু গুণ প্রাপ্ত হইয়া,—না সাহারা সমাজ না রুষসমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে। তাই জীবন ধারণে তাহার যোগ্যতা তত বেশী নহে।

ইতর জন্তুদিগের মধ্যে সঙ্কর সন্তান অনেক সময়ে বন্ধ্যাত্বগ্রস্ত হয়। সকলেই জানেন খচ্চরের সন্তান হয় না। এরূপও দেখা যায় যে সঙ্কর সন্তান পিতৃমাতৃকুলের সহিত যৌনমিলনে বন্ধ্যাত্বগ্রস্ত না হইলেও অন্য সঙ্কর জন্তুর সহযোগে গর্ভধারণ করিতে পারে না, অথবা সঙ্কর সন্তানের বংশধরগণ দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ্যাত্বগ্রস্ত

হয়। ইয়ুরোপীয় ও নিগ্রোর ন্যায় অতিবৈষম্যবিশিষ্ট জাতির মিলনে কালক্রমে এইরূপ নির্ব্বংশত্ব উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে।

অতএব অতিবৈষম্যস্থলে বিবাহ অযৌক্তিক। এই কারণেই শিখ পাত্র ও মগ পাত্রী কিম্বা ব্রাহ্মণ পাত্র ও ডোম পাত্রীর বিবাহ অমঙ্গলকর হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলার এক এক জাতির বিভিন্ন শাখাতে তাদৃশ বৈষম্য নাই। শোণিত, শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই একজাতির বিভিন্ন শাখাতে তাদৃশ পার্থক্যের অভাব। তাই তাহাদের মধ্যে আদান প্রদানে উক্তরূপ কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নাই।

সমাজনীতি।

সামাজিক সংস্কার সকলেরই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সংস্কারের ঘোর পক্ষপাতীরাও বিপ্লবের সমর্থন করিতে পারেন না; যেহেতু বিপ্লব ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক উৎপাদন করে। বাঙ্গালীর বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন সংস্কার, কিন্তু বিপ্লব নহে। হঠাৎ বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলন করিতে পারিলে অতি গুরুতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইত। তাহাতে সমাজের শৃঙ্খলা, বিভিন্নাংশের অন্যোন্য সাপেক্ষতা এবং অতীত, বর্ত্তমান, ও ভবিষ্যতের ধারাবাহিকত্ব ধ্বংস হইয়া আমাদের নৈতিক, মানসিক ও সামাজিক নানাবিধ অনিষ্ট ঘটিতে পারিত। কিন্তু এক এক জাতির বিভিন্ন শাখার মিশ্রণে তাদৃশ বিপ্লব সম্ভাবনা নাই; কারণ ইহাতে প্রকৃতিপুঞ্জের মজ্জাগত সামাজিক আদর্শের অতিবিরোধী কিছুই দেখা যায় না। এখনও সময়ে সময়ে শাখাপ্রশাখার ভেদ উপেক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন মৃদুসংস্কার; উৎকট বিপ্লবের ন্যায় আশঙ্কার কারণ নহে।

বিভিন্ন শাখার সংমিশ্রণে কতকগুলি সামাজিক উপকার হইবে। তন্মধ্যে প্রথম উপকার অভিমত পাত্র বা পাত্রী নির্ব্বাচনের সুবিধা বৃদ্ধি।

পূর্ব্ববঙ্গে দেখা যায় রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ শ্রোত্রীয় বা বংশজ জমিদারগণ নিতান্ত দীনহীন ব্যক্তিদিগের শ্বেতত্বক্ কন্যা ক্রয় করিয়া সহধর্ম্মিণীপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ভাবে ভিখারিণীর রাজরাণী হওয়া আমাদের মধ্যে নিতান্ত বিরল নহে। অপরদিকে এই সমুদয় জমিদার কুলীন নামধারী ভিক্ষুকদিগের পুত্র ক্রয় করিয়া জামাতৃপদে বরণ করেন। বহু শাখাপ্রশাখার ভেদ বশতঃ ঐ সকল জমিদারের অন্য পন্থা নাই। কিন্তু যাঁহারা উক্ত ক্রীতা জমিদারপত্নীদিগের পিতৃকুলের সহিত বিবাহের পরবর্ত্তীকালের সম্বন্ধ ও উক্ত জামাইবাবুদিগের এবং তাঁহাদের সম্ভ্রান্তা পত্নীদিগের অবস্থা জানেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে এরূপ ভাবে পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচন কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। যদি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের উপশাখাগুলি লুপ্ত হইত, এবং রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় বিবাহ প্রচলিত হইত, তবে এরূপ অসম বিবাহের কোনও প্রয়োজন থাকিত না। তেলীজাতি অতিশয় সম্পন্ন। দুঃখের বিষয় পূর্ব্ববঙ্গের ধনকুবের তেলীগণ অতি নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে পুনঃপুনঃ আদানপ্রদান করিতে বাধ্য হইতেছেন; তথাপি উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের তেলীদের সঙ্গে তাঁহাদের ক্রিয়া হয় না। শাখাভেদ হেতু মধ্যবিত্তলোকদেরও অনেক সময়ে মনোমত বর বা কন্যা জোটে না। সুশিক্ষিত সান্ন পরিবারের কন্যা অশিক্ষিত দরিদ্র পরিবারে এবং সুশিক্ষিত পাত্র নিতান্ত অশিক্ষিত পরিবারে বিবাহ করিতে অহরহ বাধ্য হইতেছেন। এক এক জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হইলে নিজশাখায় উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর অভাবে অনভিপ্রেত স্থলে সম্পর্কস্থাপনের পরিবর্ত্তে অপর কোন শাখা হইতে মনোমত নির্ব্বাচন সম্ভব হইত।

দ্বিতীয়তঃ,—সেন্সাস্ রিপোর্টে দেখা যায় বাঙ্গালার পাঁচ বিভাগের কোন বিভাগবাসী কোন জাতির স্ত্রী সংখ্যা পুরুষ সংখ্যা হইতে অধিক,

কোথাও বা তদ্বিপরীত। বিভিন্ন শাখার সংখ্যা সেন্সাস্ রিপোর্টে নাই; কিন্তু তাহাদের মধ্যেও স্ত্রীপুরুষ সংখ্যার উক্তরূপ ন্যূনাতিরেক থাকাই সম্ভব। যদি সমুদয় শাখাপ্রশাখা মিশিয়া যায়, তবে স্ত্রীপুরুষ সংখ্যার তাদৃশ পার্থক্য দূরীভূত হইয়া পাত্রপাত্রী সংগ্রহ সহজ হয়। রাঢ়ীয় বংশজগণ অনেক স্থলে পাত্রী অভাবে নির্বংশ হইয়াছেন; অনেকে প্রৌঢ়-বয়সে বহুমূল্যে বালিকাপত্নী ক্রয় করিয়া কথঞ্চিৎ সংসারধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। সংখ্যার অল্পতাবশতঃ পাত্র জুটানর অসুবিধা বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিশেষভাবে অনুভূত। শ্রীহট্টবাসী বৈদ্যগণ শুঁড়ী-দিগকে কন্যা সম্প্রদান করিতে বাধ্য হন। ইঁহারা ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষ্যে পিতৃগৃহে আগমন করেন বটে, কিন্তু রন্ধনশালায় প্রবেশ বা খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিতে পারেন না। আজকাল ইতস্ততঃ গমনাগমন অতি সহজ হইয়াছে। এখন যদি অন্যান্য অঞ্চলের বৈদ্যগণ শ্রীহট্টবাসীদিগের সহিত ক্রিয়া করিতে প্রস্তুত হন, তবে তাঁহাদের আত্মজাদিগকে এই ভাবে অস্পৃশ্যা করিতে হইবে না। বস্তুতঃ শাখাভেদের লোপে নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের প্রসার এবং স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার অপেক্ষাকৃত সমতানিবন্ধন পাত্রপাত্রী সংগ্রহ বর্ত্তমান অপেক্ষা অনায়াসসাধ্য হইবে। তাহাতে পণগ্রহণ প্রথাও কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল হইতে পারে।

এই সংস্কার দ্বারা আমাদের জাতীয় একতাও বর্দ্ধিত হইবে। তাহার কারণ নানাবিধ। প্রথমতঃ, বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হইলে বাঙ্গালার বিভিন্নাংশের মধ্যে আদানপ্রদান চলিবে। এই রেলওয়ে ও ষ্টীমারের দিনে চট্টগ্রাম ও বর্দ্ধমানে কিম্বা রঙ্গপুর ও কৃষ্ণনগরে সম্পর্কস্থাপন কঠিন বা অপ্রার্থনীয় হইবে না। তাহাতে আমাদের কথিত ভাষার সমধিক সাম্য সাধিত হইবে, এবং আজকাল বাঙ্গালার একাংশবাসীদিগের অপরাংশবাসীদের সম্বন্ধে যে কুসংস্কার আছে, তাহা মন্দীভূত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ আদানপ্রদানের

ফলে বাঙ্গালার বিভিন্নাংশের রীতি নীতি অধিকতর সমভাবাপন্ন এবং মার্জ্জিত হইবে, কারণ উন্নতের অনুকরণ অনুন্নতের পক্ষে স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য। তৃতীয়তঃ, আমাদের সহানুভূতি বর্দ্ধিত হইবে। এখন বিভিন্ন শাখাগুলি পরস্পরকে আপনা হইতে হীনতর জ্ঞান করে। আবার এক এক শাখার অন্তর্গত উপশাখাগুলিও পরস্পরের নিকট আত্মগৌরব প্রকাশার্থ বিশেষ স্পর্দ্ধা এবং সময়ে সময়ে পরস্পরকে স্পষ্টবাক্যে অপমানিত করিতেও ত্রুটি করে না। ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ ত নাইই, আহারও ন্যূনাধিক পরিমাণে নিষিদ্ধ। অধিকন্তু রাঢ়ীয় বংশজ স্পৃষ্ট অন্ন রাঢ়ীয় কুলীন মর্য্যাদা অর্থাৎ কৌলীন্যের মূল্য গ্রহণ না করিয়া আহার করেন না। এই সকল পরস্পরের সহানু-ভূতির কতদূর অন্তরায়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। অতএব দেখা যাইতেছে, সমাজনীতি নানা কারণেই আমাদের শাখাভেদ দূরীকরণের সমর্থন করে।

চারিত্রনীতি (ETHICS.)

ভারতবর্ষে ভেদবুদ্ধি অতি প্রবল। হিন্দুগণ মিলনের পরিবর্ত্তে ক্রমাগত ভেদমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। জটিল হইতে জটিলতর ভেদ-প্রণালী হিন্দুসমাজকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। এক ব্রাহ্মণজাতির প্রাচীন দশটী ভাগ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরা কোন এক ভাগে পড়েন কি না সন্দেহ। যাহা হউক এই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদের বহুতর শাখা। এক রাঢ়ীয় শাখার তিন উপশাখা, কুলীন শ্রোত্রীয় ও বংশজ। এক কুলীনদিগের ৩৬টী মেল; প্রত্যেক মেলের কয়েকটী করিয়া গোত্র ও গাঁই। এইরূপে দেখা যাইবে যে শাখার মধ্যে উপশাখা, আবার উপশাখার বিভাগ এবং উপবিভাগ ইত্যাদিভাবে ৬।৭ ক্রম পর্য্যন্ত ভেদনীতি অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় উন্নতি মিলনসাপেক্ষ।

সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে আমরা মিলনের দিকে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু যে ভাবে ইংরাজীশিক্ষা কাজ করিতেছে, তাহাতে সাধারণ লোক প্রত্যক্ষভাবে মিলন অনুভব করিতেছে না, তাহার মাহাত্ম্যও বুঝিতে পারিতেছে না। যদি বাঙ্গালার বর্ণসমূহের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তবে হিন্দুজাতির অধঃপাতের পর এদেশে বোধ হয় এই প্রথম মিলনবীজ অঙ্কুরিত হইবে। এই সংস্কার সাধিত হইলে ভেদের পরিবর্ত্তে মিলনের ভাব প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয় অধিকার করিবে,—ক্রমাগত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর গণ্ডীর পরিবর্ত্তে তাহারা বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সমষ্টির অন্তর্ভূত হইতে শিক্ষা করিবে। ইহাদ্বারা কালক্রমে আমাদের সমাজবন্ধনপ্রণালী সম্বন্ধীয় চিন্তাস্রোতও পরিবর্ত্তিত হইবে, মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক ও ব্যবহারবিষয়ক আদর্শও কিয়ৎপরিমাণে ভিন্নরূপ ধারণ করিবে। অতএব জাতীয় চরিত্রের উপর এই সংস্কারের প্রভাব অত্যধিক। আমাদের ভেদবুদ্ধি লোপ করিয়া মিলনাকাঙ্ক্ষা-বর্দ্ধন যে সংস্কারের কার্য্য, তদপেক্ষা মঙ্গলপ্রদ সংস্কার সহস্রধা বিচ্ছিন্ন বাঙ্গালীজাতির পক্ষে আর নাই। তাই চারিত্রনীতি এই সংস্কারের অতি প্রবল প্রতিপোষক। অতএব যে দিক্ দিয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক, বিভিন্নবর্ণের শাখা প্রশাখার মধ্যে বিবাহ প্রচলন করিয়া আমাদের বিবাহক্ষেত্রের প্রসারবৃদ্ধিই সর্ব্বতোভাবে সম্যক্ উদ্দেশ্য-বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মে।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপা

দোষ নহে,
রাজন্যবর্গের
রকর হইয়া-
বান ছিলেন,
য়াছি, তাহাই
সর হইয়াছি।

মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি।*

যখন আমরা সবে জগৎসমক্ষে
শুধু নিজকর্ম্মধ্বজা দেখাবার তরে
সতত নিরত, তুমি থাকিয়া অলক্ষ্যে
সাধিয়াছ মহাব্রত একা দূরান্তরে;
নির্ভয়সংযমে, সত্যে ধ্রুবতারা করি’,
প্রীতি ভালবাসাদানে, করিয়াছ জয়
গর্ব্বান্ধে শত্রুর ঘৃণা; জন্মভূমি স্মরি’,
হতভাগ্য স্বদেশীর অপমান ভয়
লাঞ্ছনা গঞ্জনা দূর করিবার লাগি
অসামান্য স্বার্থত্যাগ, বীরত্বমহান্
দেখালে গৌরবে ওহে মহা অনুরাগী!
ভারতের সত্যনিষ্ঠা করিলে প্রমাণ!
গীতোক্ত নিষ্কামধর্ম্ম সাধিলে জীবনে,
তুমিই আদর্শকর্ম্মী ভারতভুবনে!

শ্রীদক্ষিণাপ্রসাদ বসু।

শ জানুয়ারি রবিবার অপরাহ্নে এলবার্টহলে যখন মাননীয় শ্রীযুক্ত
। এই মহাত্মার অলৌকিক জীবনের এক একটী ঘটনা ওজস্বিনী ভাষায়
লেন, তখন সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে যে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়, সম্ভ্রম ও
ছুটিয়াছিল তাহা শুধু অনুভবেরই যোগ্য। সেদিন সভাতে অনেক
পস্থিত ছিলেন, এবং অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে
জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয় প্রীতিগদ্গদস্বরে শ্রীযুক্ত গান্ধির আত্ম-
র্ষক একটী উদাহরণ বিবৃত করিয়া বিস্ময় ও সম্ভ্রম আরও বর্দ্ধিত
লেখক।

ভারত-ইতিহাসের একাংশ।

প্রথম অধ্যায়।

রাজনীতি বিশারদ চতুরাগ্রগণ্য ডুপ্লে, ল্যালী, সাঁফ্রে প্রভৃতি ফরাসাবীরগণ দক্ষিণ ভারতবর্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইবার পরে পরোক্ষে ইংরাজশক্তির গতিরোধ করিবার একটিমাত্র উপায় ছিল।

ভারতবর্ষীয় রাজন্যবর্গের যে সমস্ত সৈন্য সামন্ত ছিল তাহাদিগকে পাশ্চাত্য যুদ্ধনীতি অনুসারে শিক্ষিত করিয়া তাহাদের দ্বারা বৃটিশশক্তির প্রতিরোধ করা সেই উপায়। কতকগুলি ফরাসীবীর তৎসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। অনেক ফরাসী বীরপুরুষই এই কার্য্যে তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ফরাসীদিগের কতকগুলি সুযোগও হইয়া উঠিয়াছিল। যে সমস্ত ভারতবর্ষীয় রাজারা তাঁহাদিগকে নিয়োগ করিতেন, তাঁহারা জানিতেন যে ফরাসীজাতির ইংরাজবিদ্বেষ মৌখিক নহে এবং ইংরাজ দলনই তাঁহাদের সমস্ত হৃদয়ের একমাত্র কামনা, সুতরাং তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিবার কোন বাধা নাই। তাই ভারতীয় রাজপুরুষগণ তাঁহাদিগকে অকপটে বিশ্বাস করিয়া কার্য্যোপযোগী ক্ষমতা দিতেন। কিন্তু ফরাসীগণ যে সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তাহা তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও দ্বেষ পরিপূর্ণ ভারতবর্ষীয় একতাহীনতাই ফরাসী অকৃতকার্য্যতার একমাত্র কারণ।

যে সমস্ত অসমসাহসী ভাগ্যপরীক্ষকগণ এইকার্য্যে বদ্ধপরি ছিলেন তন্মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও প্রতিভা তাঁহার কার্য্যকলাপের যতদূর ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারি আজ আমি 'ভারতী'র পাঠকসমাজে উপস্থিত করিতে অগ্র

১৭৫১ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ চেম্বারি নামক স্থানে বেনোয়া ডিবোয়াঞি (Benoit De Boigne) জন্মগ্রহণ করেন। এই ফরাসী বালকটি অতি অল্প বয়সেই আইনশিক্ষার্থ স্বদেশীয় বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। কিন্তু সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালেই তাঁহার প্রকৃতিগত দুষ্কর কার্য্যের স্পৃহা তাঁহাকে পাঠ হইতে বিরত করাইয়া যুদ্ধ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিল। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অধীন 'আইরিশ্ ব্রিগেড'এর একটি রেজিমেণ্টে ভর্ত্তি হইলেন। ঐ ব্রিগেড তৎকালে কর্ণেল লি নামক একজন সেনাপতির অধীন ছিল। সৈন্যবিভাগে পতাকা বাহকরূপে (Ensign) প্রবেশ বক্ত... ডিবোয়াঞি প্রাণপাত করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার চেষ্টা করিতে ... এবং কর্ণেল লির অধীনে থাকিয়া তাঁহার নিকট হইতে ... তৎকালে সমরবিদ্যা যতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তৎসমুদয়ই তিনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করিলেন। গ্যারিজনে সাড়ে তিন বৎসর কার্য্য করিবার পর ডানকার্ক (Dunkirque) হইয়া আইল অব্ ফ্রান্সে যাইবার জন্য তাঁহার রেজিমেণ্টের প্রতি আদেশ হইল। দেড় বৎসর আইল অব্ ফ্রান্সে কার্য্য করিয়া রেজিমেণ্ট ফ্রান্সে ফিরিয়া আইসে।

তৎকালে ফ্রান্স উদ্বেগশূন্য। সমস্ত পৃথিবীর সহিত সন্ধি করিয়া বসিয়া আছে। সুতরাং ডিবোয়াঞি ভবিষ্যতের কোন উন্নতির পথ দেখিলেন না। তাঁহার যে প্রকৃতি, তাহাতে নিশ্চেষ্ট থাকিবার সাধ্য তাঁহার ছিল না, যে অসীম ক্ষমতা তাঁহার মধ্যে নিহিত ছিল, তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র অন্বেষণ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

ঘটনাক্রমে রুষিয়ার তখন তুরস্কের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত। সেকালে রুস গবর্ণমেণ্ট শিক্ষিত যুদ্ধব্যবসায়ী পাইলেই নিজ সৈন্যে ভর্ত্তি করিয়া লইতেন। ডিবোয়াঞি ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া রুশিয়ার সৈন্যভুক্ত হইবার মনস্থ করিলেন। তাঁহার ইস্তফা পত্র মঞ্জুর হইলে

তিনি ট্যুরিনে প্রস্থান করিলেন। তথা হইতে রুশিয়ার সেনাপতি কাউন্ট অর্লফের নামে সুপারিশ পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া মার্সেলস হইতে অর্ণব পোতারোহণে গ্রীস্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় পঁহুছিবা মাত্র এম্প্রেস ক্যাথারিনের অধীনস্থ একটী গ্রীক্ রেজিমেণ্টের কাপ্তানী পাইলেন। টেনেডোদ্বীপ অবরোধ করিয়া রাখিবার জন্য রুষিয়া কর্ত্তৃক যে সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল তন্মধ্যে ডিবোয়াঞি যে দলের কাপ্তান তাহাও ছিল। নূতন অধিনায়ক ডিবোয়াঞিকে তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল সহ দ্বীপ আক্রমণ করিতে আদেশ হয়। তুরস্কগণ বিপুল বাহুবলে বহু-সংখ্যক সেনা লইয়া আক্রমণকারীদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে... সে যুদ্ধে রুষপক্ষের অধিকাংশ সৈন্য রণক্ষেত্রে শয়ন করে। কোন ক্রমে জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন বটে ... হস্তে বন্দী হইয়া প্রথমতঃ "চিয়ো" পরে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে প্রেরিত হন। এই ঘটনার সাত মাস পরে যুদ্ধ শেষ হয়। তখন ডিবোয়াঞি অন্যান্য বন্দীদিগের সহিত কারামুক্ত হইয়া মেজর পদে উন্নীত হইলেন।

সন্ধি হইয়া গেল, সমধিক উন্নতির পথে কণ্টক পড়িল, সুতরাং ডিবোয়াঞির মন আবার চঞ্চল হইল। রুষিয়ার সৈন্য বিভাগের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্মার্ণাতে আসিলেন। স্মার্ণায় ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত গুটিকত ইংরাজের প্রমুখাৎ ভারতের অতুল ধন সম্পদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, এবং সেখানে অবাধ উন্নতির পথ উন্মুক্ত জানিলেন। এইবার তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার সংকল্প স্থির হইল।

যেমন সংকল্প তেমনি কাজ। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল হইতে আলিপো যাত্রা করিয়া সেখান হইতে "বশোরা" যাত্রী একটী কাফ্‌লার সঙ্গ লইলেন। কাফ্‌লা বোগদাদ পর্য্যন্ত নিরাপদে পঁহুছিল, কিন্তু সেখানে আসিয়া শুনিল, পারস্য ও তুরস্ক মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত থাকায় বশোরার পথ নিরাপদ নহে, সুতরাং কাফ্‌লা আলিপো অভিমুখে

প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ডিবোয়াঞ্জি কাফ্‌লার সহিত আলিপোতে ফিরিলেন না। তিনি স্মার্ণাতে ফিরিলেন এবং সেখান হইতে আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া হইয়া সমুদ্র যাত্রা করিলেন। আবার বিঘ্নবিপত্তি। রসেটায় ঝড়ে তাঁহার জাহাজ মারা গেল, তিনি আরবদিগের হস্তে পতিত হইলেন। আরবগণ সাধারণতঃ অপরিচিতের প্রতি যথেষ্ট আতিথ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, ডিবোয়াঞ্জির প্রতিও তাহারা যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিল এবং তাহাদের সাহায্যে তিনি কায়রো নগরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে বহু বিলম্ব হইবার পরে ইংরাজ কন্সল মিঃ বালডুইনের সাহায্যে ডিবোয়াঞ্জি অবশেষে ভারতবর্ষে আসিবার ক... লাগিলেন ...। এবং ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে সুয়েজ হইতে মাদ্রাজ ... যাত্রা করেন। শিক্ষা পাইয়া, ... ভ্রমণকালে যে সমস্ত লোকের সহিত ডিবোয়াঞ্জির আলাপ এবং বন্ধুত্ব স্থাপন হয়, ইংরাজ লর্ড পারসি তাহার অন্যতম। তিনি ডিবোয়াঞ্জিকে লর্ড ম্যাকার্টনি ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নামে সুপারিস পত্র দেন। মাদ্রাজ পঁহুছিয়া তিনি ইংরাজ সাহায্য ব্যতীতই তাঁহার অভিলষিত পথের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাহার কোন সুযোগ সে সময়ে হইয়া উঠিল না। কারণ তৎকালে হায়দারআলির সঙ্গে ইংরাজদিগের শেষ যুদ্ধও শেষ হয় হয় প্রায়। সেরূপ অবস্থায় ইংরেজগণ কোন রণকুশল ইউরোপীয়কে হাইদার সন্নিধানে উপস্থিত হইবার সুবিধা করিয়া দিতে ইচ্ছুক না হইতেও পারেন এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, অনন্যগতি দেখিয়া, রুশিয়ার সৈন্যবিভাগে মেজরপদ থাকা সত্ত্বেও তিনি মাদ্রাজ পদাতিকের ৬নং পল্টনে (6th Madras Native Infantry) পতাকাবাহকরূপে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের সূত্রপাৎ হইল। এবং

কর্ণেল বেলি নামক সেনাপতির অধীনস্থ যে সমুদায় সৈন্য হায়দারআলি ও টিপুসুলতানের আক্রমণে এককালে বিনষ্ট পায় মান্দ্রাজ পদাতিকের ৬নং পল্টনও তাহার অন্তর্ভুক্ত হইল। হায়দার কর্তৃক ইংরাজ সৈন্য আক্রান্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে কতক সৈন্য রসদের পাহারায় নিযুক্ত হইয়া যায়। ডিবোয়াঞি সেই দলভুক্ত থাকায় এবারেও রক্ষা পাইয়া গেলেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই ডিবোয়াঞি ইংরাজ সৈন্য বিভাগের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহাঁর কর্ম্মত্যাগের কারণ অনেক অনেক প্রকার করিয়া থাকেন।

কিন্তু ইনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন, তাঁহার বয়সে সৈনিক বিভাগের এত নিম্নস্তর হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ পদবী লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব, সুতরাং তিনি কাশ্মীর আফ্‌গানিস্থান এবং পারস্য হইয়া ইউরোপেই প্রত্যাগমন করিবার মনন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় আসিয়া লর্ড পার্সি প্রদত্ত সুপারিশ পত্র ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে দেন এবং তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় তাঁহাকে জানান। এই সুচতুর গভর্ণর ডিবোয়াঞের ইউরোপ প্রত্যাগমনের প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করেন, এবং ভারতীয় রাজগণের রাজধানীতে যেসকল ইংরাজ রেসিডেণ্ট ছিল তাহাদের অনেকের নামে এবং তাৎকালিক ভারতবর্ষীয় নরপতিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নামে সুপারিশ পত্র ও অনুরোধ পত্র দিয়া ডিবোয়াঞিকে বিদায় করেন। সেই সকল পত্রের জোরে প্রথমতঃ লক্ষ্ণৌ আসিয়া ডি বোয়াঞি তদানীন্তন নবাব কর্তৃক মহা-সমাদৃত হন। নবাববাহাদুর আনুমানিক চারি হাজার টাকার "খেলাত" তাঁহাকে দেন, এবং কাবুল ব্যাঙ্কের উপর ছয় হাজার এবং কান্দাহার ব্যাঙ্কের উপরও ঐ পরিমাণ টাকার বরাত চিঠি দেন। লক্ষ্ণৌতে ডিবোয়াঞি প্রায় পাঁচ মাস কাল অবস্থান করেন। তাঁহার এই সুদীর্ঘ অবস্থিতি কালে লক্ষ্ণৌস্থিত অনেক ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারীর

সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। এবং ইংরাজের যুদ্ধ নীতিও তিনি কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্ত করিতে পারেন। তৎপশ্চাৎ দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিয়া আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে তিনি দিল্লিতে উপস্থিত হন।

শাহ আলম তখন দিল্লির বাদশাহ এবং মিরজাসাফি উজীর। উজীরের সহায়তা এবং অনুমতি ব্যতীত ডি বোয়াঞের পক্ষে বাদশাহের সন্দর্শন লাভ অসম্ভব। উজীর মহাশয় তৎকালে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আগরার সন্নিহিত স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া ছিলেন। সুতরাং ডিবোয়াঞি সেই পর্য্যন্ত যাইতে বাধ্য হইলেন। এই আগরা ভ্রমণ কালেই তাঁহার মনোমধ্যে কতকগুলি বিষয়ের আন্দোলন ও আলোচনা উপস্থিত হয় এবং সেই গুলিই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্য পরম্পরার নিয়ামক হইয়াছিল।

বাদশাহ সন্নিধানে উপস্থিত হওয়া তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না, কারণ তিনি উজীর মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ভারতের তদানীন্তন অবস্থা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ভারতবর্ষীয় রাজগণের পরস্পরের প্রতি জিগীষা, ভারতীয় সৈন্যবর্গের অশিক্ষিত অবস্থা, এবং সেনাপতিগণের রণপাণ্ডিত্যের অভাব এই সমস্ত দেখিয়া স্বতঃই তাঁহার মনে উদয় হইল যে, শিক্ষিত, সাহসী এবং রণকুশল কোন ইউরোপীয় সেনাপতির পক্ষে উন্নতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র উন্মুক্ত। রাষ্ট্রবিপ্লবের বিশাল বহ্নি চতুর্দ্দিকে প্রধূমিত, এরূপ অবস্থায় কোন ইউরোপীয় সেনাপতির পক্ষে সৈন্য সংগ্রহ এবং তাহাদের শিক্ষা কার্য্যের নিমিত্ত কোন ক্ষমতাপন্ন রাজার নিকট হইতে অনুমতি আবশ্যক। নতুবা অজ্ঞাত কুলশীল বিদেশীর স্বীয় চেষ্টায় কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। এবং এইরূপ আদেশ ও সাহায্যে যে সৈন্য প্রস্তুত হইবে তাহার বলে তাহাদিগের অধিনায়ক সমগ্র ভারতবর্ষে একাধিপত্য স্থাপন করিতে না পারিলেও প্রতিযোগী রাজন্যবর্গের শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিবেন

তাহার কোন সন্দেহ নাই।—এই চিন্তা দিন দিন তাঁহার মনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগও সুদূর পরাহত বলিয়া মনে করিলেন না।

সেই সময়ে গোহাডের (Gohad) রাণা মাধোজি সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক দুর্গমধ্যে দৃঢ়রূপে অবরুদ্ধ আছেন। ডিবোয়াঞি ভাবিলেন মাধোজির নিকট উপস্থিত হইয়া কার্য্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহার সাহায্য না লইলেও লইতে পারেন, কারণ তিনি রাণা অপেক্ষা বহুগুণে বলীয়ান, এবং যদিবা তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করেন তথাপি সেরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার সেনাপতিত্ব ও রণপাণ্ডিত্যের কোন পরিচয়ই প্রকাশ পাইবে না। পক্ষান্তরে দুর্ব্বল রাণার পক্ষাবলম্বন করতঃ যদি তাঁহার রণনৈপুণ্যে শত্রুপক্ষের চেষ্টা বিফল করিয়া দিতে পারেন, তবে তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে এবং ভবিষ্যতে উন্নতির পথও পরিষ্কার হইবার সম্ভব। এই চিন্তা করিয়া ডিবোয়াঞি গোপনে রাণার নিকট নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন:—রাণার অনুমতি হইলে ডিবোয়াঞি জয়পুর, আগরা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে সর্ব্বসাকুল্যে ৮০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অবরোধকারী সিন্ধিয়ার সেনাদলকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করতঃ তাঁহার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন।

গোহাডের রাণা তৎকালে এই প্রস্তাবে সম্মতি অসম্মতি কিছুই প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার ভরসা ছিল ইংরাজ আসিয়া শালিসে বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবে, এবং তিনি অসতর্কতা প্রযুক্ত ডিবোয়াঞের প্রস্তাব যথেষ্ট পরিমাণ গোপনেও রাখিতে পারেন নাই। যখন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল তখন কার্য্যসিদ্ধির আর কোন সম্ভাবনা রহিল না দেখিয়া ডিবোয়াঞি তাঁহার প্রস্তাব ফিরাইয়া লইলেন, এবং জয়পুরের রাজার নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া আবেদন প্রেরণ করিলেন।

তাঁহার প্রেরিত আবেদন পত্রের কোনরূপ উত্তর জয়পুর দরবার হইতে আসিবার পূর্ব্বে তিনি আণ্ডার্সন নামক মাধোজি সিন্ধিয়ার দরবারের ইংরাজ রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার নিকট যান এবং যে পর্য্যন্ত জয়পুর হইতে কোন সংবাদ না পাওয়া যায় ততদিন সেইখানেই থাকা স্থির করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে জয়পুর হইতে খবর আসিল তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। ডিবোয়ঞি মনে করিলেন কর্ম্ম স্বীকার করিবার পূর্ব্বে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় জানান উচিত, কেননা ডি বোয়াঞি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন তিনি ইউরোপ যাইবার কল্পনা করিয়াছেন, এখন সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া জয়পুরের অধীনে কার্য্য লইতেছেন, সে কথা তাঁহাকে না জানাইলে ভদ্র ব্যবহারের ক্রটী হইবে। ওয়ারেন হেষ্টিংস সংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁহার দেশীয় রাজদরবারে চাকুরী লইবার সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের মতামত তাঁহাকে নিজে জানাইবার ইচ্ছায় তাঁহাকে অবিলম্বে কলিকাতায় যাইবার জন্য খবর পাঠাইলেন।

ডিবোয়াঞির নিকট গবর্ণারের অনুরোধ প্রায় আদেশাকারে পঁহুছায়। তিনি হৃষ্টভাবে তাহা গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু তত্রাপি তাঁহার ভবিষ্যৎ শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কলিকাতা যাওয়াই স্থির করিলেন। কলিকাতায় আসিলে ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহাকে বলিলেন যে ভারতের গবর্ণার জেনারেল স্বরূপে তিনি তাঁহাকে কোন দেশীয় রাজার অধীনে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনের ক্ষমতা বা অনুমতি দিতে পারেন না, তবে তাঁহার ব্যক্তিগত কোন আপত্তি নাই। ডি বোয়াঞি ওয়ারেন হেষ্টিংসের কথাবার্ত্তার শেষ অংশ অনুমতিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহারই সহিত লক্ষ্মৌ পর্য্যন্ত আসিলেন। এবং তথা হইতে আগ্রা হইয়া জয়পুরাভিমুখে যাত্রা করতঃ পথে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে তথায় পঁহু-

ছিলেন। জয়পুরে আসিয়া তাঁহার ঈপ্সিত ফল লাভ ঘটিল না। জয়পুর হইতে সংবাদ আসিবার পর কলিকাতা গতায়াতে বহুসময় বৃথা নষ্ট হইয়াছিল। ইতিমধ্যে জয়পুর দরবারের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, রাজার রণকুশল সেনাপতির প্রয়োজনীয়তা আর মনে স্থান পাইল না। সুতরাং তাঁহারও আর চাকরী ঘটিল না। তবে জয়পুর দরবার হইতে খরচ খরচা এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁহাকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হইল।

ডিবোয়াঞি যদিও নিরাশ হইলেন তথাপি নিরুদ্যম হইলেন না। তিনি জয়পুর হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে দিল্লীশ্বরের প্রধান মন্ত্রী মিরজাশাফি নিহত হইয়াছিলেন এবং চতুর্দ্দিকে অরাজকতার নিরতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। মাধোজি সিন্ধিয়া বহুকাল হইতেই মোগল রাজধানী দিল্লি অধিকার করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এই সুযোগে সে বাসনা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু মাধোজি জানিতেন সে ব্যাপার কতদূর কষ্টসাধ্য, সেইজন্য তিনি দূরদর্শীর ন্যায় বহুকাল হইতেই এই কঠিন কার্য্যোপযোগী আয়োজনগুলি ধীরে ধীরে সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন। যে সময়ে ডিবোয়াঞি দিল্লি যাত্রা করেন সেই সময়ে মাধোজি সিন্ধিয়া আগরার সন্নিহিত স্থানে থাকিয়া বুন্দেল খণ্ড আক্রমণের ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

ডিবোয়াঞি আগ্রায় আসিয়া এই যুদ্ধ ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার জন্য মাধোজির নিকট আবেদন জানান এবং দুই পল্টন পদাতিক সৈন্য ইউরোপীয় যুদ্ধনীতি অনুসারে শিক্ষিত এবং ইউরোপীয় অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। [ক্রমশঃ]

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

নববর্ষে পল্লীদৃশ্য।

তরুণ অরুণ ধীরে ধীরে পূর্ব্ব গগনপ্রান্তে সমুদিত হইল; শিশিরসিক্ত আম্রকানন তথনও তাহার পত্রবহুল বক্ষে অন্ধকাররাশি বাঁধিয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল। দীর্ঘ রাজপথের উভয় পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, ধূসরবর্ণ, হলকর্ষিত। সমুন্নত অশ্বত্থবৃক্ষে হরিয়াল ও শুক পক্ষীর ঝাঁক। বৃক্ষে নব পত্র বিকশিত হইয়াছে, প্রভাত সমীরণভরে তাহা বিকম্পিত হইতেছে, সেই সকল পত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া পক্ষিদল বৃক্ষশাখা ঝঙ্কারিত করিতেছে, কোন ঝাঁক যুগপৎ বৃক্ষশাখা হইতে উড়িয়া বহুদূরে চলিয়া যাইতেছে, প্রভাত-রৌদ্র তাহাদের পীতাভ বক্ষে পড়িয়া রক্তিম আভা ফুটাইয়া তুলিতেছে—আলোক সমুজ্জ্বল আকাশে স্বরতরঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছে।

গ্রাম্যপথ তথনও জনবিরল, দুই একজন কৃষক এক এক জোড়া বলদ লইয়া মাঠে চলিয়াছে। বলদ দুইটি এক রজ্জুতে আবদ্ধ, পশ্চাতে কৃষক, তাহার স্কন্ধে লাঙ্গল, লাঙ্গলের ফাল প্রভাতরৌদ্র স্পর্শে চিক্ চিক্ করিতেছে, লাঙ্গলের জোয়ালে কৃষকের 'বাদা' জোড়াটা বাঁধা, আর এক পাশে একটি ছোট চটের থলি, থলির মধ্যে কয়লা, চকমকির পাথর, ইস্পাতের ঠুক্‌নী (প্রস্তর হইতে অগ্ন্যুৎপাদনের জন্য মনুষ্যকর্ণাকৃতি ইস্পাতখণ্ড), একখানি পোড়ান শোলা। কৃষক 'থরসান' টানিতে টানিতে চলিয়াছে। একটি স্ত্রীলোক গোময় সংগ্রহের জন্য পথপ্রান্তে অবস্থিত তেঁতুল গাছের মূলদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—এই বৃক্ষমূল ভিন্ন গ্রামযাত্রী গো-শকট সমূহের একটি আড্ডা—ষ্টেসন বলিলে অত্যুক্তি হয় না; বৃক্ষমূলে জেলাবোর্ড প্রদত্ত একটি ইঁদারা।

গ্রাম হইতে জঙ্গলের ভিতর দিয়া সুঁড়ি পথ নদীর দিকে অগ্রসর

হইয়াছে। শুভ্র, বৃক্ষচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন বিজন পথ, উভয় পাশের বাঁশের ঝাড় পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; নিকটে বেতের ঝাড়, কণ্টক পরিবৃত নিবিড় বেতসকুঞ্জ পথের ধারে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহার পাশে ভাঁট বন, অগণ্য শুভ্র ভাঁটফুল ফুটিয়া বন হাস্যময় করিয়া রাখিয়াছে, গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছে। গ্রাম্য বধূগণ সুমার্জ্জিত পিত্তল কলস কক্ষে লইয়া গুজরীপঞ্চম ও মলের সুমধুর নিক্কনে সেই বনপথ ধ্বনিত করিয়া নদীতে চলিয়াছে, হ্রস্ব অবগুণ্ঠন তাহাদের শ্লথবেণীবন্ধের উপর পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; সরল সুন্দর মুখগুলি হাস্যচ্ছটা প্রদীপ্ত, কিছু নিদ্রার জড়তা তখনও তাহাদের আয়তনেত্র পরিত্যাগ করে নাই, তাম্বুলরাগ তখনও তাহাদের ওষ্ঠে সংলিপ্ত রহিয়াছে।

গ্রামের মধ্যে পথের দুই পাশে গোপপল্লী। গোপবধূগণ কেহ কটি-দেশে অঞ্চল বাঁধিয়া নতদেহে গৃহপ্রাঙ্গন পরিষ্কার করিতেছে, কেহ গোশালা হইতে ঝোড়ায় করিয়া গোময় রাশি তুলিয়া একটি স্তূপে সঞ্চয় করিতেছে। গোপগণ কেহ উভয়জানুর ব্যবধান স্থলে 'থাবরে' রাখিয়া অবনত মস্তকে উভয় হস্তে গো-দোহন করিতেছে। গাভীর সম্মুখ পদে গোবৎস গো-লোমোৎপন্ন রজ্জুতে আবদ্ধ, গাভী পরম আগ্রহে জিহ্বা প্রসারিত করিয়া বৎসদেহ লেহন করিতেছে। কোন গোপ-নন্দন বারান্দায় বসিয়া তামাক টানিতেছে, কেহ কদলীপত্র কাটিয়া উঠানে বসিয়া 'পান্ত' খাইতেছে, গরুর পাল লইয়া সে মাঠে যাইবে।

গ্রামস্থ ভদ্রপল্লীর দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। গৃহের বারান্দায় রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, গৃহস্থগণ কেহ বারান্দায় কম্বলের উপর বসিয়া কোন বন্ধুর সহিত নববর্ষের ফলাফল লইয়া আলোচনা করিতেছেন, সম্মুখে একটি জীর্ণ কাঠের হাত বাক্স, তাহার উপর একখানি সূত্রবদ্ধ পুরাতন চসমা, একখানা নবদ্বীপের নূতন পঞ্জিকা। বাড়ির সম্মুখে শ্যামল দূর্ব্বাদল সমাচ্ছন্ন প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনে গোটাকতক বকফুলের, লাল করবীর ও

কৃষ্ণচূড়ার গাছ। শিরোমণি মহাশয় লগির সাহায্যে বৃক্ষশাখা হইতে পুষ্প আহরণপূর্ব্বক সাজিতে সঞ্চয় করিতেছেন, প্রভাতবায়ুভরে তাঁহার গাত্রস্থ নামাবলীখানি কম্পিত হইতেছে, সন্তোষ ও শান্তিতে ব্রাহ্মণের লোমবর্জ্জিত মুখখানি পরিপূর্ণ। তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল ভগবৎ-স্তোত্র নির্গত হইয়া বাঞ্ছিতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি পরিব্যক্ত করিতেছে।

বাজারের ভিতরের দৃশ্য আজ ঠিক অন্যদিনের মত নহে। প্রতি দোকানের দ্বারে দ্বারে রজ্জুবদ্ধ আম্রপত্র ও শোলার কদম্বফুল ঝুলিয়া বায়ুভরে বিকম্পিত হইতেছে। সকলেই স্ব স্ব দোকান সুসজ্জিত করিয়াছে, আজ তাহারা নূতন বৎসরের জন্য দেনা পাওনার নূতন খাতা খুলিয়াছে—আজ ধারে বিক্রয় বন্ধ। দোকানদারেরা ক্রেতাগণকে মিষ্টমুখ করাইবার জন্য তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরিতেছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কেবল দেনা পাওনার নীরস সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য সম্বন্ধও যে আছে, তাহা যে নিতান্তই আত্মীয়তার ভাব, তাহা দেখাইবার জন্য আজ দোকানদারগণ অর্থব্যয়ে ত্রুটি করিতেছে না। ক্রেতাগণও হৃদয়হীন নহেন, তাঁহারা টাকা দিয়া উঠানাদারের খাতা সাইত করিবেন—প্রভাত হইতেই 'সাইতের' কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

একটা ঢাক পিটাইতে পিটাইতে একজন ঢুলি কাত্যায়নীদেবীর মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কোন গৃহস্থের পূজা মানত আছে। নূতন ধুতি চাদর পরিয়া দুই হস্তে নৈবেদ্যের থালা ধরিয়া গৃহস্থের পুত্র নগ্নপদে ঢাকের অনুগমন করিতেছে; একজন ভৃত্যের ক্রোড়ে একটি কৃষ্ণবর্ণ ছাগশিশু, দেবীর নিকট বলিদানের জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে, একজনের হাতে একটি সাজি, পুষ্পরাশিতে পূর্ণ। পাড়ার কতকগুলি ছেলে দল বাঁধিয়া পূজা দেখিতে চলিয়াছে।

অনেক পল্লীরমণী আজ ফলদানের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ কেহ বা পূর্ব্ব বৎসরের আরব্ধ ব্রত উদযাপন করিতেছেন, সমস্ত

বৈশাখ মাস ধরিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণকে ফলদান করিবেন, তাঁহাদের ভৃত্য বা পরিচারিকা একখানি সুপরিষ্কৃত রেকাবিতে কয়েকটি কাঁচগোল্লা, সুপক্ক কদলী, একপণ কড়ি এবং একটি উপবীত লইয়া ব্রাহ্মণবাড়ী যাইতেছে, কেহ বা কদলীর পরিবর্ত্তে লম্বা বোঁটাবিশিষ্ট কাঁচা আম বা ডাব লইয়া যাইতেছে—ব্রাহ্মণকে ফলদান করিয়া তবে ব্রতধারিণী জলপান করিবেন।

বৈশাখের রৌদ্র ক্রমে প্রখর হইয়া উঠিল। মুনসেফী আদালতের আমলাগণ ধুতির উপর চাপকান আঁটিয়া দক্ষিণ হস্তে ছত্র ও বাম হস্তে লাল ফিতে জড়ান নথির বাণ্ডিল বুকের কাছে ধরিয়া তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে কাছারীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। মিউনিসি-পালিটীর অপর্য্যাপ্ত লোহিত রজঃ উড়াইয়া গোরুর গাড়ি নদীতীর হইতে চুণ বোঝাই লইয়া মন্থরগমনে মহাজনের আড়তের দিকে অগ্রসর হইতেছে, গাড়োয়ানের সর্ব্বাঙ্গ চুণানুলিপ্ত। ময়রার দোকানে সশব্দে ভিয়েনের কাজ চলিতেছে। গ্রাম্য পুরোহিত মহাশয় সিক্ত গামছা খানি ভাঁজ করিয়া মাথায় রাখিয়া নামাবলীতে দেহ আচ্ছাদন পূর্ব্বক যজমান গৃহে ভগবতী পূজা করিতে যাইতেছেন। প্রত্যেক গৃহস্থের গোশালায় আজ ভগবতী পূজা হইবে। পল্লী গৃহিনীগণ স্নানান্তে তুলসীমঞ্চের ঝরায় জল ঢালিয়া দিয়া ভগবতী পূজার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন, ধূপের গন্ধে গো-শালা সমূহ সুরভিত হইয়া উঠিল। প্রত্যেক গো-শালায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালসায় পরমান্ন পাক হইতে লাগিল—শিশুদিগের হর্ষধ্বনিতে প্রতি গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল।

রামহরি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পন্ন গৃহস্থ; গ্রামের মধ্যে একজন প্রধান চাষী গৃহস্থ। তাঁহার চারিখানি লাঙ্গল, গাই বলদে গোয়াল পরিপূর্ণ, চারি খাদা জমিতে (১৬ বিঘায় এক খাদা) তাঁহার চাষ। তিনটি গোলাবাড়ী। ধান, গম, ছোলা, মসিনা প্রভৃতি শস্তে গোলাবাড়ীর

গোলাগুলি পূর্ণ থাকে, তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গনেও আট দশটা গোলা। গৃহিণী আজ সকালে স্নান করিয়া আসিয়া গোলাগুলির দ্বারদেশে সিন্দুর ও চন্দনের ফোঁটা অঙ্কিত করিয়াছেন। রাখালেরা গোশৃঙ্গে তৈল ও সিন্দূর লেপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে নদীতে গা ধোয়াইবার জন্য লইয়া গিয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ আজ আনন্দপূর্ণ। তাঁহার কন্যা কমলার দুই এক দিনের মধ্যে শ্বশুর বাড়ী যাইবার কথা আছে, দুই বৎসর পরে সে এই দ্বিতীয়বার যাইতেছে, সপ্তাহকাল পূর্ব্বে জামাই যোগেশ তাহাকে লইতে আসিয়াছে। কমলা গত ফাল্গুণে পনের বৎসরে পড়িয়াছে।

আজ নববর্ষদিন, জামতার ভোজনের বিশেষ আয়োজন করিবার জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছু উৎসুক হইয়াছেন। তিনি তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী বারুই পাড়ায় গোলাবাড়ীর পুষ্করিণীতে মাছ ধরিবার জন্য প্রভাতেই দুইজন জেলে পাঠাইয়াছিলেন, বেলা দশটার মধ্যে তাহারা এক প্রকাণ্ড সুলোহিত রোহিত মৎস্য আনিয়া হাজির করিল, দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আনন্দের সীমা রহিল না। বাগান হইতে তিনি স্বয়ং ইঁচড় ভাঙ্গিয়া আনিলেন, কলাবাগান হইতে গাবথোড় ও মোচা কাটান হইল; রাখাল রমজান আমবাগানের গাব গাছ হইতে কচি কচি গাব পাতা কোঁচড় ভরিয়া ভাঙ্গিয়া আনিল। পাকা কুলের গুড়অম্বল রাঁধিবার জন্য গিন্নী কতকগুলি কুল পাথরের বাটিতে ভিজাইলেন। কমলা সকালে স্নান করিয়া আসিয়া, ভিজে চুলের গোচ্ছায় গ্রন্থি দিয়া মস্তকের সম্মুখে তাহা চূড়াকারে স্থাপন করিল, এবং রোয়াকে বসিয়া 'তিল-পিঠালী-বেগুণ ভাজা' ও বড়ার জন্য ভিজে কলাইয়ের ডাল বাঁটিতে লাগিল। কূপের নিকট বসিয়া গোয়ালা বৌ রুই মাছ কুটিতে লাগিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আজ তাঁহার কয়েকজন আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আজ 'বছরকার দিন,' জামাইকে লইয়া তিনি

এমন দিনে একাকী যে আহারামোদে ব্যস্ত থাকিবেন ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না।—পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি কিছু অতিরিক্ত আয়োজন করিয়াছিলেন।

কমলা দুই হাত নাড়িয়া মাথা দুলাইয়া ডাল বাঁটিতেছে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "মা কমল, তুই ত আর দুই একদিনের মধ্যেই শ্বশুর বাড়ী চল্লি, তোর বুড়ো শ্বশুর তোর হাতে খেয়ে বাঁচবে। আজ মাছটা তুই রাঁধ, আবার যে কবে আসবি, এর মধ্যে মরে যাইত আর তোর হাতের রান্না খেতে পাব না।"

কমলা উভয় হস্তের আন্দোলন স্থগিত করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "আজ বছরকার দিন, ওরকম অলক্ষুণে কথা বল কেন বাবা! দাদার বৌ এসে তোমাকে আমার চেয়েও ভাল করে রেঁধে দেবে।—তা তুমি যখন বলচ, আমিই না হয় মাছটা রাঁধবো, কিন্তু ঝোল খেয়ে পোড়া কপালের ঝি ব'লে গাল দিয়ো না, বছরকার দিনে যে আমার বাবাকে গাল দেবে তা আমার সহ্য হবে না।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তোর বাবা গাল খাবে না ত কি রসগোল্লা খাবে?"

স্থির হইল, কমল মাছের ঝোল ও আমের অম্বল রাঁধিবে। গৃহিণী ডাল তরকারী ও ভাত রাঁধিবেন। আর নিরামিষ হেঁসেলে বিধবা পিসিমা তিল পিঠালী বেগুণ ভাজা, বড়া, কুলের গুড় অম্বল ও খেজুরে গুড়ের পায়েস রাঁধিবেন।—কমলের ছোট বোন অমলার উপর পান সাজিবার ভার।

যথাকালে রন্ধন শেষ হইলে সকলে আহারে বসিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "আরে মাছের মুড়োটা ঐ ওদিকে লোকনাথ ঠাকুরদাদার পাতে দেও, নৈলে ঠাকুরদা বদনাম করবে, বলবে নাতি নেমন্তন্ন ক'রে মাছের ল্যাজা দিয়েই বিদেয় করেছে।"

উপবিষ্ট ভোক্তাগণ হাসিয়া উঠিলেন। চট্টোপাধ্যায় গৃহিণী অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে সকোপদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিলেন, ভাবখানা এই যে, 'অতটুকু আক্কেল আমার আছে।'

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পত্নীর সেই কোপ কটাক্ষে কিছুমাত্র আহত না হইয়া বলিলেন, "বাঙ্গালদেশে কমলার মামার বাড়ী কি না—ঝোলে ঝালটা কিছু অতিরিক্ত হয়েছে।"—চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্রদৃষ্টি তাঁহার বামপার্শ্ববর্ত্তী শ্যালকের উপর নিক্ষিপ্ত হইল।

শ্যালক মহাশয় বলিলেন, "মাছটা অতি পরিপাটী রাঁধা হয়েছে, কার রাঁধা হে চাটুর্য্যে!"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অন্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মুখে কিছু ঔদাসীন্য দেখাইয়া বলিলেন, "ও কমল রেঁধেছে, কমল রাঁধে ভাল।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ব্বমন্তব্যে শ্যালকবর কিছু আহত হইয়াছিলেন, আত্মসমর্থনের জন্য বলিলেন, "তবে আর কোমলার মাতুলালয়ের দোষ দেও ক্যান, মাছ রান্না ত তার বাপের দেশেরই শিক্ষা।"

চট্টোপাধ্যায় গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "কমলা তার মামার মুখরোচক করে রেঁধেছে, কাজেই ঝাল অপরিহার্য্য।"

এইরূপ হাস্যামোদে আহার শেষ হইলে, কিয়ৎক্ষণ পরে যোগেশ গৃহে আসিলেন। তাহার শ্যালিকা অমলা তখনও একমনে পান সাজিতেছিল। যোগেশ বলিল, "কি ঠাকুরঝি, পান সেজে যে আশ মিটচে না, তবু ত পান খাওয়াবার লোক আজও আসেনি।" অমলা গম্ভীর হইয়া বলিল, "বাঁড়ুয্যেমশাই তুমি বড় ঠাট্টা করতে পার। আমি এর শোধ নিলে কিন্তু রাগ করো না।"

"আরে রাম, তোমার উপর কি রাগ কর্ত্তে পারি! এখন পান টান কিছু দেবে? একেই ত ঠোঁট লাল হয় না দেখে তোমার দিদির মন ওঠে না।"

"সে দুঃখ আমার কাছে কেন? এই নাও।" এই কথা বলিয়া অমলা একটি সুপরিস্কৃত রূপার ডিবা যোগেশের হাতে তুলিয়া দিল; হাসিয়া বলিল, "তোমাকে একবার এমন জব্দ করবো!"

যোগেশচন্দ্র খট্ করিয়া ডিবাটি খুলিলেন, তাম্বুলের পরিবর্ত্তে দশ বারটা 'তেলাপোকা' চক্ষুর নিমিষে ডিবার ভিতর হইতে যুগপৎ বাহির হইয়া 'পত পত' শব্দে যোগেশের বিস্ময়ব্যাকুল চোখে মুখে অমলার জয়পতাকা বুলাইয়া উড়িতে লাগিল। অমলা তখন অদৃশ্য! বাতায়নের অপর পারে দাঁড়াইয়া ফুল্লকমলাননে হাস্যকৌমুদী ছড়াইয়া বলিল, "কেমন জব্দ!"

আহারের পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিস্তীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপে 'কচেবার' আরম্ভ করিলেন, পাড়ার ও ভিন্ন পাড়ার মাতব্বর বৃদ্ধেরা আসর গুলজার করিয়া বসিলেন। বাঁধা হুকায় ঘন ঘন তামাক চলিতে লাগিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে সাড়ে সাত হাত লম্বা ফরসীর নল, তাঁহাতে কাপড়ের খোলস আঁটা; চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নলটিকে কলিকার সজীব অবস্থায় কদাচ অধর সুধা দান হইতে বঞ্চিত রাখেন না, তাই অন্যান্য ক্রীড়ামগ্ন ব্যক্তিগণকে অগত্যা রূপা বাঁধানো হুকার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

আহারান্তে গৃহিণী মেঝের উপর অঞ্চল বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার বিধবা ননদ হরিনামের মালা হাতে লইয়া মধুসূদনের রোয়াকে গিয়া বসিলেন, সেখানে পাড়ার বিধবাগণের কমিটি বসিয়াছে, দশহরা গঙ্গাস্নানে নবদ্বীপ যাত্রার রেজোল্যুসন সমর্থন করিবার ভার তিনি ও অন্য কয়েকজন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কমল, অমল, চক্রবর্ত্তীদের কিরণ আর দত্তদের কামিনী তাস খেলিতে বসিল।

যোগেশ তখন গ্রাম্য লাইব্রেরীতে বসিয়া কালেজের গুটিকয়েক অবসর প্রাপ্ত ছাত্রের সঙ্গে রঙ্গালয়ে অভিনীত সীতারাম ও কৃষ্ণকান্তের

উইল নামক নাটকদ্বয়ের 'ড্রামাটিক এফেক্ট' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল।

রামনাথ বলিল, "আমি ষ্টেজে কৃষ্ণকান্তের উইল যা দেখেছি that's a ghost of its former self. What Bankim Babu would think if he only knew—"

ইংরাজী ও বাঙ্গালা মিশিয়া উভয়ের তর্ক স্রোত ভাদ্রের গঙ্গার ন্যায় প্রবল তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

দিবাকর অস্ত গেল। সান্ধ্যতপনের শ্রান্তদেহ পশ্চিম গগনপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িল, ঘাটের পথে আবার সকালের মত সারি সারি কুলনারীগণ চলিতে লাগিল; রূপে, চারুচরণপদ্মে মলের শব্দে, আর মাথাঘষার উগ্রগন্ধে বনপথ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বাজারের দোকানদারেরা স্ব স্ব দোকান রঙ্গমঞ্চের ন্যায় সজ্জিত করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় হইতেই নিমন্ত্রিত গ্রাম্য ভদ্রলোকেরা 'সাইতে' বাহির হইলেন, অনেকে পরিচারকের হস্তে টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যা হইল। সমস্ত দিনের রৌদ্রোত্তপ্ত বসুন্ধরার ললাটে উষ্ণ-বায়ু প্রবাহ অস্তমিত তপনের অন্তিম দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। কাত্যায়নী মন্দিরে কাঁশর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; মন্দির সন্নিকটস্থ অশ্বত্থতলায় জটাধারী, ভস্মাবৃত, ধূসরদেহ সন্ন্যাসীগণের কণ্ঠদেশ হইতে সুগম্ভীর "বোম্ বোম্ হর হর" ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। গঞ্জিকা ধূম্রে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইল।

এক একটি করিয়া বাজারের সমস্ত দোকানে দীপাবলী প্রজ্বলিত হইল। আজ অনেকেই বাতি জ্বালাইয়াছে, কেহ বা লণ্ঠনের ভিতর গেলাস বসাইয়া নারিকেলের তৈল জ্বালাইতেছে। 'হালি দোকানদার' নকড়ি তরফদার খুব ধুমধামে পসর হাট্টার (বেনে মশলা) এক দোকান

খুলিয়াছে, তাহার দোকানে ডিট্‌মারের এক 'হ্যাঙিং ল্যাম্প,' চিমনিটা ফাটা এবং ডোমের উপর এক আঙ্গুল পুরু ধূলা।

কৃষ্ণপক্ষ। আকাশে চাঁদ উঠিল না। তেঁতুল গাছের ঘন পাতার অন্তরালে, জঙ্গলের মধ্যে জোনাকী মিট মিট করিয়া জ্বলিয়া অন্ধকার রাক্ষসের চক্ষুস্পন্দনের ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

আকাশে সমুজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় অগণ্য নক্ষত্র দীপ্যমান হইয়াছে। পথের ধারে কাঁঠাল গাছতলায় গাড়ী গরু নামাইয়া গাড়োয়ানেরা তিউড়িতে ভাত রাঁধিতেছে, আর পরস্পরের সুখ দুঃখের আলোচনা করিতেছে। বলদগুলি এক এক বস্তা মসিনার ভুষি উদরস্থ করিয়া শয়নপূর্ব্বক রোমন্থন করিতেছে। গাড়ীতে 'তিসি' বোঝাই, রামনগর ষ্টেসনে যাইবে। গাড়ীর নীচে ঝাঁজরা করা টিনের আশ্চর্য্য লণ্ঠনের মধ্যে কেরোসিনের একটা ছোট ডিবি জ্বলিতেছে; রাজকর্ম্মানুরক্ত গ্রাম্য অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট সমূহের বিচারনৈপুণ্য হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাদের এই তৈলের অপব্যয়।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। তখনও দুই এক জন লোক লণ্ঠন হস্তে বাজারের দিকে চলিয়াছে, তাহাদের বাম হস্তে স্থূল বংশযষ্টি, তাহা হইতে ক্রমাগত পথের উপর ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল।

ইংরাজী ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতসচিবের নিকট ভারতীয় ভূমিকর সম্বন্ধে একটী আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। আমি ভিন্ন বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ, বম্বের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সারজন জার্ডিন, মান্দ্রাজের রাজস্ব বন্দোবস্তের ভূতপূর্ব্বক ডিরেক্টর মিঃ পাকৃল্, বাঙ্গালার মিঃ রেনল্ডস্, বম্বের মিঃ রজার্স, মান্দ্রাজের মিঃ গার্ষ্টিন এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ অবসর-প্রাপ্ত রাজ-কর্ম্মচারিগণ উক্ত আবেদনের স্বাক্ষরকারী ছিলেন। সেই আবেদন পত্রে ভারতীয় ভূমিকর সুসঙ্গতি এবং সুবিচারের সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার জন্য পাঁচটি নিয়মের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। বিগত ১৩০৮ সালের আষাঢ় মাসের ভারতীতে "ভারতীয় দুর্ভিক্ষ" নামক প্রবন্ধে এই আবেদন পত্রের উল্লেখপ্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম উহার ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। সম্প্রতি মহামান্য বড়লাট বাহাদুর তাঁহার মন্ত্রীসভায় সেই প্রস্তাবগুলি যাবৎ পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

১। কৃষকের নিকট হইতে খরচ বাদ আসল উৎপন্নের অর্দ্ধেক গ্রহণ।

আবেদনকারিগণ যে প্রথম নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার ভাষা এইরূপ—মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশের অধিকাংশ স্থলে যেখানে ভূমিকর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষকের নিকট হইতে লওয়া হয়—সেখানে চাষের খরচার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বাদ রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের দাওয়া আসল উৎপন্নের মূল্যের অর্দ্ধাংশের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। এমন কি ভারতবর্ষের সেইসকল প্রদেশে, যেখানে আনুমানিকরূপে আসল্লের অর্দ্ধাংশ, তাবৎ-উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশের

কাছাকাছি বলিয়া গ্রহণ করা হয়, সেখানেও সাধারণতঃ তাবৎ-উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশকে অতিক্রম করা উচিত নহে।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মের প্রথমাংশের ভিত্তি (যাহা গবর্ণমেণ্টের দাওয়াকে আসল উৎপন্নের অর্দ্ধাংশে সীমাবদ্ধ করিতেছে) স্যর চার্লস উডের ১৮৬৪ সালের প্রেরিত পত্রের উপর সংস্থাপিত। ইহা ভারত গভর্ণমেণ্ট বাক্যতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জন তাঁহার রেজোলিউসানে বলিয়াছেন, "প্রায় ৪০ বৎসর অতীত হইল, মান্দ্রাজ প্রদেশের আসল উৎপন্নের অর্দ্ধেকের নিয়ম বিকল্পে গৃহীত হয়।" তজ্জন্য আবেদন-কারিগণ কোন নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে প্রার্থনা করেন নাই, কেবল যেখানে ভূমিকর কৃষকদের দ্বারা সাক্ষাতে সরকারে প্রেরিত হয়, সেই স্থলে সেই স্বীকৃত নিয়ম ন্যায়ানুগত ও সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে কার্য্যকারী করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন মাত্র। বোম্বাই প্রদেশে ভূমি-কর আসল উৎপন্নের অর্দ্ধেকাংশে সীমাবদ্ধ করিবার কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। আর মান্দ্রাজ প্রদেশে সচরাচর এরূপ রাজস্ব আদায় করা হয় যে রাজস্ব-বন্দোবস্তকারী কর্ম্মচারীর নিজের সাক্ষ্য দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে তথায় ভূমির কর আসল উৎপন্নের সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলে। আমি এইমাত্র অনুরোধ করিয়াছি যে, যে নিয়ম কথায় গৃহীত হইয়াছে তাহা যথাযথরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়া কৃষক সম্প্রদায়কে আসল উৎপন্নের অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক ভূমিকর হইতে রক্ষা করা হউক। লর্ড কার্জ্জন তদীয় রেজোলিউশনে এরূপ রক্ষা পাইবার কোন উপায় করেন নাই। ইহাতে মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের কৃষী ভূম্যধিকারীগণের ভূমি-কর পূর্ব্বেরই ন্যায় অনিশ্চয় রাখিয়াছে। এই অনিশ্চয়তাতে কৃষীজীবিদিগকে নীতিভ্রষ্ট করিয়া ভারতীয় কৃষীকার্য্যকে উচ্ছন্ন দিবার উপক্রম করিতেছে।

উপরোক্ত নিয়মের দ্বিতীয়াংশে বলা হইয়াছে যে যথন ভূমি-কর

কৃষকদিগের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সরকারে দেওয়া হয়, উহার সর্ব্বোচ্চ হার তাবৎ উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশে সীমাবদ্ধ থাকা কর্ত্তব্য। লর্ড কার্জ্জন্ নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছেন—"আবেদনকারিগণ যে তাবৎ উৎপন্নের হার প্রবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা যদ্যপি বিধিবদ্ধরূপে প্রচলিত করা হয় তাহা হইলে সর্ব্বত্র করবৃদ্ধিতে পর্য্যবসিত হইবে। মধ্য প্রদেশের রিপোর্ট হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উৎপন্নের সহিত তাবৎ খাজনার অনুপাত এক-ষষ্ঠমাংশ হইতে এক চতুর্দ্দশাংশ পর্য্যন্ত, এবং ঐ হার প্রবর্ত্তিত করিলে রায়তদিগের দায়িত্ব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে। বঙ্গীয় রিপোর্টে ষ্ট্যাটিষ্টিক্সমূলক যে যুক্তি পাওয়া যায় তাহাতে বিশ্বাস হয় যে তথায় খাজনা সাধারণতঃ তাবৎ উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশের অনেক নিম্নে অবস্থিত। এবং অস্থায়ীরূপে বন্দোবস্তী-কৃত গভর্ণমেণ্টের মহালের রায়তেরা, এই নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূস্বামীর অধীনের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অবস্থাপন্ন। মান্দ্রাজের উত্তরে লিখিত আছে যে 'যদ্যপি গভর্ণমেণ্ট রায়তদিগের নিকট হইতে যথার্থ তাবৎ উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশ লয়েন, তথায় ভূমির রাজস্ব এখন অপেক্ষা দ্বিগুণিত করিতে হইবে।' * * * সুতরাং আবেদনকারীরা যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিলে, বিপরীত ফল প্রসব করিবে, তদনুসারে রাজ প্রতিনিধি ও তাঁহার সদস্যগণ এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষম।"

উদ্ধৃত সমগ্র মন্তব্যেই গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত নিয়মটি ভুল বুঝিয়াছেন। আবেদনকারীরা এরূপ বলেন নাই যে পঞ্চমাংশই ভূমিকরের মাত্রা নির্দ্ধারিত হইবে। তাঁহারা বলেন নাই যে গভর্ণমেণ্টকে প্রজার নিকট হইতে প্রকৃত সমগ্র শস্যমূল্যের পঞ্চমাংশ লইতেই হইবে। তাঁহারা কেবলমাত্র প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে সমগ্র শস্য

মূল্যের পঞ্চমাংশকে যেন অতিক্রম করা না হয়। ১৮৮৩ সালে সার্ এন্‌টনি ম্যাক্‌ডোলেন বাঙ্গালার জমিদারগণের পক্ষে ইহাই সর্ব্বোচ্চ ভূমিকর এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সার চালর্স উডের ১৮৬৪ সালের নিয়ম অনুসারে গভর্ণমেণ্ট অর্দ্ধেকমাত্র ভূমিকর গ্রহণ করেন, পূরা নহে। তথাপি তাহা অনেক সময়ে সমগ্র উৎপত্তির পঞ্চমাংশ অতিক্রম করিয়া যায়। ১৮৮০ সালের ফেমিন কমিশনের নিকট প্রমাণিত হইয়াছিল যে কোন কোন তালুকের ভূমিকর তাবৎ উৎপত্তির $\frac{৩১}{১০০}$ অংশ পর্য্যন্ত আছে। এবং সম্প্রতি মান্দ্রাজের রেভিনিউ বোর্ড এইরূপ বুঝাইতেছেন যে এই উচ্চ হার অতি ক্ষুদ্র প্রদেশেই ঘটিয়াছে, এবং $\frac{২২}{১০০}$ হইতে $\frac{২৮}{১০০}$ অংশ ধরিলে প্রকৃত সত্য অনেক পরিমাণে বজায় থাকে। ১৯০০ সালের ফেমিন কমিশনের নিকট প্রমাণিত হইয়াছিল যে মোটের উপর গুজরাটের ভূমিকর সমগ্র উৎপত্তির $\frac{২০}{১০০}$ অংশ; সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে গুজরাটির অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ তালুক এবং গ্রামে ভূমিকর এই অংশ অপেক্ষা অধিক অথবা এই অংশ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আবেদনকারিগণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে এই প্রকার অতি মাত্রায় করের হার নির্দ্ধারণ করিতে দেওয়া না হয়। এবং ভূমিকরের হার জমির গুণানুসারে অল্পাধিক হইলেও কোন প্রকারেই তাবৎ উৎপত্তির $\frac{২০}{১০০}$ অংশ অতিক্রম করা উচিত নহে। আবেদনকারিগণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে সার এন্‌টনি ম্যক্‌ডোনাল্ বাঙ্গালার বে-সরকারী ভূম্যধিকারীদিগের প্রাপ্য করের যে চূড়ান্ত সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাই কৃষক প্রজাদিগের গভর্ণমেণ্টকে দেয় করেরও সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। বড়ই দুর্ভাগ্য যে গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত নিয়মটি এইরূপ ভুল বুঝিলেন; একটী স্বকপোল কল্পিত নিয়ম যাহা আবেদনকারীরা কখনও প্রস্তাব করেন নাই তাহারই সম্ভাবিত অমঙ্গল ব্যাখ্যা করিলেন এবং কৃষক-

দিগের দেয় ভূমিকরের চরম সীমা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট কা... করিলেন।

ভারতবর্ষে যত প্রকার লোক গভর্ণমেণ্টকে ভূমিকর প্রদান করে তাহাদের মধ্যে মান্দ্রাজ এবং বম্বের কৃষকেরা যে পরিমাণে নিরুপায় ও অসহায় এরূপ আর কেহই নহে। উত্তর ভারতের জমিদারেরা নিজেদের দুঃখ প্রকাশ করিতে সক্ষম কিন্তু দক্ষিণ ভারতের কৃষাণ ভূস্বামিগণ তাহা পারে না। উত্তর ভারতবর্ষের জমিদারেরা 'সাহারাণ-পুরের অর্দ্ধ ভূমিকর নিয়মের' আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা দ্বারা করসীমা স্পষ্টতঃ নির্দ্ধারিত আছে। দক্ষিণ ভারতের কৃষাণ ভূস্বামীরা সেরূপ কোন স্পষ্ট সীমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না। এই জন্যই আবেদনকারিগণ ইহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত একটী দুই প্রকারে নির্দ্ধারিত সীমা প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহারা চাহিয়া-ছিলেন যে খরচ বাদ অর্দ্ধ শস্য-মূল্য গ্রহণের নিয়ম অতি দৃঢ় ভাবে এবং সর্ব্বত্রই কার্য্যতঃ রক্ষিত হয়; এবং একটি দ্বিতীয় ও অতিরিক্ত নিয়ম এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে সমগ্র উৎপত্তির পঞ্চমাংশের অধিক কর গৃহীত না হয়। লর্ড কার্জ্জন প্রস্তাবদ্বয়ের কোনটি গ্রহণ করেন নাই। ১৮৮০ এবং ১৯০০ সালে ফেমিন কমিশন যে সকল ব্যাপার প্রকাশিত করেন, তাহাতেও বড়লাট বাহাদুর দক্ষিণ ভারতের দীন অসহায় কৃষাণ ভূস্বামীদিগের উপর গভর্ণমেণ্টের দাবী সম্বন্ধে কোন প্রকার স্পষ্ট, সরল এবং বোধগম্য সীমা নির্দ্দিষ্ট করিলেন না। বড়লাট বাহাদুরের এইরূপ বিচারে আমরা নিতান্তই ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। কারণ কৃষীজীবী ব্যক্তিদিগের পক্ষে রাজা কতটা চাহিতে পারেন এবং কতটুকু তাহাদের নিজের থাকিবে, ইহা স্পষ্ট জানা এবং বুঝিতে পারা ভারতবর্ষে যে পরিমাণে আবশ্যক বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথায়ও তত নহে। রাজার দাবীর অনিশ্চয়তা কৃষিকার্য্যকে একে-

করিয়া ফেলে এবং এই সর্ব্বনাশী অনিশ্চয়তা ভারতবর্ষে কৃষিচেষ্টার সর্ব্বনাশ করিতে থাকিবে। যতদিন না এরূপ কোন ভবিষ্যৎ শাসনকর্ত্তার অভ্যুদয় হইতেছে যিনি প্রজাদিগকে আরও একটু নিকট ভাবে বুঝিতে পারিবেন, তাহাদিগের জন্য আরও একটু যথার্থ সহানুভূতি দেখাইবেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া কৃষাণদিগের বোধগম্য ভাষায় তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিবেন, যে জমির উৎপত্তির কতখানি পর্য্যন্তমাত্র গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের নিকট হইতে দাবী করিতে পারেন এবং কতটুকু নিশ্চয়ই তাহাদের নিজের থাকিবে, রাজস্ব কর্ম্মচারী বা বন্দোবস্তী কার্য্যকারকেরা তাহা স্পর্শও করিতে পারিবে না,—ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের মঙ্গল নাই। সে দিন ভারতবর্ষের পক্ষে একটি মহাশুভদিন যে দিন এরূপ বাণী ভারতবর্ষীয় কৃষাণ প্রজাদিগের প্রতি উচ্চারিত হইবে। ভুপৃষ্ঠে অন্য কোন প্রজার ইহার এতটা আবশ্যক নাই।

বারান্তরে অবশিষ্ট আন্দোলনগুলির ফলাফল বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে জানাইব।

শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত।

হাল খাতা।

আজ পয়লা বৈশাখ। নূতন বৎসরের প্রথম দিন অপর দেশের অপর জাতের পক্ষে আনন্দ উৎসবের দিন। কিন্তু আমরা সেদিন চিনি শুধু হাল খাতার। বছরকার দিনে আমরা গত বৎসরের দেনাপাওনা লাভলোকসানের হিসেব নিকেশ করি, নূতন খাতা খুলি এবং তার প্রথম পাতায় পুরণো খাতার জের টেনে আনি।

বৎসরের পর বৎসর যায়, আবার বৎসর আসে, কিন্তু আমাদের নূতন পাতায় কিছু নূতন লাভের কথা থাকে না। আমরা এক হালখাতা থেকে আর এক হালখাতায় শুধু লোকসানের ঘরটা বাড়িয়ে চলেছি। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ প্রভৃতির জের এবারেও টান্‌তে হচ্ছে। এভাবে আর কিছুদিন চল্‌লে যে আমাদের জাতকে দেউলে হতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লাভের দিকে শূন্য ও লোকসানের দিকে অঙ্ক ক্রমে বেড়ে যাচ্চে, তবে আমরা ব্যবসা গুটিয়ে নিইনে কেন? কারণ ভবের হাটে দোকানপাট কেউ স্বেচ্ছায় তোলে না, তার উপর আবার আশা আছে। লোকে বলে আশা না মলে যায় না।

মহামারী ও দুর্ভিক্ষে যে আমাদের ক্ষতি বই বৃদ্ধি নেই, একথা ত সর্ব্ববাদীসম্মত, তবে যুদ্ধের কথায় হয়ত অনেকেই আপত্তি করবেন। বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষে শুধু নিছক শান্তি, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি উৎপাতের নামগন্ধও নেই। ইংরাজরাজ এই বলে' আমাদের, এবং সম্ভবতঃ নিজেকেও, স্তোক দেন যে, এই দেশব্যাপী শান্তির এত অশেষ সুফল যে আমরা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে দেখ্‌লে স্পষ্টই দেখ্‌তে পাব তার তুলনায় প্লেগ, ফ্যামিনের যে কুফল তা নগণ্যমাত্র। ও সামান্য কুফলের দিকে চোখ পড়াটাই আমাদের নিমকহারামীর পরিচয় দেয়। কেবলমাত্র শান্তি যে একটা মহা সৌভাগ্য, এ কথা সত্য কি না সে তর্ক মিছে। কারণ সুখে হোক্‌, দুঃখে হোক্‌, আমাদের শান্তিতেই বাস করতে হবে। কিন্তু বিদেশের যুদ্ধের যে হ্যাপা সাম্‌লাতে হয়, এই আমাদের দুর্ভাগ্য। ইংরেজ মনে ঠিক দিয়ে রেখেছেন, যে ইংরেজ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন জাতির উচ্চ আশারূপ ভবরোগের একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ হচ্চে Tommy, ওরফে গোরা। তবে ঐই মহা ঔষধ বুয়রদের সম্বন্ধে যে কতকটা ব্যর্থ হয়েছে, সে ঔষধের দোষ নয়, অনুপানের দোষ। টমির মত যোদ্ধা ভূভারতে নেই। তবে

টমি যদি কোথাও হার মানে ত সে যুদ্ধের উপকরণের দোষে। টমির হাতিয়ার নিতান্ত সেকেলে, টমির হেল্‌মেটের গড়ন কি একরকমের, টমির জুতো হয় বড্ড ঢিলে নয় বড্ড কশা। সুতরাং সাজসজ্জা, বন্দুক, কামান, সঙ্গীন, তোজ্‌দান, গোলাগুলি সব বদ্‌লাতে হবে, সব আবার নতুন ক'রে করতে হবে। অগাধ পয়সা ব্যয় হবে, এবং 'এম্পায়ার'ভুক্ত ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সেই ব্যয়ভারের উপযুক্ত অংশ বহন করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের খরচের খাতায় দু' এক ক্রোর লিখ্‌তে হবে।

আমরা জাতীয় অবস্থা শুধ্‌রে নেবার একমাত্র উপায় ঠাউরেছি National Congress করা, কিন্তু ভুলে যাই, যে বিপদ যখন নিতান্ত ঘনিয়ে আসে, তখন শান্তি স্বস্ত্যয়নে রক্ষা পায় না। নিজের দুরবস্থা নিজে ছাড়া অপরে কেউ দূর করতে পারে না।

আমরা স্বজাতি সম্বন্ধে যে একেবারেই উদাসীন তা নয়। গেল বৎসর, জাতি হিসেবে কায়স্থ বড় কি বৈদ্য বড়, এই নিয়ে একটা তর্ক ওঠে। যেহেতু আমরা অপরের তুলনায় সকল হিসেবেই ছোট, সেইজন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে কে ছোট কে বড়, এ নিয়ে বিবাদবিসম্বাদ করা ছাড়া আর উপায় নেই। নিজেকে বড় বলে পরিচয় দেবার মায়া আমরা ছাড়তে পারিনে। কায়স্থ বলেন আমি বড়, বৈদ্য বলেন আমি বড়! শাস্ত্রে যখন নানা মুনির নানা মত, সূক্ষ্ম বিচার করে এবিষয়ে ঠিকটা সাব্যস্ত করা প্রায় অসম্ভব। বৈদ্যের ব্যবসায় চিকিৎসা,—প্রাণরক্ষা করা। ক্ষত্রিয়ের ব্যবসায় প্রাণবধ করা,—অতএব ক্ষত্রিয় নিঃসন্দেহ বৈদ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং বৈদ্য অপেক্ষা বড় হতে গেলে ক্ষত্রিয় হওয়া আবশ্যক, এই মনে করে জনকতক কায়স্থসমাজের দলপতি ক্ষত্রিয় হবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এ শুভসংবাদ শুনে আমি একটু বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলুম।

কারণ প্রথমতঃ আমি উন্নতির পক্ষপাতী। কোন লোকবিশেষ কিম্বা জাতিবিশেষ আপন চেষ্টায় আপনার অবস্থার উন্নতি করতে উদ্যোগী হয়েছে দেখ্‌লে কিম্বা শুন্‌লে খুসী হওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষতঃ বাঙ্গালার পক্ষে যখন জিনিষটে এতটা নূতন। নূতনের প্রতি মন কার না যায়, অন্ততঃ দুদণ্ডের জন্যও। অবনতির জন্য কাউকেই আয়াস করতে হয় না। ও একটু ঢিলে দিলে আপ্‌না হতেই

প্রমাণ করেছেন যে জড়ে ও জীবে আমাদের ভেদজ্ঞান শুধু ভ্রান্তি মাত্র। সে ভ্রান্তির মূল আমাদের চর্ম্ম চক্ষুর স্থূলদৃষ্টি। তিনি ইলেক্‌ট্রিসিটির আলোকের সাহায্যে দেখিয়ে দিয়েছেন যে অবস্থা অনুসারে জড়পদার্থের ভাবভঙ্গী ঠিক সজীব পদার্থের অনুরূপ। প্রোফেসর বোস নিজে বলেন যে ভারতবাসীর পক্ষে এ কিছু নতুন সত্য বা তথ্য নয়, এ সত্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে বহুপূর্ব্বে ধরা পড়েছিল, তাঁদের দিব্য চক্ষু এড়িয়ে যেতে পারেনি; এক কথায় এটা আমাদের খান্দানী সত্য। আমি বলি তার আর সন্দেহ কি? এ সত্যের প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্যও আবশ্যক নয়, এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছেও যাবার দরকার নেই। আমরা প্রতিদিনের ও সমগ্র জীবনের কাজে নিত্য প্রমাণ দিচ্চি যে আমাদের দেশে জড়ে ও জীবে কোন প্রভেদ নেই। সুতরাং কেউ যদি কার্য্যতঃ ওর উল্টটা প্রমাণ করতে উদ্যত হয় তাহলে নূতন জীবনের স্ফূর্ত্তির একটু আভাস পাওয়া যায়।

আমাদের বাঙ্গালী জাতির চিরলজ্জার কথা আমাদের দেশে ক্ষত্রিয় নেই! এর জন্য আমরা অপর বীর জাতির ধিক্কার, লাঞ্ছনা গঞ্জনা চিরকাল নীরবে সহ্য করে আস্‌ছি। ঘোষ, বোস, মিত্র, দে, দত্ত, গুহ প্রভৃতিরা যে আমাদের এই চিরদিনের লজ্জা দূর, এই চিরদিনের অভাব মোচন করবার জন্য কোমর বেঁধেছিলেন, তার জন্য তাঁরা স্বদেশহিতৈষী ও স্বজাতিপ্রিয় লোকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কেবল মাত্র বৈদ্যের উপর টেক্কা দেওয়াই যে কায়স্থ দলের এ ইচ্ছার মূল তা নয়, আমার বিবেচনায় এর মূল আরও গভীর। ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের কি একটা প্রচ্ছন্ন নৈসর্গিক যোগ আছে, এক এক যুগের হাওয়ায় কি একটা থাকে, যার দরুণ একই সময়ে উভয় দেশে একই প্রকার ঘটনার উদয় হয়। আক্‌বর ও এলিজাবেথ সমসাময়িক, চৈতন্য ও লুথার সমসাময়িক, ইংলণ্ডে এবং হিন্দুস্থানে একই সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দেয়, লণ্ডনের ও কলিকাতার কায়স্থ একই সময়ে ক্ষত্রিয় হবার জন্য চুল্‌বুল করে। অল্পদিন হল দেখা গেছে লণ্ডন সহরের যত কলমপেশা কেরাণীর দল হঠাৎ কলম ছেড়ে তলওয়ার ধরব বলে মহা গণ্ডগোল বাধিয়েছে। কলকাতা সহরে তার কিছুদিন পরেই, যাঁদের জাতব্যবসা কলমপেশা, তাঁরা গায়ে বর্ম্ম না হোক্ নামের পিছনে বর্ম্মন আঁটবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন।

অকৃতকার্য্য হয়েছেন। তাঁদের প্রথম ভুল শাস্ত্রের প্রমাণের উপর নির্ভর করতে যাওয়া। কি ছিলুম সেইটে স্থির করতে হলে পুরনো পাঁজি পুঁথি খুলে বসা আবশ্যক, কিন্তু কি হব তা স্থির করতে হলে ইতিহাসের সাহায্য অনাবশ্যক। ভবিষ্যতের বিষয় অতীত কি সাক্ষ্য দেবে? বিশেষতঃ বিষয়টা হচ্চে যখন ক্ষত্রিয় হওয়া, তখন গায়ের জোরই যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের এমনি অভ্যাস খারাপ হয়েছে যে আমরা শাস্ত্রের দোহাই না দিয়ে একপদও অগ্রসর হতে পারিনে।

পৃথিবীতে মানুষের উপর মানুষ অত্যাচার করবার জন্য দুটি মারাত্মক জিনিসের সৃষ্টি করেছে, অস্ত্রশস্ত্র ও শাস্ত্র। আমরা অত্যন্ত নিরীহ, কারও সঙ্গে মুখে ছাড়া ঝগড়া বিবাদ করিনে, যেখানে লড়াই হচ্চে সে পাড়া দিয়ে হাঁটিনে, এই উপায়ে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রকে বেবাক্ ফাঁকি দিয়েছি। যা কিছু বাকি আছে ডাক্তারের হাতে। আমরা চিররুগ্ন, সুতরাং ডাক্তারকে ছেড়ে আমরা ঘর করতে পারিনে, এই উভয় সঙ্কটে আমরা হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজীর শরণাপন্ন হয়ে সে অস্ত্রশস্ত্রেরও সংস্পর্শ এড়িয়েছি। আমাদের যখন এত বুদ্ধি, তখন শাস্ত্রের হাত থেকে উদ্ধার পাই এমন কি কিছু উপায় বার করতে পারিনে?

কিন্তু কায়স্থের ক্ষত্রিয় হওয়া কপালে ঘটল না। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব একে কায়স্থের দলপতি, তার উপর আবার গোষ্ঠীপতি, সুতরাং তিনি যখন এ ব্যাপারে বিরোধী হলেন তখন অপর পক্ষ ভয়ে নিরস্ত হলেন। যাঁরা ক্ষত্রিয় হতে উদ্যত তাঁদের ভয় জিনিষটে যে আগে হতেই ত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক এ কথা বোঝা উচিৎ ছিল। ভীরুতা ও ক্ষাত্রধর্ম্ম যে একসঙ্গে থাকতে পারে না, এ কথা বোধ হয় তাঁরা অবগত ছিলেন না। তবে হয়ত মনে করেছিলেন যখন মূর্খ ব্রাহ্মণে দেশ ছেয়ে গেছে, তখন ভীরু ক্ষত্রিয়ে আপত্তি কি? জড়পদার্থেরও একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, তার কার্য্য হচ্চে চলৎশক্তি রহিত করা। আমাদের সমাজকে যে নাড়ানো যায় না, তার কারণ এই জড়শক্তিই আমাদের সমাজে সর্ব্বজয়ী শক্তি।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ যে কায়স্থ সমাজের সংস্কারের উদ্যোগে বাধা দিয়েছেন শুধু তাই নয়, তিনি এবার সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় সমাজসংস্কার মহাসভার সভাপতির আসন থেকে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, হিন্দুসমাজে অনেক দোষ থাকতে পারে,

ও পরিবর্ত্তন হবে ভবিষ্যতে, বর্ত্তমানের কোনও কর্ত্তব্য নেই, কোনও দায়িত্ব নেই। সমাজ গড়ে মানুষে, ইচ্ছে করলে ভাঙ্গতে পারে মানুষে, অতএব মানুষে তার সংস্কার করতে পারে না, সে ভার সময়ের হাতে, অন্ধ প্রকৃতির হাতে। এ মত যে অস্বীকার করে সে Burke পড়েনি।

এই ভাবের কথা পূর্ব্বে আমরা অনেকবার বিলাতফেরৎ ব্যারিষ্টার মিষ্টার এন্, এন্, ঘোষের মুখেও শুনেছি, তিনিও কথায় কথায় Burkeএর দোহাই দেন।

আজকাল এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা সমাজের অবস্থা, দেশের অবস্থা, নিজেদের অবস্থা, এই সব বিষয়েই একটু আধটু চিন্তা করে থাকেন, এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে সাবধানের মার নেই। এরা সব জিনিষই ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডাভাবে করবার পক্ষপাতী। এরা রোখ্ করে সুমুখে এগোতে চান না বলে' কেউ যেন মনে না ভাবেন যে এরা পিছনে ফিরতে চান। যেখানে আছি সেখানে থাকাই এরা বুদ্ধির কাজ মনে করেন। বরং একটু অগ্রসর হওয়াই এরা অনুমোদন করেন, কিন্তু সে বড় আস্তে, বড় সন্তর্পণে। যে হাড়বাঙ্গালী ভাব অধিকাংশ লোকের ভিতর অব্যক্তভাবে আছে, এরা কেউ কেউ পরিষ্কার সুন্দর ইংরাজীতে তা ব্যক্ত করেন। সংক্ষেপে এঁদের বক্তব্য এই যে, জীবনের গাধাবোট উন্নতির ক্ষীণ স্রোতে ভাসাও, সে একটু একটু করে অগ্রসর হবে, যদিচ চোখে দেখ্তে মনে হবে চল্‌ছে না। কিন্তু খবরদার লগি মেরোনা, দাঁড় ফেলোনা, গুণ টেনো না, পাল খাটিয়ো না, শুধু চুপটি করে হালটি ধরে বসে থেকো। এই মতের নাম হচ্চে বিজ্ঞতা। বিজ্ঞতার আমাদের দেশে বড় আদর, বড় মান্য। গাধাবোট চলে না দেখে লোকে মনে করে না জানি তাতে কত অগাধ মাল বোঝাই আছে।

বিজ্ঞতা জিনিষটে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার একটা ফল মাত্র। এ অবস্থাকে ইংরেজীতে বলে Transition period, অর্থাৎ এখন আমাদের জাতির বয়ঃসন্ধি উপস্থিত। বিদ্যাপতি ঠাকুর বয়ঃসন্ধির এই বলে' বর্ণনা করেছেন যে "লখইতে না পারি জেঠ কি কনেঠ,"—এ জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ চেনা যায় না। কাজেই আমরা কাজে ও কথায় পরিচয় দিই হয় ছেলেমীর, নয় জ্যাঠামীর না হয় এক সঙ্গে দুয়ের। এই জ্যাঠাছেলের ভাবটা আমাদের বিশেষ মনঃপূত। ছোট ছেলের দুরন্ত ভাব আমরা

এই বিজ্ঞতা একটা রোগবিশেষ। এ রোগের নাম মানসিক ধাতুদৌর্ব্বল্য। কবিরাজী শাস্ত্রে স্নায়ুরোগের যে যে লক্ষণ দেওয়া আছে, এই বিজ্ঞতার ভিতর সে সব লক্ষণ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যথা,—অকারণ ভয়, শিরোঘূর্ণন, হৃৎকম্প, চিত্তচাঞ্চল্য, দুশ্চিন্তা, অকারণ উদ্বেগ, কার্য্যে অনাসক্তি, নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ, অবসাদ, বিষয় মাত্রেই অনাস্থা, অপ্রবৃত্তি, সংশয়, ইচ্ছাশক্তি ও ধারণাশক্তির লোপ, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের এখন প্রধান আবশ্যক একজন নূতন ধন্বন্তরী, যিনি এই বিজ্ঞতা রোগের মকরধ্বজ হাতে নিয়ে এসে উপস্থিত হবেন।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা আমরা সকলেই উপহাসের বিষয় মনে করি, কিন্তু সরাকে ধরা জ্ঞান করা আমাদের কাছে একটা মহৎ জিনিস। কারণ ও মনোভাবটি না থাক্‌লে বিজ্ঞ হওয়া যায় না। Burke, French Revolution রূপ বিপুল রাজ্যবিপ্লবের সমালোচনা সূত্রে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন সেই মতামত বালবিধবাকে জোর করে বিধবা রাখ্‌বার স্বপক্ষে ও কৌলিন্যপ্রথা বজায় রাখ্‌বার স্বপক্ষে প্রয়োগ করলে যে আর পাঁচজনের হাসি পাবে না কেন তা বুঝতে পারিনে।

আমাদের সমাজ ও সামাজিক নিয়ম বহুকাল হতে চলে আস্‌ছে, আচারে ব্যবহারে আমরা অভ্যাসের দাস। আমাদের শিক্ষা নূতন, সে শিক্ষায় আমাদের মনের বদল হয়েছে। আমাদের সামাজিক ব্যবহারে ও আমাদের মনের ভাবে মিল নেই। যাঁরা মনকে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিশ্বাস করেন, তাঁদের সহজেই ইচ্ছা হয় যে ব্যবহার মনের অনুরূপ করে আনি। অপর পক্ষে যাঁরা দুর্ব্বল, ভীরু ও অক্ষম অথচ বুদ্ধিমান তাঁরা চেষ্টা করেন তর্কযুক্তির সাহায্যে মনকে ব্যবহারের অনুরূপ করে আনি। এই উদ্দেশ্যে যে তর্কযুক্তি খুঁজে পেতে বার করা হয় তারি নাম বিজ্ঞভাব। আমরা বাঙ্গালি জাতি সহজেই দুর্ব্বল, ভীরু ও অক্ষম, সুতরাং স্বভাবের বলে আমরা না ভেবে চিন্তে বিজ্ঞের পদানত হই,—এই হচ্চে সার কথা।

বীরবল।

নূতন বর্ষে।

কতদিন হ'তে তব দূর আগমন
তৃষিত ব্যাকুল চিত্তে হে সত্যনূতন,
প্রতীক্ষিয়া অবশেষে হেরিতেছি আজি
প্রাচীন বসনে তুমি চুপে চুপে সাজি
কোন ক্ষণে পুরাতনে করিয়া লঙ্ঘন
প্রচারিছ অকস্মাৎ আপন শাসন ;—
হয়েছিল অস্তমিত কালি যেই রবি,
অন্ধকারে ডুবেছিল যে ধরার ছবি,
যে পক্ষীরা গেয়েছিল বিদায়ের গান,
তারাই তোমারে আজি করিছে আহ্বান ;—
তাই ভাবি কবে সেই শীতল ছায়ায়
নিত্য পুরাতন যাহা রবে এ ধরায়
গাবে বন্দনার গান বিপুল হরষে
মোর জীবনের পুনঃ নবীন বরষে !

ভুলশিক্ষার বিপদ।

বড়দিনের ছুটিটা মধুপুরে গিয়া যাপন করিবার জন্য তাগাদার উপর তাগাদা পাইতেছি; না গেলে আর চলে না। মধুপুরে আমাদের একটি ছোট বাঙ্গলা আছে। শীতকালে প্রায়ই আমাদের বাড়ীর কয়েকজন করিয়া সেখানে গিয়া অবস্থান করেন। এবার বড়দিদি নিজের পুত্র কন্যাদের লইয়া সেখানে অবতীর্ণ; সুরেন ভায়া এবার বি,এ, পরীক্ষা দিবেন,—তিনি সেখানে আপন পাঠ অভ্যাস এবং পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। দিদির মেয়ে মিনি বা মেনকারাণী আমায় মারাত্মক রকম শাসাইয়াছে, সে লিখিয়াছে—"এবার যদি তুমি না আসবে তবে আর তোমার মাথার একটিও পাকা চুল তুলে দেব না—যাও।" আর কি করিয়া থাকি? সুতরাং জিনিষপত্র গুছাইয়া অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় হাবড়া ষ্টেশনে উপনীত হইলাম।

উঃ—সেদিন কি ভীড়!—কিন্তু একটা এই শুভগ্রহ শুধু ভদ্রলোকের ভীড়। অধিকাংশই নব্যযুবক,—উত্তম পরিচ্ছদে আবৃত; সুগন্ধময়। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, হাস্য পরিহাসে প্রদীপ্ত। মনে হইল যেন কলিকাতার অধিকাংশ তরুণবিরহী যুক্তি করিয়া এই ট্রেনেই শ্বশুরালয় যাত্রা করিয়াছে। এরূপ জনসংঘ ক্লান্তিজনক নহে—বরং তাহার বিপরীত।

গাড়ী ছাড়িল। যুবকগণ উচ্চহাস্যে ও সিগারেটের ধূমে কক্ষবায়ু ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। হুগলি অবধি খুব ভীড় রহিল,—তাহার পর হইতে একটু কমিতে আরম্ভ করিল। পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে একটি স্থূলকায় প্রৌঢ়ব্যক্তি আসিয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন।

চোখে রূপার ফ্রেমযুক্ত চশ্‌মা, দেহটি একযোড়া সেকালের দৌড়দার হাঁসিয়াযুক্ত গঙ্গাজলী শালে আবৃত ; পায়ে গরম ফুলমোজার উপর ইংরাজি জুতা। বয়স বোধ করি পঞ্চাশতের কাছাকাছি হইবে।

বাবুটির সঙ্গে অনেক লোক আসিয়াছিল, জিনিষপত্রও বিস্তর। জিনিষপত্রে কামরা বোঝাই হইয়া গেল। নীচে হইতে একজন বলিল —"সব উঠেছে ত—একবার গুণে নিন।" শ্রবণ মাত্র বাবুটি এক দুই করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিনিষ গণনা আরম্ভ করিলেন, গাড়ি ছাড়িবারও ঘণ্টা দিল।

দুইবার গণনা করিয়া বলিলেন—"ওরে ছটা কেন রে—কি ওঠেনি রে, দ্যাখ্ দ্যাখ্।" তখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাবুটি হঠাৎ জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"হাঁড়িটা—হাঁড়িটা—হাঁড়িটা—"

একজন গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিল, তাঁহার হাতে হাঁড়িটা দিতে গেল; কিন্তু তিনি তাহা ধরিতে পারিলেন না; হাঁড়িটা পড়িয়া গেল। আমরা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার শব্দটা শুনিতে পাইলাম।

ভদ্রলোকটি তখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সবেগে বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলেন। উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলীর মধ্যে আমাকেই একটু "মুরুব্বি" গোছ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখলেন মশাই! একবার কাণ্ডখানা দেখলেন! দিলে হাঁড়িটে ফেলে!"

আমি লোকটার এই আপিলে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিলাম। কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলাম—"কি ছিল হাঁড়িতে?"

"মশাই—খাবার ছিল। এক হাঁড়ি খাবার ছিল—দুটাকার মাল। গেল প্ল্যাটফর্ম্মে পড়ে ধূলো মাখামাখি হয়ে। ভোগে হল না। সেই বাড়ী থেকে পৈ পৈ করে বল্‌তে বল্‌তে আসছি 'ওরে দেখিস্‌, যেন খাবারের হাঁড়িটে ভুলে যাস্‌নে।'—'ওরে দেখিস্‌, যেন খাবারের হাঁড়িটে

ভুলে যাস্‌নে।’—তা সেই খাবারের হাঁড়িটেই ভুলে গেল! এক হাঁড়ি খাবার মশাই! ভোগে হল না। আমি আবার বাজারের খাবার গুলো খাইনে কি না। ও আমার আদৌ সহ্য হয় না। আমি যেখানে যাই নিজের খাবার নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আমার পিসিমা আজ ভোর পাঁচটার সময় উঠে লুচি ভাজতে বসেছেন। (এই খানে বাবুটি আঙুল গণিতে আরম্ভ করিলেন) লুচি ছিল, কচুরি ছিল, আলুভাজা ছিল, বেগুণভাজা ছিল, মোহন ভোগ ছিল, মোল্‌নাইয়ের গোল্লা ছিল আধ সের—মোল্‌নাইয়ের গোল্লা খেয়েছ কখনও ?”

বক্তৃতার আরম্ভ হইতে সহযাত্রী যুবকগণ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল; এই প্রশ্নে হাহা করিয়া হাসিয়া ফেলিল। আমি যথোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলাম—“কৈ মনে ত পড়ে না।”

বাবুটি বলিলেন—“তা হলে খাও নি। খেলে মনে থাকত। সে ভোলবার জিনিষ নয়।”

আমি বলিলাম—“খুব সম্ভব।”

“মোল্‌নাইয়ের গোল্লার নামডাকও শোন নি ?”

“না—ও বিষয়ে বড় একটা চর্চ্চা রাখিনে।”

“কোথা থেকে আসছ ?”

“কলকাতা।”

“নিবাস ?”

“কলকাতা।”

“অ্যাঃ—নিতান্ত ক্যাল্‌কেশিয়ান তুমি! আচ্ছা মোল্‌নাইয়ের গোল্লার একটা গল্প বলি শোন। দাঁড়াও তামাক একছিলিম সেজে নিই।”

এই বলিয়া তিনি তামাক সাজিতে লাগিলেন।—এতকাল রেলপথে যাতায়াত করিতেছি, এমন অদ্ভুত মনুষ্যের সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ হয়

নাই। হায় হায়, এমন বক্তা বঙ্গীয় রাজনীতিক্ষেত্রে স্থান পাইল না! মনে করিলাম, একটা বড় সুবিধা হইয়াছে। মধুপুরে ট্রেণটা পৌঁছে অতি বিশ্রী সময়ে,—ঠিক ঘুমের সময়। ঘুমাইয়া পড়িলে মধুপুর ছাড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা। এই বাগ্মীবরের কল্যাণে জাগিয়া থাকিতে পারিব; নিদ্রাদেবী দূরে থাকিয়া নিজ মান রক্ষা করিবেন।

তামাক সাজিতে সাজিতে বৃদ্ধ বলিলেন—"বাবুর নাম ?"

"মহানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"

"আমার নাম শ্রীমদনগোপাল দেবশর্ম্মা মুখোপাধ্যায়। নিবাস মোল্‌নাইয়ের নিকট ইলছোবা গ্রাম। জেলা বর্দ্ধমান। যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান আমরা, নৈকুষ্য কুলীন। যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের সাত পুত্র ছিলেন—

যজ্ঞেশ্বরের সুত সাত
শঙ্কর জানকীনাথ।

আমরা সেই শঙ্কর জানকীনাথের সন্তান।"

এ বক্তৃতাটি এত সংক্ষিপ্ত হইল তাহার কারণ মদনগোপাল বাবু কলিকায় ফুঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মুখভাব কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে করুণভাবাপন্ন ছিল—তাহার কারণ বোধ হয় সদ্যপ্রাপ্ত সন্দেশের শোক। এখন বরং একটু গর্ব্বিত দেখাইতে লাগিল; তাহা বোধ হয় কুলগৌরবের স্মৃতিজনিত। যাহা হউক আমি পরম কৌতুকের সহিত লোকটীর পানে চাহিতে লাগিলাম। গাড়ীও বর্দ্ধমানে পৌঁছিল।

আমার চুরট ফুরাইয়াছিল, নামিয়া হোটেলে গেলাম চুরট কিনিতে। যতক্ষণ গাড়ী ছাড়িবার শেষঘণ্টা না হইল ততক্ষণ প্ল্যাটফর্ম্মের উপর পাইচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

মদনগোপাল বাবু আমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিলেন—"তার পর—সদানন্দ বাবু—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"আমার নাম মহানন্দ।"

"ওহো, ঠিক ঠিক। মহানন্দ বাবু কতদূর যাওয়া হবে?"

"মধুপুর।"

"আমি যাব কাশী। তুমি ত এখনি পৌঁছে যাবে হে! দু ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা জোর! আমায় যেতে হবে আজ সমস্ত রাত, কাল সমস্ত দিন। তাইত বলছি কিনা, এই সমস্ত রাত সমস্ত দিন যে গাড়ীতে কাটবে, কি খেয়ে প্রাণধারণ করি। কাল সন্ধেবেলা কাশী পৌঁছে যাব এখন। কাশীতে আমার মা ঠাকরুণ রয়েছেন কি না। আজ তিন বৎসর তিনি কাশীবাসী। বৃদ্ধ হয়েছেন—বয়স সত্তর বৎসরের উপর হয়েছে। এখনও প্রত্যহ ভোরে উঠে দশাশ্বমেধঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে আসেন—কি শীত—কি গ্রীষ্ম—কি বর্ষা—কি বাদল। গত ভাদ্র মাস থেকে একটু একটু ঘুস্ ঘুস্ করে জ্বর হচ্চে শুনছি। তাই একবার ভাবলাম দেখে আসি। আছেন ভাল জায়গাতেই—, কোন চিন্তার কারণ নেই, তবে কি না কাণে শুনে, সন্তান হয়ে, কি করে চুপ করে থাকি বলুন। আমার গুরুদেবের মধ্যম পুত্রটি কাশীর কলেজে অধ্যাপক, সপরিবারে থাকেন সেখানে, সেইখানেই আমার মা ঠাকরুণকে রেখে দিয়েছি। গুরু পুত্রটি অতি উপযুক্ত লোক। ন্যায়ে তাঁর সমকক্ষ কাশীতে নেই বল্লেই হয়। আমারই বয়স, একত্র খেলা করতাম। সেই অল্পবয়স থেকেই বুদ্ধির সূক্ষ্মতা দেখা গিয়েছিল।—"

আমি বলিলাম—"মশাই চুরট খান কি?"

"চুরট? খাই কখনও কখনও। ছেলেবেলায় যখন কলকাতায়

আমি বলিলাম—"মন্দ নয়, দেখুন না।" বলিয়া আমার সিগারেট কেস খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম। তিনি একটি চুরট লইয়া ধরাইয়া লইলেন; আমিও একটি ধরাইলাম।

গাড়ী তখন রাণীগঞ্জ পার হইয়াছে। দুই ধারে অনেক কয়লার খনি। স্থানে স্থানে স্তূপাকার কয়লায় আগুন ধরাইয়া দিয়াছে—খুব আলো হইয়াছে। কাছে খোলা ইঁট সাজাইয়া অস্থায়ী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া কুলীরা বসিয়া আছে—কেহ বা খাদ্যপাক করিতেছে।

আমারও ক্ষুধা পাইয়াছিল। ভাবিলাম এইবেলা কিছু খাইয়া লই। সঙ্গে আমার টিফিন্‌বাস্কেট্ ছিল, তাহাতে বাড়ী হইতে খাবার আনিয়াছিলাম। মদনগোপালবাবুর জিনিষপত্র সরাইয়া কষ্টে টিফিন-বাস্কেট বাহির করিলাম। ভাবিলাম আমি আহার করিব আর আমার এই সহযাত্রীটি অভুক্ত থাকিবেন! অথচ যদি আহ্বান করি তবে খাইবেন কি না তাহারও স্থিরতা নাই—কারণ আমার এ জিনিষগুলি ঠিক হিন্দু-ধর্ম্মসঙ্গত নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম বলিয়াই দেখি, খান উত্তম,—না খান, কি করা যাইবে। টিফিন্‌বাস্কেট্‌টি বেঞ্চের উপর তুলিয়া ডালাটি খুলিয়া বলিলাম—"মদনবাবু—আপনি খাবার যা এনেছিলেন, তা ত গেল। আমার সঙ্গে কিছু খাবার রয়েছে, যদি আপত্তি না থাকে আপনার, তবে দুজনে খাওয়া যায়।"

মদনবাবু আমার বাস্কেটের প্রতি ঔৎসুক্যপূর্ণ নেত্রপাত করিয়া বলিলেন—"কি আছে তোমার ওতে?"

আমি (আঙুল না গণিয়া) বলিলাম—"রুটি আছে, ডিম আছে, দুতিন রকম মাংস আছে, মাখন টাখন আছে।"

"হিন্দু মাংস? হোটেলের মাংস নয় ত?"

"মাংস হিন্দু। আমার বাড়ীর ব্রাহ্মণের পাক করা, শুধু রুটিটে

মদনবাবু বলিলেন—"তা হোক, হোটেলের রুটিতে আপত্তি নেই। যখন কলকাতায় ছিলাম ইংরিজি পড়তাম, তখন হোটেলের রুটি ঢের খেয়েছি। কত কি খেয়েছি! সে সব দিনে ছাত্র সমাজ ভারি উচ্ছৃঙ্খল ছিল।" বলিয়া তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন।

আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া মাংসাদি বাহির করিয়া প্লেট সাজাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"ছুরী কাঁটা ব্যবহার করেন কি?"

"না ভাই, ওসব পোষাবে না। দাও হাতে করেই খাই।"

খাইতে খাইতে মদনগোপাল বাবু হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক এক বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সারমত এই যে মুসলমানের হাতে খাইতে নাই এ কথা শাস্ত্রে পাওয়াই যাইতে পারে না; কারণ শাস্ত্র যখন তৈয়ারি হইয়াছিল তখন মুসলমান জন্মগ্রহণই করে নাই। তাহারা যখন আসিয়া আমাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, তখনি আমরা তাহাদের প্রতি বিদ্বেশবশতঃ এ প্রকার লোকাচারের প্রবর্ত্তনা করিলাম।

মাংস ফুরাইলে মদন বাবুকে বলিলাম—"রুটি আরও রয়েছে। মাখন আছে, জ্যাম্ আছে, মার্ম্মালেড্ আছে, কি নেবেন?"

মদনগোপাল বাবু বলিলেন—"মার্ম্মালেড্? মার্ম্মালেড্?—মার্ম্মা-লেড্ দাও একটু খেয়ে দেখি— কখনও খাইনি।"

দিলাম। আহারান্তে গেলাসে জল লইয়া জানালার বাহিরে তিনি হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলেন। আবার শালখানি উত্তমরূপে দেহে জড়াইয়া বেঞ্চের উপর পা তুলিয়া উপবেশন করিলেন।

তাঁহাকে আর একটা চুরট দিতে চাহিলাম, কিন্তু তিনি বলিলেন—"নাঃ—তামাক সাজি। হুঁকো কল্‌কের কাছে কেউ লাগে নারে দাদা!"

তামাক সাজা হইলে আমি বলিলাম—"কৈ মদন্ বাবু, সেই মোল্-

তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ—ভুলে যাচ্ছিলাম। আমাদের আমলের কথা নয় এ,—আমরা গল্প শুনেছি।—গল্পটা এই। বর্দ্ধমানের মহারাজা মোল্‌নাইয়ের গোল্লা খেয়ে ভারি খুসী। তাই মহারাজা হুকুম কর্‌লেন—"মোল্‌নাইয়ের যে প্রধান মোদক, তাকে নিয়ে এস, বর্দ্ধমানে বসে সে গোল্লা তৈরি করুক।" রাজার হুকুম, কি করে, প্রধান মোদক চাটু খুন্তী নিয়ে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হল। গোল্লা তৈরি করলে, কিন্তু সে রকম স্বাদটী হল না। রাজা বল্লেন—"মোদকের পো, কৈ সে রকম ত হল না!" মোদক যোড়হস্ত করে বল্লে (এইস্থানে মদনগোপাল বাবু স্বয়ং হাতজোড় করিলেন)—'মহারাজ, ভয় কব না নির্ভয় কব?' মহারাজা বল্লেন—'ভয় ছেড়ে নির্ভয় কও'। মোদক বল্লে—'মহারাজ, মোল্‌নাই থেকে আমাকেই নিয়ে এসেছেন, মোল্‌নাইয়ের মাটীও আনতে পারেন নি, মোল্‌নাইয়ের জলও আন্‌তে পারেন নি।" বলিয়া মদনবাবু অত্যন্ত হাসিতে ও কাশিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসি ও কাশি থামিলেই বলিলেন—"মোলনাইয়ের গোল্লা না খেলে তার মর্ম্ম বুঝতে পারবে না। আচ্ছা আমি কাশী থেকে ফিরে আসি দাঁড়াও। একটা রবিবার কি শনিবার আমাদের এখানে আসতে পার না?"

"অনায়াসে।"

"আচ্ছা, তা হলে তোমায় নিমন্ত্রণ করে পাঠাব—এস। ষ্টেশনে গোরুর গাড়ী পাঠিয়ে দেব,—তোমায় নিয়ে যাবে। পাণ্ডুয়া থেকে ইলছোবা বেশী দূর নয়। মোল্‌নাইয়ের গোল্লা খাইয়ে দেব,—আর আমাদের দিশী মার্ম্মালেড্‌ও খাইয়ে দেব।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"দিশী মার্ম্মালেড্‌ হয় না কি? তা ত জানিনে।"

মদনগোপাল বাবু হাসিয়া বলিলেন—"অ্যাঃ তুমি নিতান্ত একবারে ক্যালকেশিয়ান! খাদ্যের বাইরে আর কোন খবরই রাখ না। খাদ্যের

গাছ দেখনি বোধ হয়? ধানের গাছে লাল লাল ফুল হয়, গুঁড়ি চিরে বড় বড় তক্তা হয়।” বলিয়া তিনি পুনশ্চ হাসিতে ও কাশিতে আরম্ভ করিলেন। একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন—“মার্ম্মালেড্, বেলের মোরব্বা গো! কেন, কলকাতাতেও ত পাওয়া যায়।”

আমি চুরটে একটা লম্বা টান টানিয়া বলিলাম—“মাফ করবেন, মার্ম্মালেডের বেলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।”

“কিঃ?”

“মার্ম্মালেডের সঙ্গে বেলের কোনও সম্পর্ক নেই।”

“কেন? মার্ম্মালেড্ মানে কি? বেলের মোরব্বা নয়?”

“না।”

“বিলক্ষণ! তুমি বল্লেই শুনব? আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি মার্ম্মালেড্ মানে বেলের মোরব্বা।”

“মাষ্টার আপনাকে ভুলশিক্ষা দিয়েছিল।”

“বেলের মোরব্বা নয় ত কিসের মোরব্বা?”

“যদি মোরব্বাই বলেন ত কমলানেবুর মোরব্বা।”

এই কথা শুনিয়া মদনগোপাল বাবু চমকিয়া উঠিলেন। ভীতস্বরে বলিলেন—“কমলানেবুর মোরব্বা?”

আমি ভাবিলাম, ব্যাপারখানা কি! বিস্মিত হইয়া বলিলাম—“কমলা নেবুর বৈকি!”

“কমলা নেবুর হলে একেবারে মিষ্টি হত। কমলা নেবুর যদি ত স্বাদ একটু মিষ্টির সঙ্গে কষা কষা কেন?”

“আমাদের এরকম সাধারণ কমলানেবুর নয়। সেভিলদেশে একরকম কমলানেবু হয়, দেখতে ঠিক এই রকমই, তার স্বাদ একটু কষা। সেই নেবুতে মার্ম্মালেড হয়।”

মদনগোপালবাবুর মুখে ভয়ের স্থানে বিরক্তির চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। বলিলেন—"ঠিক জান তুমি ?" স্বরটি কিছু রুক্ষ।

"ঠিক জানি।"

মদনবাবু আমাকে ভেঙ্গাইয়া বলিলেন—"ঠিক জানি!" অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। ভয়ানক রাগও হইল। বলিলাম—"মশাই, মুখ ভেঙ্গানটা অনেকে ভদ্রতার লক্ষণ বলে মনে করে না।"

বলিয়া আমি জানালার দিকে পিঠ করিয়া, বেঞ্চের উপর পা রাখিয়া কক্ষের ছাদে বাতির পানে চাহিয়া রহিলাম।

মদনগোপালবাবু বলিলেন—"মনে করে না ত রাজা করে! তোমার সঙ্গে কি আমার শত্রুতা ছিল? আমি আজ বিশ বচ্ছর কমলানেবু খাইনি।—তুমি আমায় কি জন্যে কমলানেবু খাইয়ে দিলে ?"

আমি বলিলাম—"কেন ? কমলানেবু ত আর বিষাক্ত জিনিষ নয়।"

"তোমার পক্ষে বিষাক্ত জিনিষ না হতে পারে। আমার পক্ষে বিষাক্ত। আমি যখন কমলানেবু খাইনে তখন তুমি কি জন্যে আমায় খাওয়ালে ?"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"মশাই কি আগে আমায় সে কথা বলেছিলেন ?"

মদনগোপালবাবু আবার মুখ ভেঙ্গাইয়া বলিলেন—"মশাই কি আগে আমায় সে কথা বলেছিলেন! তুমি কেন সেই সময়ে বল্লেনা যে ওতে কমলানেবু আছে ?"

লোকটার ব্যবহার দেখিয়া রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। আমি বলিলাম—"আপনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করছেন।"

জানলেই ভদ্রলোক হয় না। একজন নিরীহ ব্যক্তি যা খায় না, তাকে তাই খাইয়ে দেওয়া খুব ভদ্রতা!"

আমি বলিলাম—"ক্ষিধেয় মরছিলেন—নিজের খাবার থেকে খেতে দিলাম, বেশ প্রতিফল তার!"

"ক্ষিধেয় মরছিলাম বৈকি! তোমার কাছে কেঁদে পড়েছিলাম খাবার জন্যে।"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"যা ইচ্ছে হয় বলুন।" বলিয়া আমি কম্বল মুড়ি দিয়া বেঞ্চে শুইয়া পড়িলাম।

বাবুটি অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার স্বর নরম হইয়া আসিতে লাগিল। পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে খাবারের হাঁড়ি লোকসানের শোক নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিল। বলিতে লাগিলেন—"খাবারের হাঁড়িটে যদি সঙ্গে থাকত তা হলে ত আর এ বিপত্তি হত না।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভাবিলাম লোকটা দেখিতেছি বদ্ধ পাগল! অনেক বকিয়া বকিয়া বোধ হয় শ্রান্তিবোধ হইল; তখন তামাক সাজিতে বসিলেন শব্দে জানিতে পারিলাম। তাহার পর ধূমপান করিতে লাগিলেন। আমি কম্বলে মুখ ঢাকিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু নিদ্রা আসিল না।

মদনবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া তামাক খাইলেন। ক্রমে গাড়ী আসিয়া আসানসোলে থামিল। মদনবাবু জানালা দিয়া গলা বাহির করিয়া বলিলেন—"চাপরাশি—ও চাপরাশি।"

কে একজন জানালার কাছে আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"বাপু, কটা বেজেছে বলতে পার?"

সে বলিল—"সাড়ে এগারোটা বেজেছে।"

"মধুপুরে কখন গাড়ী পৌঁছবে?"

ভাবিলাম, আমার উপর লোকটার এতই ক্রোধ হইয়াছে যে আমি না নামিয়া গেলে—পাপ না বিদায় হইলে—আর সুস্থির হইতে পারিতেছে না।

গাড়ী ছাড়িল। কিয়ংক্ষণ পরে আমার কম্বলের উপর হস্তস্পর্শ অনুভব করিলাম।

"সদানন্দবাবু—ওঠ।"

আমার নাম সদানন্দ নয়, সুতরাং আমি উত্তর করিলাম না।

"ভায়া—ওঠ। মধুপুর এল বলে। ওঠ—ওঠ।" আমি মুখ হইতে কম্বল খুলিলাম।

"ভায়া, রাগ করেছ ?"

আমি উঠিয়া বসিলাম। শুষ্কভাবে বলিলাম—"কেন, সব রাগ কি আপনারই একচেটে না কি ?"

ধীরে ধীরে আমার পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"না না রাগ কোরো না। বুড়ো মানুষ, দুটো কথা যদি বলেই থাকি, তাতে কি আর রাগ করতে হয় ? হঠাৎ মেজাজটা গরম হয়ে উঠেছিল। সব দোষটাই তোমার বলে মনে হয়েছিল। আমায় মাফ্ কর।"

ভাবিলাম মনুষ্য চরিত্র এই রকমই বটে। এখনও বলিতেছেন, "সব দোষটাই তোমার বলে মনে হয়েছিল।" অর্থাৎ এখনও মনে এই বিশ্বাস রহিয়াছে যে সবটা না হোক কিছুটা দোষ আমার তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃদ্ধের স্বর এমন কোমল ও কারুণ্যপূর্ণ যে তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববিরাগ তখনি আমি মন হইতে বিদূরিত করিয়া ফেলিলাম। ক্ষমাসূচক একটু হাস্য করিলাম।

সদনবাবু বলিলেন—"কমলানের আমি কেন খাইনে তা যদি

মদনবাবুর মুখচক্ষু যেন কালিমাময়। একটু কাসিয়া বলিলেন— "শুনবে ?" তাঁহার স্বর অত্যন্ত নীচু।

আমি বলিলাম—"বলুন।"

তিনি আরম্ভ করিলেন—"সে বিশ বছরের কথা, আমি একটা মানুষ খুন করেছিলাম।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম—"মানুষ খুন!"

"খুন বৈকি! সে খুনই বলতে গেলে। শোন। দোসরা মাঘ আমার বড়মেয়ের বিয়ে দেব বলে পৌষের শেষে কলকাতায় গিয়েছিলাম বাজার করতে। একটা মেসের বাসায় গিয়ে উঠেছিলাম, সেখানে সব কলেজের ছেলেরা থাকত। কোনও ঘরে জায়গা ছিল না। শুধু একটি ঘরে একটু জায়গা ছিল, সে ঘরে একজন জ্বররোগী পড়েছিল, আর তার শালাও সেই ঘরে থাকত। ভগ্নীপতির নাম কেদার, শালার নাম প্রবোধ। ভগ্নীপতিটি বাঙ্গাল,—বয়স কুড়ি বাইশ হবে। প্রবোধ তার চেয়ে দুই তিন বছরের ছোট ছিল। প্রবোধ কলেজ কামাই করে ভগ্নীপতির খুব সেবাটা করত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়ান, তাপ নেওয়া, মাথায় হাত বুলোনো, পায়ে হাত বুলোনো, রাত্রে দুবার তিনবার করে উঠত। কদিন ছোকরা খুব লুটোপুটি খেয়ে একদিন কতকটা সুস্থ হল। জ্বরটা অনেক কম দেখা গেল। আমি সেইদিন সন্ধেবেলা বাড়ী যাব। সকালে মাধববাবুর বাজার থেকে ভাল দেখে একশোটা কমলানেবু কিনে আনলাম। প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করলাম— 'রুগীমানুষ,—এঘরে নেবুগুলো—।' প্রবোধ বল্লে—'পাগল হয়েছেন! তা কোনও চিন্তা নেই, স্বচ্ছন্দে রাখুন।' রেখে আমি আবার বাজার করতে বেরুলাম, প্রবোধ ভগ্নীপতি একটু ভাল আছে দেখে কদিনের

নেবু খেয়ে ফেলেছে, জ্বর একবারে বিকারে দাঁড়িয়েছে। বাড়ী যাওয়া ঘুরে গেল; রোগীর সেবা করতে বসলাম। মেয়ের বিয়ের টাকা ভেঙ্গে ভাল ভাল ডাক্তার আনালাম; কলকাতা সহরে যতদূর যা হতে পারে, কিছুর ত্রুটি করলাম না। অনাহারে অনিদ্রায় বসে তিন দিন শুশ্রূষা করলাম, কিন্তু কিছুতেই বাঁচাতে পারলাম না।” বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিলেন।

আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া এই শোককাহিনী শুনিতেছিলাম। বাহিরে মহা অন্ধকার; গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। ছাদের উপর লণ্ঠনটির আলো ম্রিয়মাণ, পলিতায় গুল জমিয়াছে। গভীর রাত্রে একটি কামরায় আমরা দুইটি প্রাণী বসিয়া! আমি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—

“তাতে আপনার অপরাধ কি! আপনি ত আর জেনে শুনে করেন নি! বিশেষতঃ তার শালা যখন ঐ কথা বল্লে—”

“শালা ছেলে মানুষ। আমি তার বাপের বয়সী। সে যে ভুল করলে, আমার সে ভুল করবার কি অধিকার ছিল?”

আমি বলিলাম—“ব্যাপারটা খুব শোচনীয় সন্দেহ নেই। তবু আপনি নিজেকে এর জন্যে যতটা দোষী স্থির করেছেন—সেটা নিতান্ত অনুচিত। পাপের পরিমাণ ত কার্য্যের ফলে নয়, কার্য্যপ্রণোদক ইচ্ছায়।”

মদনগোপাল বাবু ক্ষীণস্বরে বলিলেন—“সে কথা বল্লে মন বোঝে না। আমিই এর জন্যে দায়ী। প্রবোধের কান্নাটা যদি দেখতে! সে বল্লে তারা পাঁচ ভাই এক বোন্—ঐ একমাত্র বোন্—কত আদরের বোন্,—তেরো বছর মোটে বয়স, তার এই সর্ব্বনাশ হল!—আমারও মেয়ে তখন তেরো বছরের। বাড়ী গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলাম। আমি

গাড়ীর বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। এইবার মধুপুর। বৃদ্ধকে কি সান্ত্বনা দিব? বলিলাম—"মদনগোপাল বাবু,—আপনি বৃথা নিজেকে দোষী করেন। জন্ম, মৃত্যু—এ সব ঈশ্বরাধীন ঘটনা, মনুষ্যের অধীন নয়। আপনি আমাদের শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না?"

মদনগোপাল বাবু নিরুত্তর রহিলেন। তাঁহার চক্ষে জল।

গাড়ী থামিল। নিদ্রাতুর খালাসীরা ক্ষীণ জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"মধুপুর—মধুপুর।" আমি মদনগোপাল বাবুকে নমস্কার করিয়া নামিয়া গেলাম।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বেদমাতা গায়ত্রী।

বেদ ওঁকাররূপে প্রথমে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। সেই ওঁকার স্বল্পাক্ষর গায়ত্রীচ্ছন্দে, ও গায়ত্রী বিস্তৃতাক্ষর বেদরূপে, জগতে প্রচারিত হইল। বেদের কতকগুলি বিশেষণ দ্বারা জানা যায় যে, বেদ সত্য, বেদ নিত্য, বেদ ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য, ও বেদ অপৌরুষেয়—অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই নিত্য, ব্রহ্মই ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য এবং ব্রহ্মই অপৌরুষেয়। ওঁকার প্রতিপাদ্য—ব্রহ্ম; গায়ত্রী প্রতিপাদ্য—ব্রহ্ম; এবং বেদ প্রতিপাদ্য—ব্রহ্ম; সুতরাং ওঁকার, গায়ত্রী ও বেদ অভেদ। ওঁকার অর্থ—গায়ত্রী, গায়ত্রী অর্থ—বেদ। ওঁকার গায়ত্রীকে প্রসব করিল ও গায়ত্রী বেদকে প্রসব করিল, সুতরাং বেদমাতা গায়ত্রী।

যেমন উপপত্তি (demonostration) না জানিলে প্রতিজ্ঞার

জানিলে, উপপত্তিরও মর্ম্ম হৃদ্গত হয় না। তদ্রূপ বেদাধ্যয়ন না করিলে গায়ত্রীকে অবগত হওয়া যায় না।

দ্বিজাতিগণের সেই গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, বেদাধ্যয়ন করিবার পদ্ধতি, ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল। বেদাধ্যয়ন না করিলে, গায়ত্রীকে বিশেষরূপে জানিয়া তৎসাধন সম্পন্ন হইবার উপায়ান্তর নাই। কিন্তু দ্বিজাতিগণের সেই গায়ত্রীসংস্কার অদ্যাপি প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, বেদাধ্যয়ন পদ্ধতি ভারতবর্ষ হইতে এককালে তিরোহিত হইয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে এক্ষণে গায়ত্রী, সর্পমন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ বৃথা সূত্র ধারণ করিতেছেন। অতএব ভারত এক্ষণে দ্বিজাতিপরিশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথবা তাহার সংখ্যা এত অল্প যে, তাহা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা গণনা করিতে পারা যায়। সুতরাং যখন ব্রাহ্মণই নাই, তখন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, দণ্ডী, পরমহংস প্রভৃতি রঙ্গভূমির ব্যাসবশিষ্টনারদাদিতে পরিণত হইয়াছে। আজ ভারত একজাতিতে, অর্থাৎ কেবলমাত্র শূদ্রবর্ণে পরিপূর্ণ। মনোহর ফল-পুষ্পপত্র-পরিশোভিত উদ্যান, কেবল আগাছায় পরিপূর্ণ হইলে যেরূপ শ্রীহীন হয়, ভারত এক্ষণে দ্বিজাতিশূন্য হওয়াতে, তদ্রূপ শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। আর্য্যজাতি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল-পরিশোভিত বেদকল্পতরুর আশ্রয়বিহীন হইল কেন, সেই মহান মহীরুহ হইতে পতিত হইল কেন—তাহারই কারণ যথাশক্তি নিম্নে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

আদিতে একমাত্র বেদ ছিল। এবং এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, গায়ত্রী অর্থই বেদ। সুতরাং যতকাল এক-বেদ ছিল, তত দিন বেদাধ্যয়ন দ্বারা গায়ত্রী বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, তৎসাধনসম্পন্ন হওয়া সুসাধ্য ছিল। পরে বেদ, ব্যাস কর্ত্তৃক চতুর্ধা বিভক্ত হইল;

নাই—কিন্তু চারি বেদের 'মহাবাক্য' অবগত আছি। যথা সামবেদের মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি'। তত্ত্বমসি মহাবাক্যের দুই পদ—তৎ ও ত্বং। তৎ পদের সহিত গায়ত্রীর 'ভূর্ভুব স্বঃ' পদের সহিত পূর্ণ যোজনা দেখিতে পাওয়া যায়। এবং ত্বং পদের সহিত, গায়ত্রীর 'ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ' পদের সহিত পূর্ণ যোজনা আছে। তত্ত্বমসি মহাবাক্যের উভয় পদের সহিত ব্রহ্ম নিরূপণ, ও গায়ত্রীর উভয়পদের দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ একই প্রকার। সুতরাং সামবেদের মহাবাক্য দ্বারা জানা যায় যে, গায়ত্রী প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, সামবেদেই পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য তিন বেদের মহাবাক্য—প্রজ্ঞানময়ং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি ও অয়ং আত্মা ব্রহ্ম। এই তিন বেদের মহাবাক্য, সামবেদীয় তত্ত্বমসি মহাবাক্যের ত্বং পদের পুনরুল্লেখ মাত্র। অর্থাৎ সামবেদীয় তত্ত্বমসি মহাবাক্যের ত্বং পদ, ও অন্যান্য তিন বেদের মহাবাক্য দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ একই প্রকার। তত্ত্বমসি মহাবাক্যের 'ত্বং' পদের দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ অতীব দুরূহ ও জটিল বলিয়া, ঋক, যজুঃ ও অথর্ব এই তিন বেদদ্বারা সামবেদীয় 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'ত্বং' পদকেই আরও দৃঢ়তর করা হইয়াছে। এই চারি বেদের মহাবাক্য দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, বেদের মধ্যে সামই গায়ত্রীকে পূর্ণরূপে, ও অন্য তিন বেদ অর্দ্ধরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে। এই হেতু বেদের মধ্যে সামেরই প্রাধান্য অনুভূত হয়। যথা গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভূতি বর্ণনা কালে বলিয়াছেন—

বেদানাং সামবেদোস্মি দেবানামস্মি বাসরঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥

গীতা। ১০ অঃ। ২২ শ্লোঃ।

তাই ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, "বেদের মধ্যে আমি সাম"। এইরূপে বেদ চারি ভাগে বিভক্ত হইলেও সামবেদের সহিত গায়ত্রীর

সহিত গায়ত্রীর অর্দ্ধ-যোজনা, অর্থাৎ ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ বা সাম-বেদীয় তত্ত্বমসি মহাবাক্যের ত্বং পদের সহিত কেবল মাত্র যোজনা হয়—সুতরাং সামই শ্রেষ্ঠ। বেদ চতুর্ধা বিভক্ত হইলেও সমগ্র বেদ গায়ত্রীকেই প্রতিপাদন করিতেছে। ঐ সময় হইতেই সম্ভবতঃ গায়ত্রীর সহিত বেদের ভেদের সূত্রপাত হইয়াছে। কারণ, তখন সামবেদে ব্রহ্মনিরূপণ দুই প্রকারে, অন্য তিন বেদে ব্রহ্ম নিরূপণ এক প্রকারে হওয়াতে, বেদে সংশয় উপস্থিত হইল।

মহর্ষি বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিয়া, পৈল, যৈমিনী প্রভৃতি শিষ্য চতুষ্টয়কে, এই চারি বেদ পৃথক্‌রূপে অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপে পৃথক্‌ভাবে, চারি বেদ, চারি শিষ্যকে শিক্ষা দেওয়ায়, বেদে ক্রমে সংশয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; কেননা, সামবেদ ব্যতীত অন্য বেদত্রয়, গায়ত্রীকে পূর্ণরূপে প্রতিপাদন করিতে পারে না। ক্রমে কালসহকারে শিষ্য, প্রশিষ্য, উপশিষ্যাদি দ্বারা সকল বেদেই মতান্তর প্রবিষ্ট হইল।

বেদ সকলও শাখা প্রশাখা উপশাখাদি দ্বারা বিস্তৃত হইয়া কলুষিত হইল। গায়ত্রীর সহিত বেদের সম্পূর্ণ ভেদ উপস্থিত হওয়াতে, গায়ত্রীর প্রকৃততত্ত্ব আর্য্যজাতি বিস্মৃত হইলেন। সুতরাং গায়ত্রী সর্পমন্ত্রে পরিণত হইল। বেদ অধ্যয়ন প্রচলিত রহিল বটে, কিন্তু তৎপাঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা আর্য্যজাতির মস্তিষ্ক হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল। এমন কি তাহার অর্থ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে আয়াস স্বীকার না করিয়া, "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী" এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া, বেদ সকল কেবল আবৃত্তিকৃত ও গীত হইতে লাগিল। অর্থাৎ যেমন উপপত্তি না পড়িলে প্রতিজ্ঞার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না, ও শুদ্ধ প্রতিজ্ঞা পড়িলে উপপত্তির তাৎপর্য্য কি, তাহা জানিতে পারা যায় না—গায়ত্রী ও বেদ সম্বন্ধেও তদ্রূপ

প্রকৃত বেদমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, আর্য্যজাতির এই সময় হইতেই পতনস্রোত প্রবাহিত হয়। এইরূপে ভারতে বহুমত প্রচারিত হইয়া, যখন ঘোর বেদ-বিপ্লব উপস্থিত হইল, তখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাগণ স্ব স্ব মতের প্রাধান্য রক্ষার জন্য বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়া গাহিলেন—

বেদাঃ বিভিন্নাঃ শ্রুতির্বিভিন্নাঃ।
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥

এই সময়েই দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইল। মহর্ষি কপিল দেব সাংখ্য-দর্শন প্রণয়ন করিয়া আর্য্যজাতিকে বেদের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইলেন। আর্য্যজাতি উহাই শিরোধার্য্য করিল। কিন্তু মূলে গায়ত্রীকে না রাখিয়া, কলুষিত বেদ আশ্রয় করিয়া দর্শন রচনা করা হইল। গায়ত্রী বা সামবেদের তাৎপর্য্যানুসারে উহাতে দুই প্রকারে ব্রহ্মনিরূপণ না হইয়া, ঋক্ যজুঃ ও অথর্ব্বের মতানুসারে, এক প্রকারে ব্রহ্মনিরূপণ হইল। প্রকৃতি ও পুরুষের নিরূপণ হইল। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে প্রকৃতি এই জগৎ,—পুরুষ, চৈতন্য স্বরূপ—অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা ঐ পুরুষ প্রাপ্তব্য। মুক্তির পথ প্রশস্ত হইল বটে, কিন্তু সাংখ্য প্রদর্শিত মুক্তিকে আশ্রয় করিবার যোগ্যতা কোথায়? গায়ত্রী সর্পমন্ত্রে পরিণত হওয়াতে, গায়ত্রীর 'ভূর্ভুব স্বঃ' প্রথম পদের দ্বারা, বহিরঙ্গ সাধন সম্পন্ন হইয়া, স্থূলসূক্ষ্মাদি শরীর নির্ম্মল হইল না—অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া হইল না। 'ধিয়ো যো নাঃ' দ্বিতীয় পদদ্বারা অন্তরঙ্গ সাধন সম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইল না—অর্থাৎ এফ্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া হইল না। তদনন্তর সাধনচতুষ্টয় সম্পত্তি লাভ করিয়া, মুক্তি লাভের অধিকারী হওয়া হইল না—অর্থাৎ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া

হইল না। কোন্ ব্যক্তি সাংখ্য প্রদর্শিত মুক্তিলাভে—অর্থাৎ এম্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে? সুতরাং সাংখ্যপ্রদর্শিত যোগমার্গ আর্য্যজাতিকে, পুনর্ব্বার বেদমার্গে প্রবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইল না।

সাংখ্য দর্শনের অব্যবহিত পরেই, কলুষিত বেদ আশ্রয় করিয়া, তন্ত্রপুরাণাদি রচিত হইল। এই সকল গ্রন্থাদিতে উলুচণ্ডী কুলুইচণ্ডী প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেব দেবীর অর্চ্চনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। প্রত্যেক ভারতবাসীর অংশে গড়ে একটী করিয়া দেব বা দেবী পড়িল। আর্য্যজাতি মহাকোলাহলের সহিত ঐ সকল দেব দেবীর পূজা পাঠে মত্ত হইল। নরকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। আর্য্যজাতির পতন স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

শেষ দর্শন বেদান্ত। ভগবান্ শঙ্করস্বামী দেখিলেন, শ্রুতি স্মৃতির বিনাশ হইয়াছে—ভারতে বহুমত প্রচারিত। আর্য্যজাতিকে পুনর্ব্বার বেদমার্গে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে, তিনি বাদীদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, বেদান্ত মত সংস্থাপিত করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই গায়ত্রীকে মূলে রাখিয়া, গায়ত্রীর অভিপ্রায়ানুসারে বেদান্ত দর্শন রচিত হইল না। সাংখ্যের ধুয়া ধরিয়া, এক প্রকারে ব্রহ্মনিরূপণ হইল ও ব্যাসকৃত শারীরিক সূত্র আশ্রয় করিয়া বেদান্ত দর্শন রচিত হইল বটে, কিন্তু সূত্রসমূহ বিকৃতভাবে বেদান্তে যোজিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম সূত্রটী এস্থলে আলোচিত হইতেছে—"অথা তো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"—অর্থাৎ 'অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।' বেদান্ত-মতে—'সাধন চতুষ্টয়ানন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'—অর্থাৎ যিনি সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে জানিয়া মুক্ত হইবেন।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র? শূদ্রবর্ণ নহে—যেহেতু উহাদিগের বেদে অধিকার নাই। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যও নহে—যেহেতু উহাদিগের অর্দ্ধবেদ সুতরাং অর্দ্ধ গায়ত্রীতে অধিকার মাত্র। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই পূর্ণবেদ সুতরাং পূর্ণ গায়ত্রীতে অধিকার আছে। সুতরাং সেই মুমুক্ষু ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়া, ব্রহ্মকে জানিয়া, তৎসাধন সম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, এবং তদনন্তর সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন—তিনি আবার কি নিমিত্ত 'ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু' হইবেন? এই খানে মনে বিষম খট্‌কা লাগে—বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয়। এখানে বেদান্তের এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। "ভারতীর" অসংখ্য পাঠক, অনন্যসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতপ্রবর লেখকগণ আছেন—তাঁহারা যদি দয়া করিয়া ইহার যথার্থ অর্থ পরিষ্কার করিয়া দেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব। আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি তাহা বলি—"অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" অর্থাৎ সংস্কারানন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা অর্থাৎ গায়ত্রীসংস্কারের পরেই বেদাধ্যয়নের সহিত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু হইবে। কিন্তু বেদান্ত দর্শন মুক্তিলাভের সোপানস্বরূপ হইলেও, কে সেই মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে? গায়ত্রী সর্পমন্ত্রে পরিণত হওয়াতে, এনট্রেন্স, এলে, বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া হইল না, কে সেই এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে? যাঁহারা মুক্তিলাভের জন্য বেদান্ত দর্শন আশ্রয় করিতে লাগিলেন, তাঁহারা ক্রমে অকৃতকার্য্য হইয়া, রঙ্গভূমির ব্যাসবশিষ্ঠনারদাদিতে পরিণত হইলেন। ভগবান শঙ্করস্বামী বেদান্ত দর্শন প্রণয়ন করিয়াও, আর্য্যজাতিকে পুনরায় বেদমার্গে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলেন না। আর্য্য জাতির যে পতন সেই পতনই রহিয়া গেল। আর্য্যজাতি প্রকৃত বেদমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট

প্রাপ্ত হইয়া আসিল। ভারতের ভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইল। নিবিড় অন্ধতমিস্রায় ভারত আচ্ছন্ন হইল। এদিকে ব্রহ্ম কোপানল যেন প্রজ্জ্বলিত হইয়া আর্য্যজাতিকে গ্রাস করিবার জন্য যবন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারত অধিকার করিল। যবনেরা আর্য্যজাতিকে নানাপ্রকারে প্রপীড়িত করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক জাতিকে ক্রীতদাস করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিল। ভারতের রত্নরাজি সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া লইল। দেব-মন্দির ও দেবমূর্ত্তি সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিল। ব্রাহ্মণদিগের শিখা কাটিয়া, যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লইয়া, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিল। এই সময়ে আর্য্য নামের পরিবর্ত্তিত তাহারা হিন্দুনামে অভিহিত হইল। উপরোক্তরূপে ও অন্যান্য নানাপ্রকারে আর্য্যজাতি প্রপীড়িত হইয়াও, তাহাদের চৈতন্য হইল না। আর্য্যজাতির পতন যতদূর হইতে পারে তাহার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত সেই পতনস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। ভারত নিরন্ন—আর্য্যকেশরী যেন মহারোগে আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত। কোনও কালে বেদরূপ অমৃতপান করিয়াছিল বলিয়া, অদ্যাপি প্রাণ বায়ু বহির্গত হয় নাই। আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের ন্যায় আর্য্যজাতিকে যে একেবারে নির্ম্মূল হইতে হইবে, তাহা বোধ হয় না। কেন না, কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্টে অনুমিত হয়, ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্য আবার উদিত হইলেও হইতে পারে। স্নেহময় পিতা যেমন কুপথগামী পুত্রকে বহুপ্রকারে শাসিত করিয়া, পরে নানারূপ সদুপদেশ দ্বারা, তাহাকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করেন, তদ্রূপ করুণাময় ব্রহ্ম, বৈদিক ধর্ম্মভ্রষ্ট আর্য্যজাতিকে যবন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, প্রথমে বিশিষ্টরূপে শাসন করতঃ, পরে সভ্য ইংরাজ মূর্ত্তি ধারণ [illegible] আমাদিগকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিতে-

ইংরাজজাতির অধিকৃত। আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুশিক্ষাপ্রণালী বিস্তৃত। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে ভারতের বহু স্থানে ইংরাজী ও সংস্কৃত কালেজ, পাঠশালা, স্কুল, টোল, বেদবিদ্যালয়াদি সংস্থাপিত হইয়াছে। এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রভাবে ভারতের কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া, খৃষ্টীয়ান হইবার অনুরাগের স্রোত বন্ধ করেন। ঐ সময় হইতে প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ অনুবাদিত হওয়াতে, হিন্দুজাতি বুঝিতে পারিল যে, বাইবেল হইতে আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদিও সর্ব্ববাদীসম্মত হয় নাই, এবং উহার প্রসার ইংরাজীশিক্ষিত সহরবাসীর গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই, কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্ম আচার্য্য ও প্রচারকদিগের দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যে বিশিষ্ট উপকার হইয়াছে, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরে থিওসফিষ্ট সম্প্রদায় উত্থিত হইয়া অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ চেষ্টা করিল। ঐ সকল শিক্ষার প্রভাবেই স্থানে স্থানে হরিসভা সংস্থাপিত করিয়া সুশিক্ষিত হিন্দুগণ স্বধর্ম্ম অনুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই সকল কারণে অনুমিত হয় যে, হিন্দুজাতির কিয়ৎ-পরিমাণে চৈতন্যোদয় হইতেছে। এক্ষণকার প্রচলিত ধর্ম্মসমূহে সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের তাদৃশ অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার কারণ এই যে ঐ সকল ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত নহে। ব্রাহ্ম ও থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের আস্থা ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছে। সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রমাণ বিষয়ীভূত বিজ্ঞানসমন্বিত ও সর্ব্ববাদীসম্মত প্রকৃত ধর্ম্মের রসাস্বাদনে তৃপ্তিলাভ করিতে অনুসন্ধিৎসু। সেই ধর্ম্ম একমাত্র পরম অমৃত স্বরূপ সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম। আর্য্যজাতিই বেদমন্ত্র।

গঠিত। সেই মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, কশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ প্রভৃতি আর্য্য ঋষিদিগের শোণিত অদ্যাবধি আমাদিগের ধমনীতে প্রধাবিত হইতেছে। বৈদেশিকধর্ম্ম বা বৈদেশিক প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া আমাদিগের উন্নতির আশা দূরে থাকুক, ক্রমশঃ আরও অধোগতি হইতেছে ও হইবে।

বেদ বিভাগের পর হইতেই, বেদ কালকবলে নিপতিত হইয়া আসিলে, উপনিষদই হউক বা তন্ত্রপুরাণই হউক, সকলই কলুষিত বেদ হইতে রচিত হওয়ায়, কাহাতেই গায়ত্রীর পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা হয় নাই। এদিকে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতির সোপান স্বরূপ গায়ত্রী সর্প মন্ত্রে পরিণত হওয়ায় ঐ সমস্ত শাস্ত্রাদি পরিণামে বিপরীত ফল প্রসব করিয়াছে। পতিত ভারত ইহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার ও গায়ত্রীর বেদবিহিত চর্চ্চা ভিন্ন আর্য্যজাতির উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই। এই মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইলে, ভারতের যাবতীয় অন্ধকার রাশি তিরোহিত হইবে—সূর্য্যোদয়ে তমো যথা।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যোতিষিক সমস্যা।

ইতিপূর্ব্বে আমরা একবার বিরাট নাক্ষত্রিক জগৎ সম্বন্ধীয় কয়েকটী অনাবিষ্কৃত ব্যাপারের পরিচয় দিয়াছি * আধুনিক জ্যোতিষীগণের বিপুল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, আমাদের ক্ষুদ্র সৌরজগতের ... এখনও রহস্যাবৃত রহিয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা

সোম শুক্র বুধাদি গ্রহ উপগ্রহ সকল, আমাদের চিরপরিচিত পৃথিবীর অতি নিকট আত্মীয়, সকলেই সৌরাত্মজ এবং সকলেই প্রায় একই উপাদানে গঠিত। এই সকল ব্যাপার এবং আরো অনেক তত্ত্ব ক্রমে আবিষ্কৃত হওয়ায়, আমাদের প্রতিবেশী জ্যোতিষ্কের সহিত ঘনিষ্ঠ রূপে পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের বড় প্রবল হইয়া পড়িয়াছে, ভূসহোদর জ্যোতিষ্কের নাম শুনিবামাত্রই, তাহার গার্হস্থ্য অবস্থা জানিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া পড়ি। গ্রহ উপগ্রহ সকল পৃথিবীর ন্যায় জীববাসোপযোগী, না তাহারা তরুলতা ও বায়ুমেঘহীন মহা মরুময়,—এই সকল প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়,—কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রে ঐ সকল প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী জ্যোতিষ্ক চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশ আজ কালকার বৃহৎ বৃহৎ দূরবীক্ষণগুলির লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়িয়াছে,—জ্যোতিষীগণ দেখিয়াছেন ইহাতে বায়ু নাই মেঘও নাই, চন্দ্র বহুকাল হইতে নীরবে স্বীয় কঙ্কালময় নীরস দেহ লইয়া ভূপ্রদক্ষিণ করিতেছে। এই আবিষ্কার দ্বারা আধুনিক জ্যেতিষীগণ বলেন,—চন্দ্রপৃষ্ঠ জীববাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। জ্যোতিষ্কগণের প্রাকৃতিক অবস্থার জ্ঞান এখানেই পর্য্যবসিত,—চন্দ্র ব্যতীত অপর গ্রহ উপগ্রহাদির অবস্থা কি প্রকার তাহা অদ্যাপি কোন জোতির্ব্বিদই ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই। আধুনিক যান্ত্রশিল্পের ক্রমোন্নতির সহিত জ্যোতিষ্ক পর্য্যবেক্ষণোপযোগী খুব বড় বড় দূরবীক্ষণযন্ত্র আবিস্কৃত হইতেছে সত্য, কিন্তু পাঁচ কোটী মাইল দূরবর্ত্তী জ্যেতিষ্কস্থিত পাহাড় পর্ব্বতের ন্যায় একটা বৃহৎ পদার্থ দেখিবার উপযোগী যন্ত্র যে শীঘ্র গঠিত হইবে, তাহার আশা বড়ই অল্প, কাযেই ঐ সমস্যাগুলির মীমাংসা যে কবে হইবে তাহা এখন ঠিক বলা যায় না।

নিকটবর্ত্তী,—দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবন কাল হইতে জ্যোতিষীগণ এই গ্রহদ্বয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ইহাদেরও প্রাকৃতিক অবস্থার কোন নূতনত্ব এপর্য্যন্ত কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। মঙ্গল অপেক্ষা শুক্রগ্রহের ব্যাপার যেন আরো জটিলতা ও প্রহেলিকাময়। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত হার্সেল-সাহেব বহুবার শুক্রমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—মেঘ বা কোনও অস্বচ্ছ বাষ্পদ্বারা গ্রহটী চিরকালই এরূপ আবৃত রহিয়াছে, যে তাহার উপরিস্থ অবস্থা জানিবার আর উপায় নাই। সম্প্রতি কয়েকজন পণ্ডিত শুক্রমণ্ডলের কয়েকটী নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিয়াছেন,—ইহাঁরা শুক্রপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে কতকগুলি নিশ্চল আলোক চিহ্ন দেখিয়া বলিতেছেন, চন্দ্রমণ্ডলের একই নির্দ্দিষ্ট অংশ যেমন পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকে, ইহারও এক নির্দ্দিষ্ট অর্দ্ধভাগ তদ্রূপ আমাদের দিকে উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাই শুক্রমণ্ডলস্থ সেই আলোকচিহ্নগুলি আমরা অচঞ্চল দেখিয়া আসিতেছি। এই কথাটা প্রচারিত হইবামাত্র তদ্‌বিরুদ্ধে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, একদল প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,—নূতন আবিষ্কারের কথাটা ঠিক নয়, নানা দিগ্‌গত সৌররশ্মি শুক্রপৃষ্ঠ হইতে প্রতিফলিত হইয়া, বর্ণ আলোক ও ছায়ার সমবায়ে, ঐ নিশ্চল আলোকচিহ্ন উৎপাদন করে। শুক্রপৃষ্ঠস্থ স্থির আলোক চিহ্নের উৎপত্তিতত্ত্বের উপরোক্ত দুইটী কারণের মধ্যে কোন্‌টী ঠিক তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। কাজেই শুক্রপৃষ্ঠের অবস্থা দুইশত বৎসর পূর্ব্বেকার পণ্ডিতগণ যাহা জানিতেন, আমরা তদপেক্ষা কিছুই জানিতে পারি নাই।

শুক্রের আকাশের অবস্থা আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের আর একটা বিষম সমস্যা। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, চন্দ্র যেমন সময় সময় পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী এবং তাহাদের সহিত সমসূত্রস্থ

গ্রহণ হইয়া থাকে। দূরত্বনিবন্ধন শুক্রজাত গ্রহণে ক্ষুদ্রগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, কেবল একটা গোলাকার কৃষ্ণচিহ্ন যেন সৌরবিম্বের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্য গ্রহণকালে সৌরবিম্বের আবরক চন্দ্র যেমন তাহার উজ্জ্বল অংশটা সূর্য্যের দিকে ফিরাইয়া রাখে, —এস্থলেও শুক্রের উজ্জ্বল ভাগটা তদ্রূপ সূর্য্যের দিকে উন্মুক্ত থাকে, কাযেই তাহার অনালোকিত মুক্ত অংশটা একটী কৃষ্ণচিহ্নবৎ দেখায়। সূর্য্য ও ধরার সহিত শুক্রের সমসূত্রে অবস্থান, জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটা দুর্লভ ঘটনা, এজন্য পূর্ণ শুক্রমূর্ত্তি রবিমণ্ডলে প্রায়ই দেখা যায় — কিন্তু ধরা ও সূর্য্যের সহিত তাহার প্রায় একসূত্রে অবস্থান বড় বিরল নয়। এই শেষোক্ত সময়ে সূর্য্যমণ্ডল পরীক্ষা করিলে তাহাতে পূর্ণ শুক্রমণ্ডল দেখা যায় না,—দ্বিতীয়া তৃতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় একটী ক্ষীণ উজ্জ্বল কলা শুক্রের অপূর্ণ কৃষ্ণাক্তপ্রান্তে স্পষ্ট সংলগ্ন থাকে। জ্যোতির্বিদ্গণ ইহার কারণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন,—অবস্থান ভেদে শুক্রের আলোকিতাংশের কিয়দ্ভাগ উক্ত সময়ে পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকে বলিয়া আমরা শুক্রের পূর্ব্বজনিত রূপান্তর প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; কিন্তু ইহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শুক্রবিম্বের আলোকিতাংশের যতটা উন্মুক্ত থাকা গণনা অনুসারে সম্ভব, প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তদপেক্ষা অনেক অধিক উন্মুক্ত দেখা যায়। এই ঘটনা দেখিয়া অনেক পণ্ডিত অনুমান করিতেছেন, সম্ভবতঃ শুক্রমণ্ডল পৃথিবীর ন্যায় বায়ুমেঘাবৃত আছে, সৌররশ্মি তাহার পৃষ্ঠে পতিত ও প্রতিফলিত হইয়া সেই বায়ুরাশির মধ্যদিয়া আসিবার কালীন, কিছু বাঁকা (Refracted) হইয়া আইসে, এইজন্য শুক্রের অনুজ্জ্বল অংশেরও কতকটা আলোকিত হইয়া পড়ে।

বহুদিন হইল পূর্ব্বোক্ত অনুমানমূলক তত্ত্বটী জগতে প্রচারিত

গ্রহণকালে শুক্রবিম্বের পূর্ব্ববর্ণিত রূপান্তর গ্রহণ প্রকৃতই বায়ুর অস্তিত্ব দ্বারা হইয়া থাকে কি না, তাহা অদ্যাপি রহস্যাবৃত রহিয়াছে।

পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই শুনিয়াছেন, গত কুড়ি বৎসর হইতে আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী গ্রহ মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থা লইয়া, আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। মঙ্গল পৃষ্ঠাগত হরিদাভ আলোক দেখিয়া, অনেকে বলিতেছেন,—সেটা তাহার পৃষ্ঠস্থ বৃহৎ বৃহৎ অরণ্যের প্রতিফলিত আলোক; কেহ কেহ নাকি উহাতে সমুদ্রেরও অস্তিত্ব লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন, এবং কোন এক বৈদ্যুতিক প্রথায় মঙ্গলবাসীদিগের সহিত শীঘ্রই আমাদের সংবাদ আদানপ্রদানও আরম্ভ হইবে বলিয়া সম্প্রতি জনৈক বিজ্ঞানবিদ্ আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু এত উদ্যম ও জয়োল্লাসের ভৈরবনাদের মধ্যেও সন্দেহবাদীগণের কঠোর সত্যের কর্কশধ্বনি শুনা যাইতেছে। জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষী অধ্যাপক নিউকুম্ব সম্প্রতি মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—অপর পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন না কেন, ঠিক বলিতে গেলে পৃথিবীর সহিত মঙ্গলের কেবল একটীমাত্র বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়,—শীতকালে ভূমেরু প্রদেশ যেমন বরফ দ্বারা সাদা হইয়া পড়ে, মঙ্গলের মেরুপ্রদেশও তদ্রূপ সময় সময় তুষারধবল দেখায়; কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ যে মাঙ্গলিক মেরুস্থিত তুষার তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। তুষার থাকিলেই জল থাকিত এবং জল থাকিলেই মেঘও স্পষ্ট দেখা যাইত; কিন্তু খুব বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলেও মঙ্গলাবাসে অনুমাত্র মেঘ বা বায়ুর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং মাঙ্গলিক মেরুস্থিত সেই তুষারধবল পদার্থটা যে বস্তুতই বরফ তাহার কোনই প্রমাণ নাই,—ঐ পদার্থটা কোন এক অজ্ঞাতধর্ম্ম সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ হইতে পারে না কি?

গ্রহণক গ্রহবিম্বের পূর্ব্ববর্ণিত রূপান্তর গ্রহণ প্রকৃতই বায়ুর অস্তিত্ব দ্বারা হই থাকে কি না, তাহা অদ্যাপি রহস্যাবৃত রহিয়াছে।

পাঠক পাঠিকাগণ অবশ্যই শুনিয়াছেন, গত কুড়ি বৎসর হইতে আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী গ্রহ মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থা লইয়া, আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। মঙ্গল পৃষ্ঠাগত হরিদাভ আলোক দেখিয়া, অনেকে বলিতেছেন,—সেটা তাহার পৃষ্ঠস্থ বৃহৎ বৃহৎ অরণ্যের প্রতিফলিত আলোক; কেহ কেহ নাকি ত সমুদ্রেরও অস্তিত্ব লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন, এবং কোন এক তিক প্রথায় মঙ্গলবাসীদিগের সহিত শীঘ্রই আমাদের সংবাদ াদানপ্রদানও আরম্ভ হইবে বলিয়া সম্প্রতি জনৈক বিজ্ঞানবিদ্ আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু এত উদ্যম ও জয়োল্লাসের ভৈরবনাদের মধ্যেও সন্দেহবাদীগণের কঠোর সত্যের কর্কশধ্বনি শুনা যাইতেছে। জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষী অধ্যাপক নিউকুম্ব সম্প্রতি মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—অপর পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন না কেন, ঠিক বলিতে গেলে পৃথিবীর সহিত মঙ্গলের কেবল একটীমাত্র বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়,—শীতকালে ভূমেরু প্রদেশ যেমন বরফ দ্বারা স ইয়া পড়ে, মঙ্গলের মেরুপ্রদেশও তদ্রূপ সময় সময় তুষারধবল ; কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ যে মাঙ্গলিক মেরুস্থিত তুষার তাহার নই প্রমাণ পাওয়া যায় না। তুষার থাকিলেই জল থাকিত এবং জল থাকিলেই মেঘও স্পষ্ট দেখা যাইত; কিন্তু খুব বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলেও মঙ্গলাবাসে অনুমাত্র মেঘ বা বায়ুর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং মাঙ্গলিক মেরুস্থিত সেই তুষারধবল পদার্থটা যে বস্তুতই বরফ তাহার কোনই প্রমাণ নাই,—ঐ পদার্থ টা কোন এক অজ্ঞাতধর্ম্ম সম্পূর্ণ নূতন জিনিস হইতে পারে না কি?

জ্যোতিষীগণ বহুবর্ষ ধরিয়া মঙ্গলপৃষ্ঠের মানচিত্র অঙ্কনে ব্যাপৃত

ছেন, এতদিন তাঁহাদেরই মতবাদ বিদ্বৎজনগ্রাহ্য ছিল। কিন্তু সম্প্রতি গেগেনশ্‌ইন (*Gegenschein* or Counterglow) অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায়, পূর্ব সিদ্ধান্তের প্রতি সকলেরই ঔদাস্য দেখা যাইতেছে। এই শেষোক্ত আলোকটী সূর্য্যাস্তের সহিত পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া, এবং ঠিক্ সূর্য্যের বিপরীতস্থ থাকিয়া রবিমার্গ পরিভ্রমণ করে। প্রথমোক্ত আলোক অপেক্ষাও, এই আলোকটা কিছু অনুজ্জ্বল, এইজন্য পর্য্যবেক্ষণাভ্যস্ত ব্যক্তি ব্যতীত তাহা অপরের চক্ষে হঠাৎ পড়ে না। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ উপরোক্ত আলোকটারও উৎপত্তিতত্ত্ব স্থির করিতে পারেন নাই। আজকাল কয়েকটি জ্যোতিষী বলিতেছেন, ধূমকেতুর যেমন এক একটী পুচ্ছ থাকে আমাদের পৃথিবীরও তদ্রূপ একটা জ্যোতির্ম্ময় পুচ্ছ আছে,— নবাবিষ্কৃত ক্ষীণালোকটা সেই ধরাপুচ্ছেরই আলোক। বলা বাহুল্য পণ্ডিতগণের এই উক্তি সম্পূর্ণ অনুমানমূলক, এই মতবাদের পোষক কোন যুক্তিই তাঁহারা অদ্যাপি দেখাইতে পারেন নাই।

জ্যোতিঃ শাস্ত্রের মূল অবলম্বন মহাকর্ষণ সিদ্ধান্তটা (Theory of gravitation) চিরকালই অভ্রান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ,—শত শত পণ্ডিতের কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ঐটী যেন অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মনে হয় ইহার বুঝি আর পতন নাই। জ্যোতির্বিদ্‌গণ মহাকর্ষণের মূলতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া, ঘটনার বহুকাল পূর্ব্বে গ্রহণাদি জ্যোতিষিক ব্যাপারের প্রকৃতি ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতেছেন,—নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে তাঁহাদের গণনার ফল ভবিষ্যৎবাণীর ন্যায় হইতেছে! মহাকর্ষণ সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইহা আর কি থাকিতে পারে? কিন্তু কয়েক স্থলে গণনালব্ধ ও প্রত্যক্ষ অনৈক্য দৃষ্ট হওয়ায়, ধ্রুবসত্য মহাকর্ষণ সিদ্ধান্তের উপরও যেন আধু পণ্ডিতগণের একটু সন্দেহ আসিয়া পড়িতেছে। পাঠক পাঠিকা বোধ হয় অবগত আছেন পৃথিবী স্বীয় অক্ষের চারিদিকে প্রায়

২৪ ঘণ্টায় একবার পূর্ণাবর্ত্তন করে,—গণনা দ্বারা জ্যোতিষিগণ এই আবর্ত্তনবেগের পরিমাণ স্থির করিয়াছেন, আবার প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাও এই বেগের পরিমাণ স্থির করা হইয়াছে,—এই উভয় বেগ পরিমাণ একই বলিয়া এপর্য্যন্ত আমাদের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে, পৃথিবী সেই গণনালব্ধ বেগে চলিতে চলিতে, হঠাৎ কিছুদিন ধরিয়া একটু দ্রুতবেগে ঘুরিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ ও গণনালব্ধ বেগের অনৈক্যের কারণ আধুনিক জ্যোতিষিগণ অদ্যাপি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

পৃথিবীর আহ্নিক গতির ন্যায় চন্দ্রেরও প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও গণনালব্ধ গতির মধ্যে কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্যের কথা শুনা যাইতেছে। আধুনিক জ্যোতিবিগণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন,—প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া চন্দ্র গণনালব্ধ বেগ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দ্রুতবেগে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, এবং তার পর এই বেগ কালক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়িলে কখন কখন তাহার বেগ গণনালব্ধ বেগ অপেক্ষা কমও হইয়া পড়ে। গণিতবিশারদ জ্যোতিষীগণ চন্দ্রের গতির এই বিস্ময়কর অনৈক্যের কারণ আবিষ্কার জন্য এতদিন ধরিয়া নানা পর্য্যবেক্ষণ ও গণনাদি করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত কারণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

গ্রহমাত্রেরই এক একটা কক্ষ (orbit) নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারা সেই চির-নির্দ্দিষ্টপথ অবলম্বন করিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে,—যে মহাশক্তির [illegible] আবদ্ধ হইয়া তাহারা যন্ত্রবৎ ঘুরিতেছে সে শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি [illegible]শ নাই,—এইজন্য গ্রহগণের কক্ষচ্যুতি একটা ভয়ানক [illegible]বিক ব্যাপার। কিন্তু আজ কয়েক বৎসর হইল মার্করি বা [illegible] গ্রহের এই প্রকার কক্ষচ্যুতি দেখা গিয়াছে,—এই বিস্ময়কর [illegible]নার পর হইতেই, তাহার কারণাবিষ্কারের জন্য নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ [illegible]হুচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন কিন্তু তাহা অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত রহিয়া-

বাইএর সামান্য একটু পরিহাস হইতে বুন্দী ও চিতোর রাজসিংহাসন শূন্য হইয়াছিল। রূপনগররাজকুমারী প্রভাবতী মিবারের রাণা রাজসিংহকে পতিত্বে বরণ করিলে সম্রাট্ আরঙ্গজীবের সহিত তাঁহার চিরবৈরিতা জন্মে। মিবাররাজদুহিতা কৃষ্ণকুমারীর জন্য জয়পুর ও মারবারাধিপতি প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন। মিবারাধিপতি পৃথ্বীরাজদুহিতা তারাবাই, রাঠোরকুমারী জবহরবাই, রাণী দুর্গাবতী, যোধপুরমহিষী সরস্বতী, আধুনিক সময়ে পাতিয়ালার রাণী সাহেব(১) ও ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই, ইঁহারা সকলেই ফরাসি বীরমহিলা জোয়ান অব্ আর্কের ন্যায় রণ-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শেষোক্ত দুইজন ও ইন্দোরের অহল্যা বাই স্বহস্তে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন। ঈদৃশ বীর রমণীগণের সস্মিতাননের প্রশংসাদৃষ্টি লাভাকাঙ্ক্ষায় রাজপুত-

---

(১) ইঁহার সম্বন্ধে টড্‌কৃত রাজস্থানের ইতিবৃত্তে কোন উল্লেখ নাই, সুতরাং সাধারণ পাঠক ইঁহার জীবনী না জানারই সম্ভব। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইহাঁর ভ্রাতা কর্ত্তৃক পাতিয়ালা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। ১৭৯৬ সনে নাহানের রাজার অনুরোধে স্বয়ং একদল সৈন্যসহ তথায় গমন করিয়া বিদ্রোহ দমন করেন—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর একটি রমণী—রাণী আন্‌কোর বিশেষ দক্ষতার সহিত পাতিয়ালা রাজ্যশাসন করেন। অহল্যা বাই তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর ১৭৬৫-৯৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইন্দোররাজ্য শাসন করেন। হিন্দুমহিলাগণ যেরূপ দক্ষতার সহিত রাজ্যশাসন করেন, তৎসম্বন্ধে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন—"If a Hindoo principality is strongly governed; if order is preserved without oppression; if cultivation is extending, and the people prosperous, in three cases out of four that principality is under a woman's rule. This fact, to me an entirely unexpected one, I have collected from a long official knowledge of Hindoo governments." (Subjection of Women, Chap. III.) বাঙ্গালী জমিদারদিগের মধ্যে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ আছে। নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া ভবাণী, পুটিয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরী, দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণি, কাশিমবাজারের রাণী স্বর্ণময়ী, সন্তোষের জাহ্নবী চৌধুরাণী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গণ যে রণস্থলে থার্ম্মপিলি ও মারাথনের গৌরব মলিন করিয়া দিয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

অবনতির এই দুর্দ্দিনেও রাজপুতজাতির উপর রাজপুতরমণীর প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। কর্ণেল টড্ বলেন, "বহুযুগের অত্যাচার সত্বেও তাহাদিগের শিভাল্‌রি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। প্রত্যেক রাজপুত জানে যে রাজস্থানে এমন একটি নিভৃত কোণ নাই যেখানে তাহাদের কোন বীরত্বকাহিনী অপ্রকাশিত রহিবে, এবং সুন্দরীহৃদয় উদ্বেলিত না করিবে।...রাজপুত প্রত্যেক কার্য্যেই তাহার স্ত্রীর পরামর্শ লয়, তাহার সাধারণ গৃহকার্য্য হইতে স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির লক্ষণ অনুমান করে, এবং তাহার নামে 'দেবা' উপাধি সংযুক্ত করে।" আমাদের দেশেও ব্রাহ্মণ মহিলাগণ 'দেবী' উপাধিতে সম্মানিতা ও কন্যা 'মা' এবং বধূ 'বৌমা' বলিয়া সম্বোধিত হন, ইহাতে স্ত্রীজাতির প্রতি একটি সম্ভ্রমের ভাব প্রকাশ পায় সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের প্রতি কোন অত্যাচার বা অবমাননা আমাদের প্রাণে যতটা আঘাত দেয় বোধ হয় অন্য কোন জাতির তদপেক্ষা অধিক নহে।(১) তখন হঠাৎ হিন্দু নরহত্যা প্রভৃতি যে সকল অপরাধ করিয়া বসে তজ্জন্য ইংরাজী আদালতে ফাঁসির হুকুম নিতান্ত গুরুদণ্ড বলিয়া বোধ হয়। আসল কথা এরূপ স্থলে অপমানকারীর অর্থদণ্ড বিধান হিন্দুগণ নিতান্তই অপ্রচুর মনে করে, বিদেশী বিচারক তাহাদের বেদনার তীব্রতা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের

(১) "One case of dishonour to women vibrates through the overstrung feelings of our sensitive millions, and is echoed and re-echoed from one end of the country to the other." প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, Nineteenth Century, Dec. 1900.

হয় নাই, তেমনি আমাদের নীচ শ্রেণীর মধ্যে ঈদৃশ সুরোন্মত্ত স্ত্রীহন্তা নরপিশাচের সংখ্যাও বিরল।

রেল, বা জাহাজে ভ্রমণকালেও আমাদের নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোক দেখিলে পথ ছাড়িয়া দেওয়া, গাড়ীতে স্ত্রীলোক থাকিলে বাক্‌সংযম, পুরুষ সহচর বেশী না থাকিলে সহর্ষ ধন্যবাদ অথবা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টির আশা ব্যতীত স্ত্রীলোকদিগের নানাপ্রকার ক্ষুদ্র সুবিধা বিধান, ইত্যাদি হইতে আমাদের গ্যালাণ্ট্রির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এস্থলে আর একটি কথার কিঞ্চিৎ উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অধুনা সংবাদপত্রে রেলে, জাহাজে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী সচরাচরই প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় সে সব স্থলে অত্যাচারিত রমণীদিগের পুরুষ সহচরগণ নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম। ইহা হইতে এরূপ অনুমান ঠিক্ হইবে না যে আমরা আমাদের রমণীদিগের অপমান তীক্ষ্ণরূপে অনুভব করি না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এ বিষয়ে আমাদের অনুভবশক্তি তীক্ষ্ণতম। কিন্তু শ্রুতিকঠোর হইলেও বলিতে হইবে আমাদের স্বাভাবিক কাপুরুষতাবশতঃ সেগুলি আমরা প্রায়ই নীরবে সহ্য করি। ইংরেজ যেরূপ অপমান বোধ করিলে মুষ্টি পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হয়, তদপেক্ষা অনেক প্রবল অপমান অনুভব করিয়াও আমরা চুপ করিয়া থাকি। এই কাপুরুষতার অন্য কারণও আছে। অত্যাচারী রেল কর্ম্মচারী অথবা শ্বেতাঙ্গযাত্রীর প্রতি ইংরেজ বিচারকের একটু স্বাভাবিক স্নেহ থাকাতে স্বহস্তে অপমানের প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইলে অথবা আইন আদালতে অভিযোগ করিলে অপমানিত ব্যক্তিকে আরও অপমানিত হইতে হয়। ইহা বিবেচনা করিয়াই নেশন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ ঘোষ একবার বলিয়াছিলেন, 'Tis the law which makes cowards of us all. তারপর মহিলাদিগের সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইয়া আদালতে সাক্ষ্যদান, সংবাদপত্রে

মকদ্দমার বিবরণ প্রকাশ, ইত্যাদি আশঙ্কাতেও অনেকে গোলযোগ বাধাইতে চাহেন না। যাহা হউক, এই অপ্রিয় বিষয়ের অধিকতর আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

হিন্দুদিগের মধ্যে মাতৃভক্তি পুরাকালে কিরূপ প্রবল ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এ বিষয়ে হিন্দুদিগের ধারণা এখনও পূর্ব্ববৎ প্রবল রহিয়াছে।(১) ম্যাক্স্ ওরেল এ সম্বন্ধে বলিতেছেন "ফ্রান্সে, নিম্নতম কৃষক ও মজুরেরও মাতৃভক্তি আছে।...ইংলণ্ডে তাহারা মাকে প্রহার করে, অথবা বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেয়। যাঁহারা একথার সত্যতায় সন্দেহ করেন তাঁহারা যে কোন ইংরাজী পত্রিকা খুলিয়া নেন পাঠ করেন। ..আমাদের দেশে [ফ্রান্সে] মাতা বার্দ্ধক্যে সেবানিরত সন্তান পরিবৃত হইয়া পরলোকগমন করেন। এদেশে [ইংলণ্ডে] যে পর্য্যন্ত তাঁহার শক্তি থাকে তিনি খাটিয়া খান; যখন তিনি অকর্ম্মণ্য সরঞ্জামস্বরূপ হইয়া পড়েন, তখন দাতব্য আবাসে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।"(২) ফ্রান্সের উষ্ণতর জলবায়ুতে মাতৃভক্তি অনেকটা হিন্দুদের মতই প্রবল থাকে বলিয়া বোধ হয়। এবিষয়ে ইংরেজগণ তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থনির্দ্দিষ্ট পথ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় অনুসরণ কারিয়া থাকেন।(৩) হিন্দুদিগের একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্ত্রী ব্যতীত অনেক আত্মীয়ার সহিত একত্র বাস করিতে বাধ্য করে। একান্নবর্ত্তী প্রথার বহু দোষ সত্ত্বেও পারিবারিক ব্যক্তিসমূহের মধ্যে ঐক্যবন্ধনে

(১) হিন্দুর মাতৃভক্তি সম্বন্ধে বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও আংলো-ইণ্ডিয়ান সাক্ষ্য-প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে এরূপ একজনের মত উদ্ধৃত হইল—"Filial respect and affection is quite as note-worthy a feature in Hindu character now as in ancient times." Indian Wisdom by Monier Williams, p. 438, footnote.

(২) John Bull and his Island, Chap. V.

উহা বিশেষ সহায় সন্দেহ নাই। অদ্যাপি অধিকাংশ হিন্দুপরিবারের মাতাই কর্ত্রী, তাঁহার অভাবে জ্যেষ্ঠা (এবং অনেকস্থলে কনিষ্ঠা) ভগিনী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, দম্পতী তাঁহার অধীনে বাস করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ তাঁহার হস্তে ব্যয়ার্থ সমর্পণ করেন। ইংলণ্ডে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ল্যাম্ব, প্রমুখ দুচারিটি অবিবাহিত পুরুষের এতাদৃশ ভগ্নীস্নেহ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তদ্দেশে ইহা কিছুতেই সাধারণ বলা যাইতে পারে না।

এরূপ স্থলে এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই উত্থাপিত হইতে পারে যে, পত্নী-প্রেম অপেক্ষা মাতৃভক্তি অথবা ভগিনীস্নেহ অধিক বা কম পরিমাণে প্রকৃত শিভাল্‌রির পরিচায়ক ? আমরা যাহাই কেন বলি না, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি এমন একটা নৈসর্গিক আকর্ষণ আছে যে স্বীয় ভার্য্যাকে ভালবাসারূপ কর্ত্তব্যপালন প্রায়ই কঠিন নহে, বরং সুখকর। দাম্পত্য সম্বন্ধে যে একটি ভোগ্যাভোগ্যভাব আছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহাকে নীতিবিজ্ঞানানুসারে মাতৃভক্তির পবিত্রতর পূজ্যভাব হইতে নিম্নাসন দেওয়াই সঙ্গত, কারণ দাম্পত্যপ্রেমে আত্মসংযম ও স্বার্থত্যাগের আবশ্যকতা অপেক্ষাকৃত কম। অতএব 'শিভাল্‌রি' অর্থে প্রকৃত পবিত্র নারীমর্য্যাদা বুঝিতে হইলে, হিন্দুর পত্নীপ্রীতি কম থাকিয়া মাতৃভক্তি বেশী থাকিলেও তাহাকে 'আন্‌-শিভাল্‌রিক' বলা যায় না। কিন্তু দাম্পত্যপ্রেম সম্পর্কেও হিন্দুজাতি অন্য কোন জাতি অপেক্ষা নিম্নস্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দুদিগের বিবাহ একটি চিরস্থায়ী পবিত্র সংস্কার, কেবল আইনমূলক চুক্তি নহে। মহাভারত-কার বলেন "এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ পাণিগ্রহণমিষ্যতে যদাপ্নোতি পতির্ভার্য্যা মিহলোকে পরত্র চ।" অন্যোন্যের প্রতি আমরণ একনিষ্ঠ আসক্তিকে মনু সংক্ষেপতঃ স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।(১) হিন্দু বিবাহের মন্ত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাওয়া যায় :—"ওঁ যদেতৎ

(১) ৯,১০১।

হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।" "প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্॥" স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভার্য্যাকে সংস্কারযুক্ত স্ত্রী সংজ্ঞা প্রদান করিয়া আহবনীয়ের সহিত তাহার উপমা দিয়াছেন।(১) মনু আহবনীয়কে আচার্য্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং আচার্য্যকে পিতা অপেক্ষা পূজ্য বলিয়াছেন।(২) ইহা হইতেই ভার্য্যাকে কীদৃশ উচ্চপদ দেওয়া হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। বস্তুতঃ হিন্দুশাস্ত্র বিবাহ বন্ধন অচ্ছেদ্য করিয়া দিয়া মোটের উপর সমাজে দাম্পত্যসুখের বৃদ্ধিসাধনই করিয়াছেন।(৩)

এখন ইউরোপীয় নারীমর্য্যাদা কতটা স্ত্রীজাতির প্রতি প্রকৃত সম্মানজ্ঞানপ্রসূত, আর কতটা স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণের মোহ, তাহা আলোচনা করা যাউক।(৪) বিখ্যাত ইংরেজ লেখক চার্লস্

---

(১) চন্দ্রনাথবাবুর 'হিন্দুত্ব' দেখ।

(২) ২, ২৩১, ১৪৬।

(৩) বিবাহ বন্ধনচ্ছেদ সম্বন্ধে চিন্তাশীল Goldwin Smith (Questions of the day, 1893, pp 197-98) বলেন—"Though Marriages are made not in heaven, but on Earth, it may safely be said that the great majority of them are happy; at least the partners are happier united than they would have been alone. But their success depends, in ordinary cases, upon the permanence of the bond, which enforces restraints of temper and mutual accommodation. If divorce were always open, compatibility would be seldom found; the bond would be broken by the unscrupulous as often as matrimony failed to realise the dreams of courtship. It is easy to paint horrible pictures of unwilling union after mutual disappointment. Such things do happen, and very tragical and deplorable they are. The remedy is caution before marriage, not the virtual overthrow of an institution on which, so far as we can see, the order, purity and hapiness of society depends."

(৪) "We are apt to look upon the chivalry of the middle ages from the standpoint of the nineteenth century romance-writers, to consider it as the single-minded service of a generous manhood towards a noble but weaker womanhood...It was indeed a service, on the part of the man, often arduous and prolonged; but there

ল্যাম্বের মতে গ্যালাণ্ট্রি, একটি সুবিধাজনক মিথ্যাকথা, উচ্চসমাজের যুবকযুবতীগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত পরস্পরের সুবিধার্থ একটি বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র। ল্যাম্ব তাঁহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সহিত বলিতেছেন, "যদিও গ্যালাণ্ট্রি মিথ্যাকথা হউক, তথাপি জীবনে তাহার উপকারিতা আছে স্বীকার করিতাম, যদি দেখিতাম যে, ভদ্রসমাজে যুবতী ও বৃদ্ধার প্রতি, সুন্দরী ও কুৎসিতার প্রতি, গৌরাঙ্গী ও শ্যামাঙ্গীর প্রতি, এক কথায় অবলা বলিয়া সকল স্ত্রীলোকের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শিত হয়, তাহার সৌন্দর্য্য, অর্থবল, অথবা বংশগৌরবানুসারে সম্মানের তারতম্য হয় না। আমি তখন গ্যালাণ্ট্রিকে কেবল অর্থশূন্য নাম মাত্র মনে করিব না, যখন দেখিব ভদ্রসমাজে ভদ্রপরিচ্ছদধারী কোন ব্যক্তি বিদ্রূপ উৎপাদন না করিয়া বা উৎপাদন করিবার ইচ্ছা না করিয়া স্ত্রীলোকের বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে, যখন "বৃদ্ধা চিরকুমারী' অথবা 'অমুকের বিবাহ-বিপণিতে বিক্রীত হইবার বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে,' প্রভৃতি কথাগুলি সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর বিরাগ জন্মাইয়া দিবে।"(১)

দাম্পত্যবন্ধনের পবিত্রতা স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মানের একটী উৎকৃষ্ট ব্যবহারিক নিদর্শন। এই হিসাবে হিন্দুদিগের নারীমর্য্যাদাজ্ঞান উচ্চশ্রেণীর বলিতে হইবে। হিন্দুদিগের দাম্পত্যনীতির সম্বন্ধে একজন আংলো-ইণ্ডিয়ানের মত এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।. বলিয়া রাখিতে দোষ নাই, ইনি হিন্দুদিগের গুণভাগ অপেক্ষা দোষভাগ গ্রহণে অধিকতর পটু, অতএব ইঁহার মত কিছুতেই অত্যধিক সহানুভূতিজনিত বলা যায় না। ইনি বলেন "আমি নিজে যতদূর দেখিয়াছি, এবং ভারতীয় গ্রাম্যজীবন যাঁহারা ভালরূপ অবগত আছেন তাঁহাদের নিকট যতদূর জানিতে পারিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গ্রামসমূহে সাধারণতঃ দাম্পত্যনীতি

(১) Essays of Elia—Modern Gallantry.

বিশুদ্ধ। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, বঙ্গদেশের অজ্ঞ ও দরিদ্র শ্রেণী বাসীদের নৈতিক চরিত্র পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমশ্রেণীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"(১) সাক্ষাৎসম্পর্কে ইউরোপীয় নারীচরিত্রের অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। কিন্তু ইউরোপীয় নাটক, নবেল, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও নীতি সম্পর্কীয় সংখ্যাবিজ্ঞান পাঠে যাহা ধারণা হয়, তাহাতে পূর্ব্বোদ্ধৃত মতটিকে কিছুতেই অতিরঞ্জিত বলা যাইতে পারে না।

সমাজে ইউরোপীয় নারীজাতির যতটা প্রাধান্য থাকুক না কেন, রাজনীতিক্ষেত্রে উহা নিতান্তই স্বল্প পরিসর, এবং কোন পুরুষসুলভ অধিকার লাভের নিমিত্ত ইউরোপীয় মহিলাগণ আন্দোলন উপস্থিত করিলে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পুরুষগণ তাহাতে যেরূপ ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহাতে শিভালরিক্ ভাবের একান্ত অভাবই দৃষ্ট হয়।(২) ব্যবহারনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে আমাদের দেশে

---

(১) W. J. Wilkins, Modern Hinduism, p. 412.

(২) এবিষয়ে যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন তাঁহারা M. Ostrogorski প্রণীত Rights of Women নামক গ্রন্থ এবং J. S. Millএর Subjection of Womenএর দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন। বিখ্যাত স্কচ্ ধর্ম্মসংস্কারক নক্স্ স্ত্রীলোকদিগকে শাসন ক্ষমতা প্রদান বিষয়ে বলেন "To promote a woman to beare rule is repugnant to nature, contumelic to God, a thing most contrarious to his reveled will and approved ordinance; and finallic it is the subversion of good order, of all equity and justice (Monstrous Regiment of Women). কোন আইন লঙ্ঘন না করিয়া ইচ্ছা করিলে ইংলণ্ডীয় স্বামী বর্ত্তমানকালেও স্ত্রীর প্রতি কতদূর অত্যাচার করিতে পারেন, পাঠক তাহা জানিতে চাহিলে Wilkie Collinsএর Woman in White গ্রন্থের নায়িকার জীবনী আলোচনা করিবেন।

াকদিগের অধিকার তাহার ইউরোপীয় ভগিনীর অপেক্ষা অধিক, া আশ্চর্য্য হইলেও সত্য।(১)

হিন্দুদিগের নিকট আদ্যাশক্তি নারীরূপিণী, এবং সাধারণতঃ দেবতা অপেক্ষা দেবীর সংখ্যা অধিক। লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, কালী, প্রভৃতি দেবীগণ আবহমানকাল হইতে সমগ্র হিন্দুজাতির শ্রদ্ধা, ভক্তি, পূজা আহরণ করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে হিন্দুদিগের নারীপূজা-প্রবণতা প্রকাশ পায়। যদি স্ত্রীজাতি হিন্দুকল্পনায় নিতান্ত হীন স্থান অধিকার করিয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহারা দেবত্বে উন্নীত হইতে পারিত না, এবং প্রত্যেক হিন্দু ভক্তিভরে সেই সকল দেবীর নিকট মস্তক অবনত করিতে পারিত না। "কৃষ্ণবিষয় ভারতবর্ষীয়দের নানা অংশে একটি পরম সুখের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। বৃন্দাবনলীলার উপাখ্যানটি ভারতীয় কবিত্বরসের একটি অপূর্ব্ব প্রস্রবণ। উহা পুরাণ, সাহিত্য, কীর্ত্তন, কবি, যাত্রাদি নানারূপ ধরিয়া সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্যাদিভাবে ভারতভূমিকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ভূমণ্ডলের অন্য কোন দেশের কোন একটি উপাখ্যানে এরূপ বিভিন্ন ভাবপ্রবাহ ও বিচিত্র রসতরঙ্গিনী একত্র প্রবাহিত করিয়াছে এরূপ দেখা যায় না।"(২) এই বৃন্দাবনলীলার কেন্দ্রীভূত মূর্ত্তি,—রাধিকা। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্য ও তাঁহার পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ ও বৈষ্ণবসম্প্রদায় বঙ্গের ঘরে ঘরে রাধিকার

---

(১) এ বিষয়ে ১৩০৭ সালের চৈত্রের "ভারতী" তে আমার প্রবন্ধ দেখুন। সম্পত্তিসম্পর্কে হিন্দুনারীর অধিকার সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী বলিতেছেন—"When we come to the commentaries we find higher rights conferred by them on women, who are placed almost on a par with men as regards the capacity to hold property." (Hindu Law, page 256).

(২) ৺অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।

মূর্ত্তি সজীব ভক্তিপ্রীতি মিশ্রিত করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। এই রাধাপূজার সহিত রোমান ক্যাথলিকদিগের মেরী-পূজার (Mariolatry) তুলনা হইতে পারে। মেরীপূজা নারীজাতির মর্য্যাদাবৃদ্ধির যেরূপ সহায়তা করিয়াছে কোন বিখ্যাত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক এই প্রকারে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। "জগৎ আদর্শ দ্বারাই শাসিত হইয়া থাকে, এবং কুমারী মেরীসম্বন্ধে মধ্যযুগে ইউরোপে যে অভিনব ধারণা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা যেরূপ গভীর ও স্বাস্থ্যকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, আর কোন আদর্শ এতদূর করিয়াছে কিনা সন্দেহ। স্ত্রালোক তদ্দ্বারাই প্রথম তাহার ন্যায্যস্থান অধিকারে সক্ষম হয়।...নারী আর পুরুষের দাসী অথবা ক্রীড়াপুত্তলিকা রহিলনা, কেবল নীচতা ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার ভাবের সহিত তাহার নাম আর জড়িত রহিলনা, সে উর্দ্ধে উন্নীত হইয়া যেরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ পূজা আকর্ষণে সক্ষম হইল তাহার ধারণা করাও প্রাচীনকালে অসম্ভব ছিল। প্রেমের আদর্শ উন্নীত হইল। নারীজাতির শ্রেষ্ঠতার নৈতিক সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে অনুভূত হইল।...এই আদর্শসৃষ্টি কঠোর, অজ্ঞ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে পবিত্রতা ও কোমলতার যে একটি ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিল, অতীত কালের অতি সুসভ্যজাতিসমূহের নিকটও তাহা অজ্ঞাত ছিল।..স্ত্রীজাতির প্রতি অভিনব সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাবে, আচারব্যবহারের কোমলতায়, সামাজিক সর্ব্ববিধ কার্য্যে, সুকুমার রুচির অভিব্যক্তিতে,—ইত্যাদি নানা প্রকারেই মেরীপূজার এই প্রভাব লক্ষিত হইতে লাগিল।"(১) দেবীপূজার এইরূপ মহৎ সুফল আমাদের দেশেও যে প্রসূত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই।

হিন্দুদিগের দেবমন্দিরে মধ্যে মধ্যে যে সেকল অশ্লীলচিত্র খোদিত

(১) Lecky, Rise of Rationalism in Europe, Vol II pp. 213-14.

দেখা যায়, তাহাহইতে কেহ কেহ আমাদের নারীমর্য্যাদার অভাব অনুমান করেন। এবিষয়ে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভল্‌টেয়ারের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এবং তাঁহার নিজের মন্তব্য অপেক্ষা জ্ঞানগর্ভ উত্তর প্রদানে আমরা অক্ষম। ভল্‌টেয়ারের উক্তি পাঠক যথাস্থানে দেখিয়া লইবেন, ডাক্তার মিত্রের মন্তব্যের অনুবাদ আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি। তিনি বলেন—"সহস্র সহস্র হিন্দু—পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু প্রতিবৎসর উড়িষ্যার ধর্ম্মমন্দির দর্শন করে। এজন্য ষড়ঋতুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর ঋতুতে দীর্ঘপর্য্যটনক্লেশ স্বীকার করিতে দ্বিধা করে না। তাহারা দেবদর্শনের নিমিত্ত অসহ্য কষ্টভোগ করে, এবং এই দৃঢ়বিশ্বাস লইয়া গৃহে ফিরে যে তীর্থদর্শনে তাহাদের সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়াছে; কিন্তু ঘুণাক্ষরেও একবার মনে করেনা যে, মন্দিরে অসঙ্গত বা অশ্লীল কোন কিছু তাহারা দেখিয়াছে। দেবমন্দিরের সমস্তই তাহাদের নিকট রহস্যময়, সনাতন ও পবিত্র, এবং তাহারা কখনও সেই রহস্যউদ্ঘাটন করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত গুপ্তকথা জানিতে ব্যাকুল হয় না। চিত্রগুলির কুরুচি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলে ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহাদের মনে অশান্তি ও উদ্বেগ জন্মাইয়া দেওয়া যায় বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহাদের বিশ্বাসের আবেগ তাহা ভাসাইয়া লইয়া যায়। এসমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ঐ অশ্লীল চিত্রগুলি কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধারণা মূর্ত্তিদ্বারা প্রকট করিবার চেষ্টা মাত্র, চিত্রকর অথবা তাহার নিয়োগকর্ত্তার বিকৃতরুচির পরিচায়ক নহে।" (১)

সতীদাহ, জহরব্রত প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়ম, ও বহুবিবাহ, চিরবৈধব্য এবং অবরোধপ্রথা প্রভৃতি এখনও বর্ত্তমান রীতিসমূহ হইতে হিন্দুদিগের নারীমর্য্যাদার অভাব প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়া থাকে।

(১) Indo-Aryans, Vol. I., Chap. III.

আমরা এই সকল প্রথার সমর্থন না করিয়া ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ইহাদিগকে যতদূর দূষ্য মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহারা ততদূর দোষাবহ নহে এবং তদ্দ্বারা যতদূর কুফল উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, নানা কারণে তাহা হইতে পারে নাই।

জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্য মুনির সহিত গার্গীর বিচার ও দ্রৌপদী প্রভৃতির স্বয়ম্বর হইতে সেকালে স্ত্রীলোকদিগের পুরুষ সমক্ষে বহির্গত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন পৌরাণিক যুগেও নারীদিগের সম্পূর্ণ অবরোধ অজ্ঞাত ছিল।(১) তিনি তৎকালীন সাহিত্য হইতে প্রভূত দৃষ্টান্ত সঞ্চয় করিয়া একথা প্রমাণ করিয়াছেন। তাতার আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত হিন্দুগণ অবরোধ প্রথা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।(২) রাজপুতগণ সর্ব্বপ্রথম বর্ব্বর শকজাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই প্রথা গ্রহণ করেন। রাজপুতঅবরোধ প্রথা সম্বন্ধে কর্ণেল টড্ বলেন, "রাজপুত রমণীগণ যেরূপ স্বাধীনতা, সম্মান ও সুখ উপভোগ করেন তাহা বিশেষরূপ অবগত থাকা বশতঃই আমি তাহাদিগের অবরোধকে কারারুদ্ধাবস্থার সহিত তুলনা করিতে পারি না।··· পৃথিবীতে যে সকল জাতি স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষদের সহিত স্বাধীনভাবে মিশিতে দেন নাই,—যেমন গ্রীসীয়, মিসরীয়, রোমান, চীন—তন্মধ্যে রাজপুতগণই সর্ব্বাপেক্ষা কম দয়ার পাত্র; কারণ স্ত্রীজাতির প্রতি

(১) Civilisation in Ancient India, Peoples' Edition, p. 781.

(২) "There is no evidence to show that women were in those early times curtailed of their freedom, or confined to the solitude of their own houses, as is the custom now in India among the respectable Hindu families, a custom primarly due to the fear of insult from foreign conquerors."—R. W. Fraser's Literary History of India, Chap. III., p. 31.

সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা যদি সভ্যতার পরিচায়ক হয়, তবে রাজপুতানায় সে বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ আছে।" অন্যত্র, "যদিও রাজপুতনী অন্তঃপুরে আবদ্ধ ও অদৃশ্য থাকেন, তথাপি উন্মুক্তসূর্য্যালোকবিহারিণী রমণীগণ অপেক্ষা সমাজে তাঁহাদের প্রভুত্ব কম নহে।"(১) বঙ্গদেশ অনেক কাল মুসলমান শাসনে ছিল, এবং সিরাজদ্দৌলা প্রমুখ কামুক নবাবের ভয়ে তথায় অবরোধপ্রথা সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়রূপে স্থানলাভ করিয়াছে। মহারাষ্ট্র প্রদেশে এবং সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্র উহার অস্তিত্ব একরকম নাই বলিলেই চলে। বঙ্গদেশেও নিম্ন শ্রেণীর উপর উহার প্রভাব কম। কিন্তু ইহাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না যে, অবরোধপ্রথা মহিলাদের কোমলতা, পবিত্রতা ও মাধুর্য্য অনেক পরিমাণে অবিকৃত রাখে এবং উহার মূলে তাহাদের প্রতি গভীর প্রেম এবং পরপুরুষস্পর্শের অবমাননার ভয় ও ঈর্ষা বর্ত্তমান থাকে।(২) ইংরাজদের একটি প্রবচন আছে—When a couple are newly married the first month is honey-moon and smick-smack; the second is hither and thither; the fourth is devil take him that brought thee and me together. এতদ্দ্বারা বিলাতী দাম্পত্যসুখের ক্ষণস্থায়িত্বের আভাস পাওয়া যায়। ১৯০১ সনের এপ্রিল মাসের Lady's Realm পত্রিকায় Honey-moon সম্বন্ধে কয়েকটি বিখ্যাত পুরুষ ও মহিলার মতামত সংগৃহীত হইয়াছিল। অনেকে উহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।(৩) মিসেস্ বার্চ পরামর্শ দিয়াছিলেন যে 'মধুচন্দ্রের' সময় স্বামীস্ত্রী সর্ব্বদা একত্র থাকায় তাহাদের প্রেমে শীঘ্রই অবসাদ

---

(১) Rajasthan, Mewar, Chap. XXIV.

(২) Goldwin Smith's Questions of the Day, p. 208.

(৩) Hon. S. R. Erskine ইহাদের একজন। তিনি বলেন—"The honey-moon is a more prolific source of broken marriages than the Divorce Court is of "separate establishments."

জন্মে, অতএব এরূপ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য যাহাতে একজন পরিচারিকা গৃহিণী অপেক্ষা কম সুন্দরী—দম্পতীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের সর্ব্বদা একত্র বাসের প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে পারে, তাহা হইলেই প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হইবে। আমাদের মধ্যে অবরোধপ্রথা অনেক পরিমাণে এই কার্য্যের সহায়তা করে। স্বামী সর্ব্বদা স্ত্রীর সহিত মিশিতে পারে না, সুতরাং স্ত্রীর সঙ্গ তাহার নিকট চিরকালই স্পৃহনীয় থাকিয়া যায়।(১) আবার বিদেশী সমাজসংস্কারকগণ আমাদের অবরোধপ্রথাকে যতদূর কঠোর মনে করেন প্রকৃতপক্ষে উহা ততদূর কঠোর নহে। আমাদের অন্তঃপুরবাসিনীগণ সই ও আত্মীয়াদের বাড়ী বেড়াইতে যান, স্বগৃহে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, তামাসা দেখিতে ও তীর্থ করিতে গৃহ হইতে নির্গত হন, ঘনিষ্ঠ পুরুষ আত্মীয় বান্ধব ও কর্ম্মচারীর সহিত কথোপকথন করেন, এবং পর্দ্দার অন্তরাল হইতে সুচারুরূপে গুরুতর সাংসারিক কার্য্য সমূহের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধান করেন। বিখ্যাত আংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা ঔপন্যাসিক ফ্লোরা আন্ ষ্টীল বিলাতে কোন বক্তৃতায় এই সমস্ত আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন আমাদের অবরোধ-

---

(১) ইউরোপে অবরোধপ্রথা নাই, স্ত্রী পুরুষে অবাধে মেশামিশি করে। তথায় আজকাল যৌন সম্বন্ধ কি ঘোরতর বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা জানিতে চাহিলে পাঠক Max Nordauর Degeneration নামক বিখ্যাত গ্রন্থখানি পড়িবেন। অবরোধপ্রথা থাকিলে কিয়ৎপরিমাণে ইহার একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিষেধক থাকিত সন্দেহ নাই। বিংশশতাব্দীর নারীগণ কি হইবে তাহা আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন "Modesty and restraint are dead superstitions of the past, and appear only as atavism and among the inhabitants of remote villages."—Book V, Chap. I.

প্রথা বাস্তবিকই ততটা দোষের নহে যতটা পাশ্চাত্য সংস্কারকগণ বিবেচনা করেন।(১)

প্রাচীন ভারতে রাজন্যসমাজব্যতীত অন্যত্র বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল না।(২) এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রীর মত অবধানযোগ্য। "সম্পত্তিশালী ব্যক্তির প্রকাশ্যে বহুবিবাহের দায়িত্বগ্রহণ করা গোপনে বহুরমণীসহবাস অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের গুপ্ত ও প্রকাশ্য চরিত্রের মধ্যে আধুনিক আইন যে আবরণ টানিয়া দিয়াছেন তাহাতে সমাজের বাহ্য দিক্‌টা একটু পবিত্র দেখা যায় মাত্র, ভিতরে কোন

(১)...The women of India, who, in spite of all popular belief to the contrary, have held in the past, and do hold to-day, a great and often dominating influence in the domestic and political life of the country....The women of the East are not so much *en evidence* as those of Europe, but their influence within the legitimate circle of their domestic relations is quite as great, their manners are as good and their morality is as high. They do not try to do everything which men do, and conspicuously fail ; they do not enjoy the delight of seeing their dresses and their looks recorded in the impertinent columns of society newspapers ; they do not rush to the Divorce Court to listen to the unsavoury details of the latest fashionable scandal ; and those who most know the results of this freedom of women in the West, and the history of the richest and most luxurious society which the world has ever seen, may well doubt whether the occidental or the oriental method of treating the fair sex is more in accord with practical wisdom."—Sir Lepel Griffin's Introduction to J. J. Poole's Woman's Influence in the East. প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশাভিজ্ঞ একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদের মত আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠক ইহার সত্যাসত্য বিচার করিবেন।

(২) "The general custom seems to have favoured monogamy either from necessity or from the growth of a refined sentiment. —Fraser's Literary History, Chapter III., p. 31.

উন্নতি হয় না।"(১) যেসব স্থলে স্বামী দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে ক্ষমবান মনু তাহার এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—যদি পত্নী মদ্যপা, অসাধুবৃত্তা, ভর্ত্তার প্রতিকূলাচরণশীলা, কুষ্ঠাদি ব্যাধিগ্রস্তা, ভৃত্যাদি-তাড়নশীলা, সতত অমিতব্যয়কারিণী হয়, অথবা প্রথমা স্ত্রীর ঋতু হইতে আট বৎসরের মধ্যে সন্তান না জন্মিলে, স্ত্রী কেবল কন্যা উৎপাদন করিতে থাকিলে বা মৃতপ্রসবা বা অপ্রিয়ভাষিণী হইলে, পতি পুনরায় অধিবেদন করিবে। যে স্ত্রী রোগিণী অথচ পতির অনুকূলা ও সুশীলা, তাহার অনুমতি লইয়া পতি অন্য বিবাহ করিবে, কদাপি তাহার অবমাননা করিবে না।(২) এই শ্লোক কয়টি হইতে সংহিতাকারের ব্যবহারিক বিষয় বুদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে। বল্লালের কৌলীন্যরীতির বিকৃতির ফলে এদেশে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এবিষয়ে যে কুরীতি দেখা যায় তাহা ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে এবং কালে নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইবে।

বিধবাবিবাহ পুরাকালে প্রচলিত ছিল। "সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন কাল হইতে দিধীষু (বিধবাবিবাহকারীপুরুষ), পরপূর্ব্বা (দ্বিতীয়বার বিবাহকারিণী স্ত্রী), পুনর্ভব (দ্বিতীয় ভর্ত্তার ঔরসজাত পুত্র) প্রভৃতি শব্দের

---

(১) Hindu Law, p. 70. কোন বিখ্যাত পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদের মতে ইউরোপীয় এক পত্নীত্বের নিয়ম হইতে বেশ্যাবৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছে (Karl Pearson's Ethic of Free Thought, p. 373.) ওল্ড টেষ্টেমেণ্টে বহুপত্নীগ্রহণের বিধি ছিল (Dent. XXI, 15) গিডিয়ন, ডেবিড, সলমন, সকলেরই বহুপত্নী ছিল। সম্প্রতি বিলাতে Earl Russelএর যে বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় স্থলবিশেষে বহুবিবাহ করিতে না পারিলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলও প্রসূত হইয়া থাকে। এবিষয়ে কোন বাঁধাবাঁধি আইন না করিয়া সমাজকে স্বাধীনভাবে চলিতে

প্রচলন হইতেই বিধবাবিবাহের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ অনুমিত হয়।"(১) ানুর সময়েও বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, যদিও তিনি উক্ত প্রথার অনুকূল ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।(২) বালিকা বিধবার স্পষ্ট বিবাহবিধি ছিল।(৩) পৌরাণিক যুগের শেষ সময় পর্য্যন্তও (দ্বাদশ শতাব্দী) এই প্রথা নিষিদ্ধ হয় নাই। প্রায় সমুদায় পৌরাণিক ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই বিধবাবিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহিতা নারীর গর্ভজাত সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে নারী পুনরায় বিবাহিত হয়, বালিকা হউক বা না হউক তাহাকে পরপূর্ব্বা বলে।(৪) বিষ্ণু বলেন বালিকা বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে তাহাকে পরপূর্ব্বা বলে এবং তাহার সন্তানগণ বৈধ সন্তানরূপে পরিগণিত হয়।(৫) নারদ (৬) ও পরাশর (৭) বলেন "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎস্থ নারাণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।" আপস্তম্ব (৮) এবং শাঙ্খ্য (৯) ও বিধবা বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ক্রমে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বিধবাবিবাহ লোপ পাইয়াছে। চিরবৈধব্যব্রত সম্বন্ধে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এতদ্বারা স্ত্রীজাতিসম্পর্কে দাম্পত্যবন্ধনের আদর্শ অতি ঊর্দ্ধে স্থাপিত হইয়াছে। হইতে পারে এ আদর্শ ব্যবহারিক জীবনের অনুপযোগী, কিন্তু ইহাদ্বারা সতীত্বের

---

(১) Dr. Rajendra Lal Mitra's Indo-Aryans, Vol. II., Chap. XI.

(২) ৫, ১৫৭, ১৬২ ; ৩, ১৬৬, ১৫৫, ১৮১ ; ৯, ১৬৯, ১৭৫, ১৭৬।

(৩) ৯, ১৭৬।

(৪) ১, ৬৭।

(৫) ১৫, ৭, ৮।

(৬) ১২, ৯৭।

(৭) ৪, ২৭। এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়াই পূজনীয় ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ আইন (১৮৫৬ সালের ১৫ আইন) বিধিবদ্ধ করান।

(৮) ৯, ২৯।

(৯) ১৫, ১৩।

প্রতি সম্মানের ভাবই প্রকাশ পায়।(১) পরাশর বলেন, পতির মরনান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গলাভ করেন। আর একটি কথা এই যে, চিরবৈধব্যপ্রথাদ্বারা প্রাচ্যদেশে যেরূপ অনেক তরুণ বালিকার জীবন প্রেমহীন মরুভূমি সদৃশ হইয়া যায়, সেইরূপ বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকায় পাশ্চাত্য জগতে অনেক রমণীকে চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। বরং প্রথম প্রথাটি দ্বারা প্রত্যেক নারীই একবার বিবাহের সুযোগ পায়, দ্বিতীয় প্রথায় তাহাও হয় না।(২) হিন্দুবিধবাদিগের দুর্দ্দশার কথা সকলেই বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাও যে অনেক পরিমাণে অতিরঞ্জিত, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার উক্তির খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি। "যে প্রকারে হউক ইংরেজদিগের একটি ধারণা হইয়া গিয়াছে যে হিন্দুবিধবা স্বামীর আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে নিতান্ত নিষ্ঠুর ও কঠোর আচরণ প্রাপ্ত হয়। কথাটা সত্য নহে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ স্থলে ঐরূপ হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বলিতে গেলে হিন্দুবিধবাগণ কেবল নিষ্ঠুর ব্যবহার পায় না এমন নহে। প্রত্যুত তাহারা প্রচুর সহানুভূতি পাইয়া থাকে। বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারে বৃদ্ধা বিধবাগণ অনেক সময় পুরুষদিগের উপদেশদাত্রী ও কর্ত্রী। আমরা আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে, আমরা এক প্রাচীনা হিন্দু বিধবাকে জানিতাম, তিনি বহু প্রৌঢ়বয়স্ক পুরুষ র সম্বলিত একটি পরিবারের কর্ত্রী ছিলেন এবং গ্রামের সমুদয় গুরু

(১) বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক স্বয়ং পুরুষ ও নারীর উচ্ছৃঙ্খল পুনঃ পরিণয় কঠোর একনিষ্ঠতার সমান বিরুদ্ধে। বিশেষ বিশেষ স্থলে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের পুনরায় বিবাহের অধিকার থাকা উচিত, তাঁহার এই মত। এস্থলে লেখকে চিরবৈধব্যের পক্ষীয় যুক্তিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহারা উহাকে এক দেশ দর্শি ও নারীজাতিকে হেয়জ্ঞানের পরিচায়কস্বরূপ মনে করেন, তাঁহাদের ভ্রম প্রদর্শন।

(২) ইউরোপে গড়ে শতকরা বিংশটি নারীকে চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিতে (Karl Pearson's Ethic of Free Thought, p. 373)।

বিবাদে তিনি মধ্যস্থতা করিতেন ও তাঁহার বিচার অত্যন্ত সম্মানের সহিত গৃহীত হইত। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। বুদ্ধিমতী সচ্চরিত্রা বৃদ্ধা বিধবাগণ তাঁহাদের বহুদর্শিতার প্রভাবে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক পুরুষদিগের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। বিধবাদিগের আহারাদির কঠোরতা সম্পর্কেও অনেক অতিরঞ্জন হয়।”(১)

সতীদাহ ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক নিবারিত হয়, সুতরাং বিষয়টী এখন কেবল ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়ীভূত। বৈদিক সময়ে এই প্রথা প্রচলিত ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। ঋগ্বেদের যে সূক্তের উপর নির্ভর করিয়া ঐ প্রথা প্রথম প্রচলিত হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিত মাত্রই তাহার ভুল অর্থ করা হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।(২) অনার্য্য শকদিগের মধ্যে ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং রাজপুতগণ তাহাদের সংঘর্ষে আসিয়া প্রথম উহা গ্রহণ করে। কাশ্মীরের রাজ-তরঙ্গিণী এবং পৌরাণিক ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সহমৃতা রমণীগণের সতীত্বের প্রতি পুরাণকারদিগের কতখানি শ্রদ্ধা ছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে প্রকাশ পায়। “ব্যালগ্রাহী যেরূপ গর্ত্ত হইতে সর্পকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনে, তেমনি সহমৃতা নারী মৃত-পতিকে উদ্ধার করিয়া তৎসহ স্বর্গভোগ করেন।”(৩) মুদ্রারাক্ষস নাটকের ‌একটী দৃশ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে অনেক রমণী ভর্ত্তৃবিরহ সহ্য করিতে ‌ক্ষম হইয়া স্বেচ্ছায় স্বামীসহ চিতানলে প্রবেশ করিতেন।(৪) ‌তীদাহের প্রথম অভ্যুদয়কালে জীবনে মরণে স্বামীর সঙ্গিনী হওয়া ‌রূপ একটি মহৎ আদর্শ যে তাহাতে বর্ত্তমান ছিল, একথা অনুমান

(১) Bengal Peasant Life, p. 133.
(২) ৯, ১৮, ৭।
(৩) ৪, ৩০।
(৪) অদ্যাপি কদাচিৎ সংবাদপত্রে এরূপ দু একটি ঘটনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। পরিশেষে অবশ্য অনেক কুসংস্কারও নৃশংসতা জড়িত হইয়া উহা একটি ঘোরতর পাপানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং উহা নিষিদ্ধ করিয়া গবর্মেণ্ট আমাদের বিশেষ ধন্যবাদেরই পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু এই প্রথার অস্তিত্ব হইতে হিন্দু-দিগের নারীমর্য্যাদার অভাব প্রমাণ করিতে যাওয়ার পূর্ব্বে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন জগতের সমগ্র সভ্যজাতির প্রথম অবস্থায় মানববলি প্রথা বর্ত্তমান ছিল; আসিরীয়, মিশরীয়, কার্থেজীয়, গ্রীক, রোমান, টিউটন, ফ্রাঙ্ক, মঙ্গোলীয়, মেক্সিকান্, পেরুভীয়, কেহই এই বর্ব্বর প্রথা হইতে বিমুক্ত ছিলেন না।(১) এবং ইহাও বিবেচ্য সুসভ্য শিভাল্‌রিক ইউরোপীয় জাতিসমূহ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও সহস্র সহস্র রমণীকে ডাইনী অভিযোগে ঘোরতর লোমহর্ষণ নিষ্ঠুরতার সহিত অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়াছেন।(২)

---

(১) Indo-Aryans, Vol. II, Chap. X.

(২) এবিষয়ে যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা Buckle's History of Civilisation, Vol. I., p. 364 note ও Lecky's Rise of Rationalism in Europe, Vol. I., Chap. I. দেখিবেন। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসংস্থাপক লুথার বলিতেন—"আমি বিচারক হইলে ডাইনীদিগের প্রতি কোন প্রকার দয়া প্রকাশ করিতাম না, তাহাদের সকলকে দাহ করিতাম।" বেকন, স্যার ম্যাথু হেল, স্যার টমাস্ ব্রাউন, বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক জন ওয়েস্‌লী প্রভৃতি ইংরেজগণ ইহাতে বিশ্বাস করিতেন। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে ফ্রান্সে Tarbes নগরে একটি ডাইনী হত্যা হয়। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দের ২৪ সেপ্টেম্বরের টাইমস্ পত্রে এসেক্স্ প্রদেশে একটি ডাইনী হত্যার বিবরণ আছে। কিরূপ অমানুষিক নৃশংসতার সহিত ডাইনী অপবাদযুক্তা রমনী-দিগকে দাহ করা হইত, তাহা জানিতে চাহিলে Lecky's Rationalismএর প্রথম খণ্ডের ১০৫ পৃষ্ঠার নোট ও ১২৯-৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। লেকি বলেন, "Tens of thousands of victims perished by the most agonising and protracted torments, without exciting the faintest compassion." (Vol. I., page 2.)

প্রাচীন রাজপুতদিগের জহরব্রত সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা আবশ্যক। বিজেতা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অপমান হইতে আত্মরক্ষার ইচ্ছা হইতেই ঐ প্রথার অভ্যুদয় হইয়াছিল। পামর আলাদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিলে ভীমসিংহের পত্নী সহচরী পরিবৃত হইয়া এই ঘোরতর ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া সতীত্বধর্ম্ম ও স্ত্রীজাতির গৌরব উজ্জ্বলতর করিয়াছিলেন। রোমান ইতিহাসে ভার্জ্জিনিয়স্ যে মহৎউদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া স্বীয় দুহিতার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন, রাজপুত বীরগণও তাদৃশ উদ্দেশ্যেই জহরব্রতের অনুমোদন করিতেন। এখন নৃশংস বিবেচিত হইলেও ইহাতে শিভালরিক ভাবের তীব্রতা ও উৎকট নারীমর্য্যাদাজ্ঞানই লক্ষিত হয়, তাহার অভাব নহে। যে কারণ হইতে উহার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা বিলোপের সহিত উক্ত প্রথাও লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আর একটি ক্রূর প্রথাদ্বারা বর্ত্তমানে উহার স্থান অধিকৃত হইয়াছে। আধুনিক রাজপুতদিগের মধ্যে বালিকাহত্যা সেই একই কারণ—অত্যধিক নারীমর্য্যাদাজ্ঞান হইতে উদ্ভূত। সমান ঘরে কন্যা বিবাহ দিতে না পারিলে রাজপুতমাত্রই ঘোরতর অপমান বোধ করে, এবং তাহাদের কৌলীন্যরীতি এত সূক্ষ্ম যে সহজে তুল্যঘর মিলিয়া উঠেনা, সুতরাং রাজপুত পিতা অসমান বিবাহরূপ অবমাননা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অহিফেন প্রয়োগে শিশুকালেই কন্যার মৃত্যুবিধান করে। এবিষয়ে কর্ণেল টড্ বলেন "যে উদ্দেশ্যে ইউরোপ নারীদিগের জন্য মঠে ভরিয়া গিয়াছিল, যথায় সুন্দরী যুবতীগণ আমরণ আবদ্ধ থাকিত, সেই উদ্দেশ্য দ্বারাই রাজপুত বালিকাবধে প্রথম প্রণোদিত হয়। এবং শেষোক্ত প্রথা যতই ভয়াবহ হউক, মঠে অবরোধের তুলনায় উহাকে নিতান্ত সদয় ব্যবহার বলিতে হইবে।"(১)

(১) Rajasthan, Mewar, XXIV.

স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল প্রবচন প্রচলিত আছে, তাহা হইতে কেহ কেহ তাহাদের শিভাল্‌রির অভাব অনুমান করেন। কিন্তু ইহা সহজেই বোধগম্য যে এসকল প্রবচন একদর্শী, এবং তাহাদের অনুরূপ পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই প্রচলিত আছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের অধীন, (নৈতিক হিসাবে নহে, ব্যবহারিক হিসাবে) ইহা তাহারই পরিচয় দেয় মাত্র।(১) যদি তাহাদের পুরুষদের ন্যায় স্বাধীনতা থাকিত, তাহা হইলে তাহারাও পুরুষদিগের বিরুদ্ধে এরূপ অনেক শ্লোক রচনা করিত সন্দেহ নাই। স্থানাভাব বশতঃ আমরা পাদটীকায় এরূপ কয়েকটি মাত্র বৈদেশিক প্রবচন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।(২)

---

(১) হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন গার্হস্থ্যজীবনে এ অধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে চিরকালই থাকবে। "In respect of domestic power the relative position of women will doubtless rise, but it seems improbable that absolute equality with men will be reached."—Herbert Spencer's Principles of Sociology, Vol., I., p. 791.

(২) ইংরেজী প্রবচন :—'The love of a woman and a bottle of wine. Are sweet for a season and last for a time.' 'A dog, a wcman and a walunt tree. The more you beat them the better they be.' 'There's no mischief in the world done. But a woman is always one.' 'Women's Jars. Breed men's wars'. 'He that tells his wife news is but newly married.' 'A woman's mind and winter wind often change.' 'Swine, women and bees cannot be turned.' 'One tongue is enough for a woman.' 'Women, priests and poultry never have enough.' 'A woman is to be from house three times, when she is christened, married and buried' 'Women in mischief are wiser than men.' ফরাসী প্রবচন :—'A man of straw is worth a woman of gold.' ইহুদী প্রবচন —'When an ass climbs a ladder, we may find wisdom in women.' চসারের Oxford Clerk's Taleএ গ্রীসেলডা ও সেক্সপিয়রের ডেস্‌ডিমোনা ও ইমোজেন প্রভৃতির কাহিনী আলোচনা করিলে বুঝা যায় ইংলণ্ডে পুরাকালে স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের ক্ষমতা কিরূপ অপ্রতিহত ছিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই, আমরা এই প্রবন্ধে এরূপ প্রমাণিত করিতে চাহি না যে হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত, ঠিক তদ্রূপই আছে, এবং হিন্দুগণ সর্ব্বতোভাবে নারীজাতিকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া থাকে। হয়ত পূর্ব্বকালে করিত, এখন নিশ্চয়ই করে না। যদি এখনও করিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে এরূপ অধঃপতিত হইতে হইত না, কারণ মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা অন্যরূপ শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করিত। বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে হিন্দুদিগের বর্ত্তমান সংস্কারগুলির বহুল সংশোধন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য, আমরা রমণীজাতির সম্মান করিতে কখনও জানি নাই বা এখনও জানি না—যে সকল স্বদেশী বিদেশী লেখক, বক্তা ও সংস্কারক এরূপ কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভ্রম প্রদর্শন করা। আত্ম-সম্মান বোধ না থাকিলে কোন বিষয়ে উন্নতিলাভে উৎসাহ থাকে না। যদি আমরা তাদৃশ বক্তা, লেখক এবং সংস্কারকদের কথায় সম্পূর্ণ প্রত্যয় করি, তাহা হইলে আমাদের নিজেদের উপর এতদূর অশ্রদ্ধা জন্মিবে যে তাহাতে করিয়া উন্নতির ব্যাঘাত ছাড়া স্থবিধা ঘটিবে না। প্রকৃত সত্য অবগত হইয়া হিন্দুরমণীকে সমাজে তাহার ন্যায্যস্থান প্রদানে আমরা সকলে বদ্ধপরিকর হই, এই শুভ ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লিখিয়াছি। ভরসা করি ইহা পড়িয়া পাঠক স্বীকার করিবেন the Devil is not as black as he is painted.

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুন্দরী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কান্তিচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর নাম শ্রীমতী কমলা দেবী। তাঁহার পিতা ৺নিধিরাম ভট্টাচার্য্য অতি ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। দশ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার উইলের বলে কমলা দেবী পৈত্রিক বিষয় হইতে যাবজ্জীবনের জন্য মাসিক দুই শত টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর কমলা দেবীর ভ্রাতারা বিষয় লইয়া পরস্পরের মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিল, সে সময় যদি কান্তিচন্দ্র মধ্যে পড়িয়া বিচক্ষণতার সহিত সমস্ত মিটমাট করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে বিষয় এতদিন ছারখার হইয়া যাইত তাহার সন্দেহ নাই।

কমলা দেবীর বয়ঃক্রম এখন চত্বারিংশৎ বর্ষ। পূর্ব্বে সুন্দরী বলিয়া তাঁহার বেশ খ্যাতি ছিল। সকলে বলিত,—কমলা ত সাক্ষাৎ কমলা, নাম সার্থক হইয়াছে। সে সৌন্দর্য্যের চিহ্ন এখনও তাঁহার অবয়বে বিদ্যমান ;—এখনও যদি তিনি স্থূল হইতে নিরস্ত হইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইতে মনোযোগী হন তবে এখনও কিছু বৎসরের জন্য তাঁহার সৌন্দর্য্য-খ্যাতি অটুট থাকে। তাঁহার চক্ষুর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। সে বৃহৎ টানা চক্ষু এখন অপেক্ষাকৃত ছোট হইয়া পড়িয়াছে। অলঙ্কারগুলি অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গড়াইতে হইয়াছে।

বিবাহের বৎসর খানেক পরে কমলা দেবীর একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেটি তিন বৎসরের হইয়া মারা যায়। তাহার পর পাঁচ বৎসর আর সন্তান সন্ততি হইল না। পরিবারস্থা প্রবীণারা চিন্তিত হইয়া পড়িলে[illegible] অনেক সাধুসন্ন্যাসীর ঔষধ ধারণ [illegible]

পূজা মানিয়া, নবগোপাল হইল। সেইজন্য নবগোপালের অপরিমিত আদর। নবগোপালের পর আর দুইটি কন্যা হইয়াছে,—তাহাদিগকে মানুষ করিতেছেন কমলা দেবীর বিধবা ননদ ;—স্বয়ং তিনি নবগোপালকে লইয়াই ব্যস্ত।

বেলা নয়টা বাজিয়াছে। পূজার দালানে কমলা দেবী পূজা করিতে বসিয়াছেন। আসলে ইহা একটি কক্ষ, কিন্তু ইহার নাম হইয়া গিয়াছে 'পূজার দালান'। এটি অন্তঃপুরস্থিত নিভৃত পূজার স্থান। গৃহদেবতা এখানে থাকেন না ; তাঁহার মন্দির অন্তঃপুরের বাহিরে। বেতনভুক্ পূজারী মহাশয়েরা সেখানে মহা আড়ম্বরের সহিত তাঁহার প্রাত্যহিক পূজা ও আরতি প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া থাকেন।—দালান না হইলেও কক্ষটি প্রশস্ত। কান্তিচন্দ্রের ধনবত্তার স্বর্ণচ্ছটা এ কক্ষেও বিকীর্ণ। মেঝেটি শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে বাঁধা। কক্ষটির অধিকাংশ স্থলই খালি। পূজার আয়োজন একটি কোণে। মেহগ্নিকাষ্ঠের গাত্রে হস্তিদন্তের কায করা একখানি বৃহৎ চৌকি। তাহার উপর রৌপ্য নির্ম্মিত একটি সিংহাসনের মধ্যস্থল কিংখাপে আবৃত, তাহার উপর রাম সীতার স্বর্ণমূর্ত্তি। তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশে ছোট দুইটি কিংখাপের উপাধান, তাহার ঝালর মুক্তামণ্ডিত। সিংহাসনের নিম্নে, চৌকিটির আশেপাশে আরও নানাবিধ পূজা সংক্রান্ত দ্রব্যাদি সাজান। দুইটি শঙ্খ,—একটি ছোট,—একটি বড় ;—কয়েক খণ্ড শ্বেত ও রক্ত চন্দন কাষ্ঠ, দুইদিকে চামর, ইত্যাদি। এক স্থানে উপর্য্যুপরি কয়েকখানি পুস্তক রহিয়াছে। সিন্দুরে ও চন্দনে তাহার বহির্ভাগ প্রায় আবৃত বলিলেই হয়। কয়েক খণ্ড "হিন্দুসৎকর্ম্ম মালা," একখানি "বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি," এক খানি "গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা," একখানি "শিশুবোধক"। পাঠকের কৌতুহল হইতে পারে, এ বিজ্ঞসভায় "শিশুবোধক" তাহার ধারাপাত [illegible] শ্লোক লইয়া কি করিতেছে!—কি করিতেছে তাহা

বলিতেছি। এই শিশুবোধকে "বন্দমাতা সুরধুনি পুরাণে মহিমা শুনি" ইত্যাদি যে গঙ্গাস্তোত্রটি আছে তাহা অন্য কোনও পুস্তকে পাওয়া যায় না ;—তাই শিশুবোধক ওখানে স্থান পাইয়াছে।

একখানি মসৃণ মৃগচর্ম্মের উপর কমলাদেবী আসীনা। সম্মুখে গঙ্গাজলভরা কোষাকুষি,—দুইটী চন্দনপাত্র, একখানি বৃহৎ রূপার থালায় রাশিকৃত ফুল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেকাবীতে বিবিধ নৈবেদ্য উপকরণ। মধু ভরা একটি মধুপর্কের বাটী। একটি সোণার প্রদীপে ঘৃতসিক্ত পলিতাটি মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। ধূপ ও ধূনার ধূম অল্প অল্প উদ্গত হইতেছে। কক্ষখানি সৌগন্ধে আমোদিত ;—চাঁপাফুলের গন্ধটাই সকল গন্ধকে অতিক্রম করিয়া আত্মবিস্তার করিয়াছে।

কমলাদেবীর পরিধানে একখানি গরদের শাড়ী। তাহার চওড়া লাল পাড় তাঁহার গলা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ভিজা চুলগুলি পিঠের কাপড়ের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, চুলের প্রান্তভাগে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থি বাঁধা, কারণ একেবারে খোলা চুলে পূজাদি করিতে নাই। তাঁহার গলায় চিক, উপর হাতে জসম ও নীচে হাতে চুড়ি। অপর কোনও অলঙ্কার এখন দেখা যাইতেছে না।

অধিকাংশ পূজাই কমলাদেবীর শেষ হইয়াছে—এখনও শিবপূজা বাকী। আর বুঝি আদ্যাস্তোত্র, নবগ্রহের প্রণাম এবং শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নামও বাকী। শিবপূজার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় কক্ষান্তর হইতে তাঁহার পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন।

"মা—মা।"

বলিলেন—"কেন বাবা ?"

"মা তুমি কোথা ?"

"এই যে বাবা, পূজোর দালানে রয়েছি।"

এই কথার সঙ্গে-সঙ্গে নবগোপাল মুক্ত দ্বারপথে উপস্থিত হইল।

কক্ষ মধ্যে পদক্ষেপ করিবামাত্র আবার ত্রস্তভাবে বাহির হইয়া গেল,—পাদুকা মোচন করিয়া নগ্নপদে প্রবেশ করিল।

নবগোপালের বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ। সুন্দর সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ। চুলগুলি একটু বড়,—অযত্নের সহিত মস্তকে বিন্যস্ত। তাহার বক্ষদেশ এখন নগ্ন,—সূক্ষ্ম শুভ্র যজ্ঞোপবীতটি গৌরবর্ণ দেহের উপর বেশ মানাইতেছে। চক্ষু দুইটি পুলকোজ্জ্বল।

সে আসিয়া একখানা আসন টানিয়া লইয়া মার কাছটিতে উপবেশন করিল। বসিয়াই বলিল—"মা, তোমায় ছুঁই ?"

মা বলিলেন—"না, ছুঁস্‌নে। তোর বাসি কাপড়। আমার সব পূজো শেষ হয়নি এখনও।"

সে বলিল—"না তোমায় ছুঁয়ে দিই।" বলিয়া দুইটি হস্ত প্রসারণ করিয়া জননীর অঙ্গের অতি নিকটে লইয়া গেল।

কমলাদেবী আসনে সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন—"ফের্—দুষ্টুমি করিস্ কেন ? যদি ছুঁতে হয় ত যা চেলির কাপড় পরে আয়।"

নবগোপাল বলিল—"আচ্ছা।" বলিয়া উঠিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরেই একখানি ময়ূরকণ্ঠী চেলি পড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আসনে বসিয়া বলিল—"এইবার তবে ছুঁই ?"

মা বলিলেন—"দাঁড়া দাঁড়া গঙ্গাজলে হাতটা ধুয়ে ফেল আগে। কিসের হাত তার ঠিকানা নেই !"

নবগোপাল হাত পাতিল। মা কুষিতে করিয়া একটু গঙ্গাজল লইয়া তাহার হাতে দিলেন। একটু জল অঙ্গুলিতে লইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিলেন,—শীতল জল কণা গাত্রে পড়ায় নবগোপাল শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিল। মা বলিলেন—"বল্ গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা।"

নবগোপাল বলিল—"গঙ্গা গঙ্গা।"

"তিনবার বল,—গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা।"

নবগোপাল বলিল—"গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে দুই হস্ত দিয়া জননীর গাত্র স্পর্শ করিল।

কমলাদেবী স্নেহভরে তাহার কপালে হাত দিলেন। চুলগুলি ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিলেন—

"সন্ধে করাটা কি একেবারে ছেড়ে দিলি ?"

নবগোপাল বলিল—"যিনি 'সকাল' করেছেন তিনিই 'সন্ধে' করবেন, আমি সন্ধে করবার কে মা ?"

মা বলিলেন—"আহা মরে যাই ! খালি বচন শিখেছিস্ বৈ ত নয় ! যখন নতুন নতুন পৈতে হল তখন ছেলের সন্ধে করার ঘটা দেখে কে ! শুধু সন্ধে ! নারায়ণ পূজো, শিবপূজো, কত কি। এক বছর যেতে না যেতেই সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

নবগোপাল ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"এক বছর করেছি আবার কি মা ?"

"এক বছর করলেই হল বুঝি ! ব্রাহ্মণের ছেলেকে রোজ সন্ধে করতে হয়।"

নবগোপাল বলিল—"দেখ মা, রোজ রোজ সন্ধে করার এখন আর কোনও অর্থ নেই। সেকালে যখন লেখার সৃষ্টি হয়নি, বেদ, পুরাণ, মন্ত্র, তন্ত্র ব্রাহ্মণের মুখে মুখে বাস করত, তখন মুনিঋষিরা রোজ রোজ সন্ধ্যাবন্দনা আবৃত্তি করতেন, তার একমাত্র কারণ পাছে ভুলে যান। এখন ছাপার বই হয়েছে—ছাপায় সন্ধে আগাগোড়া লেখা রয়েছে, ভুলে গেলে কোনও ক্ষতি নেই, এখন রোজ দুবেলা সন্ধ্যা করা বৃথা সময় নষ্ট।"

মা বলিলেন—"যা যা মিছে বকিস্‌নে। ভারি জ্যাঠা হয়েছিস্। নিয়মিত সন্ধে আহ্নিক করলে শরীর ভাল থাকে তা জানিস্ !"

শুনিয়া নবগোপাল হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—"মা, শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, খনির তিমির গর্ভে, এ বিশালাক্ষী গ্রামেও এসে পৌঁছেছে? আমি ভাবতাম বুঝি সহর অঞ্চলেই এর প্রাদুর্ভাব।"

মা বলিলেন—"ধর্ম্মকর্ম্মে যার মন থাকে, নিষ্ঠা থাকে, তার স্বাস্থ্য ভাল থাকে; তার আবার সহর পাড়াগাঁ কি? শাস্ত্র সব জায়গাতেই শাস্ত্র।"

জানালা দিয়া একটু একটু বাতাস আসিতেছিল। সেই বাতাসে কক্ষমধ্যস্থিত বেলোয়ারি ঝাড়টি একটু একটু দুলিতেছিল। পরকলগুলি পরস্পরে ঠেকিয়া টুন টুন করিয়া মৃদু শব্দ উত্থিত হইতেছিল। নবগোপাল সেই দোদুল্যমান ঝাড়ের পানে দৃষ্টি করিয়া একটু ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা মা, ইস্কুলের পণ্ডিত হারু চক্রবর্ত্তীর কি খুব নিষ্ঠা?"

মা উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—"নিষ্ঠা নয়? তিন বেলা সন্ধ্যা আহ্নিক না করে ব্রাহ্মণ জলগ্রহণ করেন না।"

মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া, ঈষৎ হাসিতে হাসিতে, নবগোপাল বলিল—"আচ্ছা,—তবে কেন ওঁর মাসে একবার করে কম্প দিয়ে জ্বর হয়?"

মা বলিলেন—"জ্বর হয়,—ম্যালেরিয়া জ্বর, তা কি করবে মানুষ?"

নবগোপাল হাইকোর্টে গিয়া উকীলগণের বক্তৃতা শুনিয়াছিল। কৃত্রিম রোষ সহকারে সজোরে আসন চাপড়াইয়া বলিল—"ম্যালেরিয়া জ্বর কি ডেঙ্গো জ্বর তা নিয়ে ত কথা হচ্চে না! জ্বর হয় কেন? তিবেলা সন্ধ্যা আহ্নিক করলে যদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে বলছ, তবে হারাধন চক্রবর্ত্তীর মাসে একবার করে জ্বর হয় কেন?"

কমলাদেবী নীরবে চন্দন ঘষিতে লাগিলেন।

"জবাব দাও না মা,—জ্বর হয় কেন?"

মা রাগিয়া বলিলেন—"জ্বর হয় কেন যা হারু চক্রবর্ত্তীকে জিজ্ঞাসা করগে।"

নবগোপাল তখন বিজয়ীর মত মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিল। একটু পরে বলিল—"আচ্ছা মা, আমার জ্বর হয়?"

মা চন্দন ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন—"যা যা, বেশী চালাকী করতে হবে নাক। ভারি শক্ত শরীর কি না! ঠেলা মারলে পড়ে যান তালপাতার সেপাই।"

নবগোপাল বলিল—"মা, পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে সত্যের অপলাপ করো না। এই পরশু জঙ্গলে দুটো বুনো শূয়োর মেরে এসেছি।"

মা বলিলেন—"বড় কাজ করেছিস্!"

"আমি সন্ধে করি? আহ্নিক করি?—দেখ, প্রমাণ হয়ে গেল, সন্ধে আহ্নিক করলেই জ্বর টর হয়,—না করলেই শরীর থাকে ভাল। ঠকে গেলে মা, ঠকে গেলে।"

মা বলিলেন—"যা যা।" বলিয়া জোরে জোরে চন্দন ঘষিতে আরম্ভ করিলেন।

নবগোপাল দেখিল মা একটু চটিয়াছেন। বলিল—"আচ্ছা মা, জবাব ত দিতে পারলে না। আমি যদি হতাম তবে কি জবাব দিতাম জান?"

"কি জবাব দিতিস্?"

"আমি হলে বল্‌তাম—"লোকে যে দুঃখ পায় কিম্বা সুখভোগ করে, তা সব সময় কি নিজের কর্ম্মফল অনুসারে করে? তা নয়। অনেকে বাপমার পুণ্যে তরে যায়, আবার অনেক পুণ্যাত্মা লোক বাপমার পাপে ঘন ঘন জ্বরাক্রান্ত হয়,—কুইনিন খেয়ে মরে।"

কমলাদেবী পুত্রের তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া খুসী হইলেন। বলিলেন—"আমি ত আর তোর মত কলেজে মাইনে দিয়ে লেখাপড়া শিখিনি!" বলিয়া কমলাদেবী পুত্রের পানে চাহিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এতক্ষণে কমলাদেবীর শিবপূজার আয়োজন শেষ হইল। তিনি এবার পূজায় মনোনিবেশ করিলেন। নবগোপাল বসিয়া পূজা দেখিতে লাগিল এবং ধুনাচিতে ক্রমাগত ধুনা নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

মা শিবের ধ্যান আরম্ভ করিয়া বলিলেন—"ধ্যায়ে নিত্যং মহেশং—"

নবগোপাল বলিল—"উঁহু। ধ্যায়েনি ত্যং নয়,—ধ্যায়েন্নিত্যং,—ধ্যায়েৎ ছিল নিত্যং ধ্যায়েন্নিত্যং।"

মা বলিলেন—"ধ্যায়েন্নিত্যং—আচ্ছা।—ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রবতনাশং"—

নবগোপাল বলিল—"ওগো না না 'বতনাশং' নয়; চারুচন্দ্রাবতংসং অর্থাৎ চারুচন্দ্র হয়েছে অবতংস কি না অলঙ্কার যাঁর।"

"বতংসং? আচ্ছা। চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নকল্প জলং ঘং—"

নবগোপাল হাসিয়া উঠিল। বলিল—"বিলকুল ভুল বলছ। জলং ঘং কি আবার? হা হা।"

"কি তবে?"

"রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং,—তাঁর অঙ্গ কি রকম উজ্জ্বল?—না রত্নকল্প—কি না রত্নের মত।"

"কি বল্লি?"

"রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং।"

মা বলিলেন—"অত আমার উচ্চারণ হয় না বাছা! আমরা মেয়ে মানুষ অত কি জানি! যা চিরকাল বলে আসছি, তাই বলব,—দিক করিস্ নে।"

নবগোপাল যখন বাড়ীতে থাকে, তখন মাঝে মাঝে পূজার সময় মার কাছে আসিয়া এইরূপ বসে; স্তবস্তোত্রাদির আবৃত্তিকালে মার সংস্কৃতে ভুল ধরা তাহার এসময় একটা প্রধান আমোদ। মা রাগ করেন

দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ নিবৃত্ত রহিল,—আবার দুই একটা স্থান সংশোধন না করিয়াও থাকিতে পারিল না। কমলাদেবী মুখে যাহাই বলুন, তাঁহার মাতৃহৃদয় পুত্রের অসামান্য পাণ্ডিত্য দর্শনে স্ফীত হইয়া উঠিল।

মার পূজা ও স্তবাদি শেষ হইলে নবগোপাল বলিল—"দেখ মা, আমায় কিছু টাকা দিতে পার ?"

"কেন, কি করবি টাকা ?"

"পাখী পুষব। পাখী পোষার ভারি ইচ্ছে।"

পূজার দ্রব্যগুলি সম্মুখ হইতে সরাইতে সারাইতে কমলা দেবী বলিলেন—"তা নিস্। ক টাকা চাই ?"

"তা এখন জানিনে। যত টাকা লাগে তত টাকা তুমি দেবে ত।?"

"পাখী পুষতে আর কত টাকাই লাগবে ? না হয় দশ টাকা না হয় কুড়ি টাকা। তা নিস্ এখন।"

"আচ্ছা—তিন সত্যি কর। দেবে—দেবে—দেবে ?"

মা হাসিয়া বলিলেন—"কথায় কথায় 'তিন সত্যি কর'—বলছি দেব,—আবার তিন সত্যি করব কি জন্যে ?"

তখন নবগোপাল গাত্র ঝাড়িয়া উচ্চ হইয়া বসিল। বলিল—"মা, বলেছ দেব,—শেষে আর বলতে পারবে না, যে না দেব না। আমি কি রকম পাখী পুষব জান ? ভেবেছ বোধ হয় দুটো কি চারটে টিয়ে কি ময়না পাখী পুষব সাধারণ শিকের খাঁচায় করে ?"

"তা নয় ত আর কি ?"

"ত হলে দশটাকাতেই হয়ে যেত। তা নয় মা, তা নয়। আমার মৎলব শোন যদি ত একবারে অবাক্ হয়ে যাও।"

এই সময় একজন ঝি আসিয়া বলিল—"দাদা বাবু, আপনার জল-খাবার দেওয়া হয়েছে।" বলিয়া ঝি প্রস্থান করিল।

কমলাদেবী বলিলেন—"কি মৎলব বলনা শুনি।"

নবগোপাল আরম্ভ করিল—"আমি, দুটো চারটে নয়, অনেক পাখী পুষব। আর, তাদের সাধারণ খাঁচায় পুরে ঝুলিয়ে রাখব না! খাঁচায় পাখীদের ভারি কষ্ট হয়। প্রথমতঃ, উড়তে পায় না, পাখা বদ্ধ হয়ে যায়, পাখীদের একটা যা প্রধান আমোদ, তাই থেকে বঞ্চিত থাকে। দ্বিতীয়তঃ, একটা খাঁচায় একটা পাখী রাখা ভারি অন্যায়। একলাটি থাকে—ভারি কষ্ট হয়। সেই জন্যে মনে করেছি, বড় বড় খাঁচায় এক রকমের অনেকগুলো পাখী রাখব। খাঁচা এত বড় হবে যে পাখীরা স্বচ্ছন্দে তার মধ্যে উড়ে উড়ে বেড়াতে পারবে। এক একটা খাঁচা অন্ততঃ এই ঘরের মত বড় হবে।"

মা বলিলেন—"দূর পাগল! ঘরের মত খাঁচা হয়? এমন ত কখন শুনিও নি। এত বড় খাঁচা টাঙ্গাবি কোথা?"

"টাঙ্গাব কোথা সে তখন দেখতে পাবে। তার মধ্যে সব গাছ পালা থাকবে। বেশী উঁচু গাছ নয়।—ভাল ভাল সব ফলের গাছ থাকবে, পাখীরা কতকটা মনে করতে পারবে যে স্বাধীনভাবেই রয়েছি।"

"তার মধ্যে দু চারটে নদী থাকবে না? পাখী জল খাবে কিসে?" বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

নবগোপাল বলিল—"মা তুমি হেসনা। যখন সব হবে তখন দেখতে পাবে। খাঁচা কি রকম হবে বলি শোন। তারের জাল আর কি। বাগানে যেখানে ফলের গাছ আছে, এমন একটা একটা জায়গা থেকে সেই তারের জাল ঘিরে ঘিরে খাঁচা তৈরি করাব। বুঝতে পারলে? খাঁচার মেঝেটা হবে মাটী। চারিদিকে খুঁটি পুঁতে পুঁতে তারের জাল দিয়ে ঘিরব। ছাদও হবে তারের জালের। রৌদ্র, বৃষ্টি সব অবাধে আসতে পারবে। এই রকম এক একটা ঘরে এক এক জাতীয় পাখী থাকবে।"

মা বলিলেন—"দূর পাগল! চিড়িয়া খানা করবি না কি? অত

টাকা কোথা পাব ? কুড়ি টাকা কি বড় জোর ত্রিশ টাকা দিতে পারি। তাতেই যা হয় তাই করিস্।"

"ত্রিশ টাকায় কখন হয় ? ত্রিশ টাকায় যদি হত তাহলে তোমার কাছে চাইতে আসব কেন ? হাজার টাকার কমে হবে না।"

মা বলিলেন—"ও মা ! হাজার টাকা ? হাজার টাকা খরচ করে কেউ পাখী পোষে তা-ত কখন শুনিও নি। সে হবে টবে না।"

নবগোপাল বলিল—"বাঃ, সে আমি শুনব না। তুমি বলেছ তোমায় দিতে হবে।"

মা বলিলেন—"যখন বলেছিলাম তখন কি জানি যে এত কারখানা করবি ? পাখী পোষে মানুষ দুটো খাঁচায় করে দুটো পাখী পোষে, তাই জানি। তোর এমন আজগুবি ফন্দী তা আমি কি করে জানব ?"

নবগোপাল রাগ করিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতে আদর দিয়া দিয়া কমলা দেবী তাহার পরকালটি নষ্ট করিয়াছেন। সে যখন যাহা আবদার করিয়াছে তখন তাহাই পূর্ণ করিয়াছেন। কমলা দেবী ধনবানের কন্যা, ধনবানের গৃহিণী, অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া পুত্রের সমস্ত খেয়াল পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। এখন সে শুনিবে কেন ?

নবগোপালের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তখন তাহার মাতা একটু নরম হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা, এক কায কর না, তাহলে ত বেশ হবে। তোমার খাঁচা আরও খানিক বড় কর। তারের জালের না হয়ে, আকাশ তার ছাদ হোক। তার দেওয়ালও হোক হাওয়ার। বাগানে যে সব পাখী রয়েছে—টিয়া, শালিক, দোয়েল, উকু, কোকিল, বউকথা কও,—মন কর না কেন সব পাখীই তোমার।" বলিয়া মা পুত্রের চিবুকে স্নেহে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন।

নবগোপালের দৃষ্টি অবনত। সে উত্তর করিল না। এই কথায়, তাহার চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

মা তখন বলিলেন—"ওমা, ওমা,—দেখ একবার। চোখের জল ফেলতে লাগলি, পাগল ছেলে! এমন অবুঝ তুই!" বলিয়া আদর করিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিলেন।

শেষে রফা হইল পাঁচ শত টাকার।

তখন আবার নবগোপালের মুখে হাসি ফিরিয়া আসিল। উৎসাহ সহকারে বলিল—"দেখ মা,—আমি যে পাখীকে পুষব, তাদের যাবজ্জীবনের জন্যে যে বদ্ধ রাখব তা ভেব না। তাদের ছানা হবে, ছানারা বড় হলে বুড়ো পাখীদের ছেড়ে দেব।"

মা বলিলেন—"বুড়ো পাখী ছানা ফেলে কি যেতে চাইবে? আমাকে কেউ যদি বলে, তোকে ফেলে কোথাও যেতে, আমি কি যেতে পারি?"

নবগোপাল স্নেহভরে মার মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিল। মার মুখখানি করুণায় অভিষিক্ত।

ঝি তখন আবার আসিয়া বলিল—"দাদা বাবু, আপনার জলখাবার অনেকক্ষণ দিয়েছে—শুকিয়ে যাচ্ছে।" বলিয়া সে প্রস্থান করিতেছিল।

নবগোপাল বলিল—"মারও জল খাবার আমার ঘরে দিতে বল।"

ঝি গৃহিণীর মুখ পানে চাহিল। গৃহিণী সম্মতিসূচক শিরশ্চালনা করিলেন। ঝি চলিয়া গেল।

নবগোপাল বলিল—"তবে টাকা দিও কালই কলকাতায় যাব পাখী, জাল সব কিনতে।" বলিল, রেলে যাইবে না, নৌকা করিয়া যাইবে পাখী কিনিয়া খুঁটি কিনিয়া, লোহার জাল কিনিয়া, নৌকা বোঝাই করিয়া বাড়ী আনিবে;—রেলে অত পাখী প্রভৃতি আনিবার সুবিধা হইবে না।

জননী বলিলেন—"আচ্ছা সব হবে, এখন চল বাবা জল খাবে চল।"

[ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বৈয়াকরণ বৈঠক।

প্রথমাধিবেশন।

সভা কাল—১লা এপ্রেল, ১৯০২ সাল।

স্থান—পৃথিবীর এক প্রান্তে কোন অজ্ঞাত দেশ।

পাত্র—শ্রীক্ষিতিমান—সভাপতি, শ্রীসুচরিত্র—সহকারী সভাপতি, শ্রীঅন্নহীন—কোষাধ্যক্ষ, শ্রীবরকবি-সম্পাদক, শ্রীসাংখ্যশীল সহকারী সম্পাদক, এবং সুতার্কিক প্রভৃতি চুয়াল্লিশ জন বৈয়াকরণ।

সর্ব্বসমেত উনপঞ্চাশজন সভ্য আসীন।

(সভাপতির বক্তৃতা)

"কর্ণধারহীন তরী যেমতি অকূলে
লক্ষ্যহীন হ'য়ে ভ্রমে যথেচ্ছ ভাসিয়া,
তেমতি এ বঙ্গভাষা উচ্ছৃঙ্খল গতি
চলেছে উদ্দাম বেগে ব্যাকরণাভাবে!
কৃতিমান মোরা বঙ্গভাষার সন্তান;
তাঁহার দারুণ দুঃখ দেখিয়া মোদের
বিদীর্ণ হতেছে এবে হৃদয় শতধা!
মায়ের অভাব ঘোর নাশিতে আমরা
সবে আজি সমবেত এ মহাসভায়।
উপন্যাস প্রহসন নাটক নাটিকা
গণিয়া না হয় শেষ—ওজন করিলে
হবে শত শত মণ, গদ্য পদ্য রূপে
চাপিছে ক্রমশঃ হায় পাষাণ সমান
তাঁহার কোমল বক্ষে! সেই গুরু-ভার
ব্যাকরণ-পাশে-বাঁধি সংযত করিয়া
মায়ের উদ্ধার মোরা না পারি করিতে

যতক্ষণ, ততক্ষণ শয়ন ভোজন
সুখশান্তি বিরামাদি কিছু নাই আর!
দেবী সরস্বতী হোন সহায় মোদের।
এক্ষণে সভার কার্য্য আরম্ভ হউক;
প্রথম বৈয়াকরণ করুন প্রস্তাব।"

(করতালি ও সভাপতির আসন গ্রহণ;—তদনন্তর প্রথম বৈয়াকরণের প্রথম প্রস্তাব হস্তে উত্থান।)

প্রথম বৈয়াকরণ বলিলেন :—

"সভাপতি মহাশয়, সভ্য ভ্রাতাগণ,
প্রথম প্রস্তাব আমি করি উপস্থিত
'ঌকারের নির্ব্বাসন স্বরবর্ণ হতে।'
করেনা সে কোন কাজ সুধু বসে'রয়;
হেন জড় ভরতেরে পারি না প্রশ্রয়
এই বিংশ শতাব্দীতে দিতে কোন মতে।
এ আলস্যপরায়ণে স্থান দিয়া মোরা
সভ্য জগতের চক্ষে চাহিনা হইতে
তীব্র উপহাস-পাত্র। আশা করি তাই
এক মত হয়ে সবে মোর এ প্রস্তাব—
ঌকারের নির্ব্বাসন—করিবে গ্রহণ।"

দ্বিতীয় বৈয়াকরণ বলিলেন :—

"প্রথম প্রস্তাব উক্ত সর্ব্বান্তঃকরণে
করি আমি সমর্থন। মা'র গুরু-ভার
লঘু করিবার এই প্রথম উদ্যম,—
ভাবিয়া অনুমোদন করিবেন সবে
এ প্রস্তাব,—নহে কভু এ আশা দুরাশা।
ঌকার তুলিয়া দি'নু! বুঝিনা কি কাজ
অকেজো জিনিষ যত্নে পোষণ করিয়া।"

সুচরিত্র বলিলেন ঃ—

"অকেজো জিনিষ ?—তবে এমন কি আছে
পারি যাহা ফেলে দিতে অকেজো বলিয়া ?
স্রষ্টার রহস্য যত করি প্রণিধান
ততই দেখিতে পাই কাজ নাই যার—
হেন কোন বস্তু বিধি করেনি সৃজন।
বুঝিনা অনেক স্থলে কিসে কিযে হয় ;—
তাই ব'লে তা'র কোন প্রয়োজন নাই
একথা সাজেনা বলা এ মহাসভায়।
ঌকারের নির্ব্বাসন পারিনা করিতে
সমর্থন কোন মতে অকেজো বলিয়া ;
কারণ সম্প্রতি কিম্বা দুই দিন পরে
যখন সমগ্র বেদ হবে অনূদিত
এ বঙ্গভাষায়, স্তোত্রগুলি লিপিবদ্ধ
করিতে তখন কোথা পাইব ঌকারে,—
আজি যদি করি তার দণ্ডনির্ব্বাসন ?
খোয়াইয়া নিজধন ভিখারীর মত
পরদ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দাঁড়াইয়া
উপেক্ষিত হইবার সাধ মোর নাই।"

সুতার্কিক বলিলেন ঃ—

"অসমর্থ সমর্থন করিতে আমিও
প্রথম প্রস্তাব এই নিম্নধৃত কারণে ঃ—
যতগুলি স্বরবর্ণ রয়েছে ভাষায়
ঌর মত আছে কা'র স্বাধীন স্বভাব ?
অকার প্রথম স্বর চঞ্চল প্রকৃতি,—
সরল হসন্তপুচ্ছ ব্যঞ্জনগণের
নিত্য করি নাশ নষ্ট হতেছে আপনি,—
সন্ধি-স্থলে যদি কভু ভুলে এসে পড়ে

পলাইবে তৎক্ষণাৎ লুপ্তচিহ্ন রাখি,
অথবা আকার বেশ করিবে ধারণ,
অথবা করিবে আত্মলোপ একেবারে।
অকারে আদর করি কোন শব্দ যদি
দেয় কভু নিজ অগ্রে বসিতে আসন
ঘটাবে সে তা'র অর্থে গৌণে অন্যথা।
অন্যান্য স্বরের আছে আত্মনির্ভরতা,
ব্যঞ্জনের সনে তা'রা যদি কভু মিশে
চিহ্ন দিয়া নিজ স্থান ক'রে লয় সেথা,
আপন অস্তিত্ব লোপ করেনা সহজে।
প্রস্তুত সর্ব্বত্র দিতে আত্মপরিচয়
ঌকার লয়না কোন চিহ্নের আশ্রয়।
কি বিজনে কি ব্যঞ্জনে দৃঢ়তার সহ
লইবে সে নিজ স্থল সম্পূর্ণ বুঝিয়া।
কিন্তু সে চাহেনা কোন কথায় থাকিতে,
অতি ধীর শান্তি-প্রিয় নীরব নিশ্চল,
ভালমন্দে কিম্বা সন্ধি-বিচ্ছেদে রহেনা।
ঌহেন ঋষির প্রতি এ মহাসভার
উচিত কি হয় দণ্ড-প্রয়োগ কঠিন ?"

অন্নহীন বলিলেন :—

"সভ্যগণ সুতার্কিক মহাশয় এবে
চাহেন রাখিতে ঌরে মহর্ষি বলিয়া।
সুধাই সকলে আমি ঋষির কি স্থান
উপযুক্ত থাকিবার শব্দকোলাহলে ?
চলে যান তিনি সুখে গম্ভীর কাননে,
নির্ব্বিবাদে করুনগে যোগ আরাধনা।
তথায় তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিতে কখন
যা'ব না আমরা তাই এ প্রস্তাব আমি

নির্ব্বন্ধাতিশয় সহ করি সমর্থন।
অজ্ঞাতকুলশীলে কে স্থান দিতে চাহে?"

সাংখ্যশীল :—

"এ প্রস্তাবে কোন মতে সম্মত হইতে
পারিনা কারণ সংখ্যা সামর্থ্যসূচক।
দ্বাদশটি স্বরবর্ণ রয়েছে তাঁহার,
তাহা হ'তে খসাইয়া একটি এখন
কমাইলে কি এমন হইবে বা লাভ?
বরং হীনবল হবে স্বর গুলি ক্রমে।
আজি যদি করি মোরা ৯কারের লোপ,
কালি লোপ হ'বে তবে ঐ-ঔ-কার।
কারণ "ঐ" ত "অই", "ঔ" "ওই" রূপ,
"খৈ" হবে "খই" আর "গৌ" হবে "গোউ",
কি কাজ রাখিয়া তবে "ঐ" আর "ঔ"?
ঋকারেরও ঐ দশা—যথা ঋষি=রিষি
হৃষীকেশ=হ্রিষীকেশ, আবৃত=আব্রিত।
পড়িবে তাহার পর টান ঈ ঊ লয়ে,
হ্রস্ব দীর্ঘ বিভিন্নতা বাহুল্য বলিয়া।
এইরূপে দ্বাদশটি দাঁড়াবে অর্দ্ধেকে!
দুর্ব্বল হইবে তাবা অত্যন্ত শিথিল;
কাজেই পারিনা দিতে মত এ প্রস্তাবে।"

স্বাস্থ্য বিধাতা।—"দুঃখিত অতীব আমি, শেষোক্ত বক্তার
পারিনা করিতে কোন যুক্তি সমর্থন।
বিপক্ষগণের মতে যদি কাজ হয়,
তা'হলে আবার দীর্ঘ ৡ ঃ দোঁহে এবার
করুন জীবিত! কালে তাহারা আবার
লাগিবে কোন না কোন কাজে সুনিশ্চয়!
কখন কি হ'বে বলে, আমার এখন

নিজগৃহ পরিপূর্ণ করিয়া জঞ্জালে
হইবে রাখিতে—নাই সামর্থ্য আমার
করিতে অনুমোদন ইহা কোন ক্রমে।
বিজ্ঞান বিরুদ্ধ যাহা স্বাস্থ্য হানিকর,
কিরূপে করিতে তাহা হইবে উৎসাহ?
কে রাবিশ স্তূপে চায় করিতে বসতি?”

পূর্ব্বজ্ঞানী।—“আমার সে মত নহে। রাবিশের স্তূপে
মোরা করিতেছি বাস। সভ্য বন্ধুগণ,
ভাবিয়া দেখুন দেখি এই সভা গৃহ
রাবিশের স্তূপ কিনা? প্রত্যেক নিমিষে
অতি সূক্ষ্ম অণুরূপে পড়িছে ঝরিয়া
এ গৃহের কলেবর রাবিশ গঠিত!
ফেলিবে যে অণুরাশি রাবিশ বলিয়া
সেই অণু হতে হবে সুদৃঢ় প্রাঙ্গন।
সার্সি-বাতায়ন-স্তম্ভ সোপান খিলানে
সজ্জিত সুচারু উচ্চ প্রশস্ত প্রাসাদ
দেখিয়া সহসা মনে হয় কি উদয়
রাবিশ-বিকার সব, হবে পরিণত
রাবিশ রাশিতে পুনঃ। কৌশলীর হাতে
পরিত্যক্ত বস্তু পড়ি সুন্দর আকার
ত্বরায় ধারণ করে জনমনোহর।
“অসতের ভাব নাই সতের অভাব”
এ বাক্য স্মরিয়া স্বাস্থ্য বিধাতার কথা
গ্রহণে অক্ষম;—সবে ক্ষমুন আমায়,
অণুলোপ কোন মতে করিতে পারি না।”

বরকবি বলিলেন:—

“১কারের ধ্বংস ইচ্ছা আমিও করি না,
কারণ ১কৌর্পে হবে জাতীয়তা লোপ।

আমরা বাঙ্গালি জাতি জগৎ মাঝারে
থাকিয়াও নাই ঠিক ৯কারের মত।
যথায় বসতি তথা হ'তে একপদ
যাইতে ইচ্ছুক নহি পাছে জাতি যায়
৯কারের মত তাই অচল আমরা।
মেলেরিয়া জর্জ্জরিত অন্নবস্ত্রহীন
জীর্ণ-শীর্ণ-কলেবর ৯কারের ন্যায়
নিরীহ আমরা এক কোনে আছি পড়ে।
অন্য স্বরবর্ণ গুলি নিরন্তর সুখে
প্রভূত শব্দ-সম্পত্তি করি আহরণ
সমস্ত অভাব দূর করিছে মায়ের;
মুখোজ্জ্বলকারী তা'রা সুসন্তান সবে।
আমরা কেবল পড়ে আছি ৯ সদৃশ,
না পারি করিতে মুখ মাতার উজ্জ্বল।
অথবা জন্মভূমির অভাব মোচন।
একাক্ষরে এ জাতির এমন সুন্দর
উপমা কোথাও আর পাবেনা ধরায়।
তাই আমি অনুরোধ করি সভ্যগণে
এ প্রস্তাব একেবারে অগ্রাহ্য করিতে।"
৯অতঃপর মহা গোল উঠিল সভায়;—
কেহ বলে মার রে কেহ বলে রাখ।
বৈয়াকরণিক মধ্যে বাক্যের সমর
বাধিল তুমুল। নাহি শুনে কেহ কা'রে,
বক্তা সকলেই। সভাপতি মহাশয়
উঠিয়া তখন ক্ষান্ত করিলেন সবে—
বলিলেন—"সংশোধিত প্রস্তাব আমার
শ্রবণ করুন সবে—"বাঙ্গালা ভাষায়
দ্বাদশটি স্বর আছে যথা পূর্ব্বাপর

থাকুক তেমতি তা'রা, কিন্তু লেখা যা'ক
এগারটি মাত্র এবে হয় ব্যবহৃত।"
"ধন্য ধন্য" পড়ে গেল শব্দ চারিদিকে ;
সবে একমত হ'য়ে করিল গ্রহণ
সভাপতিসংশোধিত প্রস্তাব তখন।
এইরূপে স্বরবর্ণ সে অধিবেশনে
পাশ হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচিল প্রথমে।

শ্রীসত্যোপেন্দ্র মল্লিক।

জাতিভেদ ও ভাষাভেদ।

দর্শন শাস্ত্রের মতে জাতির লক্ষণ এই ঃ—"নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বম্" যে পদার্থ নিত্য ও যাহাতে অনেক ব্যক্তি সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে তাহাকে জাতি বলে। মনুষ্য একটি জাতি, ইহা নিত্য, ও ইহাতে রাম, শ্যাম, হরি প্রভৃতি বহুব্যক্তি সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে। ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুতে জাতির নিত্যত্বের হানি হয় না। কতক ব্যক্তির মৃত্যু ও অপর ব্যক্তির জন্ম এইরূপ জন্ম মরণ প্রবাহদ্বারা জাতির নিত্যত্ব অব্যাহত থাকে। অবয়বসমূহের সহ অবয়বীর যেরূপ সম্বন্ধ ব্যক্তির সহ জাতিরও সেইরূপ সম্বন্ধ।

জাতির লক্ষণ।

মনুষ্যজাতি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত। কি প্রণালীতে এই সকল জাতির ভেদ ঘটিয়াছে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। এক জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের সহ অপর জাতির অন্তর্গত ব্যক্তি সমূহের প্রভেদের কারণ কি তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পুরাবিদ্গণ

অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। জাতিসমূহের কতিপয় বিভাজক লক্ষণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

মানবজাতির কতিপয় বিভাজক লক্ষণ।

(১) বর্ণ।—কোন কোন জাতি গৌরবর্ণ, কেহ কৃষ্ণবর্ণ এবং কেহ বা পীতবর্ণ। এইরূপ বর্ণের পার্থক্য অনুসারে জাতির ভেদ ঘটিতে পারে। গৌরাঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পীতদেহধারী ব্যক্তিগণের সহ আহার, বিহার ও বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক হইতে পারেন। পীতদেহবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গৌর বা কৃষ্ণাঙ্গ লোককে অবজ্ঞা করিতে পারেন। এইরূপ বর্ণাভিমানদ্বারা জাতির ভেদ ঘটিতে পারে। এই প্রণালীতে পাটলবর্ণ মীসরবাসী, পীতবর্ণ কানানাইট্, কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো ও গৌরবর্ণ ইউরোপীয় প্রভৃতি জাতির মধ্যে পরস্পর ভেদ ঘটিয়াছে। যে সকল ব্যক্তির সমবায়ে ঐ সকল জাতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অপর কোন পার্থক্য না থাকিলেও শরীরের বর্ণই তাহাদিগকে পরস্পর হইতে পরস্পরকে পৃথক্ করিয়াছে।

(২) কেশ-ব্যবস্থা।—মস্তকের কেশগুচ্ছও মানবজাতির অভিমানের বিষয়। কাহারও মস্তকে প্রচুর কেশ বিদ্যমান আছে, কেহ বা অল্প কেশবিশিষ্ট। কাহারও কেশ সরল এবং কেহ বা কুটিলকেশবিভূষিত। বিধাতার সৃষ্টি কি বৈচিত্র্যপূর্ণ, তিনি সমগ্র মানবের কেশ এক প্রকার করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। মঙ্গোলিয় জাতির কেশ বিরল, ঐনোজাতি বহুকেশযুক্ত, বুসম্যান জাতির মস্তক জটাপটল পরিশোভিত, কিন্তু ইউরোপীয় জাতির মস্তকে কেশ সমভাগে ব্যবস্থিত। উত্তর আমেরিকা ও মলয়বাসিগণের কেশ সরল কিন্তু নিগ্রোগণের কেশ কুঞ্চিত। মস্তকের কেশ কেবল দৈহিক সৌন্দর্য্যের উপচয় বা অপচয় সাধন করে এরূপ নহে, উহা মানবজাতির মধ্যে মহা প্রভেদও সংঘটিত করিয়াছে।

(৩) দৈহিক উচ্চতা ও পরিমাণ।—সকল মনুষ্যের দেহের উচ্চতা সমান নহে। কেহ কেহ অতীব প্রাংশু, কেহ বা নিতান্ত খর্ব্ব, কেহ স্বল্পকায়বিশিষ্ট, আবার কাহারও দেহ বিপুল। এইরূপে দৈহিক ভেদ অনুসারেও মানবগণের মধ্যে জাতিভেদ ঘটিয়াছে। উচ্চদেহ পাটাগোনিয়গণ খর্ব্বদেহ ফিউজিয়ান্‌গণ হইতে আপনাদিগকে এই প্রণালীতে পৃথক্ করিয়া থাকেন।

(৪) কপালের আকৃতি।—কপালের (মাথার খাপ্‌রীর) আকৃতির ভেদ অনুসারেও মানবজাতির মধ্যে পরস্পর ভেদ ঘটিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়, নিগ্রো, কাফির, ও বুসম্যান্ জাতির কপালের আকৃতি একরূপ নহে।

(৫) মুখশ্রী।—সকল জাতির মুখশ্রী সমান নহে। চীনবাসিগণের তির্য্যক্ চক্ষুঃ, কঙ্গদল জাতির প্রশস্ত গণ্ডস্থল, আরবজাতির উদগ্র চিবুক, নিগ্রোজাতির স্ফীত ওষ্ঠ ও কাল্‌মক জাতির সুবিস্তৃত কর্ণ ঐ সকল জাতিকে পরস্পর হইতে পৃথক করিতেছে।

(৬) প্রকৃতি—মানবের প্রকৃতি অনুসারেও উহাদের মধ্যে জাতিভেদ ঘটিয়াছে। যাহারা যে প্রকৃতির লোক তাহারা তদনুরূপ প্রকৃতির লোক লইয়া জাতিব্যবস্থাপন করিয়াছে।

জাতিভেদের কারণ

জাতিভেদের কারণ।—মহামতি আরিষ্টোটল্ বলেন জলবায়ুর ভেদ ও অবস্থার ভেদ অনুসারে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, যে দেশের জলবায়ু যেরূপ, সেই দেশের লোকের আকৃতি ও স্বভাব তদনুরূপ। গ্রীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধান স্থানের লোকের আকৃতি, প্রকৃতি, আহার, বিহার ও পরিচ্ছদ পরস্পর একরূপ নহে। যাহারা মরুভূমির সন্নিহিত স্থানে জন্মিয়াছে তাহারা কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। যাহারা নদীতীরে বাস করে তাহাদের মধ্যে অনেকেই সন্তরণপ্রিয়। যাহারা সমুদ্রগর্ভে বা দ্বীপে বাস করে তাহা-

দের বাধা হইয়া অর্ণবযান নির্ম্মাণ করিতে হয়। যে দেশে নদী নাই সে দেশে কূপ খনন ব্যতীত পানীয়লাভের উপায়ান্তর কি? দেশে শস্য না জন্মিলে মৃগয়ালব্ধ পশুমাংস দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে হয়। উষ্ণ-প্রধান স্থানে প্রত্যহ তিনবার স্নান ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। বস্তুর শুদ্ধি বিষয়ে শীতপ্রধান স্থানের লোকের মতের সহ উষ্ণপ্রধান স্থানের লোকের মতের ঐক্য নাই। আহার, বিহার, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়েও তাঁহাদের সম্পূর্ণ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ অভাবই আবিষ্কারের প্রবর্ত্তক। যাঁহারা যেরূপ অভাবে পড়িয়াছেন তাঁহারা উহার পূরণের সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপে ভারতবর্ষ, মীসর, আরব, পারস্য, ব্যাবিলন্, ক্যাল্‌ডিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন প্রকার সভ্যতা দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন সভ্যতাই বিভিন্ন জাতিসৃষ্টির মূল।

পৃথিবীর আদিম জাতিসমূহ।

জাতিভেদ প্রথা উদ্ভূত হইবার পূর্ব্বে মানবগণ কি ভাবে বাস করিতেন ও তাঁহাদের পরস্পরের সহ পরস্পরের কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল তাহার কোন নিদর্শন নাই। যখন মনুষ্যগণ স্বার্থপরতা সম্পূর্ণরূপে অভ্যাস করে নাই, যখন এদেশ আমার সেদেশ তোমার এরূপ ভেদ জ্ঞান মানব-সমাজে প্রবেশ লাভ করে নাই, এবং যে সময়ে সদাচার ও কদাচারের ব্যপদেশে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা করে নাই, মানব ইতিহাসের সেই গহন তমসাচ্ছন্ন যুগ আমাদের দৃষ্টির অবিষয়ীভূত। যখন মানবগণ ককেশীয়, মঙ্গোলিয়, নিগ্রো, ইথিওপিও প্রভৃতি জাতিতে বিভক্ত হইতে থাকেন তখনকার ইতিহাসও আমাদের একপ্রকার দুর্ভেদ্য। মানব-আকৃতির কতিপয় বিশেষ লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পুরাবিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন হিন্দু, পারসিক, গ্রীক, রোমান্, জার্ম্মান্, ইংরেজ প্রভৃতি জাতি এক সময়ে মধ্য এসিয়ার ককেশস্ পর্ব্বতের

সন্নিহিত স্থানে বাস করিতেন। ক্রমে তাঁহারা বিভিন্ন দেশে প্রবেশ করিয়া ও বিভিন্ন প্রকার অবস্থায় পড়িয়া বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুর সংস্রবে পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু, তাঁহারা সকলেই এক মূল আর্য্য জাতির শাখাপ্রশাখা মাত্র। ব্রহ্ম, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয় প্রভৃতি দেশবাসীগণের পূর্ব্বপুরুষেরাও পুরাকালে পরস্পর একত্র বাস করিতেন। ক্রমে তাঁহারাও নানা দেশে ধাবমান হইয়া নানা জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। নিগ্রো, ইথিওপিও, আমেরিকো প্রভৃতি জাতিও বিভিন্ন স্থানে অগ্রসর হইয়া বিবিধ জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। ককেশীয়, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি মূল জাতিসমূহের পরস্পর প্রভেদের কারণ কি তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। বোধ হয় তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেন ও বিভিন্ন ভাষায় কথা কহিতেন বলিয়াই পুরাকালে তাঁহাদের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিতে পারে নাই। যাঁহারা একস্থানে বাস করিতেন ও পরস্পরের মনের ভাব পরস্পরে বুঝিতেন তাঁহারাই সমবেত হইয়া এক এক জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাচীন কালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা অতি অল্পই ছিল এবং অনেক ভূভাগই গহন অরণ্যদ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকিত। প্রত্যেক জাতির অন্তর্ভূত লোক-সমূহের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে নূতন নূতন জনপদের আবিষ্কার হইতে থাকে। ক্রমে মহারণ্য স্থানে মহানগরী সংস্থাপিত হয়। যীশু খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে মীসরের সভ্যতা আরব্ধ হয়। আসীরিয়, কালডিয় ও ব্যাবিলোনীয়গণ খৃঃ পূঃ ২২০০ অব্দে সুসভ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হন। ফিনিসিয়ান্‌গণ খৃঃ পূঃ ১৯০০ অব্দে বাণিজ্য বিষয়ে উন্নতি লাভ করেন। খৃঃ পূঃ ১৯২০ অব্দে প্যালেষ্টাইন্ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হয়। মিডিয়ান্ ও পারসিকগণ খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে আপনা-দিগকে আসীরিয় রাজ্য হইতে পৃথক্ করিয়া লয়েন। উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ রাজ্য খৃঃ পূঃ ৯ম শতাব্দীতে অভ্যুদয় লাভ করে। খৃঃ পূঃ

২০০০ অব্দে পেলাস্গিক্ জাতি গ্রীসে আধিপত্য সংস্থাপন করে। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জিউগণ ব্যাবিলোনিয়ার কারারোধ হইতে মুক্তিলাভ করে। খৃঃ পূঃ ১১ শতাব্দীতে গ্রীকগণ ইটালী দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীতে রোম রাজ্যের সংস্থাপন ঘটে। খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে চীন সাম্রাজ্য পরাক্রান্ত ছিল। খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে ভারতবর্ষে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

জাতির অনিয়তত্ব।

আমরা বহুকষ্টে বিগত চারি হাজার বৎসরের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারি। পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানদ্বারা আমরা দেখিতে পাই অতি প্রাচীনকালে আসীরিয়,কালডিয়,ফিনিসিয়, মিডিয়, পারসিক, গ্রীক্, রোমান, হিন্দু প্রভৃতি জাতির মধ্যে পরস্পর অধিকতর নিকট সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়া তথায় আধিপত্য সংস্থাপন করিবেন ও ক্ষিত্যপ্তেজঃ প্রভৃতিকে পরাভূত করিয়া আপনাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবেন। মানব সমাজের এই কৌমার অবস্থায় ব্যক্তিগণের পরস্পর কোন বিদ্বেষ ছিল না। প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন জাতীয় লোক একস্থানে বাস করিয়া ও এক ভাষায় কথা কহিয়া এক নূতন জাতির সৃষ্টি করিতেন। বস্তুতঃ বহু ব্যক্তির সমবায়ই জাতি। বহু ব্যক্তি সমবেত হইলেই একটী জাতির সৃষ্টি হইত। এক দেশে বাস, এক ভাষায় কথোপকথন ও এক উদ্দেশ্য এই তিনটীর সদ্ভাব হইলেই ব্যক্তিগণ সমবেত হইতে পারিতেন এবং তাঁহাদের সমবায়ই জাতিসৃষ্টির মূল ভিত্তি। হিন্দুদর্শনে যে জাতির (genus) উল্লেখ আছে উহা নিত্য বটে, কিন্তু মানব সমাজের জাতি (nation) সমূহ অনিত্য (অনিয়ত) নানা জাতীয় ব্যক্তিগণের সমবায়ে একটী নূতন জাতির সৃষ্টি হইতে পারে। সেই নূতন জাতি কোন জাতিবিশেষের অন্তর্ভূত নহে, অথচ

উহা একটী স্বতন্ত্র জাতি। প্রাচীন ইতিহাসে যে সকল জাতির উল্লেখ আছে আজ তাহাদের অধিকাংশই পৃথিবীতে অমিশ্রভাবে বিদ্যমান নাই। প্রাচান ইতিহাসে যে সকল জাতির বর্ণনা আছে তাহারাও যে তৎকালে বিধাতার এক একটী স্বতন্ত্র সৃষ্টি ছিল তাহাই বা কে বলিতে পারে? প্রকৃত প্রস্তাবে জাতিগঠন একটী রাজনৈতিক ব্যাপার। আজ যদি দৈবের বিপাকে কতিপয় হিন্দু, চাইনীজ্, জাপানী ও ইংরেজ সংমিলিত হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব দ্বীপবিশেষে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া তথায় একত্র বাস করেন এবং তদ্দেশবাসিগণের সহ যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের সমবায়ে যে জাতির সৃষ্টি হইল তাহার কি নাম হইবে? তাহারা হিন্দু, চাইনীজ প্রভৃতির কিছুই নহে অথচ একটী পরাক্রান্ত জাতি। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে আলেক্‌জাণ্ডার বক্ত্রিয়া রাজ্যের সংস্থাপন করিয়া যে গ্রীক উপনিবেশ সংস্থাপন করেন তাহার আজ কি অবস্থা! আজ কাবুলদেশীয় মুসলমানদিগকে দেখিয়া কে চিনিতে পারে যে উহারা সেই গ্রীকগণের বংশধর। আজ কাবুলের সহ আরব দেশের মিত্রতা সম্বন্ধ কিন্তু গ্রীসের সহ উহাদের কোন সম্বন্ধই নাই। উত্তর ভারতের বজ্জিয়ান্ জাতি এক সময়ে মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ও নেপাল দেশে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া তথায় বাস করে। কিন্তু অধুনা উক্ত দেশসমূহের সহ ভারতের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।

ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতৃগণও জাতিভেদ প্রথা অনেক পরিমাণে শিথিল করিয়াছেন। অনধিক দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যীশু খ্রীষ্ট খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু এই দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর অনেক লোক তদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় জাতি ত্যাগ করিয়াছে। হিন্দু, পারসিক, কালডিয়ান্, মিডিয়ান্, ব্যাবিলোনিয়ান্, মঙ্গোলিয়ান্, চাইনীজ প্রভৃতি সমস্ত জাতিই খৃষ্টান্ জাতির মধ্যে বিদ্যমান আছে। কাল-

সহকারে উহাদের পূর্ব্বচিহ্ন কিছুই থাকিবেনা, কেবল খৃষ্টান্ এই নাম লোকস্মৃতিতে বিরাজ করিবে। মহম্মদও তুর্কিস্থান, আরব, পারস্য, কাবুল, ভারত প্রভৃতি দেশের লোক সমূহকে এক জাতির অন্তর্নিবিষ্ট করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্য, মঙ্গোলিয় প্রভৃতি জাতিকে একসূত্রে বদ্ধ করিয়াছিল, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে মগধ ও বঙ্গদেশ হইতে যে সকল লোক জাপানে যাইয়া বাস করিয়াছিল, তাহাদের হিন্দুয়ানীর একটু চিহ্নও এক্ষণে বিদ্যমান নাই। দ্রাবিড় হইতে যে সকল লোক লঙ্কায় যাইয়া বাস করিয়াছিল তাহারা এক্ষণে লঙ্কাবাসী বৌদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। আর যুগে যুগে সহস্র সহস্র লোক মধ্য এসিয়া হইতে আগমনপূর্ব্বক ভারতে বাস করিয়া হিন্দু-জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছেন। এমন কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চতম শ্রেণীর ব্যক্তিগণও ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন। আমাদের চক্ষুর উপর এই প্রণালীতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল দেখিলাম।

ভারতের জাতি-বন্ধন শৈথিল্য।

ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশেই জাতিবন্ধন অতিশয় দৃঢ়। প্রত্যেক জাতির অন্তর্ভূত ব্যক্তিগণের পরস্পর সহানুভূতিই তজ্জাতির দৃঢ়ত্বের কারণ। আমরা দেখিতে পাই যখনই কোন জাতীয় ব্যক্তিগণ একোদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া একপ্রাণতা প্রকাশ করিয়াছিল তখনই সেই জাতির অভ্যুদয় লাভ হইয়াছিল। হিন্দুর সকল সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও সুবিধা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জাতিগঠন করা সামান্য ব্যবস্থাপকের কার্য্য নহে। হিন্দু-জাতির সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি উৎপাদন করা দুরূহ ব্যাপার। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে পারে বলিয়াই মানুষ সকল জন্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে সমাজে সকল ব্যক্তির স্বত্ব ও সুবিধা নিরপেক্ষ-

ভাষার উৎপত্তি।

জাতিভেদের সহ ভাষাভেদের অতীব নিকট সম্বন্ধ। ব্যক্তিগণের বাহ্য সমবায়ে জাতির সৃষ্টি হয় এবং উহাদের আভ্যন্তর সমবায়ে ভাষার উৎপত্তি হয়। একটী মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য যদি বহুব্যক্তির তুল্য চেষ্টা জন্মে তাহা হইলে একটী ভাষার উদ্ভব হইবে। বুদ্ধিবৃত্তির বহিঃপ্রকাশই ভাষা। বুদ্ধি মানব-জাতির একটী স্বাভাবিক গুণ। মানব সমাজের আদিম অবস্থায় ঐ বুদ্ধি নানা ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। কতিপয় ব্যক্তির বুদ্ধির তুল্য প্রকাশে ভাষার উদ্ভব হয় এবং অনুকরণদ্বারা ঐ ভাষার সর্ব্বতঃ প্রসার ঘটে। সর্ব্বপ্রথমে কয়টী মূলভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করা অতীব দুরূহ। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন মধ্য এসিয়ায় যে আর্য্যভাষা প্রচলিত ছিল তাহা হইতে সংস্কৃত, গ্রীক, লাটীন, টিউটনিক, জার্মান, স্লাভোনিক প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। এই রূপে সেমিটিক ভাষা হইতে হিব্রু, আরবিক প্রভৃতি বহু ভাষা জন্মলাভ করিয়াছে। ভাষার প্রথম সৃষ্টিতে মনুষ্যের কোন কৌশল নাই, উহা প্রকৃতির কার্য্য। নিগ্রো, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরাও প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে এক একটী ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির স্বভাবের ভিন্নতা অনুসারে আদিমভাষাসমূহের পরস্পর ভেদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু সকল মনুষ্যই ভাষাদ্বারা মনোভাব প্রকাশ করে, ইহাই সকল ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসাধারণ লক্ষণ।

ভাষা সমূহের বিভাজক লক্ষণ।

জগতে নানা প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে। ঐ সকল ভাষার কতিপয় বিভাজক লক্ষণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(১) কোন ভাষা একস্বর। যে ভাষার শব্দে একটী মাত্র স্বর বিদ্যমান থাকে, ব্যঞ্জন যতই থাকুক না কেন, তাহাকে একস্বর ভাষা

কোন শব্দ বা ধাতুতে একাধিক স্বর বিদ্যমান নাই। শব্দ বা ধাতুর উত্তর যে সকল বিভক্তি যুক্ত হয় তাহারাও এক একটী স্বতন্ত্র শব্দ। তাহারাও একস্বর। একস্বর ভাষার প্রকৃতি অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় যাঁহারা এই ভাষার প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহাদের চিন্তা-নিচয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে বিভক্ত হইয়া স্ফুরিত হইয়াছিল। কোন গুরুতর ভাব প্রকাশ করিতে হইলে দুই তিনটী শব্দ একত্র করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

(২) কোন ভাষা বহুস্বর। কোন কোন ভাষার শব্দ ও ধাতুতে একাধিক স্বর ও ব্যঞ্জন বিদ্যমান থাকে। জগতের প্রায় অধিকাংশ ভাষাই বহুস্বর। এই সকল ভাষায় গুরুতর চিন্তাসমূহ এক কথায় প্রকাশ করা যায়।

(৩) কোনটী সংযোগ্য ভাষা। ঐ ভাষার শব্দসমূহ অর্থবিশেষ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পরস্পর সংযুক্ত হয়।

(৪) কোনটী রূপান্তরার্হ ভাষা। ঐ ভাষায় বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শব্দসকল বিভিন্নরূপ ধারণ করে।

ভাষার সহ জাতির সম্বন্ধ।

কতকাল হইল পৃথিবীতে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা মানবের অসাধ্য। সর্ব্ব প্রথমে পৃথিবীতে কয়টী ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাও জানা যায় না। যে সকল ভাষা অধিক লোকের ব্যবহার্য্য ছিল উহারা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এবং যে সকল ভাষা অল্প লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল উহাদের অধিকাংশই পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। কালসহকারে ভাষাসকলের মহাপরিবর্ত্তন ঘটে। চারি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভাষাসমূহ জগতে যে ভাবে কথিত হইত এক্ষণে উহার একটীও সেই ভাবে ব্যবহৃত হয় না। জাতিতে জাতিতে মিশ্রিত

নূতন ভাষার অভ্যুত্থান হয়। একই আর্য্যভাষা যেমন বিভিন্ন দেশে প্রবেশ করিয়া সংস্কৃত, গ্রীক, লাটীন প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়াছে সেইরূপ একই সংস্কৃত ভাষা রূপান্তরিত হইয়া নানা উপভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষার ভেদ অনুসারে জাতির ভেদ ব্যবস্থাপন করা সর্ব্বত্র সুসংগত বলিয়া বোধ হয় না। অনেক ভাষা পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং অনেক জাতি স্বীয় ভাষা ত্যাগ করিয়া নূতন ভাষা গ্রহণ করিয়াছে।

ভাষাই জাতি গঠনের প্রধান সহায়। পরস্পরের মনের ভাব পরস্পরে না বুঝিলে জাতি গঠিত হইতে পারে না। ভাষার ঐক্য থাকিলে অতি সহজে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জন্মে। একটী জাতির মধ্যে একের অপেক্ষা অধিক ভাষা থাকা উচিত নহে। ভাষার অনৈক্য হইলে জাতিবন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়ে। ভাষার একতাদ্বারা সকল লোক পরস্পরের প্রতি সমাকৃষ্ট হয়। সমগ্র চীন সাম্রাজ্যে এক ভাষা প্রচলিত থাকায় চীনজাতি সমধিক প্রবল রহিয়াছে। সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনে এক ইংরাজী ভাষা প্রচলিত থাকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাসমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এক সময়ে সমগ্র রোম রাজ্যে লাটীন ভাষা প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর যে সকল জাতি লাটীন ভাষায় কথা বলিতে পারিত না রোমান্‌গণ তাহাদিগকে বর্ব্বর বলিতেন। সুদূর বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষেও এক সময়ে সংস্কৃত বা তদনুরূপ কোন একটী ভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতে এখন নানা ভাষা প্রচলিত হইয়াছে। এক ভারতবর্ষে যত ভাষা আছে পৃথিবীর অবশিষ্ট সমগ্র অংশে ততগুলি ভাষা আছে কিনা সন্দেহের বিষয়। ভারতের এই ভাষাবৈষম্য জাতি-গঠনের প্রধান অন্তরায়। অনেকে অনুমান করেন কালক্রমে হিন্দী-ভাষা সমস্ত ভারতে প্রচলিত হইবে, জগতে যে সকল ভাষা আধিপত্য

স্থাপন করিবে হিন্দী তাহাদের অন্যতম। কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বাঙ্গালীগণ ক্রমে ক্রমে যেরূপ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছেন, তাহাতে উহাঁরা যে কোন কালে হিন্দীভাষা সম্যক্ ও সহজে উচ্চারণ করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায় না।

ভাষা ও জাতির নিয়ামক।

বহু অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু জাতি ভেদ ও ভাষা ভেদের কোন নিশ্চিত নিয়ামক (principle) পাইলাম না। কোন্ অখণ্ড্য নিয়ম অনুসারে জগতের লোক সকল নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা নির্দ্ধারণ করা একান্ত দুরূহ। প্রাচীন ফিনিসিয়, মিডিয়, পারসিক, ক্যাল্‌ডিয় প্রভৃতি জাতি স্বীয় নাম ত্যাগ করিয়া নবাভ্যুদিত নানা জাতিতে সংমিলিত হইয়া পড়িয়াছে। অধুনাতন ইংরেজ, জার্ম্মান, ফরাসী প্রভৃতি জাতিসমূহও নানা জাতির সমবায়ে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ইহাদের জাতিপরিণাম কি হইবে বলিতে পারা যায় না। ভারতীয় আর্য্যজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিতে বিভক্ত হইয়া পরিশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। ভাষার পার্থক্য অনুসারে তাঁহারাও আবার বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, উড়িয়া, কাশ্মীরী প্রভৃতি নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়াছেন। অন্যোন্যাসংস্পৃষ্ট ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া হিন্দুজাতি স্বীয় প্রভাব হারাইয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ এক্ষণে হিন্দুকে একটী জাতি (nation) বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। ভারতের লোক সকল উদ্যমশীল নহেন বলিয়া ইহাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সমধিক বিস্তার লাভ করিতে পারেন নাই।

এই অসীম ভূমণ্ডলে ও অনন্ত মহাকাল মধ্যে কত কত জাতির অভ্যুদয় ও বিলয় ঘটিতেছে এবং তদনন্তর সহস্র সহস্র নূতন জাতির আবির্ভাব হইতেছে। জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কত কত ভাষা অভ্যুন্নতি লাভ করিতেছে এবং তদনন্তর ঐ সকল ভাষার

অন্তর্ধান ঘটিতেছে। লোক সকল স্বীয় জাতি ও ভাষাকে স্থির রাখিবার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, ঐ জাতি ও ভাষা ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইবে। আবার অলক্ষিতভাবে নূতন নূতন জাতি ও নূতন নূতন ভাষা জন্মলাভ করিবে। বসুন্ধরা উৎসাহবান্ ব্যক্তিগণের ভোগ্যা। যাঁহারা উদ্যমশীল হইবেন এবং নানা ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া জাতিগঠন করিতে পারিবেন পৃথিবী তাঁহাদেরই ভোগের বস্তু। আর যাঁহাদের উৎসাহ নাই এবং যাঁহারা স্বজাতীয় ব্যক্তিগণের প্রতি সুবিচার করিতে অক্ষম তাঁহারা পৃথিবীর সকল জাতির দয়ার পাত্র।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

কথার কথা।

(১)

সম্প্রতি বাঙ্গলা ব্যাকরণ নিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র সাহিত্যসমাজে একটা বড় রকম বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে। আমি বৈয়াকরণ নই, হবারও কোন ইচ্ছে নেই। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরি মুসলমানরা ভস্মসাৎ করেছে বলে সাধারণতঃ লোকে দুঃখ করে থাকে, কিন্তু প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক Montaigueএর মনোভাব এই যে ও ছাই গেছে বাঁচা গেছে। কেননা সেখানে অভিধান ও ব্যাকরণের এক লক্ষ গ্রন্থ ছিল। “বাবা! শুধু কথার উপর এত কথা!” আমিও Montaigueএর মতে সায় দেই। যেহেতু আমি ব্যাকরণের কোন ধার ধারিনে, সুতরাং কোন ঋষিঋণমুক্ত হবার জন্য এ বিচারে আমার যোগ দেবার কোন আবশ্যক ছিলনা। কিন্তু তর্ক জিনিষটে আমাদের দেশে তরল পদার্থ, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে বিষয় হতে বিষয়ান্তরে অবলীলাক্রমে গড়িয়ে যাওয়াটাই তার স্বভাব। তর্কটা সুরু হয়েছিল ব্যাকরণ নিয়ে, এখন মাঝামাঝি অবস্থায় অলঙ্কার শাস্ত্রে এসে পৌঁচেছে, শেষ হবে বোধ হয় বৈরাগ্যে। সে যাই হোক্ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই মত প্রচার কর্‌ছেন, যে আমরা লেখায় যত অধিক সংস্কৃত শব্দ আমদানি করব, ততই আমাদের সাহিত্যের মঙ্গল। আমার ইচ্ছে বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষাতেই লেখা হয়।

দুর্ব্বলের স্বভাব নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। বাইরের একটা আশ্রয় আঁক্‌ড়ে ধরে রাখ্‌তে চায়। আমরা নিজের উন্নতির জন্যে পরের উপর নির্ভর করি। স্বদেশের উন্নতির জন্যে আমরা বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছি, এবং একই কারণে নিজভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে অপর ভাষার সাহায্য ভিক্ষা করি। অপর জাতি অপর ভাষা যতই শ্রেষ্ঠ হোক্ না কেন, তার অঞ্চল ধরে বেড়ানোটা কি মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়? আমি বলি আমরা নিজেকে একবার পরীক্ষা করে দেখি না কেন? ফল কি হবে কেউ বল্‌তে পারে না, কারণ কোন সন্দেহ নেই যে, সে পরীক্ষা আমরা পুর্ব্বে কখনো করিনি। স্বাধীন হবার চেষ্টাতেও সুখ আছে। যাক্ ওসব বাজে কথা। আমি বাঙ্গলাভাষা ভালবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি ক'র। কিন্তু এ শাস্ত্র মানিনে যে যাকে শ্রদ্ধা করি তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে। আমার মত ঠিক, কিম্বা শাস্ত্রী মহাশয়ের মত ঠিক, সে বিচার আমি করতে বসিনি। শুধু তিনি যে যুক্তি দ্বারা নিজের মত সমর্থন করতে উদ্যত হয়েছেন, তাই আমি যাচিয়ে দেখ্‌তে চাই।

(২)

কেউ হয়ত প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বাঙ্গলাভাষা কাকে বলে? বাঙ্গালীর মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় না। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর কি এই নয় যে, যে ভাষা আমরা সকলে জানি, শুনি, বুঝি, যে ভাষায় আমরা ভাবনা, চিন্তা, সুখ, দুঃখ বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আস্‌ছি, এবং সম্ভবতঃ আরও বহুকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাঙ্গালাভাষা। বাঙ্গলাভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়, বাঙ্গালীর মুখে। কিন্তু অনেকে দেখ্‌তে পাই এই অতি সহজ কথাটা স্বীকার করতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। শুনতে পাই কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ মৌলবী বলে থাকেন যে, দিল্লীর বাদ্‌শাহ যখন উর্দ্দুভাষা সৃষ্টি করতে বসলেন, তখন তাঁর অভিপ্রায় ছিল একেবারে খাঁটি ফার্সীভাষা তৈয়ার করা, কিন্তু বেচারা হিন্দুদের কান্নাকাটিতে কৃপাপরবশ হয়ে হিন্দীভাষার কতকগুল কথা উর্দ্দুতে ঢুক্‌তে দিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যেও হয়ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের বিশ্বাস, যে আদিশূরের আদিপুরুষ যখন গৌড়ভাষা সৃষ্টি করতে উদ্যত হলেন, তখন তাঁর সঙ্কল্প ছিল যে ভাষাটাকে বিলকুল সংস্কৃতভাষা করে তোলেন, শুধু গৌড়বাসীদের প্রতি পরম অনুকম্পা বশতঃ তাদের ভাষার গুটিকতক কথা বাঙ্গলাভাষায় ব্যবহার করতে

তাঁরা ঐ যে গোড়ায় গলদ হয়েছিল তাই শুধ্‌রে নেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। আমাদের ভাষায় অনেক অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ আছে, সেইগুলিকে ভাষার গোড়াপত্তন ধরে নিয়ে তার উপর যত পার আরও সংস্কৃত শব্দ চাপাও, কালক্রমে বাঙ্গালায় ও সংস্কৃতে দ্বৈতভাব থাক্‌বে না। আসলে জ্ঞানীলোকের কাছে এখনো নেই। মাতৃভাষার মায়ায় বদ্ধ বলে আমরা সংস্কৃত বাঙ্গলায় অদ্বৈতবাদী হয়ে উঠতে পারছিনে। বাঙ্গলায় ফার্সী কথার সংখ্যাও বড় কম নয়, ভাগ্যক্রমে ফার্সীপড়া বাঙ্গালীর সংখ্যা বড় কম। নৈলে সম্ভবতঃ তাঁরা বল্‌তেন বাঙ্গলাকে ফার্সীবহুল করে তোলো। মধ্যে থেকে আমাদের মা সরস্বতী, কাশী যাই কি মক্কা যাই, এই ভেবে আকুল হতেন। এক একবার মনে হয় ও উভয় সঙ্কট ছিল ভাল, কারণ একেবারে পণ্ডিত মণ্ডলীর হাতে পড়ে মার আশু কাশিপ্রাপ্তি হবারই অধিক সম্ভাবনা।

(৩)

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথম বক্তব্য এই যে, সাহিত্যের উৎপত্তি মানুষের অমর হবার ইচ্ছায়। যা কিছু বর্ত্তমান আছে, তার কুলুজি লিখ্‌তে গেলেই, গোড়ার দিক্‌টে গোঁজামিলন দিয়ে সারতে হয়। বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, যথা শঙ্কর Spencer প্রভৃতিও ঐ উপায় অবলম্বন করেছেন। সুতরাং কোনও জিনিষের উৎপত্তির মূল নির্ণয় করতে যাওয়াটা বৃথা পরিশ্রম। কিন্তু এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, আর যা হতেই হোক্‌, অমর হবার ইচ্ছে থেকে সাহিত্যের উৎপত্তি হয়নি। প্রথমতঃ অমরত্বের ঝুঁকি আমরা সকলে সামলাতে পারিনে, কিন্তু কলম চালাবার জন্য আমাদের অনেকেরই আঙুল নিস্‌পিস্‌ করে। যদি ভাল মন্দ মাঝারি আমাদের প্রতি কথা, প্রতি কাজ চিরস্থায়ী হবার তিলমাত্র সম্ভাবনা থাক্‌ত, তাহলে মনে করে দেখুন ত আমরা কজন মুখ খুল্‌তে কিম্বা হাত তুলতে সাহসী হতুম? অমরত্বের বিভীষিকা চোখের উপর থাকলে, আমরা যা 'perfect' তা ব্যতীত কিছু বল্‌তে কিম্বা করতে রাজি হতুম না। আর আমরা সকলেই মনে মনে জানি যে, আমাদের অতি ভাল কাজ, অতি ভাল কথাও perfectionএর অনেক নীচে। আসল কথা, মৃত্যু আছে বলেই বেঁচে সুখ। পুণ্যক্ষয় হবার পর আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরে আসবার সম্ভাবনা আছে বলেই দেবতারা অমরপুরীতে ফূর্ত্তিতে বাস করেন, তা নাহলে স্বর্গও তাঁদের অসহ্য হত। সে যাই হোক্‌, আমরা মানুষ, দেবতা নই, সুতরাং আমাদের মুখের কথা দৈববাণী হবে...

দ্বিতীয়তঃ, যদি কেউ শুধু অমর হবার জন্য লিখ্‌ব, এই কঠিন পণ করে বসেন, তাহলে সে ইচ্ছা সফল হবার আশা কত কম বুঝতে পারলে, তিনি যদি বুদ্ধিমান হন তাহলে লেখা হতে নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হবেন। কারণ সকলেই জানি যে, হাজারে নশ' নিরনব্বই জনের সরস্বতী মৃতবৎসা। তা ছাড়া সাহিত্য জগতে মড়ক অষ্টপ্রহর লেগে রয়েছে। লাখে এক বাঁচে, বাদবাকির প্রাণ দু'দণ্ডের জন্যও নয়। চরক পরামর্শ দিয়েছেন, যে দেশে মহামারীর প্রকোপ, সে দেশ ছেড়ে পলায়ন করাই কর্ত্তব্য। অমর হবার ইচ্ছায় ও আশায়, কে সে রাজ্যে প্রবেশ করতে চায়?

(৪)

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আরও বক্তব্য এই, যে জীয়ন্ত ভাষার ব্যাকরণ করতে নেই, তাহলেই নির্ঘাত মরণ। সংস্কৃত মৃতভাষা, কারণ ব্যাকরণের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে সংস্কৃত প্রাণত্যাগ করেছে। আরও বক্তব্য এই যে, মুখের ভাষার ব্যাকরণ নেই, কিন্তু লিখিত ভাষার ব্যাকরণ নইলে চলে না। প্রমাণ—সংস্কৃত শুধু অমরত্ব লাভ করেছে, পালি প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা একেবারে চিরকালের জন্য মরে গেছে। অর্থাৎ, এক কথায় বল্‌তে গেলে, যে কোন ভাষারই হোক্ না কেন, চিরকালের জন্য বাঁচ্‌তে হলে আগে মরা দরকার। তাই যদি হয়, তা হ'লে বাঙ্গলা যদি ব্যাকরণের দড়ি গলায় দিয়ে আত্মহত্যা করতে চায়, তাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আপত্তি কি? তাঁর মতানুসারে ত যমের দুয়োর দিয়ে অমরপুরীতে ঢুকতে হয়। তিনি আরও বলেন যে, পালি প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষায় হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু প্রাকৃত সংস্কৃত নয় বলে পালি প্রভৃতি ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে। অতএব, বাঙ্গালা যতটা সংস্কৃতের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পার, ততই তার মঙ্গল। যদি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত সত্য হয়, তাহলে সংস্কৃতবহুল বাঙ্গলায় লেখা কেন, একেবারে সংস্কৃত ভাষাতেই ত আমাদের লেখা কর্ত্তব্য। কারণ তাহলে অমর হবার বিষয় আর কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু একটা কথা আমি ভাল বুঝতে পাচ্ছিনে, পালি প্রভৃতি ভাষা মৃত সত্য, কিন্তু সংস্কৃতও কি মৃত নয়? ও দেবভাষা অমর হতে পারে, কিন্তু ইহলোকে নয়। এ সংসারে মৃত্যুর হাত কেউ এড়াতে পারে না। পালিও পারে নি, সংস্কৃতও পারে নি, আমাদের মাতৃভাষাও পারবে না। তবে যে ক'দিন বেঁচে আছে, সে ক'দিন সংস্কৃতের মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে বেড়াতে হবে, বাঙ্গলার উপর এ কঠিন পরিশ্রমের বিধান কেন? বাঙ্গলার প্রাণ একটুখানি, অতখানি চাপ সইবে না।

(৫)

এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য যদি ভুল না বুঝে থাকি, তাহলে তাঁর মত সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, বাঙ্গলাকে প্রায় সংস্কৃত করে আনলে, আসামী হিন্দুস্থানী প্রভৃতি বিদেশী লোকদের পক্ষে বঙ্গভাষা শিক্ষাটা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়তঃ, অন্য ভাষার যে সুবিধাটুকু নেই, বাঙ্গলার তা আছে, যে-কোন সংস্কৃত কথা যেখানে হোক্ লেখায় বসিয়ে দিলে বাঙ্গলা ভাষার বাঙ্গলাত্ব নষ্ট হয় না। অর্থাৎ যাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না, তাঁরা যাতে সহজে বুঝতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে আমাদের লিখিত ভাষা দুর্ব্বোধ করে তুলতে হবে। কথাটা এতই অদ্ভুত, যে এর কি উত্তর দেব ভেবে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁর অপর মতটি ঠিক কিনা দেখা যাক্। আমাদের দেশে ছোট ছেলেদের বিশ্বাস যে, বাঙ্গলা কথার পিছনে অনুস্বর জুড়ে দিলেই সংস্কৃত হয়, আর প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মত যে সংস্কৃত কথার অনুস্বর বিসর্গ ছেঁটে দিলেই বাঙ্গলা হয়। দুটো বিশ্বাসই সমান সত্য। বাঁদরের ল্যাজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়? শাস্ত্রী মহাশয় উদাহরণ স্বরূপে বলেছেন, হিন্দীতে "ঘরমে যায়েগা" চলে, কিন্তু "গৃহমে যায়েগা" চলে না, ওটা ভুল হিন্দী হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় ঘরের বদলে গৃহ যেখানে সেখানে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ সকল ভাষার একটা নিয়ম আছে, শুধু বাঙ্গলা ভাষার নেই। যার যা খুসী লিখতে পারি, ভাষা বাঙ্গলা হতেই বাধ্য। বাঙ্গলা ভাষার প্রধান গুণ যে, বাঙ্গালী কথায় লেখায় যথেচ্ছাচারী হতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্ব্বাচিত কথা দিয়েই তাঁর ও ভুল ভাঙ্গিয়ে দেওয়া যায়। "ঘরের ছেলে ঘরে যাও, ঘরের ভাত বেশি করে খেয়ো", এই বাক্যটি হতে কোথাও "ঘর" তুলে দিয়ে "গৃহ" স্থাপনা করে দেখুন ত কানেই বা কেমন শোনায় আর মানেই বা কত পরিষ্কার হয়।

(৬)

আসল কথাটা কি এই নয়? যে লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোন প্রভেদ নেই। ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে, অপর দিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। মুখের কথা শুধু জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখ্‌তে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে,

কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে। কেউ কেউ বলেন যে আমাদের ভাবের ঐশ্বর্য্য এতটা বেড়ে গেছে যে বাপ ঠাকুরদাদার ভাষার ভিতর তা আর ধরে রাখা যায় না। কথাটা ঠিক হতে পারে, কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে তার বড় একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। কনাদের মতে "অভাব" একটা পদার্থ। আমি হিন্দু সন্তান, কাযেই আমাকে বৈশেষিক দর্শন মান্‌তে হয়, সেই কারণেই আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে প্রচলিত বাঙ্গলা সাহিত্যেও অনেকটা পদার্থ আছে। ইংরেজি সাহিত্যের ভাব, সংস্কৃত ভাষার শব্দ, ও বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ এই তিন চিজ মিলিয়ে যে খিঁচুড়ি তয়ের করি তাকেই আমরা বাঙ্গলা সাহিত্য বলে থাকি। বলা বহুল্য ইংরেজি না জান্‌লে তার ভাব বোঝা যায় না আর সংস্কৃত না জানলে তার ভাষা বোঝা যায় না। আমার এক এক সময়ে সন্দেহ হয় যে হয়ত বিদেশের ভাব ও পুরাকালের ভাষা এই দুয়ের আওতার ভিতর পড়ে বাঙ্গলা সাহিত্য ফুটে উঠতে পারছে না। এ কথা আমি অবশ্য মানি যে আমাদের ভাষায় কতক পরিমাণে নতুন কথা আনবার দরকার আছে। যার জীবন আছে তারই প্রতিদিন খোরাক যোগাতে হবে। আর আমাদের ভাষার দেহ পুষ্ট করতে হলে প্রধানতঃ অমরকোষ থেকেই নতুন কথা টেনে আনতে হবে। কিন্তু যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন তাঁর এইটি মনে রাখা উচিত যে প্রতি কথাটির তাঁর আবার নূতন করে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে হবে; তা যদি না পারেন তাহলে বঙ্গ সরস্বতীর কাণে শুধু পরের সোনা পরান হবে। বিচার না করে একরাশ সংস্কৃত শব্দ জড় করলেই, ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হবে না, সাহিত্যেরও গৌরব বাড়বে না, মনোভাবও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করা হবে না। ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ান নয়। যে কথাটি নিতান্ত না হলে নয় সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এসো, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশি ভিক্ষে, ধার কিম্বা চুরি করে এনো না। ভগবান পবননন্দন বিশল্যকরণী আন্‌তে গিয়ে আস্তো গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে এনেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেন্ নি।

বীরবল।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরম পূজার্হ ওহে বিচারকবর,
এ পাপপঙ্কিল ভূমে তুমিই অমর!
করেতে শাসনদণ্ড, প্রাণ পূর্ণ প্রেমে,—
আসিয়াছ হে মহান্, স্বর্গ হ'তে নেমে।
দেবতার চরণের নির্ম্মাল্যের প্রায়
আলোকিত বঙ্গভূমি তোমার প্রভায়!
বিমল পবিত্র তুমি হে পরার্থপর,
তোমারে হেরিলে নিত্য পুলকে অন্তর!
সকল কর্ম্মের মাঝে—অক্ষুণ্ণ প্রতাপে—
হও নাই নত তুমি অদৃষ্টের শাপে!
চিরদিন সত্যপথে এসেছ চলিয়া
আত্মার মর্য্যাদাখানি মাথায় রাখিয়া!
ধন্য তুমি কর্ম্মবীর! হে সফলকাম,
করি তব চরণেতে অসংখ্য প্রণাম!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

ছাব্বিশ, ষড়বিংশ ও ষড়বিংশতি।

কোন বন্ধু আমাদের লিখিয়াছেন—"নববর্ষের 'ভারতীর' মলাটে বামকোণে বর্ষস্থানে দেখিলাম লেখা রহিয়াছে 'ষড়বিংশতি-বর্ষ'। সেইখানকার কাগজটুকু যেন মসৃণ বোধ হইল না। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম উহা একটি স্লিপ্। সেটুকু তুলিয়া ফেলিয়া নীচে পুরাতন 'পঞ্চবিংশবর্ষ'কে বিরাজিত দেখিলাম। তখন একটা প্রশ্ন মনে উদয় হইল। 'ষড়বিংশতি-বর্ষ' কি বিশুদ্ধ? মুদ্রাকরদোষে নববর্ষ প্রথমে স্বনামাঙ্কিত না হওয়ায় সে ত্রুটি সংশোধনের অভিপ্রায়ে শেষমুহূর্ত্তে ত্বরান্বিত সম্পাদক, বা কার্য্যাধ্যক্ষ বা যন্ত্রাধ্যক্ষের লেখনী-প্রমাদে (slip of the penএ) 'ষড়বিংশ' 'তি' সংযুক্ত হইয়া পড়ে নাই ত? বলিয়া রাখি সংস্কৃত বিদ্যার আমি কোন ধার ধারি না, এবং সংস্কৃত ব্যাকরণে একেবারেই অনভিজ্ঞ। কিন্তু একটা ধারণা এই আছে যে খাঁটি বাঙ্গলা 'ছাব্বিশ' শব্দ যেমন সংখ্যাবাচক (cardinal) ও পূরণার্থক (ordinal) উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃত 'ষড়বিংশতি' শব্দ সেইরূপ হইতে পারে না। পূরণার্থক বুঝাইতে হইলে হয় 'ষড়বিংশতি'র 'তি' বর্জ্জন করিয়া 'ষড়বিংশ' করিতে হইবে, নয় 'তম' সংযোগ করিয়া 'ষড়বিংশতিতম' করিতে হইবে। অন্যথা পূরণার্থে অশুদ্ধ হইবে। সুতরাং 'ষড়বিংশতি-বর্ষ' এই বাক্যের শুদ্ধতা সন্দেহজনক নয় কি? এবিষয়ে আমার সংস্কারটি ভ্রান্ত কি না জানাইলে পরম উপকৃত হইব।"

বন্ধুবরের উল্লিখিত প্রশ্ন অন্যান্য পাঠকের মনেও উদিত হইতে পারে, সেইজন্য উহার উত্তরটি 'ভারতী'তেই লিপিবদ্ধ হইল।

প্রশ্নকর্ত্তার সংস্কারটি একেবারে অমূলক নহে, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভুলও নহে। 'ষড়বিংশতি' পূরণার্থক শব্দ নহে, ইহা ঠিক। কিন্তু 'ষড়বিংশতি-বর্ষ' ভ্রমাত্মক নহে। উহা বিশুদ্ধ রীতিতেই লিখিত। এখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের মূলসূত্র উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কেবল সংস্কৃতকাব্যের টীকাকার মল্লিনাথ প্রভৃতির ন্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ "ত্রিদিবং" "ত্রিভাগঃ" ইত্যাদি পদ যে প্রণালীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহারই উল্লেখ করিব।

টীকাকারগণ বলেন—"বৃত্তিবিষয়ে সংখ্যাবাচক শব্দস্য পূরণার্থত্বং।" অর্থাৎ, সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দ পূরণার্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। 'ষড়বিংশতি' ও 'বর্ষ'

ইটী শব্দের পরস্পর সমাস হইয়াছে। সমাসবশতঃ এস্থলে 'ষড়্বিংশতি' এই সংখ্যাবাচক শব্দের 'ষড়বিংশ' অথবা 'ষড়বিংশতিতম' এইরূপ পূরণার্থ ব্যক্ত হইতেছে। সুতরাং ষড়বিংশতিবর্ষ = The 26th year.

মল্লিনাথ ভূয়োভূয়ঃ লিখিয়াছেন—ত্রিদিবং = তৃতীয়ং দিবং ; বা তৃতীয়া দ্যৌঃ = the third world (= heaven)। ত্রিভাগঃ = তৃতীয়ঃ ভাগঃ = the third part.

মল্লিনাথের টীকাসম্বলিত যে কোন সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ হাতে লইলেই এসম্বন্ধে সন্দেহ অপগত হইবে।

গ্রন্থ সমালোচনা।

নেড়াহরিদাস। মূল্য ১৲ টাকা। বঙ্গবাসী মেসিন প্রেসে মুদ্রিত। মডেল ভগিনী, কালাচাদ, চিনিবাসচরিত্রামৃত প্রভৃতি উপন্যাস প্রণেতা কর্ত্তৃক বিরচিত। এই বইখানির ছাপা, কাগজ, বান্ধাই খুব ভাল। বাঙ্গালা নবেল সাধারণতঃ এত ভাল সাজসজ্জায় বাহির হয় না। গ্রন্থকারের লেখাও ভাল, শব্দ চাতুর্য্যে তিনি সিদ্ধহস্ত। গল্পটীও মোটের উপর ভালই হইয়াছে, তবে এই গ্রন্থের চরিত্রাঙ্কন ও রসসৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

পাপের শোচনীয় পরিণাম ও পুণ্যের অজেয় প্রভাব অঙ্কিত করাই সদ্‌গ্রন্থ মাত্রের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকারও সেই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন। এই সাধু সঙ্কল্প দুইপ্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে। প্রথমতঃ পুণ্যচিত্রের পাশে পাপচিত্রের সমাবেশ করিয়া পুণ্যচিত্রকে অধিকতর উজ্জলবর্ণে চিত্রিত করিয়া, দ্বিতীয়তঃ পাপের চিত্রকে গাঢ় মসীময় বর্ণে চিত্রিত করিয়া,—বলা বাহুল্য এই দুইপ্রকার চরিত্রাঙ্কনেই শিল্পীর বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। প্রথম উপায় অবলম্বন করিলে, পুণ্যচিত্র অপেক্ষা পাপচিত্র অধিকতর উজ্জ্বল না হইয়া পড়ে, এবিষয়ে শিল্পীকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ পাপের স্বাভাবিক মোহিনী শক্তি খুব প্রবল। তাহাতে যদি আবার উজ্জ্বল বর্ণপাত করা হয়, তবে তাহাকে পুণ্যচিত্রের

পাশে দাঁড় করাইলে পুণ্যের মুখচ্ছবি ম্লান হইয়া পড়িবে। সুতরাং তদ্বারা পাঠকের সহানুভূতি পুণ্যের দিকে বেশী আকৃষ্ট না হইয়া পাপের দিকে বেশী আকৃষ্ট হইবে। অতএব তদ্দারা গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রাঙ্কনের বিপদ আরও অধিক। পাপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইলে, এখানে পুণ্যচিত্রের অভাবে তুলনা দ্বারা তাহা সুসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং শিল্পীকে বাধ্য হইয়া পাপচিত্র সম্যক্‌রূপে ফুটাইবার জন্য তাহার উপর ক্রমাগত রঙের উপর রঙ চড়াইতে হয়। তাহাতে সেই পাপচিত্রটী ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া পাঠকের মনে ঘৃণা, ভয়, বিস্ময়াদি ভাবের উত্তেজনা করে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার এক প্রধান দোষ এই ঘটে যে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ না করিলে সে পাপচিত্র স্বভাবকে অতিক্রম করিতে পারে। সেই পাপচিত্রটী চিত্রকরের দোষে এক অস্বাভাবিক কিম্ভূতকিমাকার জীবে পরিণত হয়। তাহার সহিত পাঠকের কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য না থাকাতে পাঠক মনে করেন, "এ আমি নহি।" ইহা বলিয়াই তাহাকে পত্রপাঠ বিদায় করিয়া দিতে অধিকারী হয়েন। সুতরাং তদ্দারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না।

নেড়াহরিদাসের গ্রন্থকার চরিত্রাঙ্কন বিষয়ে এই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এই জন্য গ্রন্থারম্ভেই তিনি নেড়াহরিদাসের চরিত্রদোষের এক লম্বা কেটালগ দিয়াছেন। এই কেটালগ হাতে করিয়া বই পড়া আরম্ভ করিলে নেড়া-চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও শেষপরিণতি কি হইবে, তাহার জন্য পাঠকের বিশেষ কোন কৌতূহল থাকে না। আর এই কেটালগের সমস্ত দোষগুলি এক ব্যক্তির ঘাড়ে চাপান হইয়াছে বলিয়া, সেঁগুলি তাহার স্বাভাবিক চরিত্রের রক্তমাংসের সহিত মিশ্রিত কি সেগুলি একটী জামার মত কেবল তাহার চরিত্রের উপরে আরোপ করা, এবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আর স্বাভাবিক চরিত্রে একটা দোষ আর একটা দোষের সঙ্গে যে ভাবে মিশ খাইয়া থাকে, সেরূপ নেড়ার একটী দোষ আর একটী দোষের সহিত মিশ্‌ খাইতে পারে নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি। নেড়া হরিদাস যেমন ঈসপের গল্পের শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত, তেমনি পঞ্চতন্ত্রের বিড়ালতপস্বীর মত ভণ্ড। কিন্তু তাহার কার্য্যকলাপ দেখিলে বুঝা যায়, তাহার ধূর্ত্ততার সহিত তাহার ভণ্ডামির মিশ্‌ খায় নাই। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে কাতর হইয়া তাঁহার বাড়ী ঘর ২০০০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া কাশীবাসী হইবেন। তাঁহার সেই টাকাটা

তিনি চোর ডাকাতের ভয়ে সঙ্গে না লইয়া হরিদাসের জিম্মায় রাখিয়া যাইবেন, আর হরিদাস মাসে মাসে তাঁহাকে ১৫৲ টাকা পাঠাইবেন। ঠাকুর এই মনস্থ করিয়া হরিদাসের নিকট গেলেন। ধূর্ত্ত হরিদাস এই প্রস্তাব শুনিবামাত্রই ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দিয়া সেই টাকাটা আত্মসাৎ করিবেন এই সঙ্কল্প করিলেন। এখন তাঁহার এই ধূর্ত্ততা ভণ্ডামির আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়া অবশ্য তিনি ব্রাহ্মণের সহিত কথা বলিবেন। অথবা ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে এরূপ দেখাইতে হইবে যে তিনি ভণ্ড নহেন, একজন পরম সাধু। কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার ভণ্ডামির মাত্রাটা এত অধিক চড়াইয়া দিয়াছেন যে অতি সহজেই যে কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া ধরিতে পারে। ব্রাহ্মণের পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া হরিদাস বলিলেন।

"আহা! আপনার একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুতে আমি তিন দিন খাই নাই (ক্রন্দনের স্বর)।"

ব্রাহ্মণ যদি নিতান্ত বোকা না হইতেন তবে শুধু এই কথাতেই তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া চিনিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন।

তার পরে হরিদাস টাকার কথা শুনিয়া বলিলেন—

("চমকিয়া উঠিয়া) ওরে! বাপরে! কি সর্ব্বনাশ! আমি অন্যের টাকা স্পর্শ করি না। আপনাকে বরং আমি নগদ ৫০৲ টাকা দিতে পারি, কিন্তু অন্যের টাকা আমি স্পর্শ করিব না।"

এই রকম আরও অনেক বড়াবাড়ি আছে।

এইরূপে ১৪৬ পৃষ্ঠায় দেওয়ানজীর মৃত্যু সংবাদ হরিদাস শ্রীমতী বৃন্দাকে এইভাবে বলিতেছেন—

"হরিদাস। বড় বৌ! সে দুঃসংবাদের কথা আমি তোমাকে কেমন করিয়া বলিব? হা রাধারমণ! তুমি এই দুঃসংবাদ বড় বৌকে দিবার জন্য আমাকে কি দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছ? হা! শ্রীনন্দের নন্দন! আমার ভাগ্যলিপিতে কি এই লিখিয়াছিলে? আমাকেই কি এই দুঃসংবাদটা শ্রীমতী বৃন্দাকে শুনাইতে হইবে? (উত্তরীয় বসনদ্বারা মুখ ঢাকিয়া পুনরায় ক্রন্দন)।"

এ নিতান্ত বাড়াবাড়ি নহে কি? এখানে হরিদাসের ভণ্ডামির উচ্ছ্বাসের তলে তাহার ধূর্ত্ততা ও বিষয়বুদ্ধি ডুবিয়া গিয়াছে। কারণ বৃন্দার ন্যায় চতুর স্ত্রীলোকের নিকট এরূপ

আবার শ্রীমতী বৃন্দা যখন ফাঁদ পাতিয়া হরিদাসকে সেই ফাঁদে ফেলিবার জন্ত তাহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নেড়ার নামে লিখিয়া দিবার ভান করিয়া সভা করিল, সেই সভাতেও হরিদাস সেই ত্যাগ-নামা লেখার সময়ে ভণ্ডামির ভয়ানক বাড়াবাড়ি করিয়াছে ; আবার থাকিয়া থাকিয়া নির্লজ্জের স্তায় যাহাতে সেই ত্যাগনামাটা নির্ব্বিঘ্নে লেখা শেষ হয় ও সকলের সম্মুখে বৃন্দার দস্তখত হয় তাহাতেও আগ্রহাতিশয্য দেখাইয়াছে। তাহার এই দুইটী ভাবের পরস্পর সামঞ্জস্ত হয় না। হরিদাসকে যদি ধূর্ত্ত বলা যায়, যদি তাহার সেই বিশাল সম্পত্তি লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে বুঝা যায়, তবে তাহার ভণ্ডামিরমাত্রা এতদূর চড়ান কোন ক্রমেই সুবুদ্ধির কার্য্য হইতে পারে না। কারণ বোকা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত ব্যবহারে সে যাহাই করুক না কেন, সেই সভার মধ্যে গুণসিন্ধু মোক্তার প্রভৃতি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি লোকের নিকট বেশী বাড়াবাড়ি করিলে "অতিভক্তি চোরের লক্ষণ" বলিয়া তাহারা তাহাকে সহজেই ধরিয়া ফেলিবে, ধূর্ত্ত হরিদাসের এরূপ জানা উচিত ছিল।

এইরূপে বেশী মাত্রায় রঙ চড়ায় হরিদাসচরিত্র নিখুঁত হইয়াছে বলিতে পারি না। বৃন্দার চরিত্রেও এই রকম অনেক বাড়াবাড়ি আছে।

যাহা হউক, পুণ্যচিত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে পাপচিত্র ফলাইয়া কৃতকার্য্য হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। গ্রন্থকার তাহাতে যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাই বিশেষ প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

পুণ্যচরিত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে পাপচিত্রাঙ্কনের আর একটা বিশেষ অসুবিধা আছে, তাহাও এ গ্রন্থে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। পাপচিত্র দেখিতে দেখিতে নয়ন মনের একপ্রকার অবসাদ, অস্থিরতা উপস্থিত হয় ; সেই "গা গিস্ গিস্ করা" দৃশ্য ও নরকের পূতিগন্ধময় বর্ণনা ক্রমাগত দেখিয়া ও শুনিয়া ধৈর্য্য রাখা কঠিন হয়, যেন দম আট্‌কিয়া আসে। তখন কোন একটী পুণ্যচিত্র দর্শন করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ গ্রন্থে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইলে তবে শীতল জলের মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায়। গ্রন্থকার পাঠকের মনে পুণ্য পিপাসা জাগাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরিতৃপ্তির কোন ব্যবস্থা করেন নাই। এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে তাঁহার পুণ্যের জয়ঘোষণার উদ্দেশ্য অধিকতর সফল হইত বলিয়া বোধ হয়।

লেখক অনেক স্থলে হাস্তরসের অবতারণা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। হাস্তরসের

উদ্ভব দুই রকমে হইতে পারে। প্রথমতঃ দুই কিম্বা ততোধিক বস্তুর স্বাভাবিক সংস্থানের কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া তাহাদের মধ্যে হাস্যোদ্দীপক কোন নূতন সম্বন্ধ আবিষ্কার করা দ্বারা। দ্বিতীয়তঃ হাস্যোদ্দীপক উদ্দেশ্যে সেই সেই বস্তুর স্বাভাবিক সংস্থানের বিকৃতি ঘটাইয়া। প্রথমটী স্বাভাবিক wit ও humour, দ্বিতীয়টী অস্বাভাবিক Satire ও caricature. ইংরাজী সাহিত্যে প্রথমটীর রাজা Dickens; দ্বিতীয়টীর রাজা Punch. প্রথমটী অপরাধীকে শিক্ষা দেয় হাসাইয়া, দ্বিতীয়টী তাহাকে শিখায় কাঁদাইয়া। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থে দ্বিতীয়টীর উদাহরণ অনেক আছে, তাহাতে লেখক অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিন্তু প্রথমটীতে দুই একটী স্থান ভিন্ন তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হরিদাস বক্ষঃস্থিত মালার ঝুলির মধ্যে অঙ্গুলি সন্নিবেশিত করিয়া অনেক সময়ে সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত পাশা খেলার চাল বলিয়া দিতেন, ইহা একটী প্রথম শ্রেণীর বিশুদ্ধ হাস্যরসের উদাহরণ। অন্য অনেক স্থলে তিনি বিশুদ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু অতিশয়োক্তি দোষে তাহা ফুটিতে পারে নাই।

৬৪ পৃষ্ঠায়—

"অট্টালিকার একমাত্র অধিকারিণী একটী মহিলা। তাঁহার স্বামী নাই, শ্বশুর শাশুড়ী নাই,—তাঁহার ভাসুর দেবর সন্তান সন্ততি কেহই নাই—কিছুই নাই। তাঁহার পিতামাতা, খুড়া, জেঠা, পিশি, মাসী, কেহই নাই। তাঁহার একটী ভগিনীপতিও নাই। তিনি একাকিনী।"

ইহা পড়িয়া হাসি পায় কি? না, রুচিদোষ হিসাবে খট্‌কা লাগে, জুগুপ্সা হয়? এই রকম গ্রন্থের মধ্যে আরও অনেক আছে।

বিকৃতিমূলক হাস্যরসের (Caricature) উদাহরণ দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আছে। যেমন একদিন অন্য পাড়ায় কালীপূজার পাঁঠাবলি হইবে, সেই পাঁঠা কাটার বাজনার শব্দ কাণে আসিবে ভয়ে হরিদাস তুলা দিয়া কাণ বন্ধ করিলেন। আর একদিন চিকের আড়ালে স্ত্রীলোকের ছায়া দেখিবেন ও টাকা দেখিবেন ভয়ে হরিদাস মুখে ঘোমটা দিয়া কথকতা শুনিতেছেন। এগুলি ভণ্ডামির পৃষ্ঠে সুতীব্র কশাঘাত সন্দেহ নাই।

আলোচ্য উপন্যাসের প্লটে কিঞ্চিৎ দোষ আছে। ব্রাহ্মণ কাশীতে গিয়া অর্থাভাবে ঋণগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার বাড়ীওয়ালা বাড়ীভাড়ার জন্য একদিন তাঁহাকে অযথাক

উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, এমন কি তাঁহাকে আটক করিয়া রোদে বসাইয়া রাখিল। কিন্তু বাড়ীওয়ালার এই কড়া খাড়াপাহারাসত্ত্বেও ব্রাহ্মণ কি উপায়ে তাহার হাত হইতে সস্ত্রীক পলাইয়া আসিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণটী যে রকম বোকা ভালমানুষ তাই আরও খট্‌কা লাগে।

আর একটী কথা। শ্রীমতী বৃন্দার হঠাৎ বৈরাগ্যোদয় কি করিয়া হইল? অবশ্যই ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই নিরন্তর ভোগবিলাসমুগ্ধা কুলটা রমণীর বিনাসাধনায় বিনাগুরূপদেশে যদি এত সহজেই বৈরাগ্যধন মিলিয়া গেল, তবে পাপরাজ্য হইতে পুণ্যরাজ্যে যাইবার পথটী নিতান্তই কুসুমাস্তরণে সজ্জিত বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে, বৈরাগ্যলাভের জন্য সেই আজন্মশুদ্ধ ধ্রুব, শুকাদির এত কঠোর সাধনার আবশ্যকতা থাকে কি? আর পাপের পথ ও পুণ্যের পথের মধ্যে যদি এত অল্প ব্যবধান হয়, তবে একথা জানিলে লোকের পাপ প্রবৃত্তি কমিবার কোন আশা থাকে না। গ্রন্থকার শ্রীমতী বৃন্দার প্রতি যেমন সদয় দেখিতেছি, নেড়াহরিদাসের প্রতি তেমনি নির্দ্দয়। কেন? সে বেচারা কোন্ চোরের গরু চুরি করিয়াছে যে, গ্রন্থকার দেওয়ানজীর তামাক সাজা ভিন্ন তাহার আর কোন সদ্গতি করিতে পারিলেন না?

কমল কুঁয়ারের কারামুক্তি।

১

রাষ্ট্র হয়ে গেল দিল্লী সহর
বিরাজে প্রাসাদে কমলকুঁয়র;
জসলমের হতে আইলা বালা
রঙ্গ মহলে বন্দী একেলা;
দাসীর বাজারে নাই, হেন রূপসী,
হারমানে তার কাছে, রাজমহিষী,

২

ওরূপ হেরিতে সবাই অধীর
বাদসাজাদার বীর মহাবীর;
প্রাণ হাতে লয়ে পঞ্চাশ জনা
ভয়ে একে একে পশে জনানা,
ঘুস দিয়ে করি বশ, প্রহরী দলে,
প্রবেশে ওমরা যত, অন্দর মহলে।

৩

বেরোয় যবে নিজ গৃহছাড়ি
আছিল তাদের লম্বা দাড়ী;
বিদায় নিয়ে যবে ফিরিয়া আসে
দাড়ীহীন দেখে সবাই হাসে,
চাঁচা পোঁছা মুখে যবে, ফিরিল ঘরে
তাদের আপন মাতা, চিনিতে নারে,

৪

"আমায় যে জন জিনিতে চায়
দাড়ী গোঁপ যেন রাখিয়া যায়,"
বরাঙ্গনার শুনিয়া পণ
সাধিল সবে আদেশ যেমন—
বেচারা কি করে তারা, শুনে সে বাণী,
গুম্ফদাড়ী ভারি ভারি, ফেলে অমনি।

৫

আমীর ওমরার গুম্ফদাড়ী
লয়ে রচে কুঁয়ার কঠিন দড়ী—
বাহির দেওয়ালে লট্‌কে তায়
প্রাচীর টপ্‌কে দেশে পালায়,
ঝুলায়ে দাড়ীর দড়ী, প্রাচীর গায়,
দ্বারপালে দিয়ে ফাঁকী পাখী পালায়।

৬

বাদসা শুনিয়ে জ্বলিল কোপে,
ভয়ে থর থর সবাই কাঁপে;
ঝুলিল সকলে ছিল যাহারা
রং মহলে রঙ্গে মাতওয়ারা।
আপন দাড়ীর ফাঁসে, আলম্বমান
আমীর পঞ্চাশ জনা, ত্যজে পরাণ।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

পুরীর আদালত।

পুরী একটা জেলা না মহকুমা? এ প্রশ্ন আমাকে কোন কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি বলি উহা অর্দ্ধ জেলা। অর্থাৎ ফৌজদারী বিচার বিভাগানুসারে উহা একটী জেলা, কিন্তু দেওয়ানী বিচার বিভাগানুসারে উহা একটী মহকুমা। আমি যদি বলি উহা একটী পূরা জেলা, অভিজ্ঞ পাঠক অমনিই ধরিয়া বসিবেন, "এ কেমন কথা? জজ নাই, সবজজ নাই—সেটা আবার একটা জেলা?" কাজে কাজেই আমি পুরীকে জেলা বলিতে সাহস করি না। কটক, পুরী ও বালেশ্বর তিন জেলায় একজন জজ, একজন সবজজ। তাঁহারা কটকেই থাকেন। পুরীতে সবে-ধন-নীলমণি একটী মাত্র মুনসেফ্ দেওয়ানী বিভাগ অলঙ্কৃত করিয়া বিরাজমান আছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উড়িষ্যায় অনেক সামাজিক ও বৈষয়িক বিবাদ পল্লীগ্রামে পঞ্চাইতগণ নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে, অথবা মামলাবাজ না হইলে, কেহ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে না। আবার ভূমিকর সংক্রান্ত মোকর্দ্দমা এখন পর্য্যন্ত দশ আইন অনুসারে কালেক্টরিতে বিচার করা হয়। এ কারণে দেওয়ানী আদালতের হাকিমের সংখ্যা উড়িষ্যায় নিতান্ত কম।

পুরীর গবর্ণমেণ্ট আফিসসমূহ সমুদ্রতীরে বালির উপরে অবস্থিত। আদালত গৃহটী ছোট একতালা কোঠা, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চলুন আমরা একবার এই কাছারিঘরে প্রবেশ করি।

পাঠক হয়ত মনে ভাবিতেছেন, এ উড়িয়া দেশের কাছারি, এখানে হাকিম আমলা উকীল সকলেই মস্তকে লম্বা টিকিধারী, গলায় "কণ্ঠী"

হইতে মধ্যে মধ্যে "পান-গুয়া-গুণ্ডী" বাহির করিয়া চর্ব্বণ করিতেছেন। কলিকাতার সহরে সর্ব্বত্র বিচরণকারী, পরস্পরকলহকারী, বহুবিধ কার্য্যকারী উৎকলবাসী বৃদ্ধকে দেখিয়া আপনার এরূপ ধারণা হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বিচারগৃহে একবার প্রবেশ করিলে আপনার সে ধারণা দূর হইবে। এই আদালতের হাকিম উড়িয়া নহেন, বাঙ্গালী। তাঁহার নাম যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। আমলা উকীল প্রায়ই উড়িয়া, কিন্তু তাঁহাদের বেশভূষা সভ্যভব্য রকমের। তবে মাথায় লম্বা টিকি, গলায় সূক্ষ্ম মালা, কপালে তিলকফোঁটা প্রায় সকলেরই আছে। হাকিম উচ্চ এজলাসে বসিয়াছেন। তাঁহার চেহারা খুব সুন্দর, বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর, মুখে দাড়ী নাই—গোঁফ আছে; সাদা চাপকান চোগা পরিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে পেস্কার অভিমন্যু মাহান্তি একটা বড় সাদা চাদর পাকাইয়া মাথায় মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় এক প্রকাণ্ড ফেটা বাঁধিয়াছেন ও বেঞ্চের উপর বসিয়া অতি ব্যস্ততা সহকারে লেখাপড়া করিতেছেন। এজলাসের সম্মুখে বেঞ্চের উপর উকীলগণ গুলজার হইয়া বসিয়াছেন। তাঁহাদের মোহরেরগণ পশ্চাদ্ভাগে কাণে কলম গুঁজিয়া সঞ্চরণ করিতেছেন। কেহ আসিয়া তাঁহার উকীলবাবুর দ্বারা একখানা ওকালত নামা দস্তখত করাইতেছেন, উকীলবাবু নাম দস্তখত করিবার আগে বায়নার টাকার জন্য হাত বাড়াইতেছেন। কেহ আজ তিন দিন হইল ডিক্রিজারির দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত হুকুম বাহির হয় নাই; সে জন্য আমলার নিকট কিরূপ "তদ্বির" করা আবশ্যক উকীল বাবুর সহিত চুপে চুপে তাহার পরামর্শ করিতেছেন। কেহ আজ দুই দিন হইল নকলের দরখাস্ত দিয়াছেন, এপর্য্যন্ত নকল পান নাই; সে নকলটী নেওয়া বড়ই জরুর, অথচ অতিরিক্ত ফিও দিবেন না; এখন আমলাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণান্ত করিলে আজই নকল পাওয়া যায়; উকীলবাবু মুয়ক্কেলের উপকারার্থে সে টাকাটা নিজে

দিবেন কি না, তাহাই জানিতে আসিয়াছেন। উকীলবাবু তখন একজন সাক্ষীর জেরা করিতেছিলেন, সাক্ষী তাঁহার মনোমত জবাব না দিয়া সত্য কথা বলিতেছিল, তিনি তাহাকে কোন প্রকার প্যাঁচে ফেলিতে পারিলেন না, এই জন্য তাঁহার মেজাজটা বড় ভাল ছিল না। তিনি বিরক্ত হইয়া "মু যাউছি পেরা—টিকে সবুর করি পার নাঁহি।" বলিয়া তাঁহার মুহুরীকে ধমক দিলেন। আর একজন মোহরের, একটা সমন জারি করিবার জন্য মফঃস্বলে পেয়াদা পাঠাইতে হইবে, কিন্তু তাহাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা না দিলে সে সমন গরজারি দিবে, উকীলবাবুকে একথা জানাইয়া তাঁহার নিকট হইতে একটী টাকা লইয়া গেলেন। একজন উকীল সবেমাত্র কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, অনেক দিন পরে মফস্বলের একজন তদ্বিরকারক (tout), অৰ্দ্ধা অৰ্দ্ধি বন্দোবস্তে তাঁহার জন্য একটা মোকৰ্দ্দমা জুটাইয়া আনিয়াছিল। এখন সে মোকৰ্দ্দমা ডিসমিস্ হইয়া গেল; সেই তদ্বিরকারক মুয়ক্কেলের নিকট হইতে যে ২৲ টাকা আদায় করিয়াছিল, তাহার ১॥০ টাকা স্বয়ং আত্মসাৎ করিয়া বাকী ॥০ আনা উকীলবাবুকে দিতে গেল। তিনি ক্রোধভরে বাহিরে উঠিয়া গিয়া তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে, রাগ করিলে কোন ফল নাই দেখিয়া আবার তাহা কুড়াইয়া লইলেন ও সেই তদ্বিরকারককে আবার আর একটী মোকৰ্দ্দমা জুটাইয়া আনিতে অনুরোধ করিলেন।

এইরূপে কাছারির কার্য্য পুরাদমে চলিতেছে। এখন একটী দোতরফা মোকৰ্দ্দমার বিচার আরম্ভ হইল। আদালতের পেয়াদা "হাজির হায়—হাজির হায়" বলিয়া চীৎকার করিলে বাদী পঙ্কজ সাহু ও প্রতিবাদী চিন্তামণি নায়ক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতৃঅঞ্চলধারী শিশুর ন্যায় পঙ্কজ সাহু তাহার উকীল লম্বোদর বাবুর সঙ্গে আসিল।

উকীলবাবুর নামটী লম্বোদর বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি ভয়ানক কৃশোদর—চেহারা খুব লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ, দাড়ী গোঁফ কামান, মস্তকের চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, কিন্তু একটা বড় লম্বা টিকি বানরের লেজের মত ঝুলিতেছে ; গলার ও মুখের চোয়ালের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পরিধানে কাল আলপাকার চাপকান, তাহার উপরে চাদর। উকীলবাবু খুব ব্যস্ততার সহিত ঘরে ঢুকিয়া বিচারপতিকে দণ্ডবৎ করিয়া দাঁড়াইলেন। পঙ্কজ সাহু তাঁহার পশ্চাৎ কতকগুলি তাল পত্র ও কাগজ বগলে করিয়া দাঁড়াইল। মণিনায়কও সেই এজলাসের সম্মুখে গলার উপরে একখানা ময়লা গামছা দিয়া জোড়হস্তে দাঁড়াইল। তাহার শরীর মলিন, কৃশ ; মুখে উদ্বেগ ও হতাশের চিহ্ন।

উকীলবাবু এইরূপে মোকর্দ্দমা আরম্ভ করিলেন—

"হুজুর! এ একটী বন্ধকা তমঃস্থকের মোকর্দ্দমা। আমার মুয়ক্কেল পঙ্কজ সাহু নীলকণ্ঠপুরের একজন বড় মহাজন। ইনি একজন ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি"—

হাকিম পঙ্কজ সাহুর দিকে তাকাইলেন। বৃদ্ধ মহাজন অমনি পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া, একটু বড় গলায় "কৃষ্ণ—কৃষ্ণ" বলিয়া উঠিল।

উকীলবাবু বলিলেন—"কদাচ ইনি মিথ্যা মোকর্দ্দমা করেন না। ইনি সে দেশে আছেন বলিয়া, সেখানকার গরিব দুঃখী লোক এ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে। কিন্তু লোকগুলা নিতান্ত "দ্রুষ্ট," তাহারা "টঙ্কা" কর্জ্জ করিয়া তাহা আর শুধিতে জানে না, জমি বন্ধক রাখিয়া পরে তাহা একেবারে অস্বীকার করিয়া বসে, এমন কি "টঙ্কা" নেওয়ার কথাও অস্বীকার করে। হুজুরের ধর্ম্মবিচার আছে বলিয়াই এ সকল নিরীহ মহাজন টঙ্কা কর্জ্জ দিতে সাহস করেন। এই ব্যক্তি মণিনায়ক আজ তিন বৎসর হইল আমার মুয়ক্কেলের নিকট হইতে তমঃস্থক

দিয়া ৫০৲ টঙ্কা কর্জ্জ করিয়াছিল, আর তাঁহাকে তুই মাল জমি "দখল বন্ধক" দিয়াছিল। কিন্তু এখন সে টঙ্কাও দেয় না, আর জমিও জোর দখল করিতে চাহে।"

মণিনায়ক কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"হুজুর ধর্ম্মাবতার! ধর্ম্মবিচার হউক! আমি নিতান্ত "রঙ্ক"—এই উকীল যাহা বলিলেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। পঙ্কজ সাহু এক জন "কৌড়ীবন্ত" মহাজন, তুই ক্রোশ পৃথ্বীর জমিদার। তিনি মিছা কথা কহিবার জন্য অনেক উকীল দিতে পারেন। কিন্তু আমি নিতান্ত গরিব, আমার উকীল হুজুর।"

এ কথা শুনিয়া উকীল বাবু চটিয়া উঠিলেন. তিনি সবেগে মাথা নাড়িয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া মণিনায়কে বলিলেন—

"কি বলিলি, আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি? তুই সাবধান হইয়া কথা বলিস্। হুজুর, আমার প্রমাণ গ্রহণ করুন।"

উকীল বাবুর মাথা নাড়ার চোটে তাঁহার মাথার সুদীর্ঘ চুটকী ঘুরিতে ঘুরিতে একবার তাঁহার বামকর্ণ আবার তাঁহার দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিল। তাঁহার গলার শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল ও মুখের হাড় বেশী রকম জাগিয়া উঠিল। এই সকল গোলযোগে তাঁহার চাপকানের গলার বোতাম ছিঁড়িয়া যাওয়াতে, তাহার কতক অংশ ডানদিকে বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িল। হাকিম একটু মুচকি হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আপনার সাক্ষী ডাকান।"

প্রথম সাক্ষী বিচিত্রানন্দ মাহান্তি পঙ্কজ সাহুর গোমস্তা। ইনি যথারীতি হলপ পরিয়া তমঃসুক প্রমাণ করিলেন ও মণিনায়ককে তিনি স্বহস্তে ৫০৲ টাকা গণিয়া দিয়াছেন বলিলেন।

তখন হাকিম মণিনায়ককে বলিলেন "তুমি এই সাক্ষীকে জেরা কর।"

মনি। (যোড় হস্তে) হুজুর আমি গরীব মানুষ, আমি কি "জরা" করিব ?

হাকিম। তুমি এই সাক্ষীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে ?

মণি। সে মিছা কথা বলিল আমি আর তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিব ? (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা "ছাম করন" ! (১) তুমি সত্য কহিলা ?

সাক্ষী। তবে কি আমি মিথ্যা কহিলাম ?

মণি। তুমি তোমার পোর মুণ্ডে হাত দিয়া একথা বলিতে পার ?

সাক্ষী। (হাকিমের প্রতি এক চক্ষু স্থাপন করিয়া) আমি তাহা কেন করিতে যাব ?

মণি। হুজুর এ ব্যক্তি মহাজনের "কার্য্য"(২) ইহার কথা বিশ্বাস করিবেন না।

তখন এ সাক্ষী বিদায় হইল, অন্য সাক্ষী আসিল। ইনি বামদেব মহান্তি—সেই পাঠশালের গুরুমহাশয়। বামদেব সাক্ষীর কাঠরার মধ্যে ঢুকিবার সময় "থু থু" করিয়া মুখের মধ্য হইতে কতকগুলি অর্দ্ধচর্ব্বিত তাম্বুল বাহিরে ফেলিয়া দিলেন এবং গলায় ঝুলান চাদরটীর ভাঁজ খুলিয়া গা ঢাকিয়া সভ্য হইয়া যোড় হস্তে দাঁড়াইলেন। অর্দ্দালী হলপ পড়াইল, কিন্তু হলপ পড়িবার সময় তাঁহার মুখের চেহারাটা কুইনাইন খাওয়া মুখের মত যেন কেমন একটু বিকৃত ভাব ধারণ করিল।

তিনি উকীলের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, তিনিই সেই তমঃসুক লিখিয়াছিলেন। মণিনায়ক কলম ছুঁইয়া দিয়াছিল, তিনি তাহার নামের "সস্তক"(৩) কাটিয়া তাহার নাম দস্তখত করিয়া ছিলেন। গোমস্তা টাকা গণিয়া দিল, মণিনায়ক তাহা হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

---

(১), (২)—গোমস্তা, কার্য্যকারক।
(৩) জাতিবাচক চিহ্ন।

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ টাকা দেওয়া নেওয়া কোথায় হইয়াছিল ?"

সাক্ষী একটু ইতস্তত: করিতেছে দেখিয়া উকীল বাবু ভীত হইলেন। মণিনায়ক উকীল দিতে পারিবে না, স্থতরাং সাক্ষীর জেরা মাত্রেই হইবে না, এই আশ্বাসে তিনি সাক্ষীকে এ সকল কথা শিখাইয়া আনেন নাই। তখন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়া তিনি বলিলেন,

"হুজুর আজ তিন বৎসরের কথা, ইহা কি কখন মনে থাকে ?"

সেয়ানা সাক্ষী অমনি ইঙ্গিত পাইয়া বলিল—"হুজুর! আমার তাহা 'স্মরণ' নাই"।

বাস্তবিক এইরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব না থাকিলে উকীল হওয়া বৃথা।

তখন হাকিম মণিনায়ককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে ?"

মণি।—অবধানী! আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে তুমি আমার নামে এই মিথ্যা কথাগুলা কহিলে? হউক, ধর্ম্ম আছেন। জগন্নাথ মহাপ্রভু আছেন। আমি ত আমার "পেলা" (১) কে তোমার "চাট্‌শালিতে"(২) পাঠাইব স্বীকার করিয়াছিলাম তবে তুমি কেন আমার প্রতি এরূপ "অনুরাগ" করিতেছ ?

সাক্ষী। সে কি কথা ? আমি কি মিথ্যা কহিলাম ?

মণি। "কঞ্চা মিচ্ছ গুড়া"(৩) কহিলে।

তখন হাকিম এই সাক্ষীকে বিদায় দিয়া অন্য সাক্ষীকে ডাকিলেন। এবার আসিলেন মার্কণ্ডপধান। তিনি হলপ পড়িবার সময় কেমন থতমত খাইলেন। পরে উকীলের সওয়ালে বলিলেন তিনি স্বচক্ষে

(১) ছেলে।
(২) পাঠশালা।
(৩) কাঁচা মিছা গুলি।

মণিনায়ককে এই তমঃসুক দিয়া ৫০৲ টাকা কর্জ্জ নিতে দেখিয়াছেন, তিনি তমঃসুকের একজন সাক্ষী।

মণিনায়ক বলিল, "হুজুর! ইনি আদৌতি করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছেন। দোহাই ধর্ম্মাবতার!"

হাকিম বলিলেন—"তোমার সঙ্গে ইহার কি আদৌতি? তুমি জেরা কর।"

মণি। হুজুর! আমার ঝিয়ের নামে এক মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া এই ব্যক্তি ও গ্রামের অন্যান্য লোক একটা "মেলি" হইয়া আমার জাতি-নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমি বীরভদ্র মর্দ্দরাজ সাণ্ডের নিকট ইহাদের নামে নালিস করিয়াছিলাম।

হাকিম। আচ্ছা তুমি সেইসব কথা ইহাকে জিজ্ঞাসা কর।

মণি। (সাক্ষীর প্রতি) মার্কণ্ড পধান। তুমি "ক্রুদ্ধ" হইয়াছ, তোমার পাঁচটী পো, তেরটী নাতি—তুমি সত্য করিয়া বল, আমার সঙ্গে তোমার আদৌতি আছে কি না?

সাক্ষী। তুমি আমার স্বজাতি—তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা কিসের?

মণিনায়ক আর কিছু বলিলনা। হাকিম তখন সাক্ষীকে বিদায় দিলেন। আরও দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী হইল। তাহারাও বাদীর দাবী সপ্রমাণ করিল। তখন হাকিম মণিনায়ককে তাহার সাক্ষী ডাকিতে বলিলেন। মণিনায়ক জোড়-হস্তে গলায় গামছা রাখিয়া কাতর স্বরে বলিল—হুজুর! আমি নিতান্ত গরীব, "অর্ক্ষিত" আমি সাক্ষী কোথায় পাব? হুজুর আমার সাক্ষী।

হাকিম। তবে তুমি কিছু বলিতে চাও?

মণি। হুজুর! আমার দুঃখ শুনিবা হন্ত। মহাজনের এই নালিশ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি কখনও তাহার নিকট হইতে এই তমঃসুক দিয়া

ও জমিবন্ধক রাখিয়া ৫০৲ টাকা কর্জ্জ করি নাই। প্রায় দুই বৎসর হইল আমার মায়ের শ্রাদ্ধের সময় ১৫৲ টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন জমি বন্ধক রাখি নাই। মহাজন শত্রুতা করিয়া এই "কুত্রিম" নালিশ করিয়াছে। ঐ তমঃসুক জাল।

হাকিম। কেন, বাদীর সঙ্গে তোমার কি শত্রুতা?

মণি। হুজুর! সে অনেক কথা। গত বছর বৈশাখ মাসে আমার মেয়ের বিবাহ দেওয়ার জন্য আমি তাঁহার নিকট আর ২০৲ টাকা কর্জ্জ করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু মহাজন আমাকে টাকা কর্জ্জ দিলেন না। সে দিন রাত্রে মহাজনের পো বিম্বাধর সাহু কুমতলবে আমার খঞ্জার ভিতরে পশিয়াছিল। আমি তাহাকে ধরিয়া লোকজন ডাকিলাম। তখন মার্কণ্ড পধান প্রভৃতি অনেক লোক আসিল। তাহারা মিছামিছি আমার ঝিয়ের নামে একটা অপবাদ রটনা করিল ও পরদিন একটা বৈঠক করিয়া আমার কাছে "ক্ষীরিপিঠা" চাহিল। আমি গরিব মানুষ টাকা কোথায় পাব? আমি নিরুপায় হইয়া আমার "ভার্য্যাকে" সঙ্গে লইয়া মর্দ্দরাজ সাঙের নিকট গিয়া নালিশ করিলাম। তিনি ধর্ম্মবিচার করিয়া, পঙ্কজসাহু মহাজনের একশ টাকা জরিমানা করিলেন, আর মার্কণ্ডপধানদিগকে শাসন করিয়া দিলেন যে আমার উপর কোন অত্যাচার না করে। কিন্তু আমার কপাল মন্দ! তাহার ৪।৫ দিন পরেই মর্দ্দরাজসাঙের "সময়" হইল। তখন মহাজন, মার্কণ্ডপধান ও গ্রামবাসী সমস্ত লোক সুযোগ পাইয়া আমার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল। আমার সেই ঝিয়ের "বাহা" এ পর্য্যন্ত দিতে পারি নাই। অবশেষে মহাজন আমাকে বলিল—"আমার যে একশ টাকা জরিমানা হইয়াছে, তুই সে টাকা দে, নচেৎ তোর "সত্বনাশ" করিব।" হুজুর, আমি এত টাকা কোথায় পাব? মর্দ্দরাজসাঙ আমাকে যে ১৫৲ টাকা দিয়াছিলেন, তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে।

এ সন "বিয়ালী" ধান ফলিল না, বর্ষাকালে কিনিয়া খাইতে হইয়াছে। ''দুর্ব্বল'' (১) "নইবঢ়ীতে"(২) ঘরদুয়ার সব ভাসিয়া গেল। পরে আমি সেই ১০০৲ টাকা না দেওয়াতেই, এই "কুত্রিম" তমঃস্থক প্রস্তুত করিয়া আমার নামে এই মিথ্যা নালিশ করিয়াছে। গ্রামের সব লোক এক জোট। পঙ্কজসাহু দুই লক্ষ টাকার মহাজন, দুই ক্রোশ পৃথ্বীর জমিদার—আমি একজন ক্ষুদ্র "তসা"(৩) সে কোথায়, আর আমি কোথায় ? হুজুর মা বাপ—ধর্ম্মযুধিষ্ঠির ! আমি গরু চরাই, হুজুর মানুষ চরাইতেছেন। হুজুর রাখিলে রাখিবেন, মারিলে মারিবেন। আমার "পাঁচ প্রাণীকুটুম্ব" আপনার চরণ ভরসা।

ইহা বলিয়া মণিনায়ক তাহার গলার গামছা দিয়া চক্ষু মুছিল। হাকিম বলিলেন, "তুমি যে সকল কথা বলিলে, তাহার প্রমাণ দেও— প্রমাণ না দিলে চলিবে কেন ?"

মণি। হুজুর ! গ্রামের সব লোক এক জোট, আমি সাক্ষী প্রমাণ কোথায় পাব ? আচ্ছা, মহাজন এখানে আছেন আমি তাঁহাকে নির্ভর মানিতেছি। তিমি এই জগন্নাথ মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ ও লোকনাথ মহাপ্রভুর "ধণ্ডা"(৪) হাতে করিয়া বলুন যে আমি তাঁহার নিকট হইতে এই তমঃস্থক দিয়া ৫০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়াছি। আমার তাহাই মঞ্জুর— আমি ঘরে চলিয়া যাইব।

ইহা বলিয়া মণিনায়ক সতেজে একটা হাঁড়িতে করিয়া কিছু অন্নপ্রসাদ ও কতকগুলি শুষ্ক ফুল লইয়া গিয়া পঙ্কজসাহুর সম্মুখে ধরিল।

---

(১) প্রবল।
(২) নদীর জল বৃদ্ধি।
(৩) তসা=চাষা।
(৪) ধণ্ডা=নির্ম্মাল্য।

তখন হাকিম পঙ্কজসাহুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কাছারির সমস্ত লোকের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। সেই উকীলবাবুও নিতান্ত দীন দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলেন, তাঁহার মনে ভয় হইল, পাছে বুড়া মহাজন তাঁহার পাকা ঘুঁটী কাঁচা করিয়া ফেলে।

বৃদ্ধ পঙ্কজসাহু করেন কি—অগত্যা সেই মহাপ্রসাদের হাঁড়ি দুই হাতে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল, গায়ে ঘাম ছুটিল, মুখ বিবর্ণ হইল। তিনি অনেক কষ্টে বলিলেন, "হাঁ, মণিনায়ক যথার্থই এই তমঃসুক দিয়া আমার নিকট হইতে ৫০৲ টাকা কর্জ্জ নিয়াছে।"

"ওহো।—ধর্ম্মবুড়িগলা—ধর্ম্মবুড়িগলা"(১)

মণিনায়ক ইহা বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হাকিম তৎক্ষণাৎ রায় লিখিয়া মোকর্দ্দমা ডিক্রি দিলেন। উকীলবাবুর জয় হইল। তিনি হাকিমকে সেলাম করিয়া সগর্ব্বে বুক টান করিয়া বাহিরে আসিলেন ও পঙ্কজসাহুর নিকট হাত পাতিলেন—"কই, আমার বাকী টাকা? তোমার মোকর্দ্দমা ত আমিই জিতিয়া দিলাম, তাহার পুরস্কারও চাই।"

পঙ্কজসাহু গলায় কাপড় দিয়া যোড় হাতে বলিল—"হুজুর আমি নিতান্ত গরিব—আমি ৫৲ টাকা দিয়াছি। আর ৫৲ টাকা মাপ দিন। আমার কাছে এক পয়সাও নাই। আর আপনি একবার বিচার করিয়া দেখুন, মোকর্দ্দমা ত আমি মহাপ্রসাদ ছুঁইয়া হলপ করাতেই ডিক্রি হইয়াছে আপনার বেশী কিছু করিতে হয় নাই।"

উকীলবাবু তখন গরম হইয়া বলিলেন "কি? আমি কিছুই করি নাই? এতগুলি সাক্ষীর জবানবন্দী কে করাইল? তুই বেটা নিতান্ত

(১) ধর্ম্ম ডুবিয়া গেল।

তেলী—ফেল্ আমার টাকা। রেখেদে তোর কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—বেটা ভণ্ড, জুয়াচোর।”

এইরূপে উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা হইল। পরিশেষে মহাজন তাঁহার কোঁচার খোঁট হইতে আর একটী টাকা বাহির করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত উকীলবাবুর হাতে দিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, এবং আর চারি টাকা বাড়ী গিয়া পাঠাইয়া দিবে বলিল। কিন্তু উকীলবাবুর আর সে টাকার ভরসা রহিল না।

এদিকে সন্ধ্যা আসিল। সূর্য্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়া একটী সুবর্ণ কলসের ন্যায় নীল সাগরবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে একটু একটু করিয়া ডুবিয়া গেল। কাছারির সমস্ত লোক চলিয়া গেল। তখন মণি-নায়কও আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিল। কিন্তু তাহার বাড়ী যাওয়ার আর প্রবৃত্তি হইল না। সে আর কোন্ মুখে গ্রামে ফিরিবে? সে মনের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিল। জগন্নাথ মহাপ্রভু তাহাকে কূল না দিলে সে আর বাড়ী যাইবে না। এইরূপে তিন দিন সে মন্দিরে পড়িয়া রহিল। এই অবস্থায় নরোত্তম দাস বাবাজী ও নবঘনর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

বাবাজী তাহার দুঃখকাহিনী শুনিলেন, নবঘনও শুনিলেন। বাবাজী তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিলেন আর তাহাকে কিছু জমি দেওয়ার জন্য নবঘনকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের দয়াতে মণিনায়কের হৃদয় গলিয়া গেল। তাঁহাদের অনুরোধে সে নীলকণ্ঠপুর ত্যাগ করিয়া নবঘনর এলাকায় বাড়ী ঘর তুলিয়া লইতে স্বীকৃত হইল। বাবাজী নবঘনকে বলিলেন—“বাবা! কেবল এই একব্যক্তি নহে—এই রকম কত শত মণিনায়ক মহাজনের উৎপীড়নে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। আমার একান্ত অনুরোধ তোমার হাতে কিছু টাকা সঞ্চিত হইলে তুমি ইহাদের উদ্ধারের কোন একটা উপায় করিবে।

আমার গোপালের ভাণ্ডার অতিক্ষুদ্র, তাহা দ্বারা আর কয়জন লোকের উপকার হইতে পারে?"

নবঘন বলিলেন—"আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। আপনি আজ আমাকে যে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, তাহার প্রতিদান স্বরূপ আপনার এই অনুরোধ আমি অবশ্যই পালন করিব।"

এই ঘটনার সাত দিন পরে বাবাজী গড়কোদণ্ডপুর হইতে বাসুদেব মান্ধাতার সঙ্গে পরামর্শ স্থির করিয়া আসিয়া নবঘনর মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাণী বিবাহে মত দিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বাঙ্গালীর বিদেশিনীবিবাহ।

মৃত্যুকে শোকের কারণ জানিয়াও মায়াময় সংসারী মানবজন্মকে আনন্দদায়ক বলিয়া বিবেচনা করে, গৃহে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে মহানন্দে মহোৎসবে যোগ দেয়। এই জন্ম ও মৃত্যু নামক দৃশ্যদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী মনোহর মহাদৃশ্যের নাম বিবাহ। এই মহাদৃশ্য বর্ত্তমান না থাকিলে জন্ম ও মৃত্যুর অস্তিত্ব থাকিত না, সুতরাং বিবাহ প্রথা অতীব গুরুত্বসম্পন্ন। ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষে, বিশিষ্ট কারণ বশতঃ, বিবাহ অসুবিধা জনক বলিয়া বিবেচিত হইলেও, ইহা সকল জাতির পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত বিধি; খৃষ্টান-সন্ন্যাসী মহাত্মা পল অবিবাহিত থাকিয়াও লিখিয়া গিয়াছেন Marriage is honourable for all—অর্থাৎ বিবাহ সকলের পক্ষে গৌরবজনক; তিনি আরও বলিয়াছেন

It is better to marry than to burn—অর্থাৎ দুষ্ট কাম প্রবৃত্তিকে গোপনে গোপনে কপটাচারীর ন্যায় সক্লেশে মনোমধ্যে পোষণ করিয়া রাখা অপেক্ষা বিবাহ করাই ভাল। শ্রীশ্রীমৎ ভগবৎগীতায় এইরূপ আচরণ অতীব নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তদ্যথা—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥

মুসলমানেরা বলেন"স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের স্বার্থ যেমন এক, বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রীর স্বার্থ তেমনি এক, অতএব বিবাহ প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে এবং জগতের সকল সংসারী লোকের পক্ষে সুন্দর বিধি।" বৈদিক ঋষির উক্তি উন্মেষণ করিয়া শ্রীমন্মহারাজ মনু লিখিতেছেন—

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি
মাংসৈর্ম্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।"

অর্থাৎ, বর কন্যাকে বলিতেছেন—আমাদের প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে এবং চর্ম্মে চর্ম্মে এক হউক। ইহাতে বুঝাগেল, বিবাহ কেবল সাংসারিক ব্যাপার নহে, ইহা অতি প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ঘটনা। গীতায় ভগবান স্পষ্টতঃ "বিবাহ দ্বারা প্রজা বৃদ্ধির" আদেশ করিয়াছেন। আমার মতে, ইহা কেবল বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রীকে প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় একত্রিত করেনা, সমগ্র সমাজ—সমগ্র জাতি—সমগ্র দেশকে ইহা নবদম্পতীর সহিত একসূত্রে আবদ্ধ করিয়া সমগ্র জাতির সহিত ঘনীভূত ভাবে মিশাইয়া দেয়; বিবাহের ইহাই সামাজিক চিত্র বা সামাজিক উদ্দেশ্য। বিবাহ, আমাদিগকে সমগ্র দেশের সুখ দুঃখের সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া দিয়া দেশানুরাগী ও দেশভক্ত করিয়া তুলে; দেশের অভাব মোচনে, দেশের জন্য চিন্তা করিতে, দেশের জন্য সহানুভূতি

প্রকাশ করিতে, দেশের জন্য হাসিতে হাসিতে অকাতরে প্রাণ দিতে, বিবাহ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়—ইহা বিবাহের রাজনৈতিক চিত্র বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। বিবাহ, আমাদের সমগ্র পরিবারকে রক্ষা করে, সমগ্র বংশকে উচ্ছেদ হইতে পরিত্রাণ করে, কুলগত ধর্ম্ম এবং কুলগত ভাষা, আচার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতিকে রক্ষা করে, পরিবারের শক্তি, সামর্থ্য, সংখ্যা, শান্তি, সুবিধা প্রভৃতি বৃদ্ধি করে, সুতরাং বিবাহ একটি পারিবারিক প্রধান ঘটনা। ভর্ত্তা ও ভার্য্যাকে প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া পরিশেষে উভয় প্রাণকে এক করিয়া পরব্রহ্মে প্রগাঢ় প্রেমসহ সমর্পিত করিতে সমর্থ হয় বলিয়া বিবাহ একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার। এখন দেখা গেল, বিবাহ আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ঘটনা। বিবাহের বিশৃঙ্খলায় কত বিশৃঙ্খলা ঘটে তাহা এখন বুঝিলেন কি? বিবাহের বিশৃঙ্খলায় সমাজের, স্বদেশের ও স্বজাতির যে সকল অবনতি ঘটিয়া থাকে, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

১। স্বদেশীয় ভাষার অবনতি।
২। স্বজাতীয় সাহিত্যের অবনতি।
৩। স্বদেশহিতৈষীতার উচ্ছেদ।
৪। স্বজাতিবৎসলতার নাশ।
৫। স্বদেশীয় বিদ্যার প্রতি অনুরাগের স্বল্পতা।
৬। স্বজাতীয় সংখ্যার অল্পতা।
৭। স্বদেশের স্বাধীনতার লোপ।
৮। কুলগত শুদ্ধাচারের হ্রাসতা।
৯। জাতীয় প্রকৃতির বিপর্য্যয়।
১০। স্বজাতীয় সমাজের সামর্থ্য হীনতা।
১১। দৈহিক বলের অবনতি।
১২। মানসিক শক্তির হ্রাস।

১৩। জাতীয় ভাবের বিনাশ।

১৪। পারিবারিক সুখ ও শান্তির উচ্ছেদ।

১৫। সামাজিক শৃঙ্খলার শিথিলতা।

১৬। রাজনৈতিক অবনতি।

আমি ধর্ম্মের কথা তালিকাভুক্ত করিব না; ধর্ম্মশাস্ত্র বা আধ্যাত্মিক কথার প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধে তুলিব না, কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবেই বাঙ্গালীর বিদেশিনীবিবাহের আলোচনা করিতে আকাঙ্খা করি। মনে করুন, গদাধরবক্সী নামে অবিবাহিত ও অজাতশ্মশ্রু কোনও কায়স্থ অর্থাভাববশতঃই হউক অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ হউক পাদ্রী প্রভুর আশ্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক গির্জ্জাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বাপ্তিস্মানামক ক্রিয়ায় যথারীতি অভিষিক্ত হইয়া খৃষ্টীয় সমাজের অন্তর্ভূক্ত হইল। গদাধর কেবল খৃষ্টান হইয়া যদি ক্ষান্ত থাকিত তাহা হইলে বুঝিতাম শ্রীমান বক্সীবাবুর বাপ্তিস্মা ক্রিয়াহেতু সপ্তকোটি বাঙ্গালীর মধ্যে একটি বাঙ্গালী—একটি মাত্র বাঙ্গালী—হিন্দুর সংখ্যায় কমিয়া গেল। কিন্তু গদাধর বা গদাধরপ্রকৃতিক লোকেরা কেবল খৃষ্টান হইয়াই ক্ষান্ত থাকে না; দেশের, সমাজের, স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের এবং তাহার সঙ্গে রাজনৈতিক শক্তির তাহারা যেরূপ হীনতা সম্পাদন করে, এখন তাহা বুঝুন। একথা স্মরণ রাখা উচিত, গদাধর খৃষ্টান হইয়াও বাঙ্গালী, বাপ্তিস্মা ক্রিয়ায় তাহার ধর্ম্মান্তর হইল কিন্তু জাত্যন্তর হইল না, খৃষ্টান হইয়াও সে বাঙ্গালী রহিল—তাহার রেস্ (Race) বা ন্যাশনালিটি (Nationality) গেল না। গদাধর খৃষ্টান হইয়া বিবাহ করিল, তাহার বর্ণাশ্রম নাই, তাহার রেস্ বা ন্যাশনালিটির বিচার নাই; রূপজ মোহের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা অন্য কোনও কারণবশতঃই হউক, মনে করুন, আজীমগড়ের খৃষ্টান কিশোর সিংহের কন্যাকে গদাধর বিবাহ করিল। এস্থলে বলা আবশ্যক, নিন্দা, গ্লানি, অসূয়া, প্রতিবাদ

অথবা অন্য যে কোন উপায়ে হউক হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের হীনতা ও অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করা বেতনভোগী ভারতবর্ষীয় পাদ্রীদিগের জীবনের যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞা ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য, সেইরূপ ভারতবর্ষের সর্ব্ববর্ণকে অন্তর্জাতিক বিবাহ এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য উপায় দ্বারা এক বর্ণে পরিণত করা—অর্থাৎ জাতীয়ত্ব, সাম্প্রদায়িকত্ব, দেশগত ভেদত্ব লোপ করিয়া একই নামে ও একই সমাজে পরিণত করা—আংগ্লো ইণ্ডিয়ান পাদ্রীদিগের জীবনের অতি মহান চেষ্টা। এরূপভাবে একীকরণের সুফলের সঙ্গে সঙ্গে কুফলও যে কত আছে তাহা আমি দেখাইব। যাহারা পুরুষানুক্রমে খৃষ্টান ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছে সেই সকল "কুলীন" খৃষ্টান স্ব স্ব রুচি অনুসারে যৌণ নির্ব্বাচনে ব্রতী হয়, কিন্তু যাহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মে নূতন ব্রতী, পাদ্রী অথবা পাদ্রীর লোকেরা তাহাদের বিবাহে হস্তক্ষেপ করেন এবং যাহাতে ক দেশীয় লোকের ক দেশীয় লোকের সহিত বিবাহ না হইয়া খ বা গ দেশীয় লোকের সহিত বিবাহ হয় প্রথমে তাহাই চেষ্টা করেন। যাহা হউক, পশ্চিমোত্তর প্রদেশের হিন্দুস্থানী কিশোর সিংহের কন্যার সহিত গদাধরের বিবাহ হইল। কিশোর সিংহের জন্ম উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, সে হিন্দুস্থানী, উর্দ্দু তাহার মাতৃভাষা, হিন্দুস্থানীর খানা সে খায়, হিন্দুস্থানীর কাপড় সে পরে, হিন্দুস্থানীর আদব কায়দায় সে অভ্যস্ত, এবং বাঙ্গালা ভাষা বলিতে বুঝিতে লিখিতে বা পড়িতে পারে না। তাহার কন্যাও এইরূপে প্রতিপালিতা। গদাধরের পুত্র কন্যা জন্মিল, তাহাদের ভাষা 'পিতার ভাষা' হইল না ইহা নিশ্চয়, হইল 'মাতার ভাষা'—অর্থাৎ উর্দ্দূ। মাতৃভাষা উর্দ্দূতে তাহারা কথা কয়, উর্দ্দূতে লেখে, উর্দ্দূতে পড়ে, উর্দ্দূতে গির্জ্জায় ও ঘরে প্রার্থনা করে, পিতা গদাধরের সহিতও উর্দ্দূতে কথোপকথন চলে। গদাধর ভাল উর্দ্দূ না জানিলেও ক্ষতি নাই। তাহাতে সন্তানসন্ততির পক্ষে অসুবিধা

…পড়ে না। গোমস্তারা ভাল বাঙ্গালা না জানিলেও তাহাদের সন্তানগণ যদি বাঙ্গালী থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় অক্ষয় দত্ত হইতে পারে। গদাধর যতদিন জীবিত, ততদিনের মধ্যে তাহার দুই একজন বাঙ্গালী বন্ধু তাহার বাটীতে গেলে তাহার সহিত—কেবল তাহার সহিত, বাটীর অন্য কাহারও সহিত নয়—বাঙ্গালায় (ইচ্ছা করিলে) কথা কহিতে পারে; গদাধর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সেই পরিবার হইতে অনন্তকালের জন্য বাঙ্গালা ভাষা উঠিয়া গেল। গদাধর মৃত হইলে লোকে বলিল, “গদাধর মরিয়াছে,” কিন্তু গদাধর একা মরে নাই, তাহার মৃত্যুর সঙ্গে একটা সমস্ত বাঙ্গালী পরিবার মরিয়া গিয়াছে। গদাধরের পুত্র কন্যাগণ বাঙ্গালা জানেনা, বুঝেনা; বুঝিবেওনা এবং শিখিবেওনা ইহা নিশ্চয়; সুতরাং বাঙ্গালীর বংশ হইতে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা একেবারে উঠিয়া গেল। গদাধরের সন্তান, সন্ততি, দৌহিত্র, পৌত্র, প্রদৌহিত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতিতে যদি ঐ বংশে, মনে করুন, কালে ৫০ জন লোক হয়, তাহা হইলে ঐ ৫০ জন মনুষ্য নামধারী জীবের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা একেবারে উঠিয়া গেল। হয়ত চর্চ্চা থাকিলে এক পুরুষে দুই পুরুষে অথবা কোনও পুরুষে দ্বিতীয় মাইকেল, দ্বিতীয় কৃষ্ণবন্দ্যো অথবা দ্বিতীয় বঙ্কিম জন্মিতে পারিত; এখন বল দেখি, বাঙ্গালীর এইরূপ বিবাহ প্রথার প্রশ্রয় দিতে পার কি? রূপজমোহের বশবর্ত্তী হইয়া যুবাবয়সে তরলমতি বাঙ্গালী এইরূপ বিবাহ দ্বারা স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যের সর্ব্বনাশ সাধন করে। বাঙ্গালীর বংশধর হইয়াও সে বংশে বাঙ্গালা কথা, বাঙ্গালা চিঠি, বাঙ্গালা পুস্তক, বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের প্রচলন নাই; বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা থাকিলে ইংরাজীর পরিবর্ত্তে আমাদের ভাষার অনেক পুস্তক, সম্বাদপত্র ও মাসিক পত্র হয়ত ঐ বংশে বিক্রীত হইতে পারিত, তাহাতে জাতীয়ধনের বৃদ্ধি পাইত; ও অনেক বাঙ্গালী শিক্ষকের প্রয়োজন হইত, বাঙ্গালীর অন্নসংস্থান

হইত, হয়ত ঐ বংশের লোকেরা বাঙ্গালা ভাষা চর্চ্চা করিতে করিতে এবং ভাষার মহত্ত্ব দেখিয়া এবং ইহা তাহাদের পুর্ব্বপুরুষগণের ভাষা বুঝিয়া, বাঙ্গালীর সাহিত্যসমিতি প্রভৃতিতে সাহায্য করিত ; কিন্তু গদাধরের এই বিবাহে এতগুলি অনিষ্ট সংসাধিত হইয়া গেল, এতগুলি ক্ষতি বঙ্গ-সমাজকে সহ্য করিতে হইল। বাঙ্গালী খৃষ্টান বা মুসলমান হইলেও বাঙ্গালী থাকে, সুতরাং তাহাদের স্বার্থ আমাদের স্বার্থের স'হত জড়িত থাকিয়া যায়, সুতরাং বঙ্গবাসীর এরূপ বিবাহ স্বদেশ ও স্বজাতির বৈরিতা-ব্যঞ্জক। কেবল ভাষা বা সাহিত্য লইয়া কথা নহে, আরও গুরুতর কথা আছে। গদাধরের মৃত্যুর পরে, কেবল একটি জিনিষ থাকিয়া যায়, সেই জিনিষটার নাম জান কি ? তালপুকুরের তালবৃক্ষগুলির চিহ্ন পর্য্যন্ত না থাকিলেও যেমন সেই পুকুরের "তালপুকুর" নাম থাকিয়া যায়, গদাধর বক্সীর পত্নী (বাঙ্গালীর গন্ধে পর্য্যন্ত বিমুক্তা হইয়াও) মিসেস্ বক্সী বলিয়া অভিহিতা হয় ; বক্সী হিন্দুস্থানীরও খেতাব বটে, সুতরাং সোনায় সোহাগা ! শ্রীমান্ বক্সীর পুত্র কন্যাগণ হিন্দুস্থানী মাতাপিতার দ্বারা পালিত এবং শিক্ষিত, হিন্দুস্থানী কাপড়ে ও খানায় অভ্যস্ত, হিন্দুস্থানী ভাষা তাহাদের মাতৃভাষা, হিন্দুস্থানী সমাজ তাহাদের সমাজ, সুতরাং হিন্দুস্থান দেশীয় লোকদিগের সহিতই তাহাদের সহানুভূতি। গদাধর যদি ভাল লোক হয় তাহা হইলে যে কয়েকটা দিন সে বাঁচিয়া থাকে সেই কয়টা দিন তুমি তাহার বাটিতে এক আধটু সহানুভূতি বা সামাজিকতার আশা করিতে পার, তাহার অন্তর্দ্ধানের পরে যেদিকে চাও কেবল হিন্দুস্থানী আর হিন্দুস্থানী ! সেখানে বাঙ্গালীর ভাষা চর্চ্চা দূরে থাকুক, সেখানে বাঙ্গালীর আর "কল্‌কে পাইবার উপ, নাই।" হিন্দুস্থানী হিন্দুস্থানী-সমুদ্রে গা ঢালিয়া দিয়া মনে প্রা মিলাইয়াছে, এখন বাঙ্গালীর গন্ধটুকু পর্য্যন্ত নাই ; এখন জিজ্ঞাসা ক হৃদয়ে হাত দিয়া, স্বদেশ ও স্বজাতির দিকে চাহিয়া, স্বদেশীয় ভাষ

সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সরল মনে বল দেখি, এই বিবাহটা বাঙ্গালীর জাতীয়-ক্ষতিজনক কি না? আমি "বাঙ্গালী" অর্থে কেবল হিন্দুর কথা বলিতেছিনা, বাঙ্গালী খৃষ্টান এবং বাঙ্গালী মুসলমানের কথাও বলিতেছি। এখন দেখ গদাধরের এই বিবাহে, একটা সমগ্র বাঙ্গালী বংশ, ভাষা, সাহিত্য, পরিচ্ছদ, দেশানুরাগ ও সংখ্যার সহিত, সমূলে উৎপাটিত হইল। এইরূপ বিবাহ ভাল না মন্দ? বাঙ্গালী খৃষ্টান রীতিমত বাঙ্গালী খৃষ্টানকে বিবাহ করুন ক্ষতি নাই, কিম্বা বিদেশিনী খৃষ্টানকে যদি করেন তাঁহাকে স্বামীকুলভুক্তা করিয়া লউন। কিন্তু শ্রীমান বক্সী সাহেবের বিবাহ সম্বন্ধে কিরূপ অভিমতি প্রকাশ করা যায়?

এখন, আর একটা নূতন বিবাহের কথা শুন। শ্রীমান নটবর ঘোষ বিলাতে অধ্যয়ন করিতে গিয়া, কালচক্রের প্রভাবে আবর্ত্তিত হইয়া ইউরোপীয় সুন্দরী মোহিনী মূর্ত্তিতে মোহিত হইলেন। তিনি "ঘোষের" পরিবর্ত্তে "মিষ্টর গোশা" উপাধি গ্রহণ করিয়া, বিলাতী পরিচ্ছদাদিতে দেহ সুশোভিত করিয়া, ইংরাজসমাজে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিলেন। নিজের ইচ্ছায়, ভেক সাজিয়া ইংরাজ সারসের নিকটে উপস্থিত হওনান্তর, কহিলেন "হে শুভ্রকান্তিসমাযুক্ত ও শুভ্রহৃদয় সমন্বিত ইংরাজ সারস! তুমি অধম বাঙ্গালীকে রক্ষা কর। হে অগতির গতি! হে অনাথের নাথ! তুমিই ভবসাগরের কাণ্ডারী অতএব তোমার জয় হউক, তোমার রাজত্ব আমার দেহে মনে প্রাণে আত্মায় সম্বর্দ্ধিত হউক; আমাকে—হে পতিতপাবন!—তুমি অসভ্যতা হইতে পরিত্রাণ কর।" শুভ্রকান্তি ইংরাজ সারস বিলাসের শুভ্রসলিলোপরে ভাসিতে ছিলেন, মাথা উঠাইয়া দেখিলেন, সম্মুখে অপূর্ব্ব মানবমূর্ত্তি উপস্থিত! উজ্জলে মধুরে একত্রে মিলিয়া মিশিয়া বিংশ শতাব্দী এই মানবকে সৃজন করিয়াছে! সারস স্বগতঃ বলিলেন Fie! Fo! Fum! Here standeth th finest specimen of a Baboo of Bengal! ইংরাজ রমণী

হইলেন, একেবারে বাঙ্গালী গন্ধ উড়িয়া গেল; জিজ্ঞাসা করি, তিনি মাতৃকুল রাখিবেন কি পিতৃকুল রাখিবেন? জিজ্ঞাসা করি, তিনি অল্পদিনের অৰ্দ্ধসভ্য, পরাধীন, কৃষ্ণকায়, দুর্ব্বল 'ভেতো' বাঙ্গালীকুলের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন,—কি পৃথ্বীবিজয়ী, সুসভ্য, স্বাধীন, শ্বেতকায় মহাবলী বৃটিশের বংশ বলিয়া পরিচয় দিবেন? বলা বাহুল্য, তিনি ইউরোপীয়ান অথবা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কিম্বা টেঁশো ফিরিঙ্গি বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হইবেন না। কিন্তু নিগর বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন ইহা নিশ্চয়।

এইবারে একটি তৃতীয় বিবাহের কথা শুনুন, ইহা কল্পিত দৃষ্টান্ত নহে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনা। অনেক দিন পূর্ব্বে যখন রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ছিলনা, তখন একজন দরিদ্র বাঙ্গালী বালক অর্থোপার্জ্জনোপলক্ষ্যে পদব্রজে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গমন করিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতে করিতে অবশেষে পঞ্জাবে গিয়া উপনীত হয়। এ বাঙ্গালী বালক সৎকুলজাত ব্রাহ্মণ ছিল এবং তাহার চেহারাও সুন্দর ছিল; পঞ্জাবে একটি চাকুরী প্রাপ্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ মুদ্রা হস্তগত করতঃ, এই যুবা বিবাহেচ্ছু হইল; ঘটনাচক্রে এক সুন্দরী শিখ যুবতীর সে পাণি গ্রহণ করিল। এই যুবা আর স্বদেশে ফিরিয়া আইসে নাই। ইহার ৫টি পুত্র এবং ২টি কন্যা জন্মে। ইহাদের সকলেরই পঞ্জাবে জন্ম এবং শিখ সমাজে লালনপালন হয়। শিখেরা, দুই একটা বিষয়ে হিন্দুর সঙ্গে অন্যমত হইলেও, ষোল আনার মধ্যে প্রায় তের আনা হিসাবে, হিন্দুর সঙ্গে সমান। উচ্চবর্ণের শিখেরা, উচ্চবর্ণের হিন্দুর অন্ন খায়; পশ্চিমোত্তর ও পঞ্জাবের উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা (অনেক সময়ে) উচ্চবর্ণীয় শিখের অন্ন খাইতে আপত্তি করে না। শিখের পরিবার আর হিন্দুর পরিবার প্রায় সকল বিষয়েই এক, সুতরাং ঐ দেশে শিখ ও হিন্দু মিলিয়া মিশিয়া গেলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ

হয় না। বাঙ্গালী যুবকের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু ঐ বাঙ্গালীর বংশ পঞ্জাবে আজিও বর্ত্তমান, ঐ বংশের লোকদিগকে আমি চিনি, ইহারা পঞ্জাবী শিখ—বাঙ্গালী নহে। ঐ যুবক মৃত্যুর সময়ে লাহোরের এক বাঙ্গালী কায়স্থকে বলিয়াছিল—"আমি ইহজগত হইতে চলিয়া যাইতেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার এতগুলি পুত্র কন্যা থাকিতেও আমি একটি বাঙ্গালী রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। আমার মরণে আমার বংশে বাঙ্গালীত্বেরও চিরকালের জন্য মরণ হইল।" এখন জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, ভাই বাঙ্গালী! এইরূপ বিবাহ ভাল কি মন্দ? বল দেখি, এইরূপ বিবাহে বাঙ্গালীর সংখ্যা, বাঙ্গালীর আশা ভরসা, বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা, এবং বাঙ্গালীর বংশের হ্রাসতা কমিয়া যায় কি না? যদি তোমার বিবাহে আমাদের সর্ব্বপ্রকারে ক্ষতি হয় তাহা হইলে তোমার বিবাহকে প্রেম চক্ষে দেখিব কি বিদ্বেষ চক্ষে দেখিব? দেশ ও স্বজাতি তোমার এই বিবাহের কথনই পরিপোষক হইতে পারেন না, ইহা নিশ্চয়।

পাঠক মহাশয়! ইহার পরে আর একটা বিবাহের কথা শুনুন। প্রায় চত্বারিংশ বৎসর গত হইল একজন বাঙ্গালী মুসলমান পেশোয়ারে গিয়া তদ্দেশীয় এক পাঠানের ভগ্নীকে বিবাহ করে; পেশোয়ারের পাঠান মুসলমানদের ভাষা উর্দ্দূ নহে, তাহাদের ভাষার নাম পশ্‌তু। বাঙ্গালী মুসলমানের বাঙ্গালা দেশে জন্ম, বাঙ্গালা দেশে সে ধুতী পরিয়াছে, চিরদিন গরম ভাত এবং পান্তাভাতে দেহ পোষণ করিয়াছে, শাক চড়চড়ি প্রভৃতিতে উদর পূরণ করিয়াছে, পুঁই আর সজনা শাক খাইয়া জীবন কাটাইয়াছে, তৈল ম্রক্ষণ করিয়া পুকুরের জলে স্নান করিয়াছে, মুড়ী মুড়কী খাইয়া বালভোগ করিয়াছে; এখন এই মহা-পুরুষ পেশোয়ারে গিয়া পাঠানী রমণীর সুচিকণ কুন্তল, সুন্দর দশন-পংক্তি, নয়নের কালো পুতুলি এবং গায়ের গোলাপী রং দেখিল,

এই অপূর্ব্ব দর্শনে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, কালো কুচ্‌কুচে বাঙ্গালী মুসলমানরমণীর সর্ব্বাংশই মন্দ ভাবিল, সুতরাং ঐ পাঠানীর সঙ্গেই, রূপজ মোহের দোষে, বিবাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। বাঙ্গালী মুসলমান অল্প অল্প উর্দ্দূ জানিত, পাঠানীও উর্দ্দূ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত, সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষে কথোপকথনের বড় অসুবিধা ছিলনা। স্বামী ভিন্ন আর সকলের সহিত ঐ পাঠানী তাহার মাতৃভাষায় (পশ্‌তু ভাষায়) কথোপকথন করিত। পাঠানেরা স্নানের সময় তেল মাখেনা, সে দেশে তেঁতুল, চাল্‌তা, আমড়া, পুঁইশাক, সজনা খাড়া পাওয়া যায় না, পাঠানেরা মুড়ী মুড়কী খায় না, রুটি ভিন্ন ভাত স্পর্শ্ করে না, কেবল ডাল রুটি অথবা রুটি গোস্‌ৎ (মাংস) খায়, এবং যেরূপ পোষাক পরে তাহার চৌদ্দপুরুষেও বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশে না। হতভাগ্য বাঙ্গালী মুসলমান দেখিল—এই বিবাহে কথোপকথনের কষ্ট, সামাজিক কষ্ট, আহারের কষ্ট এবং তৎসহ পোষাকের অসুবিধা। ভুলেও একটি বাঙ্গালী তিনি দেখিতে পান না, বাঙ্গালী আহারের গন্ধ পান না এবং স্নানের সময়ে তৈল মাখিতে গেলে লোকে হাসে ও তামাসা করে। রুটি খাইয়া শ্রীমানের পেট ফুলিয়া গেল, বাবাজী একেবারে বিপরীত জগত দেখিতে লাগিলেন। শ্রীমানের একটু ইংরাজিও জানা ছিল, জনৈক ইংরাজ বন্ধুকে বড় দুঃখে বলিলেন "I see what is sauce for the gander is not sauce for the goose" অর্থাৎ যাহা রামের পক্ষে ভাল তাহা শ্যামের পক্ষে ভাল নহে। আসল কথা এই যে, অনুকরণেরও সীমা আছে; মহাদেব বিষ পান করিয়া অমর ও নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া কি তুমি আমি বিষ পান করিতে পারি? যাহা পানে মহাদেব অমর হইয়াছিলেন তাহা পানে তোমার আমার মৃত্যু নিশ্চয়। ঐ বাঙ্গালী মুসলমান যুবক মরিয়া গিয়াছে, তাহার বংশে বাঙ্গালীত্ব পদার্থের

একটি চিহ্নও নাই। ঐ বিবাহে একটা বাঙ্গালী বংশ ধ্বংস হইয়া গেল। পাঞ্জাবেই হউক আর অযোধ্যাতেই হউক, মুসলমান সম্প্রদায় অথবা খৃষ্টান সম্প্রদায় কিম্বা হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হইয়া হউক, একটা বাঙ্গালী বংশ ঠিক বাঙ্গালীর মত বর্ত্তমান থাকিলে, তবুও আমরা প্রেমের সহিত, আশার সহিত, বুক ফুলাইয়া বলিতে পারি, অমুক স্থানে আমাদের এক ঘর বাঙ্গালী আছে—জল ঝড়ের সময় এই দূরবর্ত্তী বিদেশে তাহাদের ঘরে এক রাত্রির জন্য, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিয়া, মাথা রাখিতে পারিব; কিন্তু সে আশা আর থাকিতেছে কি? অযোধ্যা, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের মধ্যে বহুসংখ্যক স্থানে বহুসংখ্যক খৃষ্টান বাঙ্গালী এবং খৃষ্টান বাঙ্গালীর বংশ বর্ত্তমান আছে, ইহাদের শতকরা একজনও প্রকৃত বাঙ্গালী কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ, ইহাদের একশত জনের মধ্যে বোধ হয় একজনও বাঙ্গালা ভাষা জানেনা ও বুঝে না এবং কোনও প্রকারেই বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করে না। ইহাদের এক পুরুষে অথবা একপুরুষান্তরে বাঙ্গালীত্ব সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহারা বাঙ্গালী ধূতী পরেনা সুতরাং বাঙ্গালী তাঁতীর ভরসা ইহাদের উপরে নাই, ইহারা ঢাকার উড়ানী অথবা শান্তিপুরের রুমাল ব্যবহার করে না; বাঙ্গালা পুস্তক, সমাচারপত্র বা মাসিক পত্র পড়ে না এবং পড়িতে জানেনা, সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্য কোনও প্রকারে ইহাদের সহানুভূতি পাইতে পারে না; কেবল তাহাই নহে, ইহারা ইংরাজী ও উর্দ্দূতে গান গায়, হিন্দুস্থানীর হাতের তৈয়ারী দ্রব্য ব্যবহার করে, উর্দ্দূ ইহাদের মাতৃভাষা এবং যাহা কিছু বাঙ্গালীত্ববর্জ্জিত তাহাই ইহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য এবং গৃহের নিত্য শোভাবর্দ্ধক। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালীর সহিত সহানুভূতি থাকিবে কেন? বাঙ্গালী জাতির সহিত, বাঙ্গালী দেশ ও সমাজের সহিত, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত, বাঙ্গালা সংগীত, বাঙ্গালা

শিল্প, বাঙ্গালা চিত্রবিদ্যা প্রভৃতির সহিত সহানুভূতি থাকে কি? কত ক্ষতি হইল, বল দেখি? কেবল সাধারণ খৃষ্টীয় সমাজের কথা বলিতেছি না, অযোধ্যা পাঞ্জাব এবং পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বহুসংখ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালী পাদ্রী হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী অথবা ফিরিঙ্গি রমণীকে বিবাহ করিয়া এইরূপে কলঙ্ক স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন; ইহার প্রতিকার না হইলে এইরূপ ক্ষতিজনক বিবাহ চলিতেও থাকিবে বলিয়া বোধ হয়। বন্ধুতা ও সামাজিকতার অনুরোধে আমি কাহারও নামোল্লেখ করিতে নিবৃত্ত হইলাম, নতুবা ইহাদের নামের তালিকা এত সুদীর্ঘ হইত যে এক মাসের "ভারতী" বোধ হয় এই তালিকায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। মুসলমান, হিন্দু এবং এখনকার ইয়ং বেঙ্গল বাবুদের সম্বন্ধে তালিকাটা এত বড় না হইলেও, তালিকা বড় ছোট হয় না। জব্বলপুরে, মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে, রাজপুতানায় এরূপ বাঙ্গালী অনেক। দক্ষিণ ভারতে (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে) অনেক দিন হইতে খৃষ্টান ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে, সেখানকার দেশীয় খৃষ্টান এক কিম্ভূতকিমাকার জীব বলিলেই হয়। সেখানে দেশীয়ত্বের নাম মাত্র নাই, তাহারা তদ্দেশীয় লোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র স্পর্শও করে না, সকল বিষয়েই বিলাতী ধরণের লোক; ইহাদের মধ্যেও প্রাচীন বাঙ্গালী বংশ দেখিয়াছি, তাহা কেবল "বাঙ্গালীর উৎপন্ন বংশ" এই টুকুতেই পরিচয়! তদ্ভিন্ন, বঙ্গদেশের মানচিত্রও তাহারা দেখে নাই। ভারতবর্ষের বহুস্থানে মিষ্টর ঘোষ, মিষ্টর হাজরা, মিষ্টর ভাদুড়ী মিষ্টর রুদ্র, মিষ্টর দাস, মিষ্টর চাটুর্জি প্রভৃতি দেখিয়াছি, ইহারা মুখে বলে "শুনিয়াছি, আমাদের আদি পুরুষ বাঙ্গালী ছিলেন", এই টুকু বলিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয়; বাঙ্গালী বলিলে বাঙ্গালী-গৌরব বা বাঙ্গালী-মহিমা তাহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে না।

এইবারে একবার রাজপুতানার দিকে বিশেষ করিয়া দৃষ্টিপ

করিতে আকাঙ্খা করি। এই বীরপ্রসবিনী রাজপুতভূমির খৃষ্টানী বা মুসলমানীর কথা আদৌ তুলিব না, এবার খাঁটি হিন্দুর কথা তুলিব। অখণ্ডনীয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জ'না গিয়াছে, সম্রাট আকবর, রাজা জয়সিংহ, রাজা মানসিংহ প্রভৃতির সময় হইতে রাজপুতানায় বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী পরিবার এখনও বর্ত্তমান, কয়েকটি পরিবার ব্যতীত কোনও হিন্দু পরিবারে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব আদৌ নাই। ইহারা অতি পূর্ব্বকাল হইতে মাড়োয়ারী হিন্দুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়া আদান প্রদান বিবাহ প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, বিবাহটা অবশ্য হিন্দুমতে হয়, কারণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত, কায়স্থ কায়স্থের সহিত বিবাহ করে; এই সকল "বাঙ্গালী বংশধরেরা" ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, ঘোষাল, দাস, মুন্সী, দত্ত প্রভৃতি উপাধিতে পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহাদের খানা, বেশভূষা, ভাষা, আচার ব্যবহার, প্রবৃত্তি, প্রকৃতি প্রভৃতির সহিত বাঙ্গালীদের এক কণাও মিলেনা, এখন চেষ্টা করিলেও আর মিলেনা মিশেনা। এই সকল বিবাহে বাঙ্গালীর লাভ কিছু আছে কি? তোমরা বিবাহ করিলে বটে, তোমাদের বেল পাকিল বটে, কিন্তু কাকের তাহাতে কি হইল?

আর দৃষ্টান্ত দিব না। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া আসিতেছে। কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান সকল বিবাহক্রিয়াতেই বরকে কন্যার সহিত এবং কন্যাকে বরের সহিত কতকগুলি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। হিন্দুসমাজে, হিন্দুশাস্ত্রমতে, এই প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব ও দায়ীত্ব, আমার বিবেচনায় যেন অধিকতম বলিয়া বোধ হয়। হিন্দু বিবাহে বর কন্যাকে বলিতেছেন—

ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং
পতিকুলে ভূয়াসম্।

বর বিবাহ সমাপনে অন্ন-ভোজনকালে বধূকে বলিতেছেন—

ওঁ অন্নপাশেন মণিনা
প্রাণ সূত্রেণ পৃশ্নিনা!
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা।
মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে।
ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব
তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম
তদস্তু হৃদয়ং তব॥

অর্থাৎ—"যাহা মহারত্ন আত্মাস্বরূপ, যাহা প্রাণের বন্ধনস্বরূপ, সত্য যাহার গ্রন্থিস্বরূপ, সেই স্বর্গীয় অন্নরূপ পাশে তোমার চিত্ত, বুদ্ধি ও অন্তরাত্মাকে বন্ধন করিলাম। এই যে তোমার হৃদয় তাহা আমার হৃদয় হউক, এই যে আমার হৃদয় ইহা তোমার হৃদয় হউক।" তাহার পর বরকন্যা পরস্পর পরস্পরকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি,
মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্॥"

অর্থাৎ, "প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে মাংসে মাংসে এবং চর্ম্মে চর্ম্মে এক হউক।" এখন বল দেখি, এইরূপ না হইলে বিবাহ হয় কি? পত্নী যদি পতিকুলের ভাষা, সাহিত্য, আচার, ব্যবহার, বেশ, ভূষা, চিরাগত নিয়ম প্রভৃতি রক্ষা না করিলেন—যদি বিবাহ দ্বারা আমাদের মাতৃভূমির, মাতৃভাষার, স্বজাতির ও স্বকীয় সমাজের কিছুই "ধ্রুব" রহিল না, তবে সেটা বিবাহ না বাঁদীত্ব? এইরূপ বিবাহ, বিবাহ না বাঁদ্‌রামী? চর্ম্মে চর্ম্মে, মাংসে মাংসে, অস্থিতে অস্থিতে মিলিল কৈ? ইহা ত বিবাহ

নয়, ইহা একটা খুব বড় তামাসা। সেদিন লোকসংখ্যার রিপোর্টে দেখিলাম, বাঙ্গালায় এখনও ৭ কোটির অধিক লোক বাস করে; ক্লার্ক সাহেব তাঁহার স্কুলপাঠ্য ইংরাজী ভূগোলে লিখিয়াছেন—"এখনও ভারতের সকল লোককে একত্র করিয়া দাঁড় করাইলে প্রত্যেক পঞ্চম ব্যক্তি বাঙ্গালী হয়—Every fifth man is a Bengalee." দেখিতেছি, এখনও বাঙ্গালী মরে নাই, বাঙ্গালী মরিবেও না, জগতের ইতিহাসে—এই সুবিশাল সংসারক্ষেত্রে—বাঙ্গালীর পদবী অতি উন্নত, বাঙ্গালীর ভবিষ্যত অতীব আশাজনক; এহেন সুদিনে, এহেন সুসময়ে এই গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে, বিবাহ প্রথাটা ভাল করিয়া সংস্কার করিলে সোনায় সোহাগা হয়; এই সুসময়ে একটু সাবধান হইয়া, ভবিষ্যতের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া, বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিয়া বিবাহ করিলে ভূতলে বাঙ্গালী অতুল হইয়া উঠিবে, ইহা নিশ্চয়।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বৈদ্যজাতির ইতিবৃত্ত।

(ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতিবাদ।)

ইহা একটী স্বীকৃত ও বিদিত সত্য যে পূর্ব্বে কোন জাতি বা বর্ণ ছিল না, সকল মানুষ এক ছিল, পরে ত্রেতাযুগের কোন এক সময়ে গুণ ও কর্ম্মের বিভেদবশতঃ একই মানুষ চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েন।* উক্ত ৪টী শ্রেণীর এক একটীই এক একটী বর্ণ এবং উক্ত বর্ণ চতুষ্টয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার নামে প্রখ্যাত।

এবং ইহাও একটী স্বীকৃত সত্য যে পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। সেই অসবর্ণ বিবাহ ও অন্যান্য নানা কারণে ভারতবর্ষে অসংখ্য অবান্তর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু বৈদ্য ও কায়স্থ নামক প্রধান দুইটী জাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি বিষয়ে কোন শাস্ত্রের কোন স্থানে কোন বচন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

তবে কি এই দুইটী জাতি ভুইফোঁড়? না তাহাও নহে। যখন এজাতি দুইটী কোন অভাব পদার্থ নয়, যখন এজাতিদ্বয়ের অস্তিত্ব বিষয়ে চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয়ের কোন বিবাদ নাই, তখন এজাতি দুইটী আছে, তাহাও স্বীকার্য্য এবং ইহাদিগের উৎপত্তিও যে কোন না কোন প্রকারে বিবৃত হইয়াছে তাহাও তোমাকে বিশ্বাস ও স্বীকার করিতে

---

* ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতং॥ মহাভারত।
ব্যাখ্যায়াং প্রবৃত্তায়াং প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে তদা।
বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং কৃতবন্তশ্চ বৈ পুনঃ॥ ৮৭—৫৭ অ—বায়ু।

হইবে। বৈদ্য ও কায়স্থ যখন হিন্দু তখন ইহাঁরা হয় প্রত্যেকে মূল বর্ণ চতুষ্টয়ের কোন এক বর্ণ, না হয় ইহাঁরা কোন প্রকার মিশ্রবর্ণের অন্তর্গত হইবেনই। ভুঁই ফুঁড়িয়া কোন জাতির উৎপত্তি হয় নাই—হইতে পারেও না। তবে ইহাঁদিগের নিদান কি? আমরা স্বজাতির কথা লইয়া বিচার করিব।

বৈদ্যজাতি মূল বর্ণ চতুষ্টয়ের কোন বর্ণ নহেন, তাঁহারা মিশ্রবর্ণ। এখন দেখা যাউক্ কোন্ দুই বর্ণের মিশ্রণে তঁাহাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। সেই বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; বৈশ্য—বৈশ্য ও শূদ্র কন্যার পাণি-গ্রহণ করিতে পারিতেন, ইহার নাম অনুলোমবিবাহ। সবর্ণ বিবাহও অনুলোমবিবাহ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কিন্তু অধম বর্ণের পুরুষেরা উচ্চ বর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন না। না পারিলেও এই সঙ্কীর্ণতা নিসর্গের দ্বার অর্গলিত করিতে পারে নাই, ঐরূপ বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ না হইলেও ব্যবহারতঃ প্রচলিত ছিল, উহারই নাম বিলোম বা প্রতিলোম বিবাহ। উহা একতর অবেদ্যাবেদন।

শাস্ত্রকারেরা তারস্বরে দ্বিজগণকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিকে শূদ্র কন্যা বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাস ইহার ঘোর প্রতিবাদী ছিলেন, মনুও শূদ্রা দারপরিগ্রহ অতি-হেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি উহা বারিত ছিল না। এ বিষয়ের শাস্ত্র প্রমাণগুলি এই—

মনু—সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥ ১২॥

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য, সা চ, স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥ ১৩ ॥
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে ॥ ১৪ ॥
শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং ॥
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥ ১৭—৩ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রয় প্রথমে সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, পরে যদি ইচ্ছা হয়, তবে অসবর্ণ কন্যারও পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। শূদ্র কেবল নিজ বর্ণের শূদ্র-কন্যা বিবাহ করিবেন, উচ্চ বর্ণের নহে। বৈশ্যগণ সজাতীয় বৈশ্য কন্যা ও শূদ্র কন্যা বিবাহ করিবেন। ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা এবং ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যেন পারতপক্ষে শূদ্র কন্যা বিবাহ করেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য—তিস্রোবর্ণানুপূর্ব্বেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমং।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যা স্বা শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৫৭
যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদারোপসংগ্রহঃ।
ন তন্মম মতং যস্মাৎ তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ং ॥ ৫৬—১ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য; ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং বৈশ্য কেবল একমাত্র সবর্ণ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। শূদ্র আপন জাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতির কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

মানুষ আপন আপন স্ত্রীতে পুত্ররূপে (আত্মজ) জন্ম গ্রহণ করে, সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজত্রিতয় শূদ্র কন্যা বিবাহ করিবেন—আমার ইহা মত নহে।

ব্যাসসংহিতা—

উচ্চায়াং হি সবর্ণায়াং অন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে ॥ ৯
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাং।
নতু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ; নাধমঃ পূর্ব্ব বর্ণজাং ॥ ১০—২ অধ্যায়।

প্রথমে মানুষ সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, পরে ইচ্ছা হইলে অসবর্ণা কন্যারও পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। সেই অসবর্ণ স্ত্রীজাত সন্তান, পিতার জাতি হইতে একবারে হীন হইবেন না, কিছু ন্যূন হইবেন। ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য; ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যার পাণিপীড়ন করিবেন। তাঁহারা কখনই শূদ্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না, এবং অধম কোন বর্ণও আপনাপেক্ষা কোন উচ্চ বর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণে অধিকারী নহেন।

আমরা এতাবৎ এইমাত্র প্রমাণ করিলাম যে পূর্ব্বকালে অসবর্ণ বিবাহও প্রচলিত ছিল এবং এখানে ইহাও দেখান হইল যে কে কাহাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। এখন আমরা দেখাইব সেই অসবর্ণ বিবাহে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল।

মনু বলিতেছেন—সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়া স্তএবহি ॥ ৫
স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহু র্মাতৃ-দোষবিগর্হিতান্ ॥ ৬
অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ;
দ্ব্যেকান্তরেষু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিং ॥ ৭
ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদাৎ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮

ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে ॥ ৯
বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপ সদাঃ স্মৃতাঃ॥১০—১০অ।

ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র অনুলোমক্রমে সজাতীয় অক্ষত যোনি স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করেন, তাঁহারা স্ব স্ব পিতার জাতি প্রাপ্ত হয়েন।

এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যথাক্রমে স্ব স্ব অক্ষত যোনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রা স্ত্রীতে যে যে সন্তান (মূর্দ্ধাবসিক্ত—মাহিষ্য—করণ) উৎপাদন করেন তাঁহারা ঠিক্ পিতার সম্পূর্ণ জাতি প্রাপ্ত হয়েন না, মাতৃকুলের হীনতাবশতঃ পিতার জাতির সাদৃশ্য মাত্র লাভ করেন।

অর্থাৎ তাঁহারা স্ব স্ব মাতৃকুল হইতে উচ্চ ও স্ব স্ব পিতৃকুল হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়া থাকেন।

ঠিক্ অনন্তর বর্ণবিবাহে জাত সন্তানদিগের ইহাই সনাতন বিধি। —একবর্ণ ও দ্বিবর্ণ অন্তরে জাত সন্তানদিগেরও ইহাই ধর্ম্ম্যবিধি বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ তাহারাও পিতার পূর্ণ জাতি পাইবে না, পিতৃ-সাদৃশ্য মাত্র লাভ করিবে।

ব্রাহ্মণ—মধ্যে ক্ষত্রিয়কে রাখিয়া একবর্ণ অন্তরে বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলে যে সন্তান হইবে, তাহার জাতির নাম অম্বষ্ঠ। দুইবর্ণ অন্তরে শূদ্রা কন্যা বিবাহ করিলে যে সন্তান হইবে তাহার নাম পারশব।

ঐরূপ ক্ষত্রিয় শূদ্রকন্যাতে যে সন্তানোৎপাদন করেন তাহার নাম উগ্র। সে অতি ক্রূরাচার ও তাহাতে পিতৃকুল মাতৃকুলের অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও শূদ্রকুল উভয়কুলের ধর্ম্মই বিদ্যমান থাকিবে।

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন স্ত্রীতে মূর্দ্ধাবসিক্ত—অম্বষ্ঠ ও পরাশব;

ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য ও শূদ্র স্ত্রীতে জাত মাহিষ্য ও উগ্র এবং বৈশ্যের শূদ্রা স্ত্রীতে জাত সন্তান করণ।

এই ছয় জন স্ব স্ব পিতার অপসদ পুত্র বলিয়া পরিগণিত। ইহাঁরা সজাতীয় পুত্র হইতে "হীন"। একারণ ইহাঁরা অপসদ সংজ্ঞার বিষয়ীভূত।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াং।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥ ৮৯
বৈশ্যা-শূদ্রোস্তু রাজন্যাং মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৯০—১অ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করিলে তাহাতে যে সন্তান হয় তাহার নাম মূর্দ্ধাবসিক্ত; ব্রাহ্মণ বৈশ্য কন্যা বিবাহ করিলে তাহাতে যে সন্তান হয় তাহার নাম অম্বষ্ঠ, এবং তাহার শূদ্রা পত্নীতে জাত সন্তানের নাম নিষাদ। এই নিষাদ পারশব নামে প্রখ্যাত।

এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা স্ত্রীজাত সন্তান মাহিষ্য; শূদ্রা স্ত্রীজাত সন্তান উগ্র ও বৈশ্যের শূদ্রা স্ত্রীজাত সন্তানের নাম করণ। এই সকল সন্তান বৈধবিবাহজাত বলিয়া জানিবে।

এখানে প্রমাণ হইল পূর্ব্বে অসবর্ণ বিবাহ ছিল, এবং সেই অসবর্ণ বৈধবিবাহে জাত সন্তানদিগের নাম মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ মাহিষ্য, নিষাদ উগ্র ও করণ।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা বৈদ্যজাতির ইতিহাস লিখিতে বসিয়া বহু জাতির কথা বলিলাম, কিন্তু কই বৈদ্যর কথা ত একবারও মুখে আনিলাম না।

আপাততঃ তাহাই বোধ হইবে, কিন্তু তাহা নহে। বৈদ্য কোন জাতি নহে, উহা কোন জাতিবাচক শব্দও ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণবৈশ্যাসম্ভূত অম্বষ্ঠগণ বৈদ্যবৃত্তিক বলিয়া বঙ্গদেশে তাঁহারা

জাতিতে বৈদ্য বলিয়া কথিত হইয়া আসিয়াছেন, শাস্ত্রের অম্বষ্ঠ জাতি ও বঙ্গদেশের বৈদ্যগণ অভিন্ন পদার্থ। তাঁহাদিগের বৃত্তিঘটিত বৈদ্যনাম জাতিবাচক হইয়া গিয়াছে।

অনেকেই জানেন হিন্দুস্থানে নুণিয়া নামে একটী জাতি আছে। উক্ত নুণিয়া শব্দ জাতিবাচক নহে, বৃত্তিবাচক। উহা লাবণিক শব্দের অপভ্রংশ। যে বা যে যে জাতি এক সময়ে লবণের ব্যবসায় করিত, তাহারা নুণিয়া নামে আখ্যাত হইয়াছে, তাহাদের আসল জাতীয় নাম দূরে যাইয়া এখন নুণিয়া শব্দটী জাতিবাচক হইয়া পড়িয়াছে।

ঐরূপ সৌ বা সাহা জাতির নামটীও বৃত্তিঘটিত। সাধু শব্দের অর্থ বণিক্ (সদাগর)।* পূর্ব্বে শৌণ্ডিকগণ নিয়ত ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন, তজ্জন্য প্রথমতঃ তাঁহারা সাধু নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। পরে ঐ সাধু শব্দের অপভ্রংশে তাঁহারা সৌ, সা ও সাহা নামে আখ্যাত হইয়াছেন। শৌণ্ডিকগণ আপনাদিগকে সৌলোক বলেন, জনসাধারণও তাঁহাদিগকে সৌলোক বলিয়াই জানেন। এই সৌ, নুণিয়া ও বৈদ্য শব্দ বৃত্তিবাচক হইলেও জাতিবাচক হইয়া গিয়াছে। বৈদ্যেরাও ঐরূপে জাতিতে বৈদ্য হইয়া গিয়াছেন। অমরকোষে লিখিত আছে—

"রোগহার্য্যা গদঙ্কারো ভিষগ্ বৈদ্যৌ চিকিৎসকে"।

অর্থাৎ রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্ ও বৈদ্য এই ৪টী শব্দের অর্থ চিকিৎসক।

মনু বলিয়াছেন, "সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং" অর্থাৎ সূতজাতিরা সারথ্য ও অম্বষ্ঠগণ চিকিৎসা বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

অতএব যে জাতির সাধারণ জাতীয় বৃত্তি চিকিৎসা সেই বৈদ্য

---

* লেখক মহাশয় তাঁহার এই উক্তিটি প্রাচীন অভিধানের সাক্ষ্যদ্বারা সমর্থন করিলে ভাল হইত। নতুবা সত্যের পরিবর্ত্তে কল্পনাশ্রিত প্রত্নতত্ত্বের প্রশ্রয় হয়। ভাঃ সং

জাতিই অম্বষ্ঠ ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। অনুমান ভিন্ন কি ইহার আর কোন প্রমাণ নাই? অবশ্যই আছে।

আমরা বাল্যকালে বিবাহাদি সভাতে ও অন্যত্র নাম বলিতাম। তাহাতে জিজ্ঞাসা ও উত্তরের এইরূপ নিয়ম ছিল। তোমার নাম কি? উত্তর—আমার নাম অমুক ইত্যাদি। তোমরা কার সন্তান? আমরা অমৃতাচার্য্যের সন্তান। (এই অমৃতাচার্য্যই মহর্ষি গালবের ঔরসে বীরভদ্রানাম্নী বৈশ্য কন্যার গর্ভে জাত)। তোমরা কি? আমরা অম্বষ্ঠ। অম্বষ্ঠ বলি কাকে? অম্বা ক্রোড়ে কুলে বা তিষ্ঠতীতি অম্বষ্ঠঃ। বৈদ্য বলি কাকে? বেদোদ্ভবো বৈদ্যঃ।

এই রীতি এখন আর নাই। কিন্তু বৈদ্য জাতিতে ইহা আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে, এবং সর্ব্ব দেশের বৈদ্যদিগের মধ্যে এই রীতি আবহমান কাল প্রচলিত। যদি বৈদ্যগণ জাতিতে অম্বষ্ঠ না হইতেন, তাহা হইলে এ রীতি তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিত না।

বঙ্গদেশের প্রত্যেক সাক্ষর নিরক্ষর ব্যক্তিও বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ জাতিকে এক বলিয়া জানেন। যথা—

শব্দকল্পদ্রুমঃ—"অম্বষ্ঠঃ বিপ্রাৎ বৈশ্যায়ামুৎপন্নঃ অয়ং চিকিৎসাবৃত্তিঃ বৈদ্যঃ ইতি খ্যাতঃ"।

বিশ্বকোষ—বৈশ্য কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত বর্ণবিশেষ বৈদ্য।

প্রকৃতিবাদ—ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত বৈদ্য।

শব্দসার—ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত বর্ণ বৈদ্য।

সম্বন্ধ নির্ণয়—বঙ্গদেশে ইহাঁরাই অম্বষ্ঠ অথবা বৈদ্য বলিয়া খ্যাত।

জাতি নির্ণয়—ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্য কন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

বর্ণভেদ—অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য।

গোবিন্দমোহন রায় কাকিনীয়া।—ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে সমুৎপন্ন সন্তান অম্বষ্ঠ নামে অভিহিত। এই জাতির প্রচলিত নাম বৈদ্য।

রঘুনন্দন তদীয় শুদ্ধিতত্ত্বে এদেশের প্রধান দুইটী জাতি বৈদ্য কায়স্থের কোন নামই লয়েন নাই। তিনি অম্বষ্ঠ ও শূদ্র নাম করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতেও বুঝিতে হইবে তৎকালে কায়স্থগণ শূদ্র ও বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ বলিয়া বিদিত ছিলেন।

আমরা অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যজাতির একত্ব ও অভিন্নত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত স্বীকৃত সত্য বলিয়া জানি, সাধারণের মতও তজ্জন্য উদ্ধৃত হইল। কেহ কেহ অনভিজ্ঞতা কিংবা ঠেঁটামি বশতঃ উহাতে আপত্তি করিয়া থাকেন তজ্জন্য আমরা শাস্ত্র হইতেও বচন উদ্ধৃত করিয়া এবিষয়ের সংশয় নিরসন করিব।

স্কন্দপুরাণ—ক্রোড়ে বিলোক্যৈব শিশুং মুনীন্দ্রাঃ,
প্রাপুর্ম্মুদং বেদতয়ৈব জাতঃ।
বৈদ্যঃ সুতোঽয়ং জননী-কুলেচ,
স্থিতস্ততোঽম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ—আয়ুর্ব্বেদং দদৌ তস্মৈ বৈদ্যনাম চ পুষ্কলং।
তেনাসৌ পাপশূন্যোঽভূদম্বষ্ঠখ্যাতিসংযুতঃ॥

এখানে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যের সাম্য সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এবিষয়ে আর কোন কথা বলা অনাবশ্যক। এই সকল গ্রন্থ সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ভিন্ন পরবর্ত্তী নহে, কাজেই অম্বষ্ঠজাতি বহুদিন যাবৎ বৈদ্য নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। খ্যাতনামা ভরতসেন মল্লিক মহাশয় বর্ত্তমান সময়ের ২২৫।২৬ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, তিনিও ভাট্টীকা মুখে আপনাকে অম্বষ্ঠ বলিয়া বিশেষিত করিয়াছিলেন। যথা—

নত্বা শঙ্করমম্বষ্ঠো গৌরাঙ্গমল্লিকাত্মজঃ।

ভট্টিটীকাং প্রকুরুতে ভরতো মুগ্ধবোধিনীং॥

অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যগণ একই পদার্থ তাহা প্রদর্শিত হইল, আমরা এইক্ষণ দেখাইব উহাঁরা একতর দ্বিজ, ব্রাহ্মণবৎ দশবিধিসংস্কারে অধিকারবান্ এবং তাঁহারা একতর ব্রাহ্মণ বলিয়া আভিজাত্যে ক্ষত্রিয় হইতেও গরীয়ান্। যথা—

সুবীজং চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।

তথার্য্যাৎ জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি ॥৬৯

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।

শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥৪০—১০অ—মনু।

যে প্রকার সুক্ষেত্রে সুবীজ বপন করিলে সুফল ফলিয়া থাকে, সেইরূপ আর্য্যপুরুষ হইতে আর্য্যাস্ত্রীতে জাত সন্তান আর্য্যোচিত উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কারের যোগ্য হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সজাতীয় এই তিন এবং মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য অসবর্ণজ এই তিন, মোট এই ৬ পুত্র দ্বিজপদবাচ্য ও ইহাঁরা উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কারে অধিকারী। শূদ্রমাতৃক পারশব, উগ্র করণগণ এবং আমূল বর্ণসঙ্কর শ্রেণী শূদ্রধর্ম্মা।

অম্বষ্ঠগণের পিতা মহান্ আর্য্যকুল বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ, মাতাও আর্য্যকুল প্রসূতি বৈশ্যা, সুতরাং তজ্জন্য তাহারা উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কারে অধিকারী।

এবিষয়ে কুল্লূক ও মেধাতিথির টীকা ও ভাষ্য এই—দ্বিজাতীনাং সমান জাতীয়াসু জাতাঃ তথা আনুলোম্যেন উৎপন্নাঃ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়া বৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং এবং ষট্ পুত্রাঃ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য) দ্বিজধর্ম্মিণঃ উপনেয়াঃ। যে পুনরন্যে দ্বিজাত্যুৎপন্নাঃ সূতাদয়ঃ প্রতিলোমজাস্তে শূদ্রধর্ম্মাণঃ নৈষামুপনয়নমস্তি। ইতি কুল্লূকঃ।

সজাতিজা স্ত্রৈবর্ণিকেভ্যঃ সমান জাতীয়াসু জাতাস্তে দ্বিজধর্ম্মাণ ইত্যেতৎ সিদ্ধমেব অনূদ্যতে। অনন্তরজানাং তুল্যতাভিধানং তদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থং। অনন্তরজা অনুলোমা ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যায়ং জাতা স্তেপি দ্বিজধর্ম্মাণঃ উপনেয়া ইত্যর্থঃ। উপনীতাশ্চ দ্বিজাতি ধর্ম্মৈঃ সর্ব্বৈঃ অধিক্রিয়ন্তে। যে পুনরপধ্বংসজাঃ সঙ্করজাঃ তে শূদ্রাণাং সধর্ম্মাণঃ সমানাচারাঃ। অনন্তর গ্রহণং অনুলোমোপ লক্ষণার্থমেব তেন ব্যবহিতোপি ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যায়াং জাতঃ গৃহ্যতে। ষট্ সংখ্যাতিরিক্ত ত্বাৎ ন শূদ্রায়াং জাতঃ পারশবঃ। ইতি মেধাতিথিঃ।

ইহাদ্বারা অম্বষ্ঠের দ্বিজত্ব ও উপনয়নাদির অধিকার বিশদ ভাবেই সমর্থিত হইল। এখন তাঁহারা যে দ্বিজশ্রেণীতে ৩য় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

ব্রহ্মমূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবং॥

শব্দকল্পদ্রুমধৃতহারীতবচন।

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ৫ জন দ্বিজ এবং ইহাঁদিগের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী পরবর্ত্তী হইতে গরীয়ান্। সুতরাং এই প্রমাণবলে বৈদ্যগণ ক্ষত্রিয় হইতেও উচ্চতর জাতি বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছেন।

ফলতঃ পূর্ব্বকালে মাতা যে কোন জাতীয়াই কেন হউন না, সন্তান স্ব স্ব পিতার জাতি প্রাপ্ত হইতেন। এখনও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাতেও ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীজাত পুত্রসন্তান ব্রাহ্মণ বলিয়া ও কন্যা শূদ্রী বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেন। অম্বষ্ঠগণও একদিন পিতার জাতি ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইতেন, তখন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী স্ত্রীজাত সন্তান ও ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা

পরিগণিত হইতেন। যেমন পরশুরাম (তাঁহার মাতা রেণুকা ক্ষত্রিয় কন্যা), ব্যাস (মাতা ধীবর কন্যা) ও অমৃতাচার্য্য (পিতা ব্রাহ্মণ, মাতা বীরভদ্রানাম্নী বৈশ্য কন্যা, ইনিই অম্বষ্ঠ জাতির আদি পুরুষ) প্রভৃতি। ক্রমে গুণের আপেক্ষিক লাঘব বশতঃ মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠগণ মুখ্য ব্রাহ্মণ না হইয়া গৌণ ব্রাহ্মণ নামে কথিত হয়েন। ব্রাহ্মণসন্তান শূদ্র-মাতৃক পারশবগণ ব্রাহ্মণ্য লাভের অধিকারী নহেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা পর্য্যন্ত একতর ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন, তাঁহারা মদ্রাদি দেশে দেবলের কাজ করিতেন।(১) সুতরাং যাঁহার পিতা মহান্ আর্য্য বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ জাতি, ও মাতাও বিশুদ্ধ দ্বিজাতি বৈশ্যকন্যা সে অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য কিছুতেই ব্যাহত হইতে পারে না ও ব্যাহত ছিল না, এ বিষয়ে শাস্ত্রে এই সকল প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—মহাভারত—

তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য, দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য তু।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ ॥ ১১ ॥

৪৪অ—মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব।

ব্রাহ্মণের—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা, এই তিন স্ত্রী; ক্ষত্রিয়ের—ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা, এই দুই স্ত্রী; এবং বৈশ্যের মাত্র সজাতীয়া এক স্ত্রী, ইহাতে তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ; ক্ষত্রিয় ও মাহিষ্য এবং বৈশ্য এই যে সকল সন্তান হয় তাহারা স্ব স্ব পিতার সম অর্থাৎ সমান জাতীয় বলিয়া স্বীকৃত।

সুতরাং এ বচন বলে অম্বষ্ঠ একদিন মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে ?

উক্ত মহাভারতেই অন্যত্র বর্ণিত আছে—

(১) শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতঃ পারশবো মতঃ।
মন্ত্রকাদীন্ ফলাশ্রিত্য জীবেয়ুঃ পূজকাঃ স্মৃতাঃ ॥

জনক উবাচ।—বর্ণো বিশেষবর্ণানাং মহর্ষে কেন জায়তে।

এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং তদ্ ব্রূহি বদতাং বর ॥

যদেতৎ জায়তেঽপত্যং সএবায়মিতিশ্রুতিঃ।

কথং ব্রাহ্মণতো জাতো বিশেষগ্রহণং গতঃ ॥

পরাশর উবাচ। এবমেতন্ মহারাজ! যেন জাতঃ স এব সঃ।

তপসস্ত্বপকর্ষেণ জাতিগ্রহণতাং গতঃ ॥

সুক্ষেত্রাৎ চ সুবীজাচ্ চ পুণ্যো ভবতি সম্ভবঃ।

অতোঽন্যতরতো হীনাৎ অবরো নাম জায়তে ॥

জনক বলিলেন হে মহর্ষে। এক বর্ণ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ বিশেষ বর্ণের উৎপত্তি হইবার কারণ কি? শ্রুতিতে লিখিত আছে মাতা যে কোন জাতীয়াই হউক না, সন্তান যাহার ঔরস জাত তাহারই জাতি প্রাপ্ত হইবেন? অতএব ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রী জাত সন্তানেরা কেন মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও পারশব এই সকল পৃথক্ জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়? কেন মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয় না? পূর্ব্বে হইত, এখন হয় না কেন?

পরাশর বলিলেন, "হে মহারাজ! আপনার কথাই সত্য, পূর্ব্বে সন্তান, পিতার জাতিই প্রাপ্ত হইত কিন্তু এইক্ষণ গুণের অপকর্ষবশতঃ ভিন্ন জাতি বলিয়া (মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি) কথিত হইতেছে। কিন্তু যাঁহাদিগের মাতৃকুল, দ্বিজ ও আর্য্য এবং পিতৃকুলও উচ্চতর, তাঁহারা পবিত্র জাতি বলিয়া স্বীকৃত।" বৈদ্যগণের মাতা ও পিতা উভয়ই আর্য্য ও দ্বিজ বর্ণ, সুতরাং তাঁহারা একটী উচ্চজাতি তাহা মনে করিতে হইবে? অপিচ তাঁহারা অতি পূর্ব্বকালে একবারে মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই গৃহীত হইতেন তাহাতেও কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু শেষে তাঁহারা ভিন্ন জাতি বলিয়া আখ্যাত হইলেও তাঁহারা গৌণ ব্রাহ্মণ বলিয়া

মিশ্র (মিছির) ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিজ্ঞাত রহিয়াছেন। মিশ্র ব্রাহ্মণ শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্ত্যর্থ যে দুই জাতির মিশ্রণে জাত ব্রাহ্মণ।*

মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠগণ যে ভিন্ন জাতিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া গৃহীত হইতেন, সে বিষয়ে শাস্ত্রের প্রমাণ এই, যথা—

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাৎ জাতঃ ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি॥
অব্রাহ্মণং তু মন্যন্তে শূদ্রাপুত্রমনৈপুণাৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥

মহাভারত।

ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত সন্তান যে ব্রাহ্মণ হইবে, তাহাতে কোন সংশয়ই নাই, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াজাত মূর্দ্ধাবসিক্ত ও ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে জাত অম্বষ্ঠও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত। কিন্তু পারশব শূদ্রাজ বলিয়া ব্রাহ্মণ নহেন। ব্যাসসংহিতায় লিখিত আছে—

ঊঢ়ায়াঃ হি সবর্ণায়াং অন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সবর্ণ কন্যা বিবাহ করিয়া পরে ইচ্ছা হইলে অসবর্ণা কন্যারও পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। তাঁহাদিগেরই সেই অসবর্ণা স্ত্রীজাত সন্তানেরা পিতৃসাজাত্য হইতে প্রকৃষ্টরূপে (একবারে) হীন হইবে না সুতরাং কিছু ন্যূন হইবে। অতএব এতদ্বারা মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠের গৌণ ব্রাহ্মণ্য সপ্রমাণ হইতেছে।

---

* ইহার প্রমাণ কৈ? সত্যানুসন্ধিৎসার দ্বারা স্বশ্রেণীর মর্য্যাদাবৃদ্ধির চেষ্টা প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। বৈদ্যকুলতিলক লেখক মহাশয়ের প্রযত্ন সেজন্য প্রশংসনীয়। কিন্তু মিশ্র অতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের উপাধির শব্দার্থ মাত্র ধরিয়া অন্য কোন প্রমাণ ও অনুসন্ধান নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাদের প্রতি বর্ণসঙ্করত্ব আরোপ করিলে তাহা কি পণ্ডিত সমাজের গ্রাহ্য হইবে? ভাঃ সঃ।

মনু বলিয়াছেন—(১০—অ)।

স্ত্রীষ্বনন্তর জাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥ ৬॥
অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরেষু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিং॥ ৭॥

অর্থাৎ মাতৃকুলের হীনত্বনিবন্ধন অনন্তর স্ত্রীজাত সন্তানেরা ৫ম বচনানুসারে পিতার মুখ্যজাতি (জাত্যাজ্ঞেয়াঃ) প্রাপ্ত হইবে না, কিন্তু তাহারা পিতার জাতির সদৃশ বলিয়া গণ্য হইবে। একান্তর ও দ্ব্যন্তরবর্ণ্যা স্ত্রীজাত সন্তানদিগের সম্বন্ধেও ইহাই ধর্ম্ম্যবিধি বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ তাহারাও পিতৃসদৃশ বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং অম্বষ্ঠ পিতৃতুল্যত্ব নিবন্ধন একতর ব্রাহ্মণ হইতেছেন।

মনু অন্য শ্লোকে (১০ অ—৯) বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাতে জাত সন্তানের নাম উগ্র (আগুরি), সেই উগ্রগণ "ক্ষত্রশূদ্রজন্তঃ"। কাজেই তাহাতে পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলেরই সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকিয়া উগ্র ক্ষত্রিয়গণ একতর ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণপিতৃক বৈদ্যেরা কেন ঐ কারণে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইবেন না? অম্বষ্ঠের ন্যায় উগ্রও আপন পিতার একান্তর স্ত্রীজাত সন্তান। যদি উগ্রের শরীরে ক্ষত্রিয়ত্বও থাকে তবে কি ঐ হেতুতে অম্বষ্ঠের শরীরেও ব্রাহ্মণ্য থাকিবে না?

আমাদিগের এই সকল প্রমাণ মহামান্য হিন্দু শাস্ত্রোক্ত। সুতরাং ইহা কেন অবাধ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না? যদি কেহ এই সকল বচনের আর কোন ভিন্নার্থ করিতে পারেন তবে আমরা তখন অবশ্যই পরাজয় স্বীকার করিব।

আমরা অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য সপ্রমাণ করিলাম। তাঁহারা বঙ্গদেশেও

প্রাচীনারা (যাঁহারা ধনমদে সত্যের অপলাপ করিতে শিক্ষা করেন নাই এখনও হিন্দুর সারল্য বজায় রাখিয়াছেন) তাঁহাদিগকে বদ্যি বামুণই বলিয়া থাকেন।

ফলতঃ বৈদ্যগণ কি সে অধিকারে বঞ্চিত ছিলেন ? না কখনই নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল সকল জাতিরই আদিনিবাস। মুষ্টিমেয় বৈদ্যসন্তান বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়া থাকিবেন। আদি স্থান নিশ্চয়ই অসংখ্য অম্বষ্ঠে পরিপূর্ণ ছিল, তাঁহারা কি সমূলে নির্ব্বংশ হইয়াছেন ? অবশ্য লিপিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কতকগুলি অম্বষ্ঠ, অম্বষ্ঠ "কায়স্থ" (কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ—হলায়ুধঃ) হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ঐ দেশে অম্বষ্ঠ কায়স্থ নামে বিদিত। কিন্তু যাঁহারা স্বজাতির বৃত্তি চিকিৎসা পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা অবশ্যই এখনও বিদ্যমান রহিয়াছেন। উহাঁরা কেহ অমৃতসেনী ব্রাহ্মণ, কেহ বা মিছির ব্রাহ্মণ নামে পরিজ্ঞাত। বৈদ্যবৃত্তিক সমুদায় মিছিরদিগকে আমরা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করি। মথুরার পণ্ডিত চন্দ্রসেন চৌবে, কলিকাতায় চিকিৎসা করিতে আসিয়া ছিলেন, উহাঁরা নিশ্চয়ই অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বটেন।

আরও একটী কথা দেখিতে হইবে, যেমন বঙ্গদেশে লোক আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছে, তেমনই দাক্ষিণাত্য প্রদেশেও লোক যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়া ছিলেন। সুতরাং তৎ তৎ স্থলেও অম্বষ্ঠগণ মুখ্য বা মিশ্র ব্রাহ্মণরূপে নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছেন।

আমাদিগের কুলজি গ্রন্থে লিখিত আছে, নন্দি প্রভৃতি উপাধিধারী কতকগুলি বৈদ্য মহারাষ্ট্র দেশে গমন করিয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় ভরতসেন মল্লিক মহাশয় ইহা ২২৫ বৎসর পূর্ব্বে নিজ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন *। বোম্বাই অঞ্চলেও আমিষাশী এক শ্রেণী ব্রাহ্মণ আছেন,

---

* [illegible]

তাঁহারা "সেনবী ব্রাহ্মণ" নামে প্রথিত, এবং তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে তথায় উপনিবিষ্ট, তাহাও সে দেশে পরিজ্ঞাত। পূজ্যপাদ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও তদীয় "বোম্বাইচিত্রে" এ কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং বোপদেবাদি বাঙ্গালী অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা তথায় যাইয়া সেনবী ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা আস্থা বিশ্বাস করিতে পারে।

উৎকলে দাশ শর্ম্মা, ধর শর্ম্মা, কর শর্ম্মা, সেন শর্ম্মা, গুপ্ত শর্ম্মা ও দেব (দে) শর্ম্মা আখ্যাধারী বহু ব্রাহ্মণ আছেন। এই কলিকাতাতেও তাঁহারা নানাস্থানে পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগকেও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ মনে করা ধৃষ্টতার কার্য্য নহে।

যে গয়ালীদিগের* পদপ্রান্তে আমূল ব্রাহ্মণ সন্তান সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত

---

* অনুসন্ধানদ্বারা অবগত হওয়া গেল গয়ালীরা অম্বষ্ঠ নহেন মাথুর ব্রাহ্মণ। পুরাণে ইঁহাদের উৎপত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে যথা;—"বরাহস্য তু ঘর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে পুনঃ।" যখন ভগবানের তৃতীয় অবতার মহাবরাহ দন্তদ্বারা পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবর হন তখন তাঁহার দেহ হইতে মাথুর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়। মাথুর ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য অতিপুরাকালের। মাথুরেরা তীর্থগুরু, কেবল তীর্থেই ইঁহারা পূজিত হন। আর গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুপাদপদ্মে ও অন্যান্য স্থলে শ্রাদ্ধকালে যাঁহারা মন্ত্র-পাঠ বা পৌরহিত্য করেন তাঁহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। শাকদ্বীপীরা গৌড়দেশে (বঙ্গদেশে) আচার্য্য-ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। ইহাঁরা গয়ায় তন্ত্রধারক বা পুরোহিতের কার্য্য করেন। প্রমাণ যথা :—ব্রাহ্মণবিশেষস্য নামবিশেষপ্রশ্নে ব্রহ্মযামলে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে। শরদ্বীপে চ বেদাগ্নিঃ শাকদ্বীপে চ সিদ্ধকঃ। ভূমধ্যে চ ব্রহ্মচারী দৈবজ্ঞো দ্বারকাপুরে॥ দ্রাবিড়ে মৈথিলেচৈব গ্রহ-বিপ্রেতি সংজ্ঞকঃ। অঙ্গদেশে ধর্ম্মবক্তা পাঞ্চালে শাস্ত্রীসংজ্ঞকঃ॥ সারস্বতে শুভমুখো গান্ধারে চিত্রপণ্ডিতঃ। তৈরহুতে তিথিবিপ্রো নাটকে ঋক্ষসূচকঃ॥ উদ্যানে জ্যোতিষী বিপ্রো ব্রহ্মলে বিধিকারকঃ। বভ্রাটে যোগবেত্তা চ নিটালে দেবপূজকঃ॥ রাঢ়দেশে উপাধ্যায়ো গয়ায়াং তন্ত্রধারকঃ। কলিঙ্গে জ্ঞানবিপ্রঃস্যাৎ আচার্য্যো। গৌড়দেশকে॥

বঙ্গদেশীয় আচার্য্যেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, সরযূপারী ও শাকদ্বীপী। রাজা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক আহূত হইয়া যাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন তাঁহারা সরযূপারী। আর যাঁহারা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে প্রথম মগধেও তৎপর বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন তাঁহারা শাকদ্বীপী। বঙ্গদেশ ব্যতীত গয়া, পাটনা, গাজীপুর, সাহাবাদ, গোরক্ষপুর,

করিয়া থাকেন, উহাঁরাও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। উহাঁদের উপাধি সেন, দত্ত ও গুপ্ত ; মতিলাল সেন গয়ার সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা। ইহাঁদিগকে মুখ্য ব্রাহ্মণ না ভাবিয়া গৌণ ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ ভাবা কি অন্যায় হইবে ?

বৈদ্য শব্দের অপভ্রংশে প্রাকৃতভাষায় "বেজ্জ"। উহার অপভ্রংশে বঙ্গভাষায় বেজ (ব্যাজ) হইয়াছে। বঙ্গদেশের বৈশ্যগণকে বেজ ও বৈদ্য স্ত্রীগণকে বেজ্জী বা বেইজানী বলে। শ্রীরামের বানর ডাক্তার সুষেণও সুষেণবেজ নামে আহূত। আমি এই অজুহতে আসামের বেজ বড়ুয়া শর্ম্মাগণকেও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করি। বঙ্গদেশ হইতে জাতিস্রোত আসামে চলিয়া গেল, তাহার সহিত অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যের দুই একটা কলমও গিয়াছিল, একথা মনে স্থান দেওয়া অসঙ্গত নহে। বেজ বড়ুয়াদিগেরও বৈদ্যদিগের ন্যায় চিকিৎসাই জাতীয় বৃত্তি, সুতরাং উহাঁরা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। বঙ্গদেশের ধরোপাধিক ব্রাহ্মণদিগকেও আমরা যূথভ্রষ্ট অম্বষ্ঠ ভিন্ন আর কিছুই মনে করি না।

এখন তর্ক হইতেছে বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠদিগের ব্রাহ্মণ্য গেল কেন ? কেন যাইবে না ?

যে দেশের সাত শত ব্রাহ্মণ সাত শত শূদ্রে পরিণত হইয়াছিল, সে দেশের অম্বষ্ঠেরা যে মেথর হইয়া যায় নাই ইহাই সৌভাগ্য। ক্রিয়া লোপে তখন বঙ্গবাসীরা অস্পৃশ্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছিলেন। যদি হিন্দুর শাস্ত্র সত্য হয়, তাহা হইলে বেদ ও আচারভ্রষ্ট শ্ববৃত্তিক ৪২ কর্ম্মা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ এখনও শূদ্র ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কিন্তু কান্যকুব্জের ৫ জন ব্রাহ্মণ ও পরে ৫ জন বৈদিক আসিয়া

ঘটিল না। তাই বঙ্গের বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণ্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী। সম্বন্ধ নির্ণয়ে এবিষয়ে একটী প্রশস্ত কারিকা ধৃত আছে বাহুল্য বোধে গৃহীত হইলনা। কিন্তু এই মহান্ধকারেও বৈদ্যের সংস্কৃতের পঠন, পাঠন ও অদাস জীবন, এখনও তাঁহাদিগের রসাতল গত ব্রাহ্মণ্যের সাক্ষ্য দান করিতেছে। আমরা বৈদ্যজাতির উৎপত্তি ও সামাজিক আভিজাত্য সম্বন্ধে যাহা শাস্ত্রে পাইয়াছি তাহা লিখিলাম। এইক্ষণে মাননীয় সত্যপ্রকাশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে এই জাতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তৎ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মহর্ষি মেধাতিথি মনুর—"ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়া অম্বষ্ঠ নাম জায়তে" এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"কন্যা গ্রহণং স্ত্রীমাত্রোপলক্ষণার্থং ইতি ব্যাচক্ষতে বৈশ্যস্ত্রিয়া মিত্যর্থঃ"।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়—আবার মেধাতিথির ভাষ্যের অর্থব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"অর্থাৎ এই শ্লোকে যে বৈশ্যকন্যা শব্দের প্রয়োগ আছে উহার অর্থ বৈশ্য স্ত্রী। অতএব মেধাতিথির মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে কোন বৈশ্যস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান অম্বষ্ঠ। ইহাতে ব্রাহ্মণের পরিণীতা পত্নী বুঝাইলনা। অতএব ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত না হইলে অবৈধ সন্তান হয়। প্রাচীন সুবিজ্ঞ বৈদ্যগণ—বরং বৈশ্যত্ব কিংবা শূদ্রত্ব স্বীকার করিতেন তথাপি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের অবৈধ সন্তান বলিতে সম্মত হইতেন না। কিন্তু আধুনিক নব্য শিক্ষিত বৈদ্যগণের মত স্বতন্ত্র"।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বোধ হয় স্মৃতি শাস্ত্রে নূতন ব্রতী। তাঁহার শ্যাম কেশও বোধ হয় এখন ধবলিমার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই, করিলে তিনি শাস্ত্রের একপ ব্যাখ্যাও করিতেন না। বৈদ্যদের মত সম্বন্ধে

ব্রাহ্মণ অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারিবেন, কার কার কন্যা বিবাহ করিবেন মনু তাহা ৩য় অধ্যায়ের ১২।১৩শ শ্লোকে বলিয়া দশমাধ্যায়ের ৬।৮।৯ শ্লোকে সেই অসবর্ণ বিবাহে উৎপন্ন সন্তানদিগের কথা বিবৃত করিলেন। এবং তথায় তিনি বলিলেন ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে যে সন্তান হইয়াছিল, তাহার নাম অম্বষ্ঠ।

মেধাতিথি জানিতেন যে দেশে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় দুই একটা মহাপ্রাণী জন্মা আশ্চর্য্য নয়, তাই তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বলিলেন যে এই যে কন্যা শব্দ আছে ইহা দ্বারা কেহ এমন মনে করিওনা যে ব্রাহ্মণ বৈশ্যের কন্যাতে অনূঢ় ভাবে এই কানীন সন্তান জন্মাইয়া ছিলেন। মনু ছন্দোহনুরোধে ও বিবক্ষা বশতঃ এখানে কন্যা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলতঃ এই বৈশ্যকন্যা অর্থ বৈশ্য স্ত্রী।

ব্রণান্বেষী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ইহাতেও গতিরোধ হইল না, তিনি বলিলেন "বৈশ্য স্ত্রী"—অর্থাৎ বৈশ্যের স্ত্রী !!!

আমরা মনে করি এখানে মেধাতিথির "বৈশ্যস্ত্রী" এই পদটীতে ষষ্ঠী সমাস নহে, ইহা কর্ম্মধারয় সমাস নিষ্পন্ন পদ। উহার অর্থ ব্রাহ্মণের বৈশ্যা স্ত্রী অর্থাৎ বৈশ্যজাতীয়া নিজ পরিণীতা পত্নী।

পাঠক দেখুন কুল্লূক তজ্জন্য বলিয়াছেন কন্যা গ্রহণাদত্র ঊঢ়ায়া মিত্যধ্যাহার্য্যং। বিন্নাস্বেষ (বিবাহিতাস্বেষঃ) বিধিঃ স্মৃতঃ—ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন স্ফুটীকৃতত্বাচ্চ। ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্য কন্যায়া মূঢ়ায়াং অম্বষ্ঠাখ্যো জায়তে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ বস্তাটীও না নাড়িয়াছেন তাহা নহে; তথাপি স্বাদগ্রহণে কেন এত গোলযোগ ঘটিল আমরা তাহা বুঝিতে অত্যক্ষম।

মেধাতিথি যে অম্বষ্ঠকে বৈধ সন্তান জানিয়া (১০ অ—৪১ শ্লোকে) দ্বিজাতির দশবিধ অধিকারে সম্পূর্ণ স্বত্ববান্ বলিলেন, তিনি সেই অম্বষ্ঠকে অবৈধ সন্তান বলিবেন ইহা বাতুলজনকল্পনাভিন্ন আর কি

মনু (১০—অ—৭ শ্লোক) স্পষ্টতই বলিয়াছেন "ধর্ম্ম্যং বিদ্যাৎ ইমং বিধিং"। যদি অম্বষ্ঠ বৈধ সন্তানই না হইবেন তাহা হইলে মনু কি বিধি প্রণয়ন করিয়া পরস্ত্রীগমনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন ইহাই বুঝিতে হইবে? "ব্যভিচার কর ও উহাই ধর্ম্ম্য বিধি", মনুর বচনের কি ইহাই প্রকৃতার্থ? ব্যভিচারজ হইলে সে বর্ণসঙ্কর হয়, বর্ণসঙ্কর হইলে সে শূদ্রধর্ম্মা হইয়া থাকে। মেধাতিথি যাহার দ্বিজত্ব সংস্থাপনে অতীব আগ্রহবান্ সে ব্যভিচার জাত এ বড়ই বিচিত্র বারতা! "পতিতো জার দোষতঃ"—যে জারজাত সে পতিত হইয়া থাকে, সমাজে কি বৈদ্যেরা অনাচরণীয় অস্পৃশ্য পতিত জাতি?

মনু অসবর্ণ বিবাহের মত দিয়াছেন, সে বিবাহে কে কে জন্মিয়াছে তাহাদের নাম লইয়াছেন এবং তাহাদিগকে পিতার অপসদ পুত্র বলিয়াছেন। তাহারা ধর্ম্মপত্নীর সন্তান নয়, একথা বলা কি সম্পূর্ণ বিকৃত বিচেষ্টা নহে? মনু অসবর্ণ বিবাহের বিধি দিলেন এবং অসবর্ণা স্ত্রীগণ গৃহে আনীত হইলে কি ভাবে সপর্য্যিত হইবেন তাহারও ব্যবস্থা দিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। যথা—

গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরু যোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ॥ ২১০—২অ।

গুরুর সজাতীয়া স্ত্রীকে শিষ্যেরা গুরুর ন্যায় পূজা করিবেন। কিন্তু গুরুর অসবর্ণা স্ত্রীদিগকে পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিবেন না, দেখিয়া গাত্রোত্থান ও মুখে নমস্কার করিবেন।

সুতরাং বুঝিতে হইবে অসবর্ণা স্ত্রীগণ ধর্ম্মপত্নী, বৈধপত্নী ও তৎ সন্ততিগণও বৈধ সন্তান ও বৈধ বংশধর। এবং উহাঁরা রিক্থভাগীও বটেন।

মনু শাস্ত্র বচন প্রণয়ন করিয়া ব্যভিচারের সমর্থন করিয়াছেন ও সেই ব্যাভিচারিণীদিগকে অভিবাদনাদিও করিতে বলিয়াছেন। বোধ হয়

ঋজুপাঠের কর্ণ হৃদয়রহিত লম্বকর্ণ ভিন্ন আর কেহই সে কথা মনেও স্থান দিবেন না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্যত্র বলিয়াছেন—"যদি বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠই ধরিয়া লওয়া যায়।" বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ এক, ইহা একটী স্বীকৃত সত্য ও পরিজ্ঞাত তথ্য। আমরা তাহা সপ্রমাণও করিয়াছি, এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠগণকে বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন সেটীও তাঁহার শাস্ত্রানভিজ্ঞতার অন্যতর পরিচয়। বৈধ অনুলোমজগণ বর্ণসঙ্কর নহেন। দুই বর্ণসঞ্জাত হইলেই তাহাকে বর্ণ সঙ্কর বলে এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্যত্র বলিয়াছেন বৈদ্য ও কায়স্থ সমান। আমরা কিন্তু এ কথার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি যদি ইংরাজ আমলের স্কুলের পরীক্ষাফল ও কাজকর্ম্মের অবস্থা দেখিয়া একথা বলিয়া থাকেন তবে আমরাও তাহাতে তথাস্তু বলিব। কেননা আধ্যাত্মিক বিষয় বাদ দিলে বর্ত্তমান পার্থিব উন্নতিতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ যে প্রায় সমান তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যদি জাতিগত আভিজাত্য বিষয়েও এই মত পোষণ করিয়া থাকেন তবে অন্যায় করিয়াছেন। এ দুই জাতি কোন দিন সমান ছিল না; কোন দিন সমান বলিয়া গৃহীতও হইতে পারে না। এ হিন্দুর জাতি। ধনসম্পদে ইহার গৌরব লাঘব ঘটে না। ইহা বিলাতি লর্ডসিপ নহে।

সকলেই জানেন ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা এই ৫টী জিলাতে বৈদ্য ও কায়স্থে আদানপ্রদান হইয়া থাকে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যদি জানিতে ইচ্ছা করেন তবে ঐ সব অঞ্চলের একজন কায়স্থকে জিজ্ঞাসা করিলেও জানিতে পারিবেন; বৈদ্যগণ, তথায় কায়স্থের নিকট সর্ব্বোচ্চ কুলীন বলিয়া স্বীকৃত।

ঐ সকল দেশে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র উপাধিধারী কায়স্থগণ, তত্রত্য

নন্দী, দত্ত, ধর ও কর উপাধিধারী কায়স্থের নিকট অতি হেয় কায়স্থ। কায়স্থের মধ্যে নন্দী, দত্ত, ধর ও কর শ্রেষ্ঠ এবং কুলীন। কেন? এই নন্দী, দত্ত, ধর ও কর কায়স্থেরা বৈদ্য ছিলেন কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। ঐকারণে বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থদিগের মধ্যে দাশ ও নন্দী মহাকুলীন। বসু ঘোষাদি নহে।

কাশীতে কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর মোকদ্দমায় হাবড়ায় বিহারীলাল ভঞ্জ জমিদার মহাশয় সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছেন আমি কায়স্থ, কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু বৈদ্য। তিনি আমা অপেক্ষা জাতিতে ও বয়সে বড় বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি।

হিতবাদীর মোকদ্দমায় বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, ও বাবু গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী বিশদাক্ষরে বলিয়াছেন আমরা শূদ্র তজ্জন্য আচমন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারি না।

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভিন্ন অন্য জাতি পড়িতে পাইত না। শম্ভু বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিদ্যাসাগর চরিতের ৯০ পৃষ্ঠায় তাহা বর্ণিত আছে। তথায় কায়স্থ শূদ্র বলিয়া বিবৃত।

শাস্ত্রে আছে "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ"—আমরা ব্যবহারতঃ দেখিতেছি কায়স্থগণই শূদ্র বলিয়া মতি-লাভে বারিত ছিলেন। তাই দেবনাগরাক্ষরে অনধিকারী কায়স্থের লিখন জন্য কায়তি নাগরীর সৃষ্টি। কিন্তু পক্ষান্তরে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণবৎ সংস্কৃতের পঠন পাঠনায় অধিকারী; সংস্কৃত গ্রন্থগুলিও ব্রাহ্মণ বৈদ্য ভিন্ন কায়স্থকৃত নহে। বৈদ্যের উপাধিগুলি দেখিলেও ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুঝিতে পারিবেন।

কায়স্থের উপাধি—দস্তিদার, শীকদার, সরদার, তরপদার, মাঝী, সরকার ইত্যাদি। আর বৈদ্যের উপাধি—বিদ্যার্ণব, বিদ্যারত্ন, সার্ব্বভৌম,

শিরোমণি ও বাচস্পতি প্রভৃতি, ইহা ছাড়া কবিভারতী, কবিশেখর, কবিকর্ণপূর প্রভৃতি উপাধির ত অন্তই নাই* ।—

অপিচ ভাণ্ডারী, খানসামা, ফিরিওয়ালা, মুদি, দোকানদার, দাঁড়ী ও মাঝী প্রভৃতি অসংখ্য কায়স্থ শ্রেণী আছে, যাহারা যে কোন ভদ্র কায়স্থের কন্যাগ্রহণে ও কন্যাদানে অধিকারী। এ হেন হীনকর্ম্মা কায়স্থ, অহীনকর্ম্মা একতর ব্রাহ্মণ বৈদ্যের সমান একথা বলা ধৃষ্টতা বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্রকৃত সম্ভ্রান্ত বংশজ কায়স্থগণ একথা জানেন না, তাঁহারা এখনও বৈদ্য জাতিকে নমস্য বলিয়াই অবগত আছেন।

আমরা নিম্নে বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মত উদ্ধৃত করিলাম।

১। বঙ্গীয় সমাজ প্রণেতা বাবু সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম এ, বি এল্,—টাকী।—বৈদ্যগণ প্রধানতঃ সেন-গুপ্ত, দাশ, আখ্যাধারী। সমাজে ইহাঁরা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সমকক্ষ ভাবে ব্রাহ্মণের নিম্নে আসন গ্রহণ করেন। ৮৪ পৃষ্ঠা।—

২। সম্বন্ধ নির্ণয় প্রণেতা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি অধ্যক্ষ হুগলি নর্ম্ম্যাল স্কুল।—ইহাঁরা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সমকক্ষভাবে ও ব্রাহ্মণের নিম্নে আসন গ্রহণ করেন। স্থলবিশেষে ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার প্রায়ই ব্রাহ্মণ সদৃশ। এবং স্থলবিশেষে কায়স্থাদি সৎ শূদ্রের তুল্য। ১৫১ পৃষ্ঠা।

---

* কর্ণ পূরাৎ সুতো জাতো রাম চন্দ্রঃ শিরোমণিঃ
রমা নাথঃ সার্বভৌমঃ কন্যা মেনাং ব্যুবাহ চ।
রতি কান্ত স্তথা গৌরী কান্তশ্চ রাম কান্তকঃ।
জ্যেষ্ঠোহি কণ্ঠা ভরণো মধ্যমঃ কবিভারতী।
কনীয়ান্ কণ্ঠহারশ্চ……বৈদ্য কুল পঞ্জিকা—কণ্ঠহার।

প্রবন্ধ লেখক—এই গৌরীকান্ত দাশ কবি ভারতীর অধস্তন সন্তান—এবং লেখকের পিতা—রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের বংশের দৌহিত্র।

৩। পণ্ডিত বেণীমাধব ন্যায়রত্ন জাতিকৌমুদীপ্রণেতা ৩২ পৃষ্ঠা।—

সকল সঙ্কর বর্ণের * মধ্যে আমরা বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতে সঙ্কুচিত নহি। এই জাতির মধ্যে বহুতর ঋষি ও ঋষিতুল্য মানব জন্মগ্রহণ করিয়া ধরিত্রীর বহুপকার সাধন করিয়াছেন, এই জাতির ব্যবসা চিকিৎসা। এই জাতি অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা গ্রন্থ ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও ছন্দঃ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণাদির ন্যায় সংস্কারভাজন, এবং ব্রাহ্মণাদির ন্যায় পূজনীয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ লক্ষিত হয় না।

৪। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী ৬-৭ পৃষ্ঠা।—

কাঁচড়াপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাশ একটী বৈদ্য বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের দুই পুত্র—বিজয়রাম ও নিধিরাম। বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি 'বাচস্পতি' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার একটী টোল ছিল। তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কএকখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত।

---

* দুই বর্ণে জন্মিলেই সে বর্ণসঙ্কর হয় 'এই বাল্য কুসংস্কার বশতঃ ন্যায়রত্ন মহাশয় বৈদ্যকে বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন।—লেখক।

ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল।

(২) জমিদারদিগের পক্ষে অর্দ্ধভূমিকরের নিয়ম।

আবেদনকারীদিগের দ্বিতীয় প্রস্তাব এইরূপ ছিল ঃ—যেখানে ভূমিকর জমিদারে দেন, সেখানে যে সকল জমিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, এরূপ স্থলে সর্ব্বত্রই ১৮৫৫ সালের সাহারাণপুর-বিধি প্রচলিত থাকা উচিৎ—যাহাদ্বারা প্রকৃত প্রজাকরের অর্দ্ধেক গভর্ণমেণ্টকে দেয়করের সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

১৮৫৫ সালে লর্ড ডালহৌসির গভর্ণমেণ্টের দ্বারা নিরূপিত এবং প্রচারিত সাহাণপুরনিয়মাবলীর ৩৬শ নিয়ম এইরূপ—

"কোন সম্পত্তির আয় সূক্ষ্মরূপে প্রায়ই নিশ্চয় করা যায় না কিন্তু খরচ বাদে গড় আয় সম্বন্ধে আজকাল পূর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, ইহা দ্বারা কর নির্দ্ধারণ অতিরিক্ত দাঁড়াইতে পারে, কারণ প্রকৃত গড় আয়ের দুই তৃতীয়াংশ কোন ব্যক্তি বা সমাজ বহুকাল ধরিয়া সহজে দিয়া উঠিতে পারেন না, এইজন্য গভর্ণমেণ্ট বন্দোবস্তী কার্য্যকারকদিগের প্রতি আদেশের ৫২ প্যারায় লিখিত নিয়ম এই পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিবার সংকল্প করিয়াছেন, যে, খরচ বাদে গড় আয়ের অর্দ্ধাংশের মধ্যেই রাজার দাবী সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে প্রত্যেক সম্পত্তির গড় উৎপত্তির অর্দ্ধাংশই রাজকররূপে লওয়া হইবে। কিন্তু এই বিষয় এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে কলেক্টরের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে সাবধানে নির্ণীত খরচ বাদ আয়ের, পূর্ব্বের ন্যায় দুই তৃতীয়াংশ নহে, অর্দ্ধাংশ মাত্রই গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য হইবে। যে জমি বন্দোবস্ত করিতে হইবে তাহার আয় সূক্ষ্মরূপে জানিবার জন্য বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া উক্ত আদেশাবলীর ৪৭ হইতে ৫১ প্যারায় যেরূপ সাবধান হইবার কথা বলা হইয়াছে তদ্বিষয়ে কালেক্টরের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।"

উক্ত নিয়মের মধ্যে খাজনা ভবিষ্যতে বৃদ্ধির পর সম্পত্তির

সম্ভাবিত আয় সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা নাই। "খরচ বাদ গড় আয়" "প্রকৃত গড় আয়" এবং "সাবধানে নিরূপিত খরচ বাদ আয়" এই কথা এবং এইরূপ কথাই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কথার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহের ছায়া মাত্র থাকিতে পারে না। লর্ড ডালহৌসির গভর্ণমেণ্ট সম্পত্তির তৎকালীন প্রকৃত আয়ের বিষয়ই ভাবিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে সম্ভাবিত আয়ের বিষয় নহে।

কিন্তু রাজকর্ম্মচারীরা সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত, এবং কি প্রকারে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অন্যায়রূপে এড়াইয়া মধ্যপ্রদেশের রাজস্ব কিরূপে বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল তাহা মিঃ, জে, বি, ফুলারের স্বাক্ষরিত ১৮৮৭ সালের ১৮ই মে তারিখের একখানি পত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা উক্ত পত্র হইতে দুইটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"তখন যেরূপ কর নিরূপণের প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে প্রদেশের কোন অংশে যে কর্ম্মচারী রাজস্বের বৃদ্ধি সঙ্গত মনে করেন, এবং তাহাই ঘটাইতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে আয়ের নির্দ্দিষ্ট অংশের মধ্যে রাজস্বকে সীমাবদ্ধ করে এমন রাজনিয়ম সম্পূর্ণ পালন করা অসম্ভব ছিল, যদি না আয় শব্দটীকে অত্যন্ত শিথিল এবং অনিশ্চিত অর্থ প্রদান করা হইত। কার্য্যতঃ, প্রত্যেক মহালের আয় অর্থাৎ খাজনামূল্য কতকগুলি গড় তালিকা দৃষ্টে সম্ভাবিত অনুমানের তুলনা হইতে নির্দ্ধারণ করা হইত; কোনও গ্রামে, যাহাতে ভূমির বিশেষত্বজাত বিভিন্ন হারের ভূমিকর পাওয়া যাইত, তাহাতে বিভিন্ন প্রকারের ভূমিকর পক্ষে উক্ত-প্রকার করের হার ধরিয়া যে অনুমিত আয়ে পৌঁছান যায় পূর্ব্বোক্ত অনুমানসমূহের মধ্যে তাহাই সর্ব্বপ্রধান। গভর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক ভূমিকর উক্তরূপে নির্দ্ধারিত হইলে, ভূস্বামীগণের তরফে খাজনার নূতন বন্দোবস্তের যে যোগাড় করা হইত তাহা দ্বারা তাঁহাদের প্রাপ্য খাজনা কতদূর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইত, তাহারই উপর, উক্তরূপে সরকার-কল্পিত মহালের আয়ের প্রকৃত আয়ের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকিত কিনা তাহা নির্ভর করিত।"

"উপরন্তু, ইহাও বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, সম্প্রতি যেরূপ বন্দোবস্ত

গতবারের বন্দোবস্তের সময় যে প্রকারে আয়ের অর্দ্ধাংশ করগ্রহণের নিয়ম অন্যায় কৌশলে ভঙ্গ করা হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। অর্দ্ধাংশ নিয়ম খাটাইবার সময় এখন আর প্রকৃত ও নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত মূল্য মহালের খাজনামূল্য বলিয়া ধরিলে চলিবে না।"

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই ফুলার সাহেবই এখন ভারত-গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী এবং লর্ড কার্জ্জনের "ল্যাণ্ড রেজলিউশন" স্বাক্ষর করিয়াছেন, এবং সেই জন্যই ১৮৮৭ সালে যাহাতে তিনি নিজে অর্দ্ধ-উৎপত্তি নিয়মের ব্যতিক্রম করা বলিয়াছেন তাহাকেই ১৯০২ সালে সঙ্গত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফুলার সাহেব একজন উপযুক্ত এবং গুণশালী কর্ম্মচারী, ভারতবর্ষের রাজস্বকার্য্যে তাঁহার বিস্তর বহুদর্শিতা আছে, এবং তিনি যে উচ্চ পদ অধিকার করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু হায়! আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে ১৮৮৭ সালে তিনি নিজে যাহাকে রাজকর্ম্মচারী দ্বারা রাজনিয়ম ভঙ্গ বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন ১৯০২ সালে তাহাকেই সঙ্গত প্রমাণ করিবার চেষ্টাই তাঁহার ঐ উচ্চপদের একটী সর্ব্ব প্রথম কার্য্য হইবে। ১৯০২ সালে তিনি এইরূপ লিখিতেছেন :—

"অতএব যাহা আদায়ের অর্দ্ধাংশ নিয়ম বলিয়া জ্ঞাত, তাহা যে কোথাও জমিদারদিগের সমগ্র নগদ আদায়ের অর্দ্ধাংশের অনধিক মাত্র সেই জিলা হইতে প্রাপ্য রাজস্বরূপে গ্রহণ করিতে গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করে, এরূপ বিবেচনা করা নিতান্তই ভুল। এ বিষয়ে যে কোন কঠোর আজ্ঞা নাই শুধু তাহাই নহে, কিন্তু আদায় কথাটির যে অর্থ তখন এবং তাহার পরেও অনেক বৎসর ধরিয়া করা হইয়াছে, তাহাতে বন্দোবস্তের কর্ম্মচারীকে প্রকৃত নগদ খাজনা অতিক্রম করিয়া দৃষ্টিচালন করিতে, ভবিষ্যতে সম্ভাবিত আয় বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করিতে, যে প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে অনেকগুলি বিশেষ সত্ত্বের অধিকারী এরূপ প্রজার জমির আয় যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে, এবং যেখানে জমি কেবলমাত্র চাষি-জমিদারের অধিকৃত সেখানে "স্থির" অথবা উদ্বাস্তু জমির করমূল্যের সঙ্গে সঙ্গে ফসলের লাভের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। ফলে ইহাই দাঁড়াইত যে এইরূপে নির্দ্দিষ্ট

রাজস্ব সরকারি কর্ম্মচারিগণের কথিত ও কল্পিত আদায়ের অর্দ্ধেক মাত্র হইলেও সচরাচর প্রকৃত আদায়ের অর্দ্ধাংশেরও অত্যন্ত অধিক পরিমাণ গ্রাস করিত।"

১৮৮৭ খৃঃ, অব্দে যাহা রাজবিধির ব্যতিক্রম বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছিল, ১৯০২ খৃঃ, অব্দে তাহারই এইরূপ সমর্থন চেষ্টার কোন প্রকার সমালোচনাই অপ্রীতিকর হইবে। সন্তোষের বিষয় এই যে রাজবিধির অজ্ঞতা জন্যই হউক বা ইচ্ছাজনিতই হউক উক্ত প্রকার অন্যায় করনির্দ্ধারণ প্রথা এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইদানন্তীন উৎকৃষ্টতর প্রথা পূর্ব্বোক্ত ল্যাণ্ড রেজোলিউসন্‌এ বর্ণিত হইয়াছে।

"যাহা হউক সম্প্রতি নির্দ্দিষ্ট কর সমভাবেই কমিয়া আসিতেছে, উত্তর পশ্চিম এবং অন্যান্য জমিদারী প্রদেশে জমির "সম্ভাবিত" আয় এখন আর গণ্য করা হয় না। জমিদারকৃত জমির উন্নতি, ফসলের অনিশ্চয়তা ও স্থানীয় অবস্থার জন্য কর নির্দ্ধারণে কিঞ্চিৎ ছাড় দেওয়া হইয়া থাকে। এবং রাজস্ব ভূম্যধিকারীর প্রকৃত আয়ের উপরই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ভূম্যধিকারীর নিজ খাসের ও প্রজাবিলি জমির ন্যায্য খাজনা উক্ত আয়ের মধ্যে গণ্য করা হয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ভূমিকর এইরূপে জমিদারের পক্ষে হ্রাস করিয়া গড়ে আয়ের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও কম করা হইতেছে। অযোধ্যায় পুনর্বন্দোবস্ত, যাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তাহাতে ভূমিকর গড়ে আয়ের শতকরা ৪৭ অংশেরও কম দাঁড়াইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্পকাল ইংরাজশাসনে শাসিত মধ্যপ্রদেশ, যেখানে মারাট্টাশাসনকাল হইতে প্রচলিত ভূমিকর, কোনও কোনও স্থলে, প্রকৃত আয়ের শতকরা ৭৫ অংশ গ্রাস করিত, সেখানেও উক্ত কর ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে; কিন্তু উহা এখনও উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের সাধারণতঃ প্রচলিত অতি সঙ্গত ও স্বল্পহারে এখনও আসিয়া পৌছায় নাই। কালে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষিকার্য্যে অধিকতর শ্রম ও অর্থনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য অংশ আরও হ্রাস হইবে আশা করা যায়; এবং ইহারই মধ্যে (মধ্যপ্রদেশের রিপোর্টে ইহা দেখান হইয়াছে) উক্ত প্রদেশের উত্তরস্থ তিনটী জেলায় বহুকালব্যাপী বন্দোবস্তের শেষে যে সহসা করের অতিবৃদ্ধি সম্ভাবিত হয়, তাহারই প্রশমনমানসে, সম্প্রতি নূতন কর নির্দ্ধারণে আদায়ীখাজনার শতকরা

ভূমিকর আয়ের শতকরা ৮৩১/৩ অংশ বলিয়া প্রচার করা হইয়াছিল ; ১৮০৩ সনে উহাকে শতকরা ৭০।৭৫ অংশে নামাইয়া আনা হইয়াছিল ; ১৮৪০ সনে শতকরা ৬০ অংশে ; আর সেদিনমাত্র যে পুনর্বন্দোবস্ত শেষ হইল তাহাতে উহা শতকরা ৫০১/২ অংশে দাঁড়াইয়াছে।"

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর শেষাংশের মন্তব্যগুলি সম্ভবতঃ আমার ব্যক্তিগত প্রশংসা হিসাবে প্রকাশ করেনই নাই ; কিন্তু তথাপি আমার বোধ হয় আমি ন্যায়তঃ যৎকিঞ্চিৎ কৃতিত্ব গ্রহণ করিতে পারি, কেন না, উড়িষ্যার বন্দোবস্ত অ্যাক্‌টিং কমিসনাররূপে আমারই পর্য্যবেক্ষণাধীনে সংসাধিত হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট সঙ্গত নিয়মে বন্দোবস্ত বিধান করিবার এই অনুমতি দানের সময় আমার মন্তব্য ও পরামর্শলিপি সরকার বাহাদুরের সম্মুখে ছিল।

মোটামুটি ও সাধারণতঃ বলিতে গেলে ভারত গভর্ণমেণ্ট অবেদন পত্রে উল্লিখিত নিয়ম স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু উহাকে বিধিবদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। সরকারী রেজোলিউসনে বলা হইতেছে—

"এই সারসংগ্রহে ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে যদিও শতকরা ৫০ অংশ কুত্রাপিও নিশ্চয় ও অপরিবর্ত্তনীয় বিধিরূপে প্রচারিত হয় নাই, তথাপি সমস্ত স্বল্পকালের জন্য বন্দোবস্তী জমীদারীজেলার সর্ব্বত্রই উক্ত অংশের নিকটস্থ হইবার ক্রমশঃবর্দ্ধিত চেষ্টা বরাবরই ছিল ও আছে, এবং অসাধারণ অবস্থাধীনে উহাপেক্ষা অনেক অল্পাংশ গৃহীত হইয়া থাকে। যে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের মৎলব স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত এবং যাহাতে, স্থানীয় অবস্থাগুণে সঙ্গত ও আবশ্যক না দাঁড়াইলে, কার্য্যগত সমব্যবহার এতই সাধারণ তৎসম্বন্ধে কোনও নূতন নিয়ম প্রকাশ করা গভর্ণমেণ্ট আবশ্যক মনে করেন না।"

আবেদনকারীগণ এই মন্তব্য প্রচারে একপ্রকার সন্তুষ্ট থাকিতে

করিতেছে। লর্ড কর্জ্জনের গভর্ণমেণ্ট আরও একটু দৃঢ়ভাবে এবং ভাষায়—লর্ড ডালহাউসির গভর্ণমেণ্ট ব্যবহৃত প্রমাদসম্ভাবনাশূন্য স্পষ্ট বাক্যে—অর্দ্ধাংশ ভূমিকরনিয়ম গ্রহণ ও প্রচার করিলে বর্ত্তমান রাজ্য-পরিচালক মহোদয়গণের যশোবৃদ্ধিই হইত এবং ভারতবাসীগণ সেই স্পষ্ট আশ্বাস লাভ করিত, যাহা তাহাদের পক্ষে এতই আবশ্যক!

(৩) সকল বন্দোবস্তেই ৩০ বৎসরের নিয়ম।

এ বিষয়ে লর্ড কার্জ্জনের মন্তব্যেও আমাদিগের আশার কারণ আছে। আবেদনকারীদিগের প্রস্তাব ছিল যে কোনও প্রদেশেই ভূমিকরের পুনর্বন্দোবস্ত ৩০ বৎসরের কমে করা না হয়। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের রেজোলিউসন এইরূপ।

"ইহার পর যে প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে তাহা এই যে, অচিরস্থায়ী বন্দোবস্তী স্থানে কোনও বন্দোবস্তকাল ৩০ বৎসরের ন্যূন না হয়। সংক্ষেপে বন্দোবস্তের ইতিবৃত্তের সারসংগ্রহ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়, বোম্বাইয়ে ডিরেক্টরসভা সুদূর ১৮৩৭ সনে ৩০ বৎসর বন্দোবস্তকাল নির্দ্দিষ্ট করেন। তথা হইতে ইহা মান্দ্রাজ ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে প্রচারিত হইয়া গত অর্দ্ধশতাব্দীকাল চলিয়া আসিতেছে। ১৮৬৭ সনে উড়িষ্যা বন্দোবস্তের বৃদ্ধির সময় এবং ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সনের মধ্যে নির্দ্ধারিত মধ্যপ্রদেশের অধিকাংশ বন্দোবস্তেরই গ্রাহ্যকরণ সময়ে উক্ত-নিয়মেরই অনুসরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কখনই পঞ্জাবে সাধারণতঃ প্রচলিত হয় নাই; উক্তপ্রদেশের অধিকাংশেই অপেক্ষাকৃত স্বল্পকাল ২০ বৎসরই স্বীকৃত নিয়মরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। ১৮০৫ সনে ভারতসচীব মহোদয় এই বিষয়টী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা ও বিচার করিয়া চূড়ান্তরূপে স্থির করিয়াছিলেন যে ৩০ বৎসরই মান্দ্রাজ বম্বে ও উত্তরপশ্চিমবিভাগে বন্দোবস্তের সময়রূপে চলিতে থাকিবে, পঞ্জাবে ২০ বৎসরই সাধারণ নিয়ম হইবে (কোনও কোনও স্থলে ৩০ বৎসরও গ্রাহ্য হইবে), এবং মধ্যপ্রদেশেও ২০ বৎসর। উড়িষ্যায় সম্প্রতি যে পুনর্বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে ৩০ বৎসরের বন্দোবস্তকাল গ্রহণ করা হইয়াছে।

সকলেই জানেন এবং সহজবোধ্য। যেখানে ভূমি সম্পূর্ণরূপে কর্ষিত হইয়াছে, কর সুসঙ্গত, ও কৃষিফল অতিমাত্র হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনাধীন নয়, সেখানে গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য প্রতি ৩০ বর্ষে অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষের জীবিতকালে একবার মাত্র পুনর্নির্দ্দিষ্ট হইলেই যথেষ্ট। যেখানে বিপরীত অবস্থার প্রাবল্য, বিস্তর জমি পতিত আছে, কর স্বল্প এবং ফসলের পরিমাণ অতি হ্রাসবৃদ্ধিযুক্ত, অথবা যেখানে রাস্তা, রেলপথ ও খাল নির্ম্মাণ-বশতঃ বা প্রজাসংখ্যাবৃদ্ধি কিম্বা ফসলের মূল্য বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য ত্বরিতপদে সম্পদোন্নতি ঘটিতেছে, সেখানে এতদীর্ঘকাল পুনর্বন্দোবস্ত ফেলিয়া রাখিলে প্রজাদেরও ক্ষতি হইয়া থাকে—কেন না সহসা ও এককালীন খাজনার অতিবৃদ্ধি সহ্য করা তাহাদের অসাধ্য,—এবং সাধারণ ট্যাক্সদাতারও ক্ষতি হইয়া থাকে, কেন না কিছু কালের জন্য তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায়তঃ প্রাপ্য বর্দ্ধিতকর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বন্দোবস্তের ৩০ বৎসরাপেক্ষা স্বল্পকালের স্বপক্ষে এই সকল যুক্তি পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশের পক্ষে যথেষ্ট প্রাবল্যের সহিত আজকাল প্রয়োগ করা যাইতে পারে কি না, এবং আজকাল পারিলেও সময়ের গতিতে সেই প্রয়োগের প্রাবল্য হ্রাস হইয়া আসিবে কি না, এ দুইটী অতি গুরুতর প্রশ্ন এবং কোন উপযুক্ত সময়ে ভারতগভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সযত্ন মনোনিবেশ করিবেন।”

শেষ কথাটীতে আমাদের যৎপরোনাস্তি আশার সঞ্চার হইয়াছে। পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ “পিছুপড়া স্থান” নয়; তাহারা অর্দ্ধশতাব্দী বৃটিশ শাসনে আছে; বিশিষ্ট রেলপথাবলী তাহাদের ভিতর দিয়া চলিয়াছে; তাহাদিগকে বারম্বার নববন্দোবস্তাধীন করা হইয়াছে। পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশেও এখন ৩০ বৎসর নিয়ম কেন স্পষ্টতঃ ও চূড়ান্তরূপে প্রসারিত হইবে না তাহার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা সত্ত্বেও প্রত্যেক পুনর্বন্দোবস্তই জনসাধারণের পীড়াদায়ক; স্বল্পস্থায়ী বন্দোবস্তে উন্নতির সর্ব্বপ্রবৃত্তিই এবং উদ্‌বৃত্তির সর্ব্বসম্ভাবনাই লোপ করিয়া দেয়; দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্তে জমীদার ও কৃষাণ উভয়কেই আশা ও উৎসাহ প্রদান করে, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীগণের অর্থ এবং কর্ম্মচেষ্টা ও [illegible]

একপুরুষকাল পরেই, দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল; এবং সেইরূপ দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত বোম্বাইয়ে ১৮৩৭ সনে, অর্থাৎ শেষ পেশওয়ার রাজ্য বৃটিশরাজ্যভুক্ত হইবার ২০ বৎসর মাত্র পরেই, করা হইয়াছিল। নিশ্চয়ই পঞ্জাবে ও মধ্যপ্রদেশে অর্দ্ধশতাব্দী বৃটিশশাসনের পর স্বল্পস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণগুলি এখন আর বর্ত্তমান নাই; এবং লর্ড কার্জ্জন যে ভারত-সচীবমহোদয়কে তাঁহার ১৮৯৫ সনের রায়ের পুনর্বিচার করিতে ও এই দুইটী প্রাচীন ও সুব্যবস্থিত প্রদেশে ৩০ বৎসরের নিয়ম প্রসারিত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন এরূপ আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে।

(৪) কৃষকদিগের করবৃদ্ধি সীমাবদ্ধ করা।

এ বিষয়ে আবেদনকারীদিগের প্রস্তাবিত নিয়ম এই যে যেখানে ভূমিকর কৃষক প্রজার নিকট পাওয়া যায়, সেখানে ফসলের মূল্যবৃদ্ধি অথবা গভর্ণমেণ্টের নিজ খরচায় প্রস্তুত খাল প্রভৃতির দ্বারা ক্ষেত্রের জলসেকসুবিধাসম্ভূত জমির শ্রীবৃদ্ধি—এই দুই কারণ ব্যতীত কোনওরূপ করবৃদ্ধি করা হইবে না।

যে সকল স্পষ্ট ও সঙ্গত কারণে ভূমিকর বৃদ্ধি করা উচিত তাহা নির্দ্দিষ্ট করাই আবেদনকারীগণের অভিপ্রায় ছিল। জমীদার ও প্রজাদিগের মধ্যে এ বিষয়ে এই প্রকারের স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বাঙ্গলার ভূমিকর আইনে বিধিবদ্ধ আছে, এবং এই সকল স্পষ্ট ও বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত কোনপ্রকার করবৃদ্ধিই আদালতে মঞ্জুর হয় না। কৃষি প্রজার নিকট গভর্ণমেণ্টের ভূমিকরের দাবীসম্বন্ধে সেরূপ কোনও স্পষ্ট ও বিশিষ্ট করবর্দ্ধনকারণ বিধিবদ্ধ করা হয়

স্বরূপে ভূমিকর প্রদান করে, তাহারা চিরন্তন অনিশ্চয়তার অবস্থায় বাস করে; তাহারা জানে না কি কারণে সরকার বাহাদুর আগামী বন্দোবস্তের সময় করবৃদ্ধির দাবী করিবেন, তাহারা বুঝিতেই পারে না কেন সরকারী দাবী বৃদ্ধি করা হইল। এই স্থলটী লিপিবদ্ধ করিবার সময়ই সম্মুখস্থ একখানি সংবাদপত্রে দেখিতেছি যে মালাবারের সম্প্রতিকৃত বন্দোবস্তে ভূমিকর, শতকরা, পলেঘাটে ৮৫ অংশ, কালিকটে ৫৫ অংশ, কুরুম্ব্রানাটে ৮৩ অংশ ও ওয়ালাভানাডে ১০৫ অংশ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। আমার জ্ঞানগোচরে ভারতে কোনও জমীদার কোনও বেসরকারী জমীর পুনর্বন্দোবস্তে এরূপ ভয়ানক করবৃদ্ধি কস্মিন্‌কালেও করেন নাই; এবং এরূপ করবৃদ্ধি সরকারের খাস প্রজাদিগকে চিরন্তন ও নিরবচ্ছিন্ন দৈন্যের অবস্থায় নিশ্চয়ই রাখিবে। আরও অধিক অমঙ্গল এই যে প্রজারা জানেনা ও বুঝিতেই পারে না, সে কারণগুলি কি যাহার জোরে সরকার বাহাদুর পুনর্বন্দোবস্তকালে এরূপ করবৃদ্ধি দাবী করেন, এবং এই অনিশ্চয়তা সর্ব্বপ্রকার কৃষিচেষ্টাকে পঙ্গু করিয়া ফেলে ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রবৃত্তিকে মরণমুখে আনীত করে। আবেদনকারীগণ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে সরকারী খাসপ্রজারা বেসরকারী প্রজাদের মত নিরাপদ অবস্থায় সমুন্নীত হয়। ইহা অপেক্ষা সঙ্গত ও ন্যায্য প্রস্তাব আর হইতেই পারে না; এবং সরকার বাহাদুর জমীদারের কার্য্যের বিরুদ্ধে যে সীমাসংস্থাপিত করিয়াছেন, এবং অতি ন্যায্যভাবেই করিয়াছেন, সেই সীমাই নিজ কার্য্যের বিরুদ্ধে ও স্থাপিত করিতে গভর্ণমেণ্টের ইতস্ততঃ করা অনাবশ্যক ও অনুচিত।

অস্থায়ী বন্দোবস্তী প্রদেশে আজ কাল যে অনির্দ্দেশ্য অস্পষ্ট ছায়াময়

"দক্ষিণের কৃষাণসম্বন্ধে এই ঘটে যে শান্তির সুখসৌভাগ্য ও সুসভ্য রাজশাসনের উপকারপুঞ্জ হতভাগ্যের দারিদ্র্য বৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করে, কেন না, উন্নতিপ্রাপ্ত রাজপথ ও দেশের সাধারণ অগ্রসরণ করবৃদ্ধির কারণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। উক্ত বর্ত্মরাজি ও গমনাগমন ও সম্বাদাদির সুবিধায় যদি উৎপন্ন ফসলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এই স্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট কারণে করবৃদ্ধি ন্যায্য ও সঙ্গত। কিন্তু যদি ইহাতে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষাণ তদ্দ্বারা কি উপকার লাভ করিল এবং তাহার 'ধনশালী প্রতিবেশী'মহোদয় রেলে যাতায়াত করিতে পারেন বা তাহার সুদখোর মহাজনমহাশয় হাতের কাছেই দেওয়ানী আদালতের সুবিধা ও সৌভাগ্য ভোগ করিতে পাইয়াছেন বলিয়া তাহার দেয় কর কেন বর্দ্ধিত করা হইবে? দেশের সাধারণ উন্নতিতে কৃষাণের যেটুকু প্রকৃত সুবিধা লাভ ঘটে তাহা ফসলের মূল্য বৃদ্ধিতেই লক্ষিত হয়, এবং তাহাই ভূমিকর বৃদ্ধির একটী ন্যায্য ও বিধিসম্মত কারণ। যখন ফসলের মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই তখন করবৃদ্ধির এক অতিরিক্ত কারণ যোগাড় করিয়া লওয়ার অর্থ এই যে কৃষাণ বেচারা যে উপকার নিজে কোনও রূপে ভোগ করিল না তাহারই জন্য তাহাকে করদানে বাধ্য করা, এবং ইহাতে প্রতি বারের বন্দোবস্তের পর তাহাকে দীনতর করিয়া তোলা হয়।"

এ যুক্তি আমার নয়; এই প্রকারের যুক্তি বর্ত্তমানকালে যত রাজপ্রতিনিধি ভারতাভিমুখীন হইয়াছেন তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চসহানুভূতিদীপ্ত ও উদারহৃদয় মারকুইস্ অফ্ রিপন মহোদয়ের করুণহৃদয়েই উদিত হইয়াছিল। সুদূর ১৮৮২ সনে রিপন বাহাদুর একটী নিয়ম করিয়াছিলেন যে একবার জরিপ ও বন্দোবস্ত করা [illegible]

ও কিছুমাত্র বৃদ্ধি করা হইবে না। মান্দ্রাজ-গভর্ণমেণ্ট এই নিয়ম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পুরাকালে ডিরেক্টার সভা যেরূপ ভারতকর-সমূহের চিরন্তন ও অবিশ্রান্ত বৃদ্ধির জন্য অতি ব্যাকুল ছিলেন বর্ত্তমান সময়ে তদ্বিষয়ে তেমনি অতি ব্যাকুল ইণ্ডিয়া অফিস লর্ড রিপনের সহজ স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর নিয়ম নামঞ্জুর করিয়া, ভারতপ্রজাকে পুনর্বার অনিশ্চয়তা ও নৈরাশ্যতলে নিমজ্জিত করিলেন। এই মারাত্মক ও নৈতিকবিকৃতিবাহী অনিশ্চয়তার দূরীকরণ ও গভর্ণমেণ্ট কি কি সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট কারণে ভূমিকরের বৃদ্ধির দাবী করেন কৃষাণগণকে তাহা জানিতে দেওয়াই আবেদনকারীদিগের অভিপ্রায় ছিল। সেই-জন্য তাঁহারা লর্ড রিপনের নিয়মের মত একটী নিয়ম সংগঠিত করিয়াছিলেন ও আশা করিয়াছিলেন, যে বেসরকারী জমিদারগণের অধীনস্থ কৃষিজীবিদের রক্ষার যে উপায় করা হইয়াছে গভর্ণমেণ্টের নিজের অধীন কৃষিপ্রজাদের পক্ষেও সেই সংরক্ষণোপায় প্রসারিত করার আবশ্যক লর্ড কার্জ্জন বুঝিবেন। কার্জ্জন বাহাদুর তাঁহাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন।

লর্ড কার্জ্জন লিখিয়াছেন—"যে ফসলাদির দামের সাধারণ গড়তালিকা নিজেই ভূমিমূল্যাদি নির্দ্ধারণের একটা প্রমাদময় ও আংশিক উপায়মাত্র, তাহা হইতে অনুমিত ভূমিমূল্যবৃদ্ধি ব্যতীত আর সমস্ত প্রকারের উক্ত বৃদ্ধির অংশবিশেষে গভর্ণ-মেণ্টের অধিকার অস্বীকার করার ফল এই হইবে যে কতকগুলি ব্যক্তিকে তাহাদিগের স্বোপার্জ্জিত নয় এরূপ বৃদ্ধি অকারণে ও অকাতরে অর্ঘ্যদান করা হইবে।"

ব্যাপারটীকে এরূপ চক্ষে দেখা অনুদার ও রাজনীতিবিশারদের অযোগ্য ক্ষুদ্র দৃষ্টির ফল। এবং এস্থলে ইহা ভুলিয়া যাওয়া হইতেছে যে কৃষাণকুলকে এরূপ বৃদ্ধি "অর্ঘ্যদান" না করিলে তাহাদিগকে ... দুর্গতি ও দারিদ্র্যে মগ্ন রাখা হইবে যাহা ভারতে বৃটিশ

(৫) সর্ব্বপ্রকার স্থানীয় সেস্ সীমাবদ্ধ করা।

আবেদনকারীদিগের শেষ প্রস্তাব এইরূপ ছিল:—একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হউক, যাহাকে অতিক্রম করিয়া স্থানীয় সেসের দ্বারা ভূমিকরকে ভারাক্রান্ত করিতে দেওয়া হইবে না; প্রস্তাবিত সীমা ছিল শতকরা ১০ অংশ।

১৮৫৫ সনে যখন নিয়ম করা হইয়াছিল যে উত্তরভারতে সরকারী ভূমিকর সম্পত্তির প্রাপ্য খাজনার অর্দ্ধাংশে সীমাবদ্ধ থাকিবে, এবং সার চার্লস্ উড্, যিনি পরে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স হইয়াছিলেন, তিনি যখন নিয়ম করেন যে দক্ষিণ ভারতে ভূমিকর খরচবাদ আয়ের, যাহাকে ইকনমিক্‌রেণ্ট বলা হইত, তাহার অর্দ্ধাংশ হইবে, তখন ভূমিকরের উপর যোগ করিয়া দিবার সেস্‌সমূহ হয় অতি তুচ্ছ ছিল, নয় মোটেই ছিল না। তাহার পরে ঐ সেস্‌গুলি বহুগুণ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ভূমিকরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তযুক্ত বঙ্গবিভাগে ঐ সেস্‌গুলি জমিদারের প্রাপ্য খাজনার উপর ধরা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তহীন, অন্যান্য বিভাগে উক্ত সেস্ ভূমিরাজস্বের উপর ধরা হয়।* আবেদনকারীগণ সাগ্রহে প্রতিপন্ন করেন যে এই সেস গুলির একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। সেসের নাম করিয়া ভূমিকরের উপর ক্রমাগত এবং সীমা ও বাধাশূন্য হইয়া যথেচ্ছকর সংযোগ করিবার ক্ষমতা যদি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ভূমিকর খাজনার অর্দ্ধাংশে বা উদ্বৃত্ত আয়ের (ইকনমিক রেণ্টের) অর্দ্ধাংশে সীমাবদ্ধ করায় কিছুমাত্র লাভ নাই। প্রাইমারি অর্থাৎ নিম্নতন সাধারণ-শিক্ষাদান

* আমি ভ্রমক্রমে ১৯০০ সনে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে মধ্যপ্রদেশে সেস্ সমূহ জমীদারপ্রাপ্য খাজনার উপর ধরা হয়; গভর্ণমেণ্টের রেজোলিউসন্ আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছে। আবেদনকারিগণ, কিন্তু এই ভুল এড়াইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা জানেন যে বঙ্গ ব্যতীত সর্ব্বপ্রদেশেই সেস্ সমূহ ভূমিরাজস্বের উপর ধরা হয়।

ও পোষ্ট আফিসের জন্য করগ্রহণ সঙ্গত ও ন্যায্য; কিন্তু তাহার জন্য ভূমিকরের বৃদ্ধি করা অন্যায়। ভূমিকরকে খাজনার অর্দ্ধাংশে সীমাবদ্ধ করিয়া তাহার পর সেসের ছদ্মবেশের আবরণতলে সেই ভূমিকরেরই কলেবরে সীমারহিতভাবে পুষ্টিযোগ করিয়া যাওয়ায়, প্রতিশ্রুত প্রতিজ্ঞা বাক্যটি শোনায় ঠিক, কিন্তু প্রাণে মারা হয়।

অতএব আশা করা যায় যে, যদি ওরূপ সেস্ গ্রহণ করাই হয়, তাহা হইলে সেগুলি ভূমিকরের কোন একটী অংশের ভিতর সীমাবদ্ধ হইবে যে সীমা কিছুতেই ও কখনই অতিক্রম করা হইবে না, এবং ভূমিকরের শতকরা ১০ অংশ এক প্রকার ন্যায্য সীমা। গভর্ণমেণ্টের রেজোলিউসনের নিম্নোদ্ধৃতাংশে একটী অতি ক্ষীণ আশার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

"।সন্ধু, মান্দ্রাজ ও কুর্গ ব্যতীত আর কোনও প্রদেশেই স্থানীয় ট্যাক্স আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করে না; এই তিনটী প্রদেশে ঐ সকল উপরি কর প্রজার দেয় রাজস্বের যথাক্রমে শতকরা ১২½, ১০½ ও ১৩½ অংশ, জমীর প্রকৃত করমূল্যের উপর গণনা করিয়া দেখিলে ইহা যে প্রচুর পরিমাণে স্বল্পতর অংশ প্রমাণিত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতগভর্ণমেণ্টের সাধারণ অভিমত এই যে, উপযুক্তরূপে চারাইয়া দিলে, স্থানীয় ট্যাক্স যে মোটের উপর গুরুভার বা অতিরিক্ত এরূপ বিবেচনা করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই; বরং সাধারণতঃ ইহা এখনই আবেদনকারীগণ যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করাইতে চান, তাহার নীচেই পড়িয়াছে। কিন্তু উহার বণ্টন যে অনেক সময় অন্যায় হয়, এবং জমীদারগণ যে আইনকর্ত্তৃক তাঁহাদের নিজ স্কন্ধে স্থাপিত বোঝা প্রজার স্কন্ধে কৌশলে নামাইয়া দেন এরূপ সন্দেহ করিবার অনেক কারণ আছে। দেশস্থ এত লোকের অজ্ঞ ও অশিক্ষিত অবস্থায় এই অবিচারের যথেষ্টরূপ নিরাকরণ অসম্ভব। এবং এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, যে যে সমস্ত ট্যাক্স রাজবিধির ইচ্ছাতিরিক্ত কঠোরভাবে কৃষি প্রজাপুঞ্জকে প্রপীড়িত করে, উপস্থিত হইলেই সুবিধাক্রমে সেই ট্যাক্সগুলির প্রশমন

ভারত-ইতিহাসের একাংশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মাধোজি সিন্ধিয়ার নিকট ডিবোয়াঞি একেবারে অপরিচিত ছিলেন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি গোহাডের রাণা যখন দুর্গ মধ্যে মাধোজি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ, তখন ডিবোয়াঞি রাণার নিকট যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন রাণা যথেষ্ট সতর্কতার সহিত সেগুলি গোপন রাখিতে পারেন নাই। ক্রমে তাহা মাধোজির কর্ণগোচর হয়, এবং মিঃ আণ্ডার্সন কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া যখন ডিবোয়াঞি তাহার নিকট যান, তখন মাধোজির শিবিরে এক রাত্রি বাস করিতে বাধ্য হন, এবং কথিত আছে সেই রাত্রিতে সিন্ধিয়ার আদেশক্রমে ডিবোয়াঞি যে শিবিরে ছিলেন সেই শিবির দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, এবং তাঁহার সঙ্গীয় যাবতীয় জিনিষ পত্র মাধোজি সন্নিধানে নীত হইলে, কাগজ পত্র বাদে আর সমস্ত অস্থাবর তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। সেই সমস্ত কাগজ পত্র পাঠে গোহাডের রাণার নিকট ডিবোয়াঞির প্রস্তাব সম্বন্ধে মাধোজির আর কোন সন্দেহ থাকে না। ডিবোয়াঞি যে প্রস্তাব রাণার নিকট করিয়াছিলেন তাহাতে রণপাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় ছিল এবং মাধোজি সিন্ধিয়ার ন্যায় আজীবন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী সুচতুর সেনাপতির নিকট ডিবোয়াঞির প্রস্তাবের সারবত্তা বুঝিতে বাকী রহিল না। ইংরাজের সহিত যুদ্ধে সিন্ধিয়া দেখিলেন যে এক পক্ষ মধ্যে চারি সহস্র মাত্র পদাতি সৈন্যের বলে কর্ণেল গডার্ড তাঁহার বিশ সহস্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীকে দুই দুই বার বিধ্বস্ত করিলেন; এবং কাপ্তেন পপ্‌হাম

প্রথায় পরিচালিত হইলে না করিতে পারে এমন কার্য্য পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। পদাতি সৈন্যের উপকারিতা এবং ডিবোয়োঞির ক্ষমতা, অধ্যবসায় এবং সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া সিন্ধিয়া এই ফরাসী বীরকে স্বীয় সৈন্যমধ্যে বরণ করিতে আর দ্বিধা করিলেন না, প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী মাতৃভূমিকে কলঙ্কস্পর্শশূন্য করিবার যে সদিচ্ছা হৃদয়ে গূঢ়ভাবে পোষণ করিয়া মন্ত্রণাকুশল সিন্ধিয়া এই ফরাসী বীরকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন তাহা যে সম্পূর্ণ হয় নাই, সে কেবল আমাদের দেশের দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। সর্ব্বগুণান্বিত মহারাষ্ট্র-প্রধান মাধোজি সিন্ধিয়া এবং বীরাগ্রগণ্য রণপণ্ডিত সেনাপতি ডিবোয়াঞি তাহার জন্য দায়ী নহেন।

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে যখন ডিবোয়াঞি মাধোজি সিন্ধিয়ার সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত হন, তখন মোগল সাম্রাজ্যের বড় দুর্দ্দশা। সাহ আলম তখন দিল্লির নামে মাত্র বাদশা। দুর্দ্ধর্ষ বীর তৈমুরলঙ্গের বংশধরের যে মহাগৌরবান্বিত সিংহাসন তিন শত বৎসর কাল অক্ষুণ্ণ ছিল, যে মোগল রাজদণ্ড সর্ব্বদা সবলে পরিচালিত হইয়া হিমালয় হইতে সহ্যাদ্রি পর্য্যন্ত এবং কাবুল হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত অখণ্ড রাজশক্তি প্রচার করিয়াছে, আজ সেই জগৎপ্রথিত "তখ্‌তে তাউস্" টলটলায়-মান, সেই বজ্রতুল্য রাজদণ্ড সাহ আলমের দুর্ব্বল হস্ত হইতে স্খলিত-প্রায়। দ্বাবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে দ্বিতীয় আলমগিরের হত্যাকাণ্ডের সময় হইতেই মোগল রাজশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল; সাহ আলম পাত্রমিত্র উজীর প্রভৃতির হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপের লীলাক্ষেত্র দিল্লিপ্রাসাদে নিয়মরক্ষার্থ সন্ধ্যা ও সকালে তাঁহার পূর্ব্ব পিতামহদের সিংহাসনে বসিতেন মাত্র, কিন্তু সাম্রাজ্যের বল্গারশ্মি

বা" বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে অভিহিত করিত সেই মহৈশ্বর্য্যশালী মহা প্রতাপবান্ দুর্দ্ধর্ষ বীরত্বসম্পন্ন সম্রাটবংশের আজি এ দুর্দ্দশা কেন? কে বলিবে কেন, বোধ করি অদৃষ্টের দোষ, নিয়তির লিখন। অতীত ইতিহাস আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে দিল্লির সিংহাসন কাহারও ভাগ্যে কখনও চিরস্থায়ী হয় নাই।

পাণিপৎ ক্ষেত্রে আহম্মদ শা আব্দালি মহারাষ্ট্রশক্তির উপর যে আঘাত করিয়াছিল, তাহাতে মহারাষ্ট্র-গৌরব বড় নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, কিন্তু ধীরে ধীরে মাধোজির যত্ন, চেষ্টা ও মন্ত্রণায় মহারাষ্ট্রীয়দের লুপ্ত-গৌরব প্রায় পুনস্থাপিত হইয়া আসিয়াছিল। সিন্ধিয়া তুকাজি হোল-কারের সহিত একতায় বিস্তীর্ণ মালবরাজ্যে মহারাষ্ট্রশক্তি পুনর্বর্দ্ধিত করিলেন, এবং উভয়ে মিলিয়া আব্দালি কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত বাদশাহ সাহ আলমকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইয়া দিল্লির রাজনৈতিক গগনের প্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিয়া দিলেন। ইহার আট বৎসর পরে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সিন্ধিয়া এবং হোলকার উভয়েই সসৈন্যে হিন্দুস্থান (আর্য্যাবর্ত্তভূমিকে হিন্দুস্থান বলিত) ছাড়িয়া দাক্ষিণাত্যে স্বীয় রাজ্যরক্ষার জন্য যাইতে বাধ্য হন। এই সময়ে মাধোজির ভাগ্যে মুহুর্মুহু উন্নতি ও অবনতি ঘটে, কিন্তু সালবি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের পর হইতে মাধোজির নিষ্কণ্টক হইয়া স্বীয় রাজ্যে স্বাধীন-ভাবে থাকিতে অবসর হয় এবং সম্মিলিত মহারাষ্ট্রশক্তির নায়ক হইয়া তিনি বিনাশোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্য সম্বন্ধে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অবকাশ পান। সমগ্র ভারতভূমিতে হিন্দুরাজ্য একছত্র করিবার পবিত্র কামনা মাধোজি সিন্ধিয়া বহুকাল যাবৎ হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এবং তিনি ভাবিয়াছিলেন যে যদি কখনও সে

স্থাপন করিবেন। দুর্ব্বল বাদশাহ সাহআলমের সময় অরাজকতা মূর্ত্তিমান হইয়া সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতেছিল, এবং পাত্রমিত্র উজীর প্রভৃতির পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ক্ষয়িতমূল মহামহীরুহের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য বিশাল মোগল-সাম্রাজ্য ভূমিসাৎ হইবার জন্য সামান্য ফুৎকারের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ছিল মাত্র। মাধোজি সিন্ধিয়ার অভিলাষ পূর্ণ করিবার এতদপেক্ষা শুভ মুহূর্ত্ত আর হয় নাই, এবং এই মাহেন্দ্রক্ষণেই ডিবোয়াঞি তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন। এই দুই মহাপুরুষের সম্মিলন যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছিল।

মাধোজি সিন্ধিয়া ডিবোয়াঞিকে কার্য্যে নিয়োগ করিয়াই দুই পল্টন পদাতি সৈন্য ইংরাজি রীতি নীতি অনুসারে শিক্ষিত ও ইংরাজি প্রথায় সজ্জিত করিতে আদেশ দেন। ডিবোয়াঞির মাসিক এক হাজার টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া দেন, এবং প্রত্যেক সৈন্যের বেতন মাসিক ৮৲ আট টাকা হিসাবে দিতে স্বীকৃত হন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ডিবোয়াঞি সিন্ধিয়ার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সৈন্য বিভাগের সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। ভারতবর্ষ-ভূমি বীরপ্রসবিনী, আদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন দিনই সৈনিক ব্রতধারী লোকের কথনও অভাব হয় নাই, সুতরাং লোক সংগ্রহ করিতে ডিবোয়াঞিকে বিশেষ কোন কষ্টভোগ করিতে হয় নাই। চতুর্দ্দিক হইতে পঙ্গপালের ন্যায় লোক আসিয়া ডিবোয়াঞির নিকট সৈনিকপদ প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ইউরোপীয় রীতি অনুসারে সৈন্য গণনা করিতে হইলে সৈন্য-দিগের পরিচালনার জন্যও ইউরোপীয় সেনা-নায়ক আবশ্যক এ কথা ডিবোয়াঞি বিস্মরণ হন নাই, সুতরাং তিনি সাধারণ সৈনিকদিগের

লেপ্টেনাণ্ট কাপ্তান প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নববাহিনী পরিচালনার সৌকার্য্য সম্পাদন করিলেন। স্কটলণ্ডবাসী সাঙ্গোটার নামক জনৈক বীরপুরুষ সর্ব্বপ্রথমে ডিবোয়াঞিয়ের অধীনে কার্য্য স্বীকার করিয়া তোপখানার পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত হন, তাঁহার উপদেশে অতি অল্পকাল মধ্যে বহুসংখ্যক কামান এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া মাধোজির অস্ত্রাগার পূর্ণ হইতে লাগিল। সে কালের ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই কিছু দিবস পরে ইন্দ্রিয়লালসার দাস হইয়া ভোগসুখে কালাতিপাত করিতেন। কিন্তু ডিবোয়াঞি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তিনি সকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সৈন্য বিভাগের সমস্ত কার্য্য নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এবং প্রতি পদাতিকটি পর্য্যন্ত নিজে পছন্দ না করিলে বাহাল হইতে পারিত না। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, অশ্রান্ত চেষ্টা এবং দুর্দ্দমনীয় অধ্যবসায়ের গুণে তিনি প্রায় পাঁচ মাস কাল মধ্যে দুই পল্টন পদাতি সৈন্য (প্রতি পল্টনে ৮৫০ জন পদাতি ছিল) প্রয়োজনীয় যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্রাদি এবং পরিচ্ছদে সজ্জিত করতঃ যুদ্ধকার্য্যে নিপুণ করিয়া তুলিলেন।

সেকালে ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের রাজ্যে কি সৈনিক বিভাগে কি রাজস্ব বিভাগে কোন বিভাগেই কার্য্য শীঘ্র বা সুচারু সম্পন্ন হইত না,—সুতরাং ডিবোয়াঞি যে এই অল্পকাল মধ্যে সৈনিক বিভাগে এই যুগান্তর প্রবর্ত্তনকারী কার্য্যে সফল মনোরথ হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কৃতিত্বের অতি মহৎ উদাহরণ বলিতে হইবে। ডিবোয়াঞির বাহিনী সমরোপযোগী শিক্ষা প্রাপ্ত হইবা মাত্র মাধোজি উক্ত বাহিনী আপ্পা

এযাবৎকাল মহারাষ্ট্রীয়গণ কেবল অশ্বারোহী সৈন্যেরই মর্য্যাদা বুঝিতেন, পদাতি সৈন্যের কার্য্যকারিতা কখনও উপলব্ধি করেন নাই; সুতরাং ডিবোয়াঞির নূতন পদাতি সৈন্যের প্রতি মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রথমে হতশ্রদ্ধা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু সেনাপতি ডিবোয়াঞি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এবং সে সুসময় আসিতে বিশেষ বিলম্বও হয় নাই। এলাহাবাদের সন্নিকটবর্ত্তী কালিঞ্জর দুর্গ আক্রমণ কালে ডিবোয়াঞির পল্টনকেই যাবদীয় দুরূহ কার্য্যের ভার লইতে হইয়াছিল, এবং এরূপ অতুল বিক্রমের সহিত তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল যে, স্বয়ং মহারাষ্ট্র সেনাপতি আপ্পা খাণ্ডেরাও তাহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

কিন্তু মাধোজি বুন্দেলখণ্ডের যুদ্ধ-ব্যাপার অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই স্থগিদ করিয়া দিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুর্ব্বল বাদশাহ শাহ আলম যখন ক্ষীণহস্তে রাজদণ্ড ধারণ করিলেন, তখন স্বার্থসিদ্ধি মানসে আমির ওমরাহগণ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত করিয়াছিল, এবং ঐ আত্ম-কলহের ফলে বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী গোপনভাবে নিহত হইলে পর শাহ আলম স্বয়ং মহাভীত হইয়া পড়িলেন, এবং ইংরাজের নিকট সহায়তা প্রার্থনা জানাইলেন। যে কারণেই হউক ইংরাজের নিকট সহায়তা লাভে বিফল মনোরথ হওয়ায় গত্যন্তর না দেখিয়া তাঁহার বিদ্রোহী ওমরাহদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত মাধোজি সিন্ধিয়ার নিকট সহায়তা এবং সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। মাধোজি হিন্দু রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা বহুকাল হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, কিন্তু এত শীঘ্র এরূপ সুযোগ ঘটিবে তাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই; তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে দিল্লি যাত্রা করিলেন, তাঁহার আগমন বার্ত্তা পাইয়া বিদ্রোহীদিগের মধ্যে অনেকে দিল্লি ত্যাগ করিয়া পলায়ন

এইরূপে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে হতভাগ্য বাদশাহ শাহ আলম মহারাষ্ট্রসহায়ে পুনরায় তাঁহার পিতৃপিতামহের তখ্‌তে আরোহণ করিয়া নিজেকে ধন্য এবং কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন।

যথার্থ ক্ষমতা এইরূপে অযাচিতভাবে মাধোজির হস্তে আসিয়া পড়িল, বাদশাহ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সিন্ধিয়াকে "আমির উল ওমরা" উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিলেন, কিন্তু মাধোজি তাহা বিনয়ের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া পুনার পেশোয়াকে "উকীল মুতলুফ" (Supreme deputy of the Emperor) উপাধি দিবার জন্য বাদশাহকে অনুরোধ জানাইলেন। এরূপ ক্ষেত্রে অনুরোধের প্রতিশব্দ হুকুম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বাদশাহ অনন্যোপায় হইয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন, সুতরাং পেশোয়ার প্রতিনিধি—সিন্ধিয়াই ফলতঃ বাদশাহের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া দিল্লীশ্বরের সৈন্য ও রাজস্ব বিভাগের যাবদীয় ক্ষমতা নিজ হস্তে লইয়া মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন।

শ্রীজগদিন্দ্র নাথ রায়।

হারা-ধন

(Victor Hugo হইতে।)

শোক-তপ্ত ভগ্ন হৃদি
　　　বৎস-হারা ওগো মাতৃগণ!
বেশ জেনো, ভগবান
　　　তোমাদের শোনেন ক্রন্দন।
হারা-পাখী সব তিনি
　　　নিজ হাতে রাখেন ধরিয়া,

শ্মশান্ ও জনম-স্থান এ দুয়ের মাঝে জেনো
গূঢ়ভাবে আছে গতিবিধি ;
কে জানে গো, কালের সে অনন্ত অতল গর্ভে
কত আছে রহস্যের নিধি ॥

বলিতেছি তোমাদের যে মায়ের কথা
তাহার নিবাস-ভূমি পুরী কলিকাতা ;
জানিতাম আমি তারে
ভাল দশা তাদের যখন
তার গৃহ-সংলগন
ছিল মোর পিতার ভবন।
ভগবান-দত্ত বৈধ যা কিছু সৌভাগ্য সুখ
—পায় গো সব সে ;
বিয়া হয় যার সনে বরিয়াছিল গো তারে
নিজে ভাল বেসে ;
ক্রমে হল পুত্র তার মাতৃ-বক্ষ উচ্ছসিল
স্নেহানন্দ-রসে ॥

প্রথম গর্ভের শিশু শুয়ে আছে রেশমের
কোমল শয্যায় ;
মাতা দেয় স্তন তারে কলনাদ করে শিশু
অস্ফুট ভাষায় ;
সমস্ত রজনী সে গো
কল্পনার দ্বার দেয় খুলি'
নিশার আঁধার মাঝে
নেত্র দুটি উঠে শুধু জ্বলি' ;
টুঁ-শব্দ নাহি মুখে নীরবে ঝুঁকিয়া
শুনিছে কখন্ শিশু পড়ে ঘুমাইয়া ;

তার পর তাকিয়ায়
পিঠ দিয়া পড়িল হেলিয়া,
কাচুলি হইতে স্তন
দেখা দিল দুধেতে ভরিয়া ;
অধরে মৃদুল হাসি,
চাহি' আছে শিশুটির পানে ;
"যাদুমনি"-"ধনমনি"
বলি' ডাকে কত শত নামে।
কতই চুম্বন করে তার সেই খুদে-খুদে
রাঙা দুটি পায় ;
কত কথা বলে তার ;—নগন সুন্দর শিশু
মৃদু হাসে তায় ;
আহ্লাদে মাতার বাহু ধরি' কর-পুটে
কোল হতে ঠোঁট্-তক্ ভর দিয়া উঠে॥

পত্র-শব্দ-সচকিত মৃগটির প্রায়
বাড়িতে লাগিল শিশু যত দিন যায় ;
চলিতে লাগিল ক্রমে টলিতে টলিতে,
পরে আধো আধো কথা লাগিল বলিতে।
হইল বছর তিন, মধুর বয়স সেই
যখন গো বাণী
বিহঙ্গ-শিশুর মত অলপ উড়িতে পারে
নাড়ি' ডানাখানি।

মা বলিল ;—"যাদু মোর
হইয়াছে কেমন বড়টি !
কেমন শিখিতে পটু,
আখর চিনিল চটপটি।
কি দস্যি —বলে মোরে :—কাপড় পরায়ে দে মা

আমি আর পরিব না। খোকার পোষাক, দেখ
বড় আমি কত !
দুরন্ত দুর্দ্দান্ত অতি
খুদে-খুদে এ মরদ গুলি,
যাহোক বাছাটি মোর
এরি মধ্যে পড়ে পুঁথি খুলি"।
ভালবাসে দূরে যেতে
তেজে ভরা তার ক্ষুদ্রপ্রাণ,
পড়ায় তাহার মাতা
রামায়ণ করিয়া বানান ;
আহা কি স্নেহের দৃষ্টি
ভঙ্গুর এ পুত্তলিটি-পরে ;
কত সুখ হয় মনে
—দ্যাখে কত গরবের ভরে।
শিশুর হৃদয় যবে করে ধুক্ ধুক্
সেই সঙ্গে কাঁপি' উঠে জননীরো বুক্ ॥

একদিন—কার্ না গো
আসে হেন অশুভ দুর্দ্দিন—
পিশাচী কাশের ব্যাধি
আক্রমি' শিশুরে করে ক্ষীণ ;
ক্রমে মহা বল করি' ভয়ঙ্করী সে পিশাচী
কণ্ঠ তার ধরিল চাপিয়া ;
ছটফট্ করে শিশু স্বর্গচ্ছবি নেত্র দুটি
অন্ধকারে ফেলিল ছাইয়া।
শীতল হইল ওষ্ঠ ঘর্ঘর শবদে শ্বাস
ওঠে ঘন ঘন
করাল কৃতান্ত আহা চুপি চুপি শিশুটিরে

সেই পিতা, সেই মাতা
সেই শোক, শূন্য সেই খাট,
দেয়ালে কপাল ঠোকা,
ভীষণ সে শ্মশানের ঘাট ;
আনাভি দীরঘ শ্বাস—স্তব্ধ হেথা মানবের ভাষা
ভাষা হায় কি বলিবে আর ?
তখান ফুরায় কথা বক্ষ ফাটি' উঠে যবে
তীব্রতম মর্ম্ম-হাহাকার॥

এইভাবে তিনমাস বিষাদের অন্ধকারে
নিস্পন্দ হইয়া মাতা বসে এক স্থানে ;
অর্থহীন স্থিরদৃষ্টি চাহি' আছে অভাগিনী
শুধু সেই দেয়ালের কোণটির পানে ;
আর সে গো অবিরাম একান্তে আপন মনে
বিড় বিড় করি' বকে কি কথা কে জানে।
আহারে নাহিক রুচি—কিছু নাহি খায়
জীবন হইল দীর্ঘ জ্বর-ব্যাধি-প্রায় ;
ঘন ঘন কাঁপে অঙ্গ ; ভীষণ বিষাদ-ভরে
বলে যেন কায় ;—
"কোথা মোর যাদুমণি, ফিরে দে, ফিরে দে ওরে
ফিরে দে আমায়"।

অবস্থা বুঝিয়া বৈদ্য
বলিলেন শিশুর পিতায়
দারুণ এ বিষাদের
শীঘ্র কোনো করুন উপায় ;
মাতা হবে শান্ত, যদি
আর একটি শিশু কোলে পায়"।

কতদিন কতমাস

একদিন সহসা গো
অনুভব করিল আপনি
যেন গো দ্বিতীয়বার
হইবে সে শিশুর জননী।
বাছার সে শূন্য খাট
—বসিয়া গো তাহার সম্মুখে,
শুনিল সে পুন যেন
"মা" বলি, কে ডাকে শিশু-মুখে।
ভাবিতে লাগিল মাতা—অবাক্ নিস্তব্ধ—
সেই আধো-আধো বাণী—মধুময় শব্দ ;
সেইদিন সহসা গো উদরের পার্শ্বদেশ
উঠিল কাঁপিয়া ;
নব-আগন্তুক কোন আসিবে এ মর্ত্ত্য লোকে
—দেয় জানাইয়া ;
মুখ হইল পাণ্ডুবর্ণ ; ভাবে ;—কে না জানি এ
অজানা পথিক ;
কাঁদিতে লাগিল শেষে, আর নিজ অদৃষ্টেরে
দিল শতধিক্ ;
"না না—এ চাহিনা আমি,
ব্যথা যে লাগিবে তোর প্রাণে
তুই ওরে যাদু মোর
শুইয়া যে আছিস শ্মশানে।
তুই যে বলিবি বাছা ;—মা গেল ভুলিয়া মোরে
মোর স্থান অধিকার করে অন্য জন ;
মা উহারে ভালবাসে, মার মুখে হাসি কত
পেয়ে কোলে এ সুন্দর মনমত ধন।
দেখনা, আদর করে
ঘনঘন করিয়া চুম্বন,

আর আমি হেথা কিনা
　　পড়ে' আছি শ্মশানে এখন।"
এই ভাবি অভাগিনী
　　বিলাপ করিয়া সারা রাত
দেখিল গো পুত্র-মুখ
　　দেখা দিল যখন প্রভাত।
স্বামী তার বলি' উঠে আনন্দে আটখান্
ওগো! ওগো! এটিও যে পুত্র-সন্তান!
প্রসূতি বিষণ্ণ অতি
　　পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগে তার মনে;
নব-শিশু হেলা করি'
　　ভাবে শুধু পূর্ব্ব-বাছাধনে,
বলে-"আহা সে বাছাটি
　　একলাটি শ্মশান-বিজনে॥"
কিন্তু কি অদ্ভুত কাণ্ড।　　সৌভাগ্য ফিরিল পুন
　　বিধির কৃপায়;
শোনে যেন নব-শিশু　　চির-পরিচিত স্বরে
　　বলিছে তাহায়
অতি মৃদু মৃদু কণ্ঠে　　শুইয়া সে জননীর
　　কোলের ছায়ায়
"সেই আমি—নহি অন্য　　এ কথা মা দেখো যেন
　　বোলো না কাহায়॥"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচী ও প্রতীচী।

আমাদের পূর্ব্ব মহাপুরুষগণের উপর তখনই ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, যখন পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী জাতিগণের অন্ধ আবেগপূর্ণ হাতড়ানী এবং তাহার ফলে পৃথিবীময় যে শোক ও অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পূর্ব্বতন ঋষিগণের পূর্ণ সত্য উপলব্ধির ক্ষমতা কি অলৌকিক তাহা তখনই যথার্থরূপ অনুভব করা যায়, যখন সামান্য খণ্ড সত্যপ্রাপ্তির চেষ্টায় পাশ্চাত্যগণের প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক শ্রম, সর্ব্বদা মারামারি কাটাকাটি, চুলচেরা বিশ্লেষণ, পৃথিবীময় পর্য্যটন এবং জীবজন্তু ও মনুষ্যের উপর উৎপীড়নের পরিচয় পাওয়া যায়। এত হাঙ্গামের পর তাঁহারা ফল দেখাইতে পারেন কি? না, দেশকালের ব্যবধান তাঁহারা বিলোপ করিয়াছেন এবং কাণাখোঁড়া ও জন্মরোগীকে তাঁহারা অধিককাল ইহলোকে আবদ্ধ রাখিয়া ভবযন্ত্রণা ভোগ করাইতে পারেন। এই অসাধ্যসাধনে লাভ এইটুকু যে অন্ধ দৌড়ধাপ শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়া জীবনের সার্থকতা লাভার্থে বিন্দুমাত্র অবসর অবশিষ্ট থাকে না। যাহারা পূর্ব্বে পাশ্চাত্য অত্যাচারের সীমার বহির্ভূত ছিল, তাহাদিগকে সভ্যতা নামক নিষ্পেষনীযন্ত্রের অধিকারের মধ্যে আনিবার সুবিধা হয়, এবং যাহাদিগকে এত যত্নে টিঁকাইয়া রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে লইয়া কি করা যায় ভাবিয়া পাওয়া দায় হয়।

পাঠক মনে করিবেন না যে, পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি আস্ফালনের দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা চাপা দিয়া আমি সুলভ আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। আমাদের দোষ বা

অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস, অধ্যবসায় প্রভৃতি অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই কারণেই শ্রেয়ঃ পন্থা উদ্ভাবনের মাহাত্ম্য এত জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এক্ষণে অবনতির শেষ সীমায় অবতীর্ণ—উহারা উন্নতির চূড়ায় বিরাজমান, তথাপি উহাদের শ্রেষ্ঠ লোকে মাথা খুঁড়িয়া যে সকল নিত্য-সত্য অস্পষ্ট ক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করিতেছে, আমাদের নিম্নতম শ্রেণীর কথায় বার্ত্তায় আচারে ব্যবহারে তাহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠার কি আশ্চর্য্য পরিচয় পাওয়া যায়। এক পক্ষে মনুষ্য চরিত্রে আধ্যাত্মিকতাকে নগণ্য করিবার শাস্তি, অপর পক্ষে তাহার প্রভাব যথাযথ অনুভব করিবার পুরস্কার হাতে হাতে দেখা যাইতেছে।

পাশ্চাত্য দুর্গতির কথা লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন হইত না, যদি না কলিশেষে আমাদের দুরদৃষ্ট এতই ঘনাইয়া আসিত যে আমরা বহু সাধনালব্ধ জ্ঞানের স্থিরজ্যোতি পরিত্যাগ করিয়া, উল্কারূপী পাশ্চাত্য সভ্যতানামধারী ভৌতিক আড়ম্বরের ঝলকে মুগ্ধ হইয়া তৎপশ্চাতে হৃদয়মন বিসর্জ্জন দিবার উপক্রম করিতাম। যাহা হউক মহা সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমরা দিন থাকিতে ভ্রম বুঝিব বুঝিব করিতেছি—শুধু বঙ্গে নহে, ভারতবর্ষময় মোহজাল কাটিয়া গিয়া সনাতন বাক্যের যাথার্থ্য পুনরুদ্ভাসিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে—শুধু হিন্দু নহে, মুসলমান, পারসী প্রভৃতি অন্যান্য ভারত-বাসীগণ সনাতন প্রাচ্যভাবের মর্য্যাদা গ্রহণ করিবার সামর্থ্য ফিরিয়া পাইতেছেন।

ইংরাজি গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের একটা ধারণা হয় যে, আর্য্য-ভাব বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বুঝি ভারতবর্ষ মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু

অধিকার অনুসারে যে প্রাচ্যজাতিগণ যে পরিমাণে সেই ভাবের মূলতত্ত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারা তাহারই ভিত্তির উপর রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ব্যক্তিগত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্যজাতিগণও যে অল্প স্বল্প আলোকের ক্ষণিকপ্রভায় তাহাদের তিমিরাচ্ছন্ন অবস্থা মাঝে মাঝে হৃদয়ঙ্গম করিয়া হাহাকার করে, তাহাও কি প্রাচী হইতে প্রাপ্ত নহে ?

সম্প্রতি একটি প্রাজ্ঞ চীনদেশীয় ভদ্রলোকের পত্রাকারে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধে এই কথার আশ্চর্য্য সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি কার্য্যগতিকে য়ুরোপে উচ্চতমশ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে বহুদিন যাপন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বক্তব্য কথা প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ করিবার উপযুক্ত। আমরা তাঁহার পুস্তিকা হইতে দুই এক স্থান স্থূলভাবে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।*

য়ুরোপের বর্ত্তমান অবস্থাসম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন ঃ—

আমাদের সভ্যতা পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বপুরাতন, তাই বলিয়া সর্ব্বোত্তম না হইতে পারে, কিন্তু নিকৃষ্টতম যে নয় তাহা ত অন্ততঃ বুঝা যায়। আর কিছু না হৌক কোন য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে যাহা পাওয়া যায় না, আমাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের সেই স্থায়িত্ব আছে, তাহা প্রমাণ হইতেছে। আমাদের সমাজে যে কেবল স্থায়িত্বগুণ আছে তাহা নহে, তাহার মধ্যে নীতির প্রতিষ্ঠা আছে। তোমাদের সমাজে আমরা ত কেবল অর্থজনিত অনর্থই দেখিতে পাই।

বিদেশীর চক্ষে ত মনে হয় যে তোমাদের পরিবার সন্তানকে যত দিন সে আত্মরক্ষায় সমর্থ না হয় ততদিন পোষণ ও রক্ষণ করিবার যন্ত্র মাত্র। যত শীঘ্র হয় তোমরা ছেলেকে পব্‌লিক্ স্কুলে পাঠাইয়া দাও, সেখানে সে পারিবারিক বন্ধন হইতে নিজেকে অতি শীঘ্রই মুক্ত করিয়া ফেলে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তাহারা যেমন অভিভাবকগণের অধীনতা বর্জ্জন করে, তেমনি তাহাদের প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য বন্ধনও পরিহার করে।

* Lethers of John Chinaman.

যে অবস্থায় জন্মাও তাহাতেই থাকাকে তোমরা লজ্জার বিষয় মনে কর। তোমাদের মতে গতি, দ্বন্দ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাপরাজয় ইহাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই ভাবের নিমিত্ত তোমাদের অসাধারণ উদ্যম ও স্থূল জগতে প্রভূত ফললাভ ঘটিয়াছে। অপর পক্ষে ইহারই জন্য তোমাদের সমাজে অশান্তি, ব্যবস্থার অভাব ও নীতিশূন্যতা। তোমাদের মধ্যে কাহারও সন্তোষ নাই, জীবন উপভোগের অবসর নাই—এতই তোমরা জীবনযাত্রার উপায় বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত। অর্থই মানুষে মানুষে একমাত্র বন্ধন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মত প্রাচ্য জাতির নিকট এই সমস্তই বর্ব্বরতার লক্ষণ। জীবনযাত্রার উপায় সংগ্রহের দ্বারা নহে, জীবনের প্রকার ও মূল্য দ্বারাই আমরা সভ্যতার পরিমাণ করিয়া থাকি। যেখানে মানুষে মানুষে দয়াদাক্ষিণ্যের স্থায়ী বন্ধন নাই, যেখানে সনাতন প্রথার প্রতি ভক্তি নাই, এমন কি বর্ত্তমান আচারের প্রতিও শ্রদ্ধা নাই, কেবল ভবিষ্যৎ লইয়াই লুব্ধ কাড়াকাড়ি, সেখানে প্রকৃত পক্ষে সমাজ আছে বলিয়াই আমরা স্বীকার করি না। আমরা তোমাদের অপেক্ষা অর্থে, বিজ্ঞানে, শিল্পে শ্রেষ্ঠত্বও বাঞ্ছা করি না, যদি সেই সঙ্গে তোমাদের সমাজতন্ত্রের অনুকরণ করিতে বাধ্য হইতে হয়।

তোমাদের আর্থিক অবস্থা এমনি হইয়াছে যে, তোমরা সর্ব্বদাই অন্নকষ্টের মুখে পতিত থাক। তোমাদের যাহা দরকার তাহা তোমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না, তোমাদের দেশে যাহা প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা তোমরা ব্যবহার করিতে পার না। এই জন্যই তোমাদের শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবার এবং আহার্য্য সংগ্রহ করিবার জন্য বাজার পাওয়া তোমাদের পক্ষে জীবন-মরণের ব্যাপার। চীন দেশকে তোমরা এইরূপ একটি বাজার পাইয়াছিলে, এই বাজার খুলিবার অভিপ্রায়ই তোমাদের চীন আক্রমণের নিগূঢ় কারণ। এ কার্য্য কতদূর ন্যায় বা ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছিল সে কথা বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। ইহা যখন তোমরা নিতান্ত প্রাণের দায়ে করিয়াছ, তখন সে সম্বন্ধে ন্যায় অন্যায়ের তর্ক তোলাই বৃথা। আমরা কি জন্য এই অনধিকার চর্চ্চায় আপত্তি করি তাহাই এক্ষণে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের দেশে নূতন নূতন কারবার খুলিয়া আমাদের বাণিজ্য ব্যবসার উন্নতি হইবে, ইহাতে যে আমাদের আপত্তির কারণ থাকিতে পারে তাহা সাধারণ ইংরাজ

আমরা যখন তোমাদের ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্পকার্য্য প্রভৃতির প্রণালী ও ফলাফল বিচার পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করি তখন উৎসাহের কারণ কিছুই দেখি না।

আরব্য উপন্যাসের রাজপুত্রের ন্যায় তোমরা বোতল হইতে প্রতিহ্বন্দিতা জিন্‌কে ছাড়িয়া দিয়াছ। এক্ষণে তাহাকে আর সামলাইতে পারিতেছ না। গত শত বৎসর ধরিয়া তোমরা তোমাদের আর্থিক গোলযোগনিবারণের বৃথা চেষ্টায় নানা প্রকার আইন প্রবর্ত্তন করিয়া আসিতেছ। তথাপি তোমাদের দরিদ্রগণ, মাতালগণ, অকর্ম্মণ্যগণ, রোগী এবং বৃদ্ধগণ তোমাদিগকে ভূতের মত পাইয়া বসিয়াছে। তোমরা মানুষে মানুষে বন্ধন ছিন্ন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় সে কার্য্য উদ্ধার করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়াছ। সকল ক্ষেত্রেই তোমাদের ব্যক্তিগত চেষ্টার পরিবর্ত্তে কোম্পানীর সমবেত চেষ্টা, মানুষের পরিবর্ত্তে যন্ত্র। সকলেই অর্থবৃদ্ধি ধ্যান করিতেছে। শ্রমজীবীর কল্যাণ সরকার ব্যতীত দেখিবার আর কেহ নাই, সরকারও এ কার্য্য করিতে অক্ষম, কারণ তাহাদের কুশল এমন সব জিনিষের উপর নির্ভর করে যাহা কেহই ভাল বোঝে না। আমদানী রপ্তানীর জটিল ব্যাপার তোমরা ইচ্ছামত নিয়মিতও করিতে পার না, পূর্ব্বাহ্নে বুঝিতে ও পার না।

কোন দূর দেশে অনাবৃষ্টি বা শুল্কের হারের তারতম্য হইলে সহস্র সহস্র লোকের ব্যবসায়ে গোল লাগিয়া যায়। কোন আবিষ্কারকের ভাগ্যবল বা বৈজ্ঞানিকের কৌশল অথবা স্ত্রীলোকের খেয়াল তোমাদের সমস্ত কারবার উলটপালট করিয়া দিতে পারে। অধিক কি তোমরা নিজেদের যন্ত্রের দাস হইয়া পড়িয়াছ। তোমাদের ধনীর ধন যেন সজীব হইয়া আহারের নিমিত্ত গর্জ্জন করিতেছে—খোরাক না যোগাইলে সে তোমাদের গলা টিপিয়া মারিবে। সুতরাং তোমরা দায়ে পড়িয়া শিল্পকার্য্য চালাও, ইচ্ছাসুখে নহে। জবর্দস্তি করিয়া যাহা তোমাদের ঘাড়ে চাপে তাহাই তোমরা খরিদ কর, আবশ্যক বুঝিয়া নহে। যাহাকে তোমরা ফ্রীট্রেড্—স্বাধীন বাণিজ্য নাম দিয়াছ তাহার মত আবদ্ধ আর কিছুই নহে।

চীনবাসীর নিকট তোমাদের আভ্যন্তরিক অবস্থা ত এইরূপ প্রতিভাত হয়। অন্যান্য দেশের সহিত তোমাদের সম্বন্ধ যে ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক উৎসাহজনক তাহাও দেখিতে পাই না। য়ুরোপীয় জাতিগণ বুভুক্ষিত শ্বাপদের ন্যায় পৃথিবীর অরক্ষিত স্থানমাত্রই গ্রাস করিতে উদ্যত। আপাততঃ এই হিংসাবৃত্তি পরস্পরের গণ্ডীর বাহিরেই চরিতার্থ করা হয়, তথাপি প্রাপ্ত শীকার বণ্টন করিবার কালে

তোমরা পরস্পরের প্রতি দাঁত খিঁচাইয়া থাক। আজই হউক কালই হউক যখন অন্য শীকার আর অবশিষ্ট থাকিবে না তখন তোমরা পরস্পরকে কামড়াকামড়ি করিবে। তোমরা যে সর্ব্বদাই অস্ত্রসজ্জা বাড়াইয়া চলিতেছ তাহার প্রকৃত অর্থ ইহাই। তোমাদিগকে হয় অন্যকে ভক্ষণ করিতে হইবে নয় নিজে ভক্ষিত হইতে হইবে। যে বাণিজ্যদ্বারা তোমরা পরস্পরকে শান্তিবন্ধনে আবদ্ধ করিবে আশা করিয়াছিলে তাহাই এক্ষণে তোমাদিগকে সর্ব্বসংহারকারী কালযুদ্ধের নিকটবর্ত্তী করিতেছে।

এই চীননিবাসী মহোদয় যে কথা বলিয়াছেন তাহা কি আমরা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিধ্বনিত করিতে পারি না? হায় রে! কালাগ্নিমুখে পতনোন্মুখ পাশ্চাত্যগণের আসন্ন দুর্দ্দশায় আমরা বাস্তবিকই শোকে অভিভূত হইতাম যদি তাহাদেরই আনীত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর চোটে আমাদের পরদুঃখকাতরতার নিতান্ত অনবসর না ঘটিত।

উপসংহারে য়ুরোপীয় রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্রে ধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে লেখক মহাশয় যাহা বলিতেছেন, তাহা পাঠকগণের কৌতুকাবহ বলিয়া বোধ হইবে।

তিনি বলিতেছেন :—

তোমাদের সমাজ যে কোনরূপ ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাত আমি দেখিতে পাই না। আমি যদি খৃষ্টধর্ম্মকে যথারূপ বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। কারণ তোমাদের শাস্ত্রে যে আদর্শ নিহিত রহিয়াছে তাহা মর্ত্ত্যসাধন নহে—স্বর্গের ধ্যান, মানব জন্মে ঐক্য বিধান নহে—দেবলোকে মিলন। আমাদের আদর্শ অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট সে বিচার করিতে আমি সাহস করি না, কিন্তু কম কার্য্যোপযোগী যে, সে কথা আমাকে বলিতেই হইবে। যে নাটকের আখ্যানবস্তুর কার্য্যক্ষেত্র অন্যত্র, মর্ত্ত্যলীলাকে তাহার এক অবান্তর উপাখ্যানমাত্র বলিয়া গণ্য করিলে সে ভাবের ভিত্তির উপর কোন স্থায়ী সমাজ কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? কাজেই তোমাদের ইতিহাসের যে সময়ে তোমরা সত্যসত্যই খ্রীষ্টের আদর্শ ধর্ম্মানুসারে জীবন গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলে তখন প্রত্যক্ষে এবং আদর্শে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। তাহাতে আদর্শেরই পরাজয় হইল। এবং সেই সংগ্রামের ধূলির মধ্য হইতে পাশ্চাত্যজগৎ আধ্যাত্মিকতা সম্পূর্ণ

পরিহারপূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইল। তখন তাহারা প্রকাশ্যরূপে সাংসারিকমাত্র—সাদা-সিধাভাবে কৌতুহল-সম্পন্ন—স্থুলজগতের শক্তিসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার সম্বন্ধে কৃতসংকল্প—সৌন্দর্য্য, ধন, বিদ্যা ও ক্ষমতা প্রাপ্তির নিমিত্ত অদম্য উদ্যমযুক্ত।

সেই সময় হইতে যদিও তোমরা নামে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী রহিলে কিন্তু কোনরূপ অনুষ্ঠানে তাহার সহিত যোগাযোগ রাখিবার চেষ্টামাত্র আর তোমরা করিলে না। যে ধর্ম্মবৃত্তি মনুষ্যের মধ্যে কিছু না কিছু অবশিষ্ট না থাকিয়া উপায় নাই, তাহা খ্রীষ্টান নামধারীগণ কেবলমাত্র মৌখিক সম্মতিদ্বারা চরিতার্থ করে, এবং তৎপরে কর্ত্তব্যভার লাঘব হওয়ায় নিশ্চিন্ত মনে স্বার্থানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। নতুবা, খ্রীষ্টধর্ম্ম যদি সত্যই কাহাকেও পাইয়া বসে তাহা হইলে সে বিপ্লবকারীর দলপুষ্ট করিতে বাধ্য হয়। কারণ খৃষ্টীয় শিক্ষা যদি কেহ যথার্থ বুঝিয়া পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তোমাদের চলিত তন্ত্রে সে টিঁকিতে পারে না।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে একটি নিরীহ নিরক্ষর অল্পদর্শী অনভিজ্ঞ প্রাচ্যদেশীয় ভক্ত-কর্ত্তৃক এই যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা যেমন এক পক্ষে হৃদয়স্পর্শীরূপে ভ্রাতৃভাবের গুণকীর্ত্তন করিয়াছিল, তেমনি অপর পক্ষে মানবচরিত্রের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ অংশ হয় গণ্যের মধ্যেই আনে নাই, নয় তাহার প্রতি বিদ্বেষ দৃষ্টিতে কটাক্ষপাত করিয়াছে।...জন্ম পাড়াগাঁয়ে, ব্যবসায়ে শিল্পী, মনোবৃত্তি ভাবুকের, সে অল্প দিনের জীবনে রাষ্ট্রনীতির সমস্যাসকল বুঝিবার সুযোগও পায় নাই, সেদিকে তাহার প্রবৃত্তিও ছিল না। ধনের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, বর্ণাশ্রম বিভাগ, বিষয় কর্ম্ম, বাণিজ্য ব্যবসা, এই সকল ব্যাপার যেমন তাহার নিত্য জীবনের বহির্ভূত ছিল, তেমনি তাহার বোধশক্তিরও অতীত ছিল।...এই লোকের সাদাসিধা আত্মত্যাগ সম্বন্ধীয় উপদেশগুলিকে দুর্দ্দান্ত রাজ্যলুব্ধ পাশ্চাত্য জাতিগণ বেদবাক্য স্বরূপ গ্রহণ করিল! [সাধ্য কি যে ইহাতে তোমাদিগকে কোনরূপে বাগ মানাইবে!] সুতরাং তোমাদের ইতিহাস যে দ্বন্দ্ব, বিগ্রহ, রক্তপাত প্রভৃতি গণ্ডগোলময় একটি সুদীর্ঘ শোচনীয় কাহিনী তাহাতে আর বিচিত্র কি?

[ধর্ম্মের মধ্যে যে যুদ্ধের স্থান নাই সে কথা আমরা বলি না] কিন্তু যাহার এই মত, সে খৃষ্টান—প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী—হইতেই পারে না।...কিন্তু কি ঘৃণার এবং বিস্ময়ের কথা যে, য়ুরোপীয় জাতিগণ তাঁহাদের ঘোর পাপানুষ্ঠানগুলিও খৃষ্টের বচনের দোহাই দিয়া করিয়া থাকে; যে, তাঁহাদের মধ্যে এমন রাজাও আছে যে নিষ্ঠুরতা-চরণে সৈন্য পাঠাইবার কালে, যিনি এক গালে চড় মারিলে অপর গাল ফিরাইবার

উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহার নাম করিয়া শুধু যুদ্ধ করিতে নয়, নির্ম্মম ও নির্দ্দয় হত্যা করিতে তাহাদিগকে উত্তেজনা করিতে পারে।

ইহাই যদি হইতে পারে তাহা হইলে খৃষ্টানধর্ম্ম আমাদের ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একথা বলিয়া তোমাদের লাভ কি? তোমাদেরই শাস্ত্রে আছে By their fruits shall ye know them—ফলেন পরিচীয়তে। সেই ফলের দ্বারাই বিচার হউক। তোমরা বল কংফুসীয়সের ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে—না হইতে পারে, তাহার নীতিসংহিতা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইতে পারে, কিন্তু সেই ধর্ম্মের প্রভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে চীনেরা একমাত্র জাতি যাহারা সকল বিষয়ে বলপ্রয়োগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা এবং ন্যায় ও ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করে।

পাছে তোমরা আমাকে স্বপক্ষপাতী বলিয়া বিবেচনা কর তাই আমি তোমাদের মধ্যে যে একমাত্র লোক আমাদিগকে ভালরূপ জানিয়া, আমাদের রাজস্বের সহায়তা হেতু আমার দেশহিতৈষী স্বদেশীয় মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তাঁহার সাক্ষ্য প্রদান করি। তোমাদের সাময়িক পত্রের সংবাদদাতাগণের মূঢ় প্রলাপের পরিবর্ত্তে একবার সেই Sir Robert Hartএর কথায় কর্ণপাত কর। তিনি চীনজাতি সম্বন্ধে বলেন, "তাহারা সৎকর্ম্মশীল, নির্ব্বিবাদী, বুদ্ধিমান, মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী। তাহারা অতিমাত্র ভদ্র, তাহারা সদ্গুণের উপাসনা করিয়া থাকে, এবং তাহারা ন্যায়কে এতই ভক্তি করে যে তাহাকে বলের দ্বারা সমর্থন করিবার কথা তাহারা মনে করিতেই লজ্জিত হয়।"

বিধির কি বিড়ম্বনা! সেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতিগণ আমাদিগকে অগ্নিকাণ্ড ও রক্তপাতের দ্বারা শিক্ষা দিতে আসিয়াছে যে জগতে ন্যায়ের কোনই সার্থকতা নাই যদি না তাহা বলের দ্বারা রক্ষিত হয়! যাহা হউক তোমরা এ সন্দেহ করিও না যে আমরা সে শিক্ষা গ্রহণ করিব না। যখন আমাদের এ শিক্ষা লাভ হইবে তখন য়ুরোপের কি দশা হইবে? তোমরা ৪০ কোটি মানববিশিষ্ট জাতিকে অস্ত্র ধরাইতেছ—যে জাতি তোমরা আসিবার পূর্ব্বে পরস্পরের এবং সমগ্র পৃথিবীর সহিত শান্তি অপেক্ষা আর কিছুই প্রার্থনা করিত না। খৃষ্টানের নামে তোমরা যুদ্ধ ডঙ্কা বাজাইয়াছ—ভাল, কংফুসিয়সের নামোচ্চারণপূর্ব্বক আমরাও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতেছি।

সুন্দরী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিশালাক্ষী হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে, পিয়ালী নদীরই উপর আর একখানি গ্রাম। গ্রামটির নাম মহেশপুর। নামটি যেরূপ জমকালো, গ্রামটি সেরূপ নহে। আসলে গ্রামই নহে, কয়েকখানি মাত্র গৃহের সমষ্টি, তাহাও দূর দূরান্তে অবস্থিত।

ঐ যে বনের মধ্যে একটি শীর্ণ গৃহ দেখা যাইতেছে, উহা গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবন। গদাধর, কান্তিচন্দ্রের প্রতিযোগী জমিদার সোণাপুরের বাবুদের তরফে চাকরি করেন। তিনি নদীর উভয়-তীরবর্ত্তী কয়েক খানি গ্রামের গোমস্তা। গ্রামগুলির প্রজাদের নিকট খাজনা আদায় করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত। খাজনা আদায় করিয়া মাঝে মাঝে সোণাপুরের কাছারিতে গিয়া সদর নায়েবকে হিসাব বুঝাইয়া দিয়া আসিয়া থাকেন।

গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের একটি কুলগত মহৎ দোষ আছে। সেই কারণে আজ দশ বৎসরকাল স্ত্রী-বিয়োগ হওয়া সত্ত্বেও দারপরিগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাঁহার একটি যুবাবয়স্ক পুত্র আছে, পশ্চিমে চাকরি করে, এ পর্য্যন্ত তাহারও বিবাহ দিয়া উঠিতে পারেন নাই। দুইটি কন্যা আছে—একটির নাম রমাসুন্দরী, অপরটির নাম রাজলক্ষ্মী। রমার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত প্রায়, কিন্তু এখনও বিবাহ হয় নাই। এত বড় কন্যার বিবাহ হইতেছে না, এজন্য গদাধর বিশেষ দুশ্চিন্তান্বিত, কিন্তু উপায় কি? এই কন্যা দুইটী ছাড়া গৃহে আছেন তাঁহার বিধবা দিদি, তিনি চক্ষে ভাল দেখিতে পান না, তথাপি আন্দাজি

আন্দাজি সংসারের সকল কাযকর্ম্মগুলি করেন। আর আছে লছ্‌মি নামে একটি হিন্দুস্থানী ধাত্রী। এই ধাত্রীর ইতিহাস কিছু কৌতুকাবহ। তাহার জন্ম রাজপুতকুলে. সিপাই বিদ্রোহের সময় তাহার পিতামহ বলবন্তসিং বিদ্রোহিদের পক্ষ বলম্বন করিয়া ধনেপ্রাণে বিনষ্ট হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বংশ এখনও প্রতাপগড়ের রাণা, কিন্তু তাঁহার স্ববংশের বালক বালিকারা কেহ ভিক্ষা, কেহ দাস্যবৃত্তি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। গদাধর চট্টোপাধ্যায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে যখন একবার কর্ম্মোপলক্ষ্যে কাশীতে সপরিবারে ছয় মাস অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সময় লছ্‌মি তাঁহার পরিজনভুক্তা হইয়াছিল। গদাধরের পুত্র ও কন্যাদ্বয়ের নিতান্ত শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ার পর হইতে লছমিই তাহাদের মাতৃস্থানীয়া হইয়া নিজের আদর্শ অনুসারে মানুষ করিয়াছে।

যে মেয়েটির নাম রমাসুন্দরী সেটি ভারি সুন্দরী। কিন্তু সুন্দরী হইলে কি হয়, তাহার ধাত্রীর শিক্ষাবৈগুণ্যেই হউক, বা জন্মনক্ষত্রফলেরই সংযোগে হউক, মেয়েটি ভয়ানক দুর্দ্দান্ত। ভাগ্যে তাহার পিতার জঙ্গলে বাস, নচেৎ সমাজে তাঁহার মাথা তুলিবার ক্ষমতা থাকিত না। রমা বন্যবিড়ালীর মত বৃক্ষারোহণ করিয়া থাকে। স্নান করিতে গিয়া পিয়ালী নদীটিকে একেবারে তোলপাড় করিয়া আসে। ছিপ লইয়া পুকুরে মাছ ধরে—এমন কি তীর-ধনুক পর্য্যন্ত ছুঁড়িতে জানে। রমা লছমীর প্রাণ। ছেলে বেলা হইতে লছমি তাহাকে সাধ করিয়া আপনার মেয়ের মত করিয়া কোঁচা দিয়া কাপড় পরান অভ্যাস করিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত রমা প্রায়ই তাহাই পরে। লছমির নিজ হস্তের সেলাই করা সূক্ষ্ম কারুকার্য্যসম্পন্ন 'আঙ্গিয়া' সর্ব্বদাই তাহার অঙ্গ শোভা করে। রাজলক্ষ্মীরও বেশভূষা [illegible] অনুরূপ, কিন্তু তাহার

লছ্‌মি যখন দ্বিপ্রহরে রমা, রাজলক্ষ্মী ও নিকটবর্ত্তী দুই এক ঘরের মেয়েদের জড় করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলায় স্বদেশীয় রূপকথা বলে, মহাভারত রামায়ণের কথা বলে, সিপাই বিদ্রোহের কথা বলে—সেই বীররক্তধারিণী রাজপুতানীর মুখে বীররসাত্মক গল্প শুনিতে শুনিতে রমার প্রাণ কি একটা উত্তেজনায় উদ্দীপিত হইয়া উঠে। অন্যান্য বালিকারা একরকম ভয়ে আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু তাহারাও প্রতিদিন শুনিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না।

তীরছুঁড়া বিদ্যায় লছমিই রমার শিক্ষয়িত্রী। প্রথমে শুধু গাছে চিহ্ন করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিত, একদিন একটি পাখী মারিল। পাখী যখন কাতর কূজন করিয়া, ধড় ফড় করিয়া বিলুণ্ঠিত হইল, তখন রমা তীর ধনুক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া আহত পাখীকে কোলে তুলিয়া, তাহার গায়ে জলসিঞ্চন করিয়া, নিজে অশ্রুজলে ভাসিয়া তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল। পাখী কিন্তু বাঁচিল না। সেই পর্য্যন্ত তীর-ধনুক উঠাইয়া রাখিয়াছে, আর স্পর্শ করে না। আর কোন ছেলে মেয়ে লইতে গেলেও বলে, "খবরদার ছুঁস্‌নে।" কিন্তু তার নিজেরই মনে অনেকবার দুর্নিবার প্রলোভন জাগিয়া উঠে।

পুষ্করিণীর তীরে একটি আম্রবন। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এটি প্রধানতঃ আমের বাগান হইলেও অন্যান্য গাছও রহিয়াছে;—খর্জ্জূর, নারিকেল, বাতাবী লেবুর গাছ প্রভৃতি। নারিকেলের প্রায় প্রত্যেক গাছটিতে গাছভরা সবুজ ডাব, খেজুর গাছে, খেজুর গুলিও প্রায় সবুজ, এক একটা পীতবর্ণ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আম সবই সবুজ—এখনও পাক ধরিতে বিলম্ব আছে। গদাধরের গৃহের খিড়কী দরজা খুলিয়া কয়েকটি ছেলে মেয়ে বাহির হইয়া আসিল। অগ্রে অগ্রে রমা, তাহার হাতে একটি আম পাড়িবার 'আংসী,' পশ্চাৎবর্ত্তী বালকবালিকাগণের কাহারো হাতে ধামা, কাহারো

হাতে ডালা, কাহারো হাতে অন্য পাত্র। বাৎসরিক কাসুন্দী তৈয়ারি হইবে তাই ইহারা আম পাড়িতে আসিয়াছে।

রমা একটা বড় গাছের তলায় আসিয়া, আংসিটা মাটিতে ফেলিয়া, অঞ্চলের বস্ত্র দিয়া নিজ কটিদেশ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিল। তাহার পর আম পাড়িতে প্রবৃত্ত হইল। কখনও বা আংসিটা একটা ফলবহুল শাখায় আটকাইয়া দিয়া জোরে নাড়া দিতে থাকে, কখনও বা এক থোলো আমের উপরিভাগে আকর্ষী লাগাইয়া থোলো শুদ্ধ পাড়িয়া আনে। ধুপধাপ করিয়া চতুর্দ্দিকে আম্র বৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলে মহা উৎসাহে ছুটিয়া ছুটিয়া আম কুড়াইয়া জমা করিতে লাগিল। একবার একটা বড় আম একটি ছোট বালিকার পিঠে সজোরে পড়িয়া গেল। আঘাত পাইয়া মেয়েটি কাঁদিয়া উঠিল—অপর সকলে হাসিতে লাগিল। রমা অবজ্ঞা ভাবে তাহাকে বলিল—"একটা আম পড়েছে পিঠে, তার জন্যে অত কান্না।"

সে বলিল—"নিজের পিঠে পড়ত যদি ত বুঝতে পারতে।"

রমা তৎক্ষণাৎ বলিল—"আচ্ছা আমি হেঁট হচ্চি। ফেল তোরা কেউ আমার পিঠে একটা আম।" বলিয়া সে সুন্দরী ধনুকের মত বঙ্কিম হইয়া হেঁট হইয়া দাঁড়াইল। সকলে পরে পরে আংসী লইয়া তাহার পিঠে আম ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। আম আশে পাশে পড়িতে লাগিল, রমার পিঠে একটাও পড়িল না।

এইরূপে এক গাছ হইতে অন্য গাছে মেয়েরা আম পাড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। ধামা, ধুচুনি, ডালা সব পূর্ণ হইয়া উঠিল। আম পাড়াও চলিতেছে—এদিকে ভক্ষণেরও বিরাম নাই। আঁচলের মধ্যে একটা একটা আম লইয়া, কাপড়সুদ্ধ সজোরে গাছের গুঁড়িতে

করিয়া ফেলিয়া, লবণসহযোগে চর্ব্বণ। ক্রমে দাঁত টকিয়া আসিল, গা শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, তথাপি বিরাম নাই।

যে মেয়েটির পৃষ্ঠে একবার আম পড়িয়াছিল, তাহাকেই এবার কাঠপিঁপড়ায় কামড়াইয়া দিল। সে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। রমা গিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, স্বরচিত "মন্ত্র" বলিয়া আঙুলে ফুঁ দিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে পালাইয়া গেল।

এই সময় মাথার উপর পক্ষীর কলরব শোনা গেল, সকলে মুখ তুলিয়া দেখিল দুইটা বড় বড় সবুজ বর্ণ পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে। এ বনে অনেক পাখী আছে, সে সকল পাখীই এ বালক বালিকাদের পরিচিত, কিন্তু এরূপ পাখী ইহারা কখনও দেখে নাই। একজন বলিল, "কি পাখী ভাই?" কেহ বলিল "টিয়ে।" অপর কেহ বলিল —"দূর, টিয়ে কখনও অত বড় হয়? আর ঠোঁট কখনও ওরকম মোটা হয়?" রমা বলিল—"এ পাখী এ বনের নয়, ধরতে হচ্চে।" বলিয়া ছুটিয়া বাড়ী গিয়া পাখীধরা জাল লইয়া আসিল।

তখন পাখী দুইটি একটি বৃক্ষের শাখায় বসিয়াছে। জাল কাঁধের উপর ফেলিয়া, রমা বৃক্ষে আরোহণ করিল। যে ডালে পাখী বসিয়া ছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী একটা ডালে আস্তে আস্তে গিয়া জাল ছুঁড়িয়া পাখীর উপর ফেলিল। একটা পাখী উড়িয়া পলাইল, কিন্তু অন্যটা জালে বদ্ধ হইয়া রহিল। ঝটপট করিতে করিতে পাখী জালসুদ্ধ ভূমিতে পড়িয়া গেল।

পাখী পড়িতে দেখিয়া কয়েকটি বালিকা সেই দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু বৃক্ষ হইতে রমা আজ্ঞা করিল, "খবরদার, কেউ হাত দিস্‌নে— উড়ে গেলে মজা দেখাব!" বালিকারা ত্রস্তভাবে সরিয়া দাঁড়াইল।

রমাকে লইয়া উর্দ্ধে ও নিম্নে নাচিতে লাগিল। ইচ্ছাপূর্ব্বক খানিকক্ষণ এইরূপ নাচিতে নাচিতে, রমা গম্ভীর স্বরে "জয় মা কালী" বলিয়া লম্ফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিল। নামিয়াই একটা ধামার আম খালি করিয়া তাহাকে উপুড় করিয়া, কৌশলে পাখীটাকে জাল হইতে ধামার মধ্যে প্রবেশ করাইল। জালমুক্ত হইবামাত্র তাহা লইয়া দ্বিতীয় পাখীর সন্ধানে ধাবিত হইল। কিন্তু বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে আরোহণ করিয়াও তাহাকে ধরিতে কৃতকার্য্য হইল না। পাখী ক্রমাগত এগাছ হইতে ওগাছে উড়িয়া বসিতে লাগিল। ক্রমে রমা শ্রান্ত হইয়া পড়িল। অনুচর ও সহচরীগণকে আদেশ করিল,—"তোরা যা, কোন্ গাছে বসে সন্ধান রাখ্, আমি বাড়ী থেকে খাঁচা এনে এ পাখীকে রেখে আসছি।" তাহারা পাখীর সন্ধানে চলিয়া গেল। রমাও বাটী হইতে একটা পুরাতন লোহার খাঁচা আনিয়া উপস্থিত করিল। এখন ধামার ভিতর হইতে কি করিয়া পাখীকে খাঁচায় প্রবেশ করাইবে, সেই সমস্যা। জালের মধ্যে হইতে ধামার নীচে পাখী ত সহজেই ঢুকিয়াছিল, কিন্তু ধামার ভিতর হইতে বাহির করিতে গিয়া উড়িয়া না পলায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া রমা শেষে এক উপায় অবলম্বন করিল। এক দিকটা একটু ফাঁক করিয়া দিয়া, ধামার চারিদিকে থাবড়া মারিতে লাগিল। তাহাতে পাখীটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, হঠাৎ একবার ফাঁক দিয়া তাহার লেজ বাহির হইয়া পড়িল। রমা তৎক্ষণাৎ পা দিয়া সে লেজ চাপিয়া ধরিল, চাপিয়া ধামা খুলিয়া ফেলিল। হাতে করিয়া পাখীকে ধরিয়া খাঁচায় পূরিতে গেল, কিন্তু অত্যাচারিত পাখী ক্যাঁক্ করিয়া তাহার একটি অঙ্গুলিতে কামড়াইয়া দিল। খাঁচায় পাখী ঢুকিল বটে, কিন্তু রমার অঙ্গুলি দিয়া দরদর করিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল।

খাঁচার দুয়ার বন্ধ করিয়া রমা পুষ্করিণীর তীরে ছুটিল। ক্ষত

অঞ্চল হইতে একটু কাপড় ছিঁড়িয়া, সিক্ত করিয়া অঙ্গুলিতে জড়াইল। তবু তখনও ভারি জ্বালা করিতেছে।

বৃক্ষতলে ফিরিয়া, পাখীর উপর ক্রোধবর্ষণ করিবার রমা অবসর পাইল। আমপাড়া আংসিটা লইয়া খাঁচার উপর ও আশে পাশে দমাদ্দম প্রহার করিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল—"হতভাগা লক্ষিছাড়া পাখী! আর কামড়াবি? আর কামড়াবি? আর কামড়াবি?"

তাহার ক্রোধদীপ্ত মুখখানি এমন নিরূপম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—তাহার ভঙ্গীটি এমনই চিত্রবৎ হইল, তাহা নিজে সে কিছুই উপলব্ধি করিল না বটে, কিন্তু সেখানে কোন দ্রষ্টা থাকিলে বিমোহিত হইত।

ক্রোধ কতকটা শান্ত হইলে পর, রমা ভাবিল এইবার বাড়ীতে খাঁচাটা রাখিয়া, অন্য পাখীটার সন্ধানে যাওয়া আবশ্যক। এই ভাবিয়া খাঁচাটা হাতে উঠাইয়া লইল। পশ্চাৎ ফিরিতেই দেখিল একটি উজ্জ্বল উন্নতকায় সুন্দর যুবা পুরুষ দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যুবা রমার হস্তস্থিত খাঁচার প্রতি চাহিয়া বলিল—"এ পাখী আমার, আমায় দাও।" "জয় মা কালী" বলিয়া গাছ হইতে লাফাইয়া পড়া অবধি সবই এ দূর হইতে দেখিয়াছে।

সহবৎশিক্ষাবিহীনা রমা তার দিকে অবহেলা ভরে তাকাইয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"তোমার পাখী? তুমি কে? পাখীর গায়ে তোমার নাম লেখা আছে?"

একটি যুবতী কন্যার মুখে নবগোপাল এতাদৃশ নিঃসঙ্কোচ ভাষা শ্রবণ করিয়া পরম আমোদ বোধ করিল। সে ভাব মনে গোপন

নৌকো পাখী নিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, একটা খাঁচা খোলা পেয়ে হঠাৎ গোটাকতক চন্ননা উড়ে পালিয়েছে, তাই খুঁজতে এসেছি।”

রমা একটু স্বর নামাইয়া বলিল—“এ—ক নৌ—কো পাখী?”

“এক নৌকো পাখী।”

“কি পাখী গা? সবই এই রকম চন্ননা?”

নবগোপাল বালিকার ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া প্রলোভিত করিবার মত স্বরে বলিল—“এক নৌকো পাখী! শুধু চন্ননা কেন হবে? ছোট বড় কাল সবুজ লাল কত রং বিরঙের পাখী।”

রমা বলিল—“তুমি কি পাখীর ব্যবসা কর?”

নবগোপাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল—“হ্যাঁ।”

“তোমার নৌকো কোথা আছে? আমাকে তোমার পাখী দেখাবে।”

নবগোপাল ঘাটের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—“ঐ ঘাটে আমার নৌকো বাঁধা আছে। যদি পাখী দেখবে ত আমার সঙ্গে চল।”

রমা উল্লাসিত হইয়া উঠিল। বলিল—“আচ্ছা একটু দাঁড়াও। খাঁচাটা বাড়ীতে রেখে আসি।” বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

নবগোপাল দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল এমন অপরূপ মেয়ে সে কখনও দেখে নাই। ধরণধারণ ভাবসাব বালিকার মত, অথচ দেখিতে নবযৌবনশালিনী দেবীর মত। কথা কহে বাঙ্গালীর মত, অথচ পরিধানে পশ্চিমবাসিনীর মত। ভাবিল, মেয়েটি কে সন্ধান লইতে হইতেছে। এত বড় মেয়ে, বিবাহই বা হয় নাই কেন? কপালে ত সিন্দুর নাই?

রমা আসিল। এখন আর তাহার মল্লবেশ নহে, হাত ও মুখের ধুলাও ধুইয়া আসিয়াছে। নবগোপালের মুখপানে চাহিয়া বলিল—“চল।”

দেখা যায় না। অধিকাংশ বৃক্ষেই লতা জড়াইয়া উঠিয়াছে। সে লতায় নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়াছে। পদতলের মৃত্তিকা এখন শুষ্ক, বৈশাখের উত্তাপে শুকাইয়া উঠিয়াছে, নহিলে বৎসরের অধিকাংশ সময় কর্দ্দমাক্ত থাকে। পথে দুইজনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। প্রশ্ন করিয়া করিয়া নবগোপাল রমার সমস্ত সংবাদ বাহির করিয়া লইল। কিন্তু সে যে পক্ষীব্যবসায়ী নহে, এটা রমার কাছে ফাঁস করিল না।

এইরূপে তাহারা নদীতীরে পৌছিল। নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। নৌকার ছাদের উপর একটি মঞ্চের মত নির্ম্মিত। সেই মঞ্চ ও ছাদের মাঝখানে পাখীর অনেকগুলি খাঁচা। এক এক জাতীয় পাখী এক এক খাঁচায় বদ্ধ আছে। কোনও খাঁচায় দশ বারোটা পাখী, কোনওটাতে বা আরও অধিক। রমাকে লইয়া নবগোপাল এক একটি করিয়া খাঁচা-গুলি দেখাইতে লাগিল। রমার যে আনন্দ! পক্ষীর সম্বন্ধে নবগোপালকে সে সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল। দেখা শেষ হইলে, নবগোপাল তাহাকে বলিল, "চল তোমায় বাড়ী রেখে আসি।" ছাদ হইতে নামিয়া, নৌকা হইতে নামিবার পূর্ব্বে, রমা নৌকার ভিতর দৃষ্টি করিল। দেখিল একটি বন্দুক টাঙ্গানো রহিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কার বন্দুক?"

নবগোপাল বলিল—"আমার বন্দুক।"

"তুমি বন্দুক ছুড়তে জান?"

"জানি বৈ কি।"

"একবার ছুড়ে দেখাও না।"

"বেশ" বলিয়া নবগোপাল বন্দুক, বারুদ প্রভৃতি বাহির করিয়া আনিল। বলিল—"এখানে ছুড়লে আমার পাখী ভয় পাবে; চল পথে গিয়ে ছুড়ব।"

দুইজনে নৌকা হইতে অবতরণ করিল। রমা বলিল—"আমি কখনও বন্দুক ছুড়িনি।" ভারি বিনয়পূর্ণ হতাশ্বাস স্বর।

নবগোপাল সোৎসাহে বলিল—"তুমি বন্দুক ছুড়বে ?"

"আমি ত জানিনে কি করে ছুড়তে হয়।"

"আমি তোমায় শিখিয়ে দেব।" বলিয়া নবগোপাল বলিল—"আমি আগে ছুড়ি দেখ। এই রকম করে হাতের তলায় ধরতে হয়। এই রকম করে ঘোড়া তুলে টুপি পরাতে হয়। তারপর, এই রকম করে নিশানা করে,—এই রকম করে ঘোড়া টেনে দিতে হয়।"—এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক আওয়াজ হইয়া গেল,—মুখ দিয়া অজস্র ধূম বাহির হইয়া পড়িল।

রমা বলিল—"এইবার আমি ছুড়ব—দাও।" বলিয়া নবগোপালের হাত হইতে বন্দুক লইল। প্রথমে নিজে সে টোটা পরাইতে পারিল না। নবগোপাল টোটা পরাইয়া দিল। টুপি রমা নিজেই পরাইতে পারিল। ছুড়িবার পূর্ব্বে বন্দুকের পশ্চাদ্ভাগ বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া প্রস্তুত হইল।

নবগোপাল বলিল—"ও রকম নয়, ও রকম নয়। বুকের উপর ধরতে নেই—আওয়াজ হলে বন্দুক পিছু হটে—মানুষকে ফেলে দেয়। এই রকম করে পাঁজরের পাশে হাতের তলায় ধরতে হয়।"

যথাশিক্ষামত বন্দুক ধরিয়া, রমা ঘোড়া টানিয়া দিল। বন্দুক অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া পুনশ্চ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তখন রমার খুসী দেখে কে! বলিল—"আবার একবার ছুড়ব।"

রামার সাহসে ও সখে নবগোপালের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে একখানা আংলো ইণ্ডিয়ান কাগজে একবার একটা ছবি দেখিয়াছিল তাহারই কথা মনে পড়িল। সে ছবিটা এই—একজন ইংরেজ যুবতী বন্দুক ছোড়া শিক্ষা করিতেছে, কেননা, আজকাল 'নেটিভ'দের

ছবিটা নবগোপালের চক্ষে লাগিয়াছিল ভাল, কিন্তু তার আনুষঙ্গিক ঐ মন্তব্যটাতে রক্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। আজ কেন বলিতে পারে না, সে জ্বালা যেন শীতল হইল। নবগোপাল আবার বন্দুক প্রস্তুত করিয়া দিল, রমা আবার ছুড়িল।

অতঃপর দুই জনে গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল। এতক্ষণে এই বন্দুকবান্ পুরুষের প্রতি রমার ভারি ভক্তি হইল। এবার একবার ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি কি জন্তু শিকার কর?"

নবগোপাল বলিল—"আমি হরিণ, বুনো শূয়োর, পাখী অনেক মেরেছি।"

পাখীমারার কথাটা শুনিতে রমার হৃদয়ে একটুখানি ব্যথা লাগিল।

"বাঘ কখনও মেরেছ?"

"বাঘ একবার মেরেছি একটা।"

"কি করে বাঘ মারলে বল না!" বলিয়া আগ্রহাতিশয্যে দাঁড়াইয়া পড়িল। নবগোপাল তাহার মুখখানির পানে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চাহিল,—দুইটি সরল চক্ষু কৌতূহলাবিষ্ট। সে বলিল "কি করে বাঘ মেরেছি শুনবে?"

পূর্ব্বমত আগ্রহে রমা বলিল—"বল।"

নবগোপাল বলিল—"আমি একবার নৌকো করে নদীর মাঝখান দিয়ে আসছিলাম। অন্ধকার হয়ে এসেছিল। জলে ছব ছব করে শব্দ শুনতে পেলাম। মাল্লারা বল্লে বাবু একটা বাঘ আসছে। আমি অমনি বন্দুক তুলে গুলি করলাম। গুলি তাকে লাগল কি না জানিনে, বাঘটা কিন্তু ফিরে তীরের দিকে যেতে লাগল। আমি মাঝিদের বল্লাম বাঘের পিছু পিছু নৌকো নিয়ে যেতে। বাঘ যাই তীরে উঠল, অমনি আবার

এই শিকারের কাহিনী শুনিয়া রমা কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে নবগোপালের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। একটু পরে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"আমি যদি শিকার করতে পারতাম!"

নবগোপাল প্রথমাবধি এ বালিকার চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিস্ময়ের পর নূতন বিস্ময়ে আপ্লুত হইতেছিল। বৃক্ষশাখা ধরিয়া "জয় মা কালী" বলিয়া লম্ফপ্রদান করা হইতে আরম্ভ করিয়া বন্দুক ছোড়া অবধি ইহার সকল কার্য্যকলাপই এমন অনন্যসাধারণ, যে, যখন বালিকা শিকার করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিল, তখন আর তাহার কিছুমাত্র বিস্ময়বোধ হইল না। নবগোপাল বলিল—"যাবে তুমি একদিন আমার সঙ্গে শিকার করতে রমা?"

রমার চক্ষে কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিল। সে বলিল—"আমায় নিয়ে যাবে?"

নবগোপাল বলিল—"যাব। কবে যাবে বল?"

"যবে তুমি নিয়ে যাবে।"

"পরশু?"

"বেশ। পরশু আমি দুপুরবেলা ঐ ঘাটে আসব।"

"বেশ। তবে সেই কথা রইল, ভুলো না।"

এইবার ইহারা বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াছিল। রমা বলিল—"তুমি ভুলো না।" বলিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। নবগোপাল নির্নিমেষ নেত্রে বালিকার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার বিস্ময় তাহাকে এমনি অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে প্রস্তাবিত কার্য্যের সম্ভাবনীয়তা বা যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই তাহার মস্তিষ্কে উদিত হইল না। [ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ সমালোচনা।

মহামতি রাণাড়ে। শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। মূল্য ৵০ আনা।

বর্ত্তমান সময়ে যে দুই চারিজন মহাত্মার আবির্ভাবে এই চিরদাসত্ব-নিপীড়িত মনুষ্যত্ব-নিষ্পেষিত হিন্দুজাতি সভ্য সমাজে মস্তক উত্তোলন করিয়া কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্বীয় স্মরণাবশেষ পূর্ব্বতন গৌরব-মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে, মহামতি রাণাড়ে তাহাদের মধ্যে একজন। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ ও তাহার উপরে অত্যুচ্চ পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুশীলন এই উভয়বিধ সুযোগের শুভসমবায়ে তাঁহাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়াছিল। তাহার ফলে আমরা দেখিতে পাই, তিনি একদিকে যেমন গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত উচ্চতম বিচারাসনে উপবিষ্ট অনন্যসাধারণ ন্যায়পর মহাযশস্বী বিচারপতি, আবার অন্যদিকে তিনি স্বদেশীয় জনসাধারণের হৃদয়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত স্বদেশবৎসল ধর্ম্মপরায়ণ দেশহিতৈষী। যদি ভারতবর্ষে এরূপ কোন ব্যক্তি থাকেন, যিনি দিবসের ২৪ ঘণ্টাকাল স্বদেশের হিতচিন্তা করেন, তবে তিনি কেবল মহামতি রাণাড়ে একথা হিউমসাহেব বলিয়াছেন। স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতিকল্পে তিনি করেন নাই এমন কাজ নাই। "মহারাটা জাতির ইতিহাস" তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর গবেষণার এক অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে, তিনিই প্রথমে স্বদেশীয় বস্ত্রাদির ব্যবহার প্রচলন করেন। তিনি জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও নেতা ছিলেন। তিনি একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন, কিন্তু সমাজসংহারক ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। এইরূপ একটী আত্মায়—অস্থিমজ্জাবিশিষ্ট স্বাধীনচেতা পুরুষের জীবনী আধুনিক সময়ের পক্ষে বড়ই উপযোগী ও উপকারী। বর্ত্তমান সময়ের স্রোতের তৃণ, জলের বুদ্‌বুদ, মেরুদণ্ডহীন নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে এই মহাত্মার জীবনী যত অধিক আলোচিত হইবে, ততই দেশের মঙ্গল। এই ক্ষুদ্র জীবনচরিত নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাতে মৃত মাহাত্মার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা অতি সুকৌশলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা পড়িয়া, তাঁহার সম্বন্ধে আরও বেশী কথা জানিবার কৌতুহল জন্মে। দেউস্কর মহাশয় বঙ্গীয় পাঠকের সেই কৌতূহল ভবিষ্যতে নিবৃত্ত করিবেন, আমরা এরূপ আশা করি।

ঝাঁসীর রাজকুমার। উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত আর একখানি ক্ষুদ্র জীবনচরিত মূল্য ।৵০।

এখানি সেই সিপাহী যুদ্ধের রণরঙ্গিনী ঝাঁসীর রাণী মনস্বিনী লক্ষ্মী বাইয়ের দত্তক পুত্র দামোদর রাওয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। হতভাগ্য দামোদররাও এখনও জীবিত। গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহদত্ত ক্ষুদ্রবৃত্তিই এখন তাঁহার উপজীবিকা। তাঁহার জননী যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ইংরেজ সৈনিকগণের নির্ম্মম নারী-বাৎসল্যশূন্য কাপুরুষোচিত অস্ত্রাঘাতে হত হইলে, বালক দামোদররাও কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত গহন বনে পলায়ন করেন। দুই বৎসরকাল নিবিড় দুর্গম পাহাড় জঙ্গলে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতের নিদারুণ প্রকোপের মধ্যে ইংরেজের ভয়ে লুকাইয়া থাকিয়া, তিনি যে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িতে পড়িতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাঁহার এই ক্লেশকাহিনী, তিনি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন ; গ্রন্থকার তাহা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দিয়েছেন। এই ক্ষুদ্র জীবনী ঘটনাবৈচিত্র্যে ও মর্ম্মস্পর্শী রসসঞ্চারণে বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে একখানা বৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্লট নিহিত রহিয়াছে। কোন সুযোগ্য শিল্পীর হাতে পড়িলে, এই উপকরণের দ্বারা একখানি অভিনব মনোহর উপন্যাস রচিত হইতে পারে।

বাজীরাও—ঐ—মূল্য ৸০। যে মহারাষ্ট্র বীরের শৌর্য্যপ্রভাবে একদিন সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইয়াছিল, ভারতের বিজয়লক্ষ্মী একদিন অস্তগামী মোগল-সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া যে পূর্ণ শশধরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মহারাষ্ট্রকুলনায়ক বাজীরাওয়ের ইহা একখানি ক্ষুদ্র জীবনচরিত। ইহা পাঠ করিলে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়। ইংরেজ ঐতিহাসিক-গণের চর্ব্বিত চর্ব্বণ অবলম্বন না করিয়া গ্রন্থকার অনেক প্রাচীন মহারাটী পুঁথি পত্র ঘাঁটিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই মৌলিক গবেষণা বড়ই প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতে আমাদের তাঁহার নিকট বঙ্গভাষায় একখানি মহারাষ্ট্রীয় জাতির ইতিহাসের দাবী রহিল।

শ্রীযুক্ত দেউস্কর মহাশয় শৈশবে তাঁহার মাতৃভাষার স্তন্য পান করিয়া থাকিলেও তিনি বঙ্গভাষারূপ ধাত্রীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত। সুতরাং অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী অপেক্ষাও তিনি যে অধিক উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা লিখিতে পারিবেন, তাহার আশ্চর্য্য

কি? তিনি বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে একজন সুপ্রতিষ্ঠ লেখক, তাঁহার লিপি কৌশলের আর নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক? এই তিনখানি গ্রন্থেরই ভাষা সুমার্জ্জিত, মধুর ও প্রাঞ্জল। তিনি ইতিহাস লিখিয়া থাকিলেও ইহাতে ভাষার বিভীষিকা নাই। আশা করি তাঁহার পুস্তকের সমুচিত আদর হইবে। এই তিনখানি পুস্তকই স্কুলের ছাত্রদিগকে পুরস্কার দেওয়ার উপযুক্ত।

ইব্রাহিম ও অগ্নি-উপাসক।

দিন যায় সপ্তাহ খানেক চলে যায়
অতিথের দেখা নাই অতিথি শালায় ;
ইব্রাহিম মহামতি ভাবিয়া অধীর,
আমার আশ্রমে কেন না আসে ফকীর।

একদিন ঘুরে ফিরে মরুর মাঝারে
সুভদ্র তাপস-বৃদ্ধ সুক্ষণে নেহারে ;
লোলচর্ম্ম, জীর্ণবাস, ঘন কণ্ঠশ্বাস,
ক্লিষ্ট ক্লান্ত শীর্ণকায়, শুভ্র কেশপাশ।

সাধু তারে সম্ভাষিয়ে বহু সমাদরে
আতিথ্য সৎকার তরে নিয়ে যান ঘরে ;
কহিলা বিনয়ে "মোর স্বল্পই সম্বল,
হেথায় যা কিছু আছে তোমারি সকল।
কিছুকাল তাম্বু মাঝে কর হে বিশ্রাম,
ইচ্ছাসুখে খেয়ে পিয়ে লভহ আরাম।"

বাক্যগুলি বৃদ্ধ কাণে যেন সুধা ঝরে,
বিনা বাক্য ব্যয়ে তার আতিথ্য স্বীকারে ;
দাস দাসী পরিজন করে আয়োজন,
বসিবারে দেয় তারে মহার্ঘ্য আসন ;
ভোজগৃহে সারি সারি, অতিথি সহিত
আর যত নিমন্ত্রিত বসে যথারীত।

ভোজনের আগে সবে আল্লা নাম কয়,
হেন কালে বৃদ্ধ খালি মৌনভাবে রয়।
ইব্রাহিম কহে "বৃদ্ধ, এ কি আচরণ ?
যার খাও সে নাম না, কর উচ্চারণ ?"

বৃদ্ধ কহে "উপদেশ দেন গুরুদেব,
সেই মন্ত্রে জপি নাম পূজি অগ্নিদেব।"

শুনিয়া বিষম কষ্ট—ইব্রাহিম খুড়া
বুঝিলেন অগ্নি-উপাসক এই বুড়া।
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বৃদ্ধে করে বহিষ্কার,
কলঙ্ক পরশে পাছে পরশি অঙ্গার।

হইল আকাশ বাণী "ছি ছি ছি কি লাজ
বিজ্ঞ তুমি মূঢ় সম একি তব কাজ?
আমি ত বুড়ারে সহি অশীতি বৎসর,
সহিতে না পার তুমি দুই দণ্ড ভর?
অগ্নি-উপাসকে সেবি হতে পার ক্ষুণ্ণ,
আতিথ্য ধরম কিন্তু রেখো গো অক্ষুণ্ণ।"*

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

* স্যাদি—বোস্তন।

সুন্দরী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যাকাল, উঠানে পট্‌পট্‌ করিয়া বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িতেছে, রায়-গৃহিণী ভাণ্ডারঘরের বারান্দায় কম্বল আসন পাতিয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। ভাণ্ডারঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহারই আলো খোলা দুয়ার ও জানালাপথে আসিয়া বারান্দায় পড়িতেছে, সেই আলোকে রায়-গৃহিণীকে চেনা যাইতেছে মাত্র,—ভাল দেখা যাইতেছে না। তাঁহার অনতিদূরে থাবা পাতিয়া একটি কালো বিড়াল বসিয়া আছে, অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে মৎস্যচিন্তা করিতেছে; রায়-গৃহিণী ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্না। আলো অধিক থাকিলে দেখা যাইত, তাঁহার ওষ্ঠযুগল ঘন ঘন নড়িতেছে; এখন শুধু তাঁহার মুখনির্গত শব্দটা শুনা যাইতেছে মাত্র, স্বর মৃদু ও অনুচ্চ—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

দূরে পদশব্দ শুনা গেল, গৃহিণী কাণ পাতিয়া রহিলেন। শব্দটা নিকটে আসিতে লাগিল; তিনি জানিতে পারিলেন তাঁহার পুত্রের পদশব্দ। সীতারায় সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মা বলিলেন—"সীতু?"

"আমি।"

"ভিজে এলে?"

"না ভিজব কেন, ছাতা সঙ্গে ছিল।"

"কাপড় ভেজে নি ত?"

সীতারায় বসনের প্রান্তভাগ স্থানে স্থানে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পরীক্ষা

করিলেন, শেষে বলিলেন—"ছু চার ফোঁটা জল পড়ে থাকতে পারে, বেশী ভেজেনি।"

মার মন—তাহাতে প্রত্যয় হইল না। বলিলেন—"কাছে সরে এস, দেখি।"

সীতানাথ নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। মাতা তাঁহার বস্ত্রে হাত দিয়া বলিলেন—"ভেজেনি ?—বেশ ভিজেছে! যাও কাপড় ছেড়ে ফেল শিগ্‌গির করে।"

সীতানাথ মাতৃআজ্ঞা পালন করিতে অগ্রসর হইলেন। নিজের ঘরে গিয়া, মাথনাকে তামাক সাজিতে আদেশ করিলেন। মেঝেতে বিছানা পাতা ছিল, বস্ত্র পরিবর্ত্তনান্তরে, তাহার উপর বসিয়া ধূমপানে মনোযোগী হইলেন।

রায়-গৃহিণী হরিনামের ঝুলিটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার আকৃতি দীর্ঘ, স্ত্রীলোকের পক্ষে একটু অধিক দীর্ঘ। সম্প্রতি তীর্থদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, ৺প্রয়াগধামে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন, সেই জন্য এখন তাঁহার চুল ছাঁটা, সাধারণ পুরুষ মানুষের মত। তাঁহার মুখ ও অবয়বে স্ত্রীজাতিসুলভ কোমলতারও যেন অভাব, সেই জন্য কক্ষস্থিত কেরোসিনের বাতির আলোকে তাঁহাকে একটি স্ত্রীবেশী পুরুষের মত দেখাইতেছিল। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছে, কিন্তু এ বয়সের অন্যান্য হিন্দু বিধবার মত ইনিও বেশ "শক্ত" আছেন।

কক্ষে তখন আর কেহ নাই। রায়-গৃহিণী কোনও অনাবশ্যক ভূমিকা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি জন্যে আজ ডেকে পাঠিয়েছিল কান্তি?"

"একটা পরামর্শ করবার জন্যে।"

"কিসের পরামর্শ ?"

"ছেলের বিয়ে!"

"নবুর বিয়ে? মন হয়েছে? তবে যে শুনেছিলাম ছেলে বি এ পাস না কর্‌লে বিয়ে দেবে না?"

"হ্যাঁ, তাই আগে বল্‌ত বটে। এখন মত বদলে গেছে। ছেলেকে আর পড়াবার ইচ্ছে নেই।"

রায়-গৃহিণী গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"বটে!—তা কি পরামর্শ হল? কোথাও থেকে সম্বন্ধ টম্বন্ধ এসেছে না কি?"

সীতানাথ ভাবিয়া ভাবিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন—"না—সম্বন্ধ—ঠিক—নয়। একটা আভাষ মাত্র।"

"কোথা?"

"সূর্য্যপুর। সূর্য্যপুরের জমিদার হরিহর চাটুয্যের মেয়ের সঙ্গে।"

"বটে!"—বলিয়া গৃহিণী নিস্তব্ধ রহিলেন। তাঁহার মুখভাব অত্যন্ত অপ্রসন্ন। সীতানাথ ধূমপান করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে জননী বলিলেন—"তোমার কি মত?"

"আমার মত? আমার মতে কি এসে যাবে?"

"এসে যাবে না?" রায়-গৃহিণীর স্বর কিঞ্চিৎ যেন উত্তেজিত। "এসে যাবে না ত তোমার কাছে পরামর্শ নেবার কি আবিশ্যক ছিল? কার মত নিয়ে নিয়ে কান্তি বাঁড়ুয্যে এত বড়টা হল?"

সীতানাথ উত্তর করিলেন—"আমার আর মতামত কি। আমায় যেতে হবে সূর্য্যপুর কথাবার্ত্তা কইতে।"

শুনিয়া রায়-গৃহিণীর মুখ হইতে অপ্রসন্নতার ভাবটা তিরোহিত হইতে লাগিল। বলিলেন—"তবু ভাল।"

পুত্র বলিলেন—"তবু কি ভাল?"

"কান্তি যে একেবারে সব বন্দোবস্ত করে ফেলেনি, তোমার উপর ভার দিয়েছে, সেই ভাল।"

"কেন, তাতে কি হবে? তোমার মৎলবটা কি?"

একটা কথা আছে, ছেলের মনের ভাব মার কাছে কখনও অবিদিত থাকে না। তাহা সত্য বটে। কিন্তু ছেলে যদি শিশু ও নির্ব্বোধ না হয়, তবে মার মনোভাবও ছেলের কাছে অধিকক্ষণ ঢাকা থাকে না।

"মৎলব কি? আমার ইচ্ছে তোমার মেয়ের সঙ্গে নবগোপালের বিয়ে হয়।"—রায়-গৃহিণীর স্বর দৃঢ়।

সীতানাথ হাসিতে হাসিতে ফু ফু করিয়া ধূমনিঃসরণ করিলেন। বলিলেন—"পাগল হয়েছ মা? সে অসম্ভব!"

"কেন অসম্ভব? এটা কি এমন বড় কথা হল?"

"খুবই বড় কথা। আমি কি দিয়ে হাতির বাচ্চা কিনব? আমার কি আছে?"

"তবে আর তোমাদের ভাব কিসের? বন্ধুত্ব কিসের? অনেক দিন থেকে আমার মনে এটা আছে। তোমার মেয়েও ছোট, আর শুনেছিলাম না কি বি এ না পাস কর্‌লে কান্তি বাঁড়ুয্যে ছেলের বিয়ে দেবে না, তাই এতদিন চুপ করে ছিলাম।"

সীতানাথ মনে মনে ভাবিলেন, "বন্ধু হলে কি হয়? এ কি প্রণয়ের বন্ধুতা? এ স্বার্থের বন্ধুতা। আমি যতক্ষণ কান্তির কাযে লাগব ততক্ষণই আমি কান্তির বন্ধু। আবার কান্তি যতক্ষণ আমার স্বার্থের সুবিধে করে দিতে পারবে, ততক্ষণই সে আমার বন্ধু।—বন্ধুত্ব!" মাকে সুধু বলিলেন "সে আশা ছেড়ে দাও মা।"

মা বলিলেন—"আশা আমি সহজে ছাড়িনে।—কেন? তোমার মাথায় এত বুদ্ধি খেলে, আর এইটে করে তুলতে পারবে না?"

সীতানাথ বলিলেন—"মা, এ কথা কি আমিই ভাবিনি? সে আমিও ভেবেছি। কিন্তু সে আকাশকুসুম মাত্র। কান্তির খাঁই যদি শোন! সে চায় হরিহর চাটুয্যে তার জমিদারীর সুন্দর বনের সমস্ত অংশটা জামাইয়ের নামে লেখাপড়া করে দিক।"

এই কথা শ্রবণমাত্র রায়-গৃহিণীর মুখ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। সীতানাথ বলিলেন—"মা, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? তোমার আসনটা এনে দিই।" মা বলিলেন—"থাক্ থাক্—আমি এই মাটীতেই বস্‌ছি।" বলিয়া মেঝের উপর রায়-গৃহিণী উপবেশন করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—"কবে তোমায় যেতে হবে?"

"এই পাঁচ সাত দশ দিনের মধ্যে।"

রায়-গৃহিণীর মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতার দীপ্তি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বলিলেন—"তা বেশ।"

রায়-গৃহিণী বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বাহিরে অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। উঠিয়া দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিলেন। তাহার পর স্বর নামাইয়া বলিলেন—"তা হলে ভালই হয়েছে। তুমি এক কায কর। যে কদিন আছ, ক্রমাগত কান্তিকে জপাও যেন স্নন্দর বনের ঐ সমস্ত জমিদারীর এক পয়সা কমে কোন মতেই ছেলের বিয়ে দিতে রাজি না হয়। আমি হরিহর চাটুয্যেকে জানি। সে এমন খোকা নয় যে অমনি সাঁ করে অত বড় একটা বিষয় হাতছাড়া করে দেবে।"

"তুমি ত জান মা, হরিহর চাটুয্যের ঐ একমাত্র মেয়ে। ছেলেপিলে নেই—হবারও লক্ষণ নয়। রাজি ত হতেও পারে।"

রুক্ষ স্বরে গৃহিণী বলিলেন—"যদি রাজি হয় তবে তুমি যাচ্চ কি ঘাস কাট্‌তে? এমন ভাবে কথা কইবে যাতে সে কোন মতে রাজি না হয়। আসল কথাটা এই যে এ সম্বন্ধটা তোমায় ভেঙ্গে আসতে হবে। এইটুকু বুদ্ধি খেলাতে পারবে না?"—বলিয়া গৃহিণী বদ্ধ দুয়ারের পানে সসংশয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

সীতারাম নিস্তব্ধভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। জননীর ওষ্ঠ ততক্ষণ নড়িতে লাগিল। ঝুলির মধ্যে মালা খড় খড় করিতে লাগিল। মৃদু মৃদু শব্দ হইতে লাগিল—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

সীতানাথ শেষকালে বলিলেন—"এইটুকু বুদ্ধি খেলাতে পারি। এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেওয়া কিছুই আশ্চর্য্য কথা নয়। কিন্তু তা হলেই যে আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারব, তারও ত স্থিরতা নেই। লাভে থেকে, এটা ঘটাতে পারলে যা পেতাম, তাও যাবে ;—কথামালার কুকুর ও প্রতিবিম্বের দশা হবে।"

"কি পেতে?"

"কান্তি ত বলেছে দু হাজার দেবে ঘটকালি। ওদের কাছ থেকেও কোন্ দু হাজার না আদায় করতে পারব! এই চার হাজার ত এক রকম বাঁধা রয়েছে বলতে গেলে। যদি ভাঙ্গি, তবে যার আশায় ভাঙ্গব তার কিছুই নিশ্চয়তা নেই।"

মা স্থির স্বরে বলিলেন—"তা হোক। অত কাছে নজর কোরো না—দূরে নজর কর। ভাব দিখিন, যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়, তবে সে কত সুখের কথা হবে! তোমার মেয়ে রাজরাণী হবে। সোণায় হীরেয় গা ঢেকে যাবে।—দু হাজার চার হাজার টাকার মায়া কোরো না। চেষ্টা করে দেখ, চেষ্টায় কি না হয়? তুফোন উঠবে ভেবেই নৌকো ডুবিও না।"

মানুষ নিজে যেটা অত্যন্ত অসম্ভব জ্ঞানে মনে স্থান দিতে পারে না, অন্য কেহ যদি জোরের সহিত ঠিক্ সেই জিনিষটাই প্রস্তাব করিয়া বলে "কেন হইবে না?"—তাহা হইলে প্রথমটা সে চম্‌কিয়া উঠে। যদি সে প্রস্তাবটা স্বীয় স্বার্থের একান্ত অনুকূল হয় তবে অনুকূল যুক্তিগুলিই তাহার মনে মৌমাছির মত ভীড় করিয়া আসিতে থাকে। ক্রমে তাহার বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। সীতারায়েরও তাহাই হইতে লাগিল। তখন তিনি কহিলেন—"আচ্ছা মা, তুমি যা বলছ তা ভেবে দেখব।"

সারারাত্রি সীতারায়ের আর নিদ্রা বা অন্য চিন্তা রহিল না। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া মাতাকে সেই ভাণ্ডারঘরের বারান্দায় উপবিষ্ট ও মালাজপে নিযুক্ত দেখিলেন। জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি মস্তকে লইয়া বলিলেন—"মা, তোমার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।"—কেবল এইরূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সীতানাথের মাতৃভক্তির নদীতে প্রবল জোয়ার আসে। মাতা কোনও বাক্যনিঃসরণ না করিয়া, আশীর্ব্বাদ স্বরূপ শুধু তাঁহার হরিনামের মালাটি পুত্রের মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার মালাজপের স্বরটা যেন একটু উত্তেজনা প্রাপ্ত হইল। তাঁহার ওষ্ঠ ঘনকম্পিত হইতে লাগিল—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শেষ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর ঠিক একটি সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। আজ সীতারায় সূর্য্যপুর যাত্রা করিবেন। আজ রায়গৃহিণী অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন এবং বউ-ঝিকে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়াছেন। সূর্য্যপুরে যাইতে হইলে রেলপথে কোনও সুবিধা নাই, নদীপথেও নাই। সমস্ত পথ পালকীতে যাইতে হইবে। আহারাদি সমাপন করিয়া যত সকালে যাত্রা করা যায় ততই ভাল—বউঝিগণ তাহার উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন। পালকীর জন্য আটজন বাহক স্থির হইয়া আছে; তাহারা বলিয়াছিল অত সকালে তাহাদের ভাত হইয়া উঠিবে না—সুতরাং তাহাদের জন্যও রন্ধন এইখানে হইবে। গোশালার নিকট নারিকেলগাছের নিম্নে মাটী খুঁড়িয়া বেহারাদের ভাত ও ডাল রাঁধিবার জন্য প্রকাণ্ড উনান

কাটা হইয়াছে। সহরের পাঠকগণকে হয়ত বলা আবশ্যক যে এই আটজন ছুলিয়া অন্ততঃ চব্বিশজন "বাবু"র উপযুক্ত অন্নব্যঞ্জনাদি ধ্বংস করিতে সুসমর্থ।

গৃহিণী আজ সমস্ত বাড়ীময় কলের পুত্তলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার হস্তে সেই হরিনামের মালা, কিন্তু ঝুলিটী আজ নূতন। এটী তিনি বৃন্দাবন হইতে পাঁচ আনা দিয়া খরিদ করিয়া আনিয়া ছিলেন,—এটি পোষাকী ঝুলি, বিশেষ বিশেষ দিনে ব্যবহার করিয়া থাকেন মাত্র। ঝুলিটি লাল বনাতে নির্ম্মিত। তাহার গাত্র চিত্রযুক্ত। পীতবর্ণ রেশমের সূত্রে কৃষ্ণ ও রাধিকার মূর্ত্তি অঙ্কিত। কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন, শ্রীরাধিকার মুখভাব দেখিলে আর যাহাই মনে হউক, বাঁশীর গানটা যে বিশেষভাবে উপভোগ করিতেছেন এ সন্দেহ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণভাগে আর একটা কি পদার্থ অঙ্কিত রহিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে জানোয়ার বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আসলে উহা একটি কদম্বতরু।

গৃহিণী বউঝিগণকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিয়া সংপ্রতি মাখনা বা মাখন সর্দ্দারের অন্বেষণে ব্যস্ত। ঘটের উপর স্থাপনা করিবার জন্য একটা আম্রশাখা প্রয়োজন, তা সে যেটা আজ দিন বুঝিয়া কোথায় যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। সকলকে তিনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"মাখনাকে দেখেছিস্?" কেহ বলে না যে দেখিয়াছি। বালকবালিকাগণ গৃহের নানা স্থানে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিল। শেষে পাঁচু নামক একটি আট বৎসরের বালক হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া বলিল—"দিদিমা—দিদিমা—মাখনা ঐ—ছাতে—চিলে কোঠার উপর—মাদুর পেতে শুয়ে ঘুমুচ্চে।"

শুনিয়া গৃহিণী জ্বলিয়া উঠিলেন। বাড়ীর তামাম লোক উঠিয়াছে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আটটা বাজিল,—সে নবাবপুত্রের আর নিদ্রাভঙ্গ হয় না! বলিলেন—"হতভাগা হারামজাদা! কাণে গিয়ে কেউ এক ঘটি

জল ঢেলে দেয়, তবে জব্দ হয়।” পাঁচুকে বলিলেন—“যা দিকিন পেঁচো, শিগ্‌গির মাখনকে ডেকে নিয়ে আয়। বল গিন্নিমা ভারি রাগ করেছে।”

পাঁচু কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে ভাবিল, একটা মজা করিতে হইতেছে। ভাবিয়া একটা ঘটির সন্ধান করিয়া এক ঘটি জল লইল। সেই ঘটি দুই হাতে ধরিয়া সিঁড়িতে জল ফেলিতে ফেলিতে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল। নারিকেলগাছের পাতা কাঁপাইয়া ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে। মাখন নিশ্চিন্ত হইয়া দিব্য নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল। পাঁচু তাহার কর্ণরন্ধ্রের অনতিদূরে ঘটি ধরিয়া উপুর করিয়া দিল।

মাখন তড়াক্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। উঠিয়াই ঠাস্ ঠাস্ করিয়া পাঁচুর গণ্ডদেশে কয়েকটা চড় বসাইয়া দিল। পাঁচু ক্রোধে ঘটিটা মাখনের প্রতি ছুড়িয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সিঁড়িতে নামিয়া গেল। তাহার মাতা—সীতানাথের ভগ্নী—রান্না ঘরে বসিয়া ডাল বাছিতেছিলেন—“ওগো মা গো—মেরে ফেলেছে গো” শব্দে পাঁচু তাঁহার গায়ে গিয়া পড়িল, পাত্রস্থিত সমস্ত ডাল ঘরময় ছড়াইয়া গেল।

মার নাম বিনোদিনী, ইনি সীতানাথের বিধবা ভগ্নী। বিনোদিনী বিস্মিত হইয়া “কেন বাবা, কি হয়েছে বাবা” প্রভৃতি বাক্যে পুত্রের অশ্রু মুছাইতে লাগিলেন। পাঁচু বলিল দিদিমার হুকুমে সে ছাদে মাখন সর্দারকে জাগাইতে গিয়াছিল, এই অপরাধে মাখন তাহাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়াছে।

এই শুনিয়া ক্রোধে অভিমানে বিনোদিনী উঠিয়া পড়িলেন। পুত্রকে কোলে লইয়া গৃহিণীর উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। গৃহিণী তখন

বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন এবং পুত্রের গণ্ডযুগলের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন—"অ্যাঁ! এত বড় আস্পর্দ্ধা! ছেলের গায়ে হাত তোলা! মরবার পালক উঠেছে! দিচ্চি দূর করে তাড়িয়ে আজ।—আসুক ড্যাক্‌রা, দেখাচ্ছি।" এই কথা বলিয়া দৌহিত্রের সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, ভিজা কাকটির মত মাখন ধীরে ধীরে আসিতেছে। পাঁচুর ক্রন্দন তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল এবং সে জননীর অঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া চকিতের মধ্যে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

মাখন কাছে আসিলে সকলে দেখিলেন তাহার হাতে একটা ঘটি, বস্ত্র জলসিক্ত, ওষ্ঠ দিয়া রক্তপাত হইতেছে। সে আসিয়াই বলিল—"মা ঠাকরুণ, আমার মাইনে পত্তর চুকিয়ে দাও, আমি চল্লাম।"

সে, সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন—"এমন বদমাইস ছেলেও ত কোথাও দেখিনি!—তা তুই বুড়ো মিনষে, কচি ছেলের গায়ে হাত তুল্লি কি বলে? মেরেছিস্ গালে একবারে পাঁচ পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেছে।"

মাখন বলিল—"আমার মাইনে দাও।" বলিয়া গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পুত্রের যাত্রার সময় এইরূপ একটা গণ্ডগোল দেখিয়া গৃহিণী অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কিন্তু কায আগে, মাখন এখনি চলিয়া গেলে আর ডাল ভাঙ্গিয়া আনে কে। সুতরাং যথাসাধ্য তাহার সান্ত্বনা করিলেন। পাঁচুকে প্রচণ্ড প্রহার করায় মাখনও একটু অপ্রতিভ হইয়াছিল, সুতরাং সে সান্ত্বনা মানিল। গৃহিণী তখন তাহাকে আম্রশাখা আনিতে

পাঁচুর দিদি হরিদাসী বসিয়া কুটনা কুটিতেছিল। হরিদাসীর নিকটে গিয়া মালা হাতে করিয়া গৃহিণী দাঁড়াইলেন। তাহার কুটনার প্রতি নজর করিয়া বলিলেন—"বলি হ্যাঁগা হরিদাসী এইকি তোমার কাযের ছিরি?"

"কেন দিদিমা ?"

"এ কি কুটনো কুটছ না খেলা করছ ?"

"কেন কি হয়েছে ?"

"মাছের ঝোলের আলু কুটছ তা কি অমন ডুমো ডুমো করেই কুটতে হয় ? সিদ্ধ হতে ছজন্ম লেগে যাবে যে !"

হরিদাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"বড় হচ্চে ? আচ্ছা তা ছোট ছোট করে কুটছি।"

অতঃপর গৃহিণী গিয়া পুত্রের ঘুম ভাঙ্গাইলেন। তাঁহাকে সত্বর স্নানাদি সমাপন করিতে উপদেশ দিলেন। বলিলেন—"ভাত হল বলে, খেয়ে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়—রোদ্দুর বেড়ে উঠছে।"

রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিয়া হরিদাসীর আলুর পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"হরিদাসী—তুমি যে অবাক্ করলে বাছা !"

"কেন দিদিমা ?"

"ছোট ছোট করে কুটতে বলেছি বলে কি অমনি একবারে কুচি কুচি করতে হয় ! গলে যে ঘণ্ট হয়ে যাবে, খুঁজে পাওয়া যাবে না !"

হরিদাসী বিরক্তির সহিত বলিল—"চৌচির করছিলাম, তাতে বল্লে ডুমো ডুমো হচ্চে। আটচির করছি তাতে বলছ কুচি কুচি হচ্চে। তবে কি রকম করে কুটব ?"

হরিদাসীর বিরক্তি দেখিয়া গৃহিণী তাহাকে উঠিতে বলিলেন। হরিদাসী বলিল—"আচ্ছা বাবু, আর একটু বড় করছি না হয়।"

গৃহিণীর আজ প্রাতঃকাল হইতে মেজাজটা বড়ই বিগড়িয়া রহিয়াছে। ঝাঁঝিয়া বলিলেন—

"বল্লে কথা শোননা কেন? বলছি পাঁচশোবার করে 'ওঠ'। গ্রাহ্যই নেই। এমন ত একগুঁয়ে মানুষও দেখিনি।"

হরিদাসী তখন বঁটি ছাড়িয়া উঠিল। গৃহিণী মালার থলিটি সন্তর্পণে কুলুঙ্গিতে রাখিয়া কুটনা কুটিতে বসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বেশীদূর অগ্রসর হইতে হইল না। এপ্রকার কার্য্যাদি হইতে তিনি বহুদিনযাবৎ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, অভ্যাস ছিল না। বঁটিতে আঙুল কাটিয়া ফেলিলেন।

বধূ প্রভৃতিরা সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার ক্ষত ভিজে ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া দিল। হরিদাসীর রাজ্য হরিদাসীকে ছাড়িয়া দিয়া, মালা লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

পূজার ঘরের বারান্দায় গিয়া দেখিলেন, একটা আমের ডাল রহিয়াছে। মাখনও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। ডালটি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া, তীব্র দৃষ্টিতে মাখনের প্রতি চাহিলেন। বলিলেন—"মাখনা—"

"কি মা ঠাকরুণ?"

"মাইনে নিস্? না বেগার খাটিস্?"

মাখনের মেজাজটাও আজ বড় মধুর ছিল না। বিরক্ত ভাবে সে বলিল—"কেন? কি হয়েছে?"

"একটা আমের ডাল ভেঙ্গে আনতে বল্লাম—তা এই কি ডালের ছিরি?"

"কেন, কি হয়েছে আমের ডালে?"

"কি হয়েছে আমের ডালে? চোখের মাথা খেয়েছিস? দেখতে পাচ্চিস নে? কতকালকার শুকনো পাতা, পোকায় খেয়েছে—এই ডালে কখনো ঘট হয়?

মাখন বলিল—"গাছে উঠতে হবে কেন? নীচে থেকেই ত কত ডাল নাগাল পাওয়া যায়।"

"হুঁঃ—আমি তা আগেই বুঝতে পেরেছি ডালের চেহারা দেখে। যা, আর একটা ডাল দেখে পেড়ে নিয়ে আয়, গাছের মগডালে উঠে। বেশ কচি কচি পাতা দেখে।"

মাখন বলিতে যাইতেছিল—"কেন মাঠাকরুণ, নেয়ে জল খাবে না কি?" কিন্তু সামলাইয়া লইল বলিল—"আচ্ছা নীচে থেকেই আর একটা ডাল দেখে পেড়ে আনছি। গাছে আর উঠতে পারব না।"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—"কেন? গাছে উঠতে পারবিনি কেন? সোণার অঙ্গে ব্যথা লাগবে? এত নবাব হয়েছিস্?"

"নবাব হয়েছে কে বলছে? কাল বিষ্টি হয়ে গেছে, গাছের ডালে পিছল, শেষে কি চাকরি করতে এসে গাছ থেকে পড়ে প্রাণটা খোয়াব?"

গৃহিণী বলিলেন—"আহাহা! দেখিস্! পিছল হয়েছে বলে বিশ্বে আর ত কেউ মাটীতে পা দিচ্চে না। সবাই বিছানায় গদীর উপর পা তুলে বসে আছে!"

রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে মাখন চলিয়া গেল।

একটু এদিক ওদিক করিয়া গৃহিণী ভাবিলেন রান্নাঘরে গিয়া বধূদিগকে এইবারে একটু শাসন করিয়া আসিবেন। উঠানে তাড়াতাড়ি যাইতে যাইতে পিছলে দড়াম করিয়া পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া উহু উহু শব্দ করিয়া উঠিলেন। বউঝিরা কার্য্য ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। মাখন বাগানে গাছের উপর হইতে উঠান দেখিতে পাইতেছিল, এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া, পাতার মধ্যে বসিয়া, মুখে কাপড় দিয়া সে খুব খানিক হাসিয়া লইল।

[ক্রমশঃ।]

কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা।

কায়স্থ কুলোদ্ভব কবিবর কাশীদাসের কবিত্বশক্তি অথবা জীবন-চরিত বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অমর কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় কাশীদাসের মহাকাব্য মহাভারত বঙ্গ-সমাজ ও বঙ্গ-সাহিত্যের যে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে তাহা বর্ণনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিবার আকাঙ্খা নাই। সংক্ষেপতঃ এ কথা বলা আবশ্যক, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীদাসের মহাভারত বিদ্যমান না থাকিলে বঙ্গদেশ বোধ হয় তিন শত বৎসরের পশ্চাতে এখনও পতিত থাকিত। বাল্মীকির রামায়ণ অথবা বেদব্যাসের মহাভারত সুশিক্ষিত লোকের নিকটে সুপাঠ্য হইলেও কয়জন শিক্ষিত লোক তাহা পাঠ করিয়া থাকেন? কিন্তু কাশীদাসের মহাভারত অথবা কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালার সুশিক্ষিত, শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত নরনারীর প্রত্যেকেরই পক্ষে অতি উপাদেয় ও নিত্যপাঠ্য পুস্তক বলিয়া পরিগণিত। বঙ্গদেশের পুরুষ ও রমণীর চরিত্র-গঠন পক্ষে বাঙ্গালা রামায়ণ ও বাঙ্গালা মহা-ভারত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও সহায়কের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা যতদিন জীবিতা থাকিবে, ততদিন এই দুই মহাকাব্য বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে ঘরে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মপাঠ্য পুস্তক বলিয়া পরিগৃহীত হইতে থাকিবে। কাব্যাংশেও কাশীদাসের মহাভারত বাঙ্গালা সাহিত্যসমাজে অতুল্য ও অমূল্য। জলের মধ্যে যেমন জাহ্নবী, বৃক্ষের মধ্যে যেমন অশ্বত্থ, বেদের মধ্যে যেমন সামবেদ, ঋতুদিগের মধ্যে যেমন কুসুমাকর, বাঙ্গালা কাব্যকারদিগের

তেমনি মহাভারত। বাঙ্গালার লেখকপুঙ্গবপুঞ্জ এবং সাহিত্য-স্যন্দন-সারথীগণ কাব্যকার কাশীদাসকে গৌড়ীয় সাহিত্যপ্রাসাদের উচ্চ সিংহাসনে আরূঢ় করিয়াছেন বটে কিন্তু এতবড় কবির যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহারা যে একটি অযথা কথার কল্পনা করিয়া কাশীদাসের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন তাহারই যথাসাধ্য অপনোদন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বাঙ্গালার অনেক লেখক বলিয়া থাকেন—"কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা ছিল না, তিনি মূল মহাভারতের অনুবাদে অসমর্থ ছিলেন, কেবল কথকের কথকতা শুনিয়া অথবা পাঁচালিকারের পাঁচালি পাঠ করিয়া মহাভারত লিখিয়া গিয়াছেন।" কি আশ্চর্য্য অযথা কথা! কি অসহনীয় অন্যায় দোষারোপ! এতবড় কবি সম্বন্ধে এতবড় অসত্য ও অর্ব্বাচীন অভিমতি প্রকাশ করিতে যাঁহারা সাহসী তাঁহাদের সাহসের প্রশংসা করিবার জন্য কেহ কেহ সম্মত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের অথবা বহুদর্শীতার প্রশংসা করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। এরূপ অন্যায় কথা বালকের মুখে শোভা পাইতে পারে, সাহিত্য ক্ষেত্রের প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর মুখে ইহা কদাচ শোভা পায় না। "কাশীদাস সংস্কৃত জানিতেন না" কেবল এইটুকু বলিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত নহেন, "তিনি পাঁচালি পাঠ করিয়া অথবা কথকতা শুনিয়া মহাভারত লিখিয়াছেন", ইহাও তাঁহাদের অভিমতির অন্যতম অঙ্গ! "লর্ড বেকন লাটিন জানিতেন না", অথবা "রাজা রামমোহন রায় পারস্য জানিতেন না" বলা যেমন অসত্য, অন্যায় ও অযৌক্তিক, কবিবর কাশীদাস সম্বন্ধেও ঐরূপ অভিমতি প্রকাশ করা অতীব অসত্য এবং অতীব অন্যায়। ইহাঁদের এই ধারণা যে ভ্রমাত্মিকা তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। ইহাঁদের এই কুসংস্কারজনিত অভিমতির উর্ম্মিমালায়

এই আন্দোলনের পূর্ব্বে কাশীদাসকে সকলেই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু এই অন্যায় সংস্কারের আন্দোলনে অনেকের মনে অযথা সংশয়ের সৃষ্টি হওয়ায় কাব্যকার কাশীদাসের মর্য্যাদার হানি হইয়াছে। কাশীদাস সম্বন্ধে এই ভ্রমাত্মিকা ধারণার যথাসাধ্য অপনোদন করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত প্রমাণ-পুঞ্জের সহায়তায় পাঠক মহাশয়গণ কবিবর কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট অধিকার ও অভিজ্ঞতার কথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

প্রথম প্রমাণ।

কাশীদাসের পূর্ব্বে দাশরথি রায়, রসিকচন্দ্র রায়, বিদ্যাধন ভট্টাচার্য্য, শেখর সেন, গৌরহরি দাস প্রভৃতি পাঁচালিকারগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে কোনও পাঁচালি ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতে হয় "কাশীদাস কোন্ পাঁচালী পড়িয়া মহাভারত লিখিয়াছিলেন?" ইহার যে সহজ, সরল বা সুস্পষ্ট উত্তর নাই তাহা অনেকেই স্বীকার করিতে বাধ্য। যতদিন পর্য্যন্ত কাশীদাসের পূর্ব্বসাময়িক পাঁচালির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত "কাশীদাস পাঁচালি পড়িয়া মহাভারত লিখিয়াছেন" এ কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। অনেক দিন পূর্ব্বে "কলিকাতা রিভিউ" নামক বিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রে সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল যে "শেখর সেনের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কেহ পাঁচালী লেখেন নাই।" পাঁচালিকার শেখর সেন কাশীদাসের জন্মগ্রহণের প্রায় ৩১ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে কাশীদাসের পাঁচালি পাঠ করিয়া মহাভারত রচনা করার কথাটা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না কি?*

দ্বিতীয় প্রমাণ।

কাশীদাসের পূর্ব্বে বেদব্যাসের মহাভারত ভিন্ন আর কোনও মহাভারত ছিল না। বাঙ্গালা ভাষায় তখন আর কেহ মহাভারত অনুবাদ অথবা প্রণয়ন করেন নাই। কাশীদাসের পূর্ব্বে মহাভারতীয় সাহিত্য বা মহাভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কোনও গ্রন্থ ছিল না। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে কথকের মুখে কাশীদাস মহাভারত শুনিয়াছিলেন, সেই কথক ঠাকুর অবশ্যই কোনও একটা গ্রন্থের আশ্রয় লইয়া কথকতা ব্যবসা চালাইতেন, কিন্তু সে গ্রন্থখানার নাম কি? তাহা অবশ্যই বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে পারে না, কারণ সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারত কিম্বা মহাভারত সম্বন্ধে কোনও পুস্তক ছিল না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কথক ঠাকুর সংস্কৃত মহাভারতের কথকতা করিতেন। সংস্কৃত মহাভারতের কথকতা হইতে পারে, এবং এখনও হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও কথক ঠাকুরকে বাঙ্গালা কবিতা মুখস্থ করিতে হয়, বাঙ্গালা কবিতায় সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ শুনাইতে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হয়; কাশীদাসের পূর্ব্বে এমন কোনও দিগ্‌গজ বাঙ্গালী কথকের নাম শুনা যায় নাই। কথকেরা ছয়মাসকাল একস্থানে বসিয়া বসিয়া, ভাত ডালের ধ্বংস করিতে করিতে, অষ্টাদশ পর্ব্ব সমাযুক্ত প্রকাণ্ড হইতেও প্রকাণ্ডতর সংস্কৃত মহাভারতের লক্ষ লক্ষ শ্লোকের একাদিক্রমে কথকতা করিতেন ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? এরূপ কথকতার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই এবং এরূপ কথকতা এখনও চলেনা এবং চলাও সম্ভবপর নহে। তদ্ভিন্ন এরূপ কথকতার প্রথা ছিলনা এবং এখনও নাই। কিয়দংশ মাত্র চৈত্র মাসে, বৈশাখ

এখন জিজ্ঞাসা করি, সংস্কৃত মহাভারতের লক্ষ লক্ষ শ্লোক কাশীদাস কি কথকতায় শুনিয়াছিলেন? এরূপ কথকতা কখনও হয় নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। রাজাদিগের বাটীতে কখনও কখনও হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কাশীদাস কোনও রাজবাটীতে যান নাই, রাজার আশ্রয় অবলম্বন করেন নাই এবং রাজবাটীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই, তাহার প্রমাণ আছে। কাশীদাসের নিবাস কাটোয়ার নিকট সিঙ্গিগ্রাম, সেখানকার কায়স্থেরা কাশীদাসের বংশধর অথবা রক্ত-সম্পর্কীয় ব্যক্তিবর্গকে "অভোজী" বলিয়া বর্ণনা করেন, এস্থলে "অভোজী" শব্দের অর্থ "যাঁহারা কাহারও বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গমন করেন না এবং জ্ঞাতিভিন্ন কাহারও হাতের তৈয়ারী অন্ন গ্রহণ করেন না।" শুদ্ধাচারী নৈকষ্য (কুলীন) ব্রাহ্মণদিগের "অশূদ্র পরিগ্রাহী" উপাধি সিঙ্গির কায়স্থদিগের "অভোজী" উপাধির তুল্য। সুতরাং জিজ্ঞাসা করি, কাশীদাস কোথায় বা কোন্ ঠাকুরের কথকতা শুনিয়াছিলেন?

তৃতীয় প্রমাণ।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, কথকতা শুনিয়া মহাভারতের রচনা হয় নাই; যদি তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, কাশীদাস কথকতা শুনিতেন, তাহা হইলেও এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে, কেবল কথকতা শুনিয়া কি এত বড় কাব্যের প্রণয়ন সম্ভবপর হইতে পারে? যদি বল, 'সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ হইলে এত অমিল থাকিবে কেন?' ইহার উত্তরে বলা যায়, 'অমিল' কথাটা তোমাদের কল্পনা-ব্যাকরণের শব্দ বিশেষ; 'সংক্ষিপ্ত' কথাটা ব্যবহার করিলেও কতকটা যুক্তিসঙ্গত হইত, কারণ কাশীদাসের মহাভারত সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও

করি; কিন্তু আসল কথায় কোথাও 'অমিল' নাই। তবে কেমন করিয়া বলিতে পার, "কাশীদাসের মহাভারত মূলের আদৌ অনুবাদ নহে?" অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হইলেই কি অসত্য অনুবাদ হয়? অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হইলেই কি বলা যায় যে, অনুবাদক অনুবাদ্য গ্রন্থের মূল ভাষা জানিতেন না? সুপ্রসিদ্ধ ইটালীয় পণ্ডিত বেনিদিক্ত্ (Father Benedict) বহুল লাটিন গ্রন্থের ইটালীভাষায় সংক্ষিপ্তানুবাদ করিয়াছেন; অনেক মহাকাব্যের ঐতিহাসিক বিবরণ সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিয়া মূলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন; অথচ পাদ্রী বেনিদিক্তের মত সে সময়ে লাটীন পণ্ডিত ভূতলে আর দ্বিতীয় ছিল কিনা সন্দেহ। *

চতুর্থ প্রমাণ।

কেরি, মার্শমান, হেন্‌বুশ্, সোয়েঞ্জার প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পাদ্রীরা শ্রীরামপুর হইতে "ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামক সম্বাদপত্র প্রকাশ করিতেন। উক্ত ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়ার পঞ্চম খণ্ডে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সাহেবেরা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সম্পাদক বলেন "কাটোয়ার নিকটে সীতাহাটী গ্রামে কাশীদাস সংস্কৃত পড়িতেন।" ঐ সীতাহাটী গ্রাম এখনও বর্ত্তমান আছে, ইহা গঙ্গাতটে অবস্থিত এবং কাটোয়া থানার অধীন। সম্পাদক আরও লিখিয়াছেন "কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস ইহাঁরা উভয়েই সংস্কৃত জানিতেন। আমরা ইহাঁদের জন্মস্থানে ইহাঁদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহাতে সাহস করিয়া বলা যায়, কাশীদাস ও কৃত্তিবাস এই দুই কবি অত্যন্ত ভাবুক, ভক্ত, ধর্ম্মপরায়ণ এবং পণ্ডিত ছিলেন; হিন্দুর সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাঁদের

* [illegible]

খুব জ্ঞান ছিল এবং কঠিন সংস্কৃত ভাষা ইহঁারা খুব যত্নের সহিত অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিয়াছিলেন।” সে কালের প্রাজ্ঞ ও ধর্ম্মভীরু পাদ্রী মহাশয়েরা বাজে কাজ করিতেন না এবং বাজে কথা কহিতেন না। কাশীদাস সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুসন্ধান ও অভিমতিকে উপেক্ষা করা যায় না।

পঞ্চম প্রমাণ।

কাশীদাসের সময়ে বাঙ্গালাদেশে মুদ্রাযন্ত্র (প্রেস) ছিল না কিন্তু কাগজের প্রচলন ছিল। কাশীদাসের পুঁথি তালপাতা কি ভূর্জ্জপাতায় অতি অল্প সংখ্যায় লিখিত হইয়াছিল, তাঁহার অধিকাংশ পুঁথি (প্রায় শতকরা ৯২ খানা) প্রাচীন কাগজে লিখিত হয়। সে কালে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী “কাগ্‌জী” নামক জাতি বিশেষ কাগজ তৈয়ার করার জন্য প্রখ্যাত ছিল। হুগলী, চুঁচুড়া, পাণ্ডুয়া, মোগলমারী, গড় মান্দারণ প্রভৃতি স্থানের কাগজ পশ্চিম বঙ্গে এবং কিশোরগঞ্জ, সেনহাটী, বাঘের হাট, সুসঙ্গ, সন্দীপ প্রভৃতির কাগজ সে সময়ে পূর্ব্ব বঙ্গে খুব কাটৃতি হইত। কাশীদাসের প্রাচীন পুঁথি সমূহে (কাগজের পুঁথি সমূহে) পুরাতন বাঙ্গালা অক্ষরে স্পষ্ট লেখা আছে “মূল সংস্কৃতের অনুবাদ।” ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঐ গ্রন্থ হস্ত লিখিত হয়, কিন্তু সকলেই লিখিয়াছেন “মূল সংস্কৃতের অনুবাদ।” এই সকল গ্রন্থ অনেক দেশবিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারাও লিখিত হইয়াছিল, তাঁহারাও কি ভ্রান্ত? এই সকল গ্রন্থ একটি আদি গ্রন্থ হইতে নকল করা হয়, ঐ আদি গ্রন্থ কাশীদাসের স্বহস্ত লিখিত, উহাতেও লেখা ছিল “মূল সংস্কৃতের অনুবাদ।” ঐ লেখা দেখিয়া নকল করা হইয়াছিল। কাশীদাস এত বড় ধর্ম্মভীরু কবি হইয়া কি একটা

ভারতকে মূলের অনুবাদ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, তবে সমগ্র দেশের সেকালের লেখক ও পণ্ডিতেরা কি আগাগোড় ভ্রান্ত ছিল? ইংরাজী স্কুলে একটু সংস্কৃত পড়িয়া তোমরা কাশীদাসকে সংস্কৃতাজ্ঞ বলিতে সাহসী হইয়াছে কিন্তু সেকালের মহামহা দিগ্‌গজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও একথা বলিতে সাহসী হয়েন নাই।

ষষ্ঠ প্রমাণ।

আজিকালিকার কয়েকজন বাঙ্গালী লেখক (অন্ততঃ ছয় জন) লিখিয়াছেন কাশীদাস নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি পাঁচালী শুনিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছেন। আমি সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি, কাশীদাস কোথায় এ কথা লিখিয়াছেন? কাশীদাসের মহাভারত ভিন্ন অন্য কাব্য ছিল না ও নাই, তবে কি তিনি তাঁহার মহাভারতে এ কথা লিখিয়াছেন? না, তাহা লেখেন নাই। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা শুনুন—

(স্বর্গারোহণ পর্ব্বের শেষ দেখ)

"সম্পূর্ণ ভারত গ্রন্থ থাকে যার ঘরে।
পাপ, তাপ, ব্যাধি তারে কভু নাহি ধরে॥
শুচি হয়ে শুদ্ধ চিত্তে শুনে যেইজন।
অন্তকালে গোলকেতে দেখে নারায়ণ॥
শোকচ্ছন্দে বিরচিল মহামুণি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ॥"

বলুন দেখি, ইহাতে কি এই বুঝায় যে কাশীদাস পাঁচালী শুনিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন? তিনি লিখিতেছেন 'পাঁচালী প্রবন্ধে

সেই রূপে, সেই ভাবে, সেই ভাষায়” মহাভারত রচনা ও প্রকাশ করিয়াছি। তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—

সুধাপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসাত্মজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরামদাস।
অলি হই কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥

এখানেও সেই কথা; “পাঁচালী শুনিয়া লিখিয়াছি” একথা কোথাও নাই। বনপর্ব্বের ধৃতরাষ্ট্রের খেদ নামক অধ্যায়ে তিনি লিখিতেছেন—

মহাভারতের কথা হইল প্রকাশ।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কয় কাশীরামদাস॥

অনেকস্থানে লেখা আছে “পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভনে”; “গীতছন্দে বিরচিল কাশীরাম দাস” “কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীতে গাথা”; আর একস্থলে দেখ—

অরণ্যপর্ব্বের কথা, অতিসুখ মোক্ষদাতা,
রচিলেন মহামুণি ব্যাস।
রচিল পাঁচালী ছন্দে, মানস আবেশানন্দে,
কৃষ্ণদাসানুজ কাশীদাস॥

আর উদ্ধৃত করিবার স্থান বা সময় নাই, আর উদ্ধৃত করিবার আকাঙ্খাও নাই, কারণ মহাভারতের আগাগোড়া এইরূপ ভণিতায় পরিপূর্ণ। “পাঁচালী শুনিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছি” একথা কোথাও লেখা নাই সুতরাং লেখকদিগের এই ধারণা ভ্রমাত্মিকা। আর এক কথা এই যে, সেক্ষপীয়রের চম্পূকাব্য ও গদ্য পদ্যময় নাটক

সহিত ঠিক সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাহা হইলে মূলের সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হইলেও—এবং তাহা হইবারই কথা—এই অনুবাদকে 'অমিল' এবং 'মূল হইতে স্বতন্ত্র' বলিবার তোমার অধিকার জন্মিতে পারে কি? তুমি কি বলিতে পার, অনুবাদক অমুক বাবু মোটেই ইংরাজী জানেন না? তাহার পরে আর এক কথা এইযে, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার, প্রমাণে লেখা হইয়াছে যে, কাশীদাসের পূর্ব্বে পাঁচালীকার ছিলনা, কিন্তু কাশীদাস পুনঃপুনঃ "পাঁচালী" শব্দের উল্লেখ করিতেছেন এবং পুনঃপুনঃ বলিতেছেন "আমি পাঁচালী ছন্দে রচনা করিয়াছি", তবে পাঁচালী শব্দ কোথা হইতে আসিল? এই কথার একটা মীমাংসা করা আবশ্যক। বাঙ্গালায় "পাঁচালী" এইরূপ বানান করা হয় কিন্তু কথাটা 'পাঁচালী' নহে—পাঁচালি। পশ্চিম বঙ্গে (রাঢ়দেশে) এই কথার উৎপত্তি, পূর্ব্ববঙ্গে উচ্চারণ দোষে সংস্কৃত পঞ্চশব্দ পাশ্ এবং পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ বলিয়া উচ্চারিত হয়। অলিশব্দে ভ্রমর। বাঙ্গালায় বারেয়ারী শব্দ বারোয়ারী বলিয়া উচ্চারিত হয়, বারেয়ারী হিন্দী শব্দ, অর্থ—বারজন ইয়ার বা এয়ার (বন্ধু অথবা গ্রামবাসী) একত্রে মিলিয়া যে উৎসব করে তাহাই। গ্রামের মাতব্বর (প্রধান) পঞ্চজন মনুষ্য মিলিয়া—অর্থাৎ পঞ্চায়ৎ মিলিয়া—যাহা করে তাহা পাঁচালির কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়। হিন্দীভাষায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, পাড়ার প্রধান লোককে "পাড়ার নাক" বলে, কাঠিবাড়ে পাড়ার প্রধান লোককে "পাড়ার চোখ্" বলে; কোচিন রাজ্যে পাড়ার প্রধান লোক "মশুর ডাল' (The Masoor pulse of the village) বলিয়া অভিহিত হয়, আর অতি পুরাকাল হইতে রাঢ়-দেশে গ্রামের প্রধান প্রধান মণ্ডল মাতব্বর লোক ও প্রধানেরা 'অলি' 'ভ্রমর' 'মক্ষিকা' (The Bee of the village) বলিয়া সম্বোধিত

বংশগত উপাধি অলি, ভোমরা ইত্যাদি। কাশীদাসের পূর্ব্বে ও তাঁহার সময়ে বারোয়ারীর লোকেরা পাঁচালি বলিয়া গণ্য হইত। ইহারা ছড়া গাহিত, সং সাজিয়া নাচিত ও তামাসা করিত, তর্জ্জা ও ঝুমুরের মত পয়ারছন্দে গালাগালি, করিত, কিন্তু পাঁচালি গ্রন্থ লেখে নাই অথবা দাশুরায়ের মত পাঁচালি প্রথাও তাহারা জানিত না। পাঁচালি বলিয়া কোনও পুস্তক সে সময়ে ছিল না, তাহাদের অধিকাংশ ছড়া পয়ারে মুখে মুখে বিরচিত হইত, এবং তাহাই গান করা হইত। তখন এইরূপ পাঁচালি ছিল। ক্রমে উহা "পাঁচালী" নামে আখ্যাত হইয়া পুস্তকাকারে আসিয়া পৌঁছিল এবং উহার প্রথা পরিবর্ত্তিত হইল। রাঢ়দেশে এখনও ঐরূপ গাওনা আছে, তাহার নাম এখনও পাঁচালি, তাহাদের পুস্তক নাই, মুখে কেবল কবিতা অভ্যাস করা আছে, কিন্তু তাহাদের রুচি অনেক সময়ে বিকৃত হইলেও রচনা ও ভাষায় তাহাদের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। দাশরথী রায় ইহাদের "ধরণ" অনুকরণ করিয়া পাঁচালী নাম দিয়াছেন, পাঁচালী শব্দ ভাল বাঙ্গালা নহে, ইহা রাঢ়দেশের প্রকৃত "পাঁচালি" শব্দ। ইহারা মহাভারত জানিত না এবং গাহিত না; এখনও গায়না এবং কখনও গায় নাই। কাশীদাস ইহাদের মুখে মহাভারত শুনেন নাই, ইহাদের পয়ার ছন্দে এবং অন্যান্য ছন্দে মহাভারত রচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের ভাষার অনুকরণ করিয়া নিজের মহাভারত মধ্যে সেইরূপ ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্যথা—

(বিরাটপর্ব্বে ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য দেখ।)

প্রণমহ দ্বিজ পদ সরসিজ

সৃজন পালন নাশা।

যে পদ ভজিল   সেই সাধু নীল
তরিল দুঃখ পিপাসা।
অবনি অবধি   যতেক তীর্থাদি
যে পদে সবার বাসা॥
ভবার্ণবাপ্লব   যে পদ পল্লব
লক্ষ্মী বশকারী ধূলি।
আয়ুযশপ্রদ   অজয় সম্পদ
পাইতে যাহারে বুঝি॥

অন্যত্রে—

১। ঘটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা॥
মোহময় সংসার কটাহে কামকর্ত্তা।
ভূতগণ করে পাক এই শুন বার্ত্তা॥

(বনপর্ব্ব)।

২। রবি হেন চক্ষু রাঙ্গা দেখি লাগে ডর।
পাসরিল মুখ খান যেন সরোবর॥
চরণের দপদপি বসুমতি কাঁপে।
সাগর লঙ্ঘিতে যার শক্তি এক লাফে॥

(দ্রোণপর্ব্ব)।

৩। উঠ উঠ মহারাজ,   সকল বিধির কাজ,
সবার মরণ মাত্র গতি।
যে দিন নিয়ত যার   সেই দিন মৃত্যু তার
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি॥
মহা মহা বীর মরে,   নিত্য যায় যম ঘরে,

সকল সংহারে কাল, নাহি তার কালাকাল,
অনুশোচ করহ অন্তর ॥

(নারীপর্ব্ব)

৪। পক্ষহীন পক্ষী যেন রহিল পড়িয়া।
জলহীন মীন যেন মরয়ে পুড়িয়া ॥
পুণ্যহীন দেহ যেন ফলহীন বৃক্ষ।
বিষহীন সর্প যেন ধনহীন লোক ॥

* * * *

একাদশী ব্রত যেই জন না করিবে।
সত্য কহিলাম এই দেশে না থাকিবে ॥
জীব হিংসা না করিবে আমার সংসারে।
এই নিরূপণ আমি কহিনু সবারে ॥

(অশ্বমেধপর্ব্ব)

কাশীদাসের এই ছন্দ ও ভাষা রাঢ়দেশের পুরাতন পাঁচালির (পাঁচালীর নহে) ভাষার অনুকরণ। কাশীদাস রাঢ়দেশের লোক ছিলেন, কারণ সিঙ্গিগ্রাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। তিনি পাঁচালী শুনিয়া মহাভারত লেখেন নাই, পাঁচালির প্রবন্ধের (ভাষার) অনুকরণ করিয়াছেন।

মহাভারতের কথা হইল প্রকাশ।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥*

সপ্তম প্রমাণ।

কাশীদাস নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি সংস্কৃত মহাভারতের— ব্যাসদেবের মহাভারতের—বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন। বনপর্ব্বে তিনি লিখিতেছেন—

বনপর্ব্ব ব্যাস ঋষি করিলা প্রকাশ।
ভাষায় রচিলা তাহা কাশীরাম দাস॥

এখানে ইহার এই অর্থ হয় যে "ব্যাসের বিরচিত বনপর্ব্ব কাশীরাম দাস বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিল।" আদিপর্ব্বের শেষে স্পষ্ট লেখা আছে—

সুধাময় ভারত শ্রীব্যাস বিরচিল।
এত দূরে আদিপর্ব্ব সমাপ্ত হইল॥

সভাপর্ব্বে দেখ—

সভাপর্ব্বে সুধারস রাজসূয় কথা।
কাশীরাম দাস কহে ব্যাসদেবে গাঁথা॥

ভীষ্ম পর্ব্বে দেখ—

ব্যাস বিরচিত গাথা   অপূর্ব্ব ভারত কথা
শ্রুতমাত্র কলুষ বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত   সুজনের মনঃপূত
বিরচিল কাশীরামদাস॥

মুষলপর্ব্বে দেখ—

ভারত মুষলপর্ব্ব ব্যাস বিরচিত।
কাশীরামদাস কহে রচিয়া সঙ্গীত॥

সমগ্র মহাভারতের শেষে, ব্যাসের সমগ্র মহাভারতকে লক্ষ্য করিয়া কাশীরামদাস লিখিয়াছেন—

শ্লোকচ্ছন্দে বিরচিল মহামুণি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ॥

মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
সংক্ষেপে কহিনু কিছু রচিয়া পয়ার।
কাশীরামদাস কহে শুনে সাধু নর॥

আবার দেখ আদি পর্ব্বে—

প্রথমে বন্দিব গুরু ব্যাস মহামুণি।
যাঁহার রচিত গ্রন্থ ভারত কাহিনী॥

এই উক্তিতে কাশীরামদাস বেদব্যাসকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল কবিতা দ্বারা অকাট্য ভাবে দেখান যায়, কাশীদাস মূল মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছেন এবং সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য অনুবাদ সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তিনি যে সংস্কৃত জানিতেন না অথবা সংস্কৃতের অনুবাদ করেন নাই একথা তিনি কোথাও বলেন নাই বরং আপত্তিকারীদিগের অযথা আপত্তিগুলি তাঁহার রচনা দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে।

এই বারে আমি অষ্টম প্রমাণের অবতারণা করিবার আকাঙ্ক্ষা করি।

অষ্টম প্রমাণ।

কাশীদাসের পুঁথি (মহাভারত) সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা বটতলার মোহনচাঁদ শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়। মোহনচাঁদ অপেক্ষা পুরাতন পুস্তক-বিক্রেতা বটতলায় আর কেহ ছিল না, ইনিই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় রীতিমত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ অধরচন্দ্র কর্ম্মকারের পিতামহের জ্যেষ্ঠসহোদর এজন্য বাঙ্গালা অক্ষর (Types) তৈয়ার করেন। ত্রয়োদশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহায্যে ও তত্ত্বাবধানে কাশীদাসের মহাভারত বটতলায় প্রথম ছাপা হয়। গ্রন্থের মলাটে পণ্ডিতেরা লিখিয়াছিলেন

শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

"মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ প্রণীত।"

সংস্কৃত মূল মহাভারত।

যাহা কাটোয়া পরগণার এলাকায়

সিঙ্গিগ্রাম নিবাসী ৺ভগবদ্ভক্ত

কাশীরাম দাস তেঁহ বাঙ্গালায়

পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ করণে

শ্রী শ্রী শ্রীবিষ্ণুপদ সরোজের বিমল

মধু তেঁহ ভৃঙ্গরূপে পান করিয়াছেন ও ভক্তবৃন্দেরে করাইয়াছেন।

আদি, সভা, বন, বিরাট প্রভৃতি অষ্টাদশ

পর্ব্বের অনুবাদ।

পয়ারাদি ছন্দে

৺কাশীরামদাস অনুবাদকারী ও

প্রণয়নকারী।" (ইত্যাদি)।

অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই তেরজন পণ্ডিতের সকলের নাম পাই নাই, কতকগুলির নাম পাইয়াছি, তদ্যথা—কৈলাসনাথ তত্ত্বনিধি সাং চাতরা (শ্রীরামপুর); যদুনাথ ভট্টাচার্য্য সাং অধিকারীপাড়া (অম্বিকা কালনা গ্রাম); হরবল্লভ বিদ্যানিধি সাং সোণাকাটি, পরগণা হাঁসদহ; এবং কেনারাম শিরোমণি সাং গড়মান্দারণ পরগণা জাহানাবাদ যাহা হউক এই সকল পণ্ডিত সে সময়ে যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের কার্য্য দৃষ্টি করিলেই স্পষ্ট বোধ করা যায়। ইহাঁরা কাশীরামদাসকে মূলের অনুবাদক বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়া গিয়াছেন। এই তেরজন দিগ্‌গজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকের সার্টিফিকেট্‌খানা কি সহজে উপেক্ষা করা যাইতে পারে?

নবম প্রমাণ।

কাশীদাসের অনেক পরে বর্দ্ধমানের মহারাজা শ্রদ্ধেয় মহাতাপ বাহাদুরের এবং কলিকাতার খ্যাতনামা জমিদার বাবু কালী প্রসন্ন সিংহের যত্নে, ব্যয়ে ও উৎসাহে বহুসংখ্যক দেশমান্য সুপণ্ডিতের দ্বারা সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন মানকর নিবাসী প্রতাপচন্দ্র রায় অন্যের দ্বারা মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন, ইহাঁদের কেহই—বিশেষতঃ সভাসদ পণ্ডিতগণ—"কাশীদাসের সংস্কৃতে অজ্ঞতা" সম্বন্ধে অভিমতি দেন নাই। বরং মহাতাপচাঁদ বাহাদুর স্পষ্টই বলিয়াছেন "কাশীদাস যে সংস্কৃত জানিতেন না ইহা বালকের কথা। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে তিনি খুব সংস্কৃত জানিতেন, আমার বহুসংখ্যক পণ্ডিত মহাশয়দিগেরও এই মত।" মহারাজা মহাতাপচাঁদের ভাগলপুরে মৃত্যু হয়, মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে বহরমপুরের জনৈক দেশপ্রসিদ্ধ হিন্দু জমিদারকে তিনি বলিয়াছিলেন "যদি ভাল বাঙ্গালা শিখিতে চাও তবে কাশীদাসী মহাভারত পাঠ কর। কাশীদাসের বাঙ্গালা সংস্কৃতের খুব নিকটে নিকটে পৌছিয়াছে, ইহা সংস্কৃত-অভিজ্ঞ বহুদর্শী পণ্ডিতের মহাকাব্য।" মহারাজা মহাতাপ চাঁদের বহুদর্শনজনিত এই অভিমতি সহজে খণ্ডন করা বা উপেক্ষা করা যায় না। পণ্ডিতদিগের মতই বা কেমন করিয়া উপেক্ষা করিবে?

দশম প্রমাণ।

(সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।)

কায়স্থ-কুলোদ্ভব কবিবর কাশীদাস যে সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট অধিকার ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ—তাঁহার নিজের মহাভারত। কাশীদাসের মহাভারত কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতার অমর সাক্ষী। যাঁহারা তাঁহার মহাভারত মনোনিবেশ সহকারে আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অর্থ বুঝিয়াছেন

এবং মূল সংস্কৃত মহাভারতের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে নিরপেক্ষ ভাবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, কাশীদাস কায়স্থ হইয়াও ব্রাহ্মণাধ্যাপকের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় প্রচুর দখল রাখিতেন। নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে কাশীদাসের সংস্কৃত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

(ক) বেদব্যাসের সকল পর্ব্বই কাশীদাস উল্লেখ করিয়া মূলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সংক্ষিপ্তভাবে, বিবিধছন্দে, অনুবাদ করিয়াছেন। "আদি" হইতে "স্বর্গারেহণ" পর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল পর্ব্বেরই সংক্ষিপ্ত সারতত্ত্ব কাশীদাসে পাঠ করিতে পাই।

(খ) ব্যাসের মহাভারতের পর্ব্বান্তর্গত অধ্যায় সমূহে যে সকল স্থানে প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তত্ত্ব বা প্রয়োজনীয় বিষয়ের বর্ণনা আছে বিশেষতঃ ভক্তি, যোগ, মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্বন্ধে যে যে স্থলে বর্ণনা আছে, কাশীদাসের গ্রন্থে তাহার একটিও বাদ যায় নাই। (গ্রন্থ পাঠ করিয়া ও মিলাইয়া দেখুন। প্রমাণের জন্য পুস্তকের কবিতা উদ্ধৃত করিতে গেলে একখানা বিস্তৃত পুস্তক লিখিতে হয়, সুতরাং উদ্ধৃত করিলাম না।)

(গ) নদনদী সাগর সরোবর নগর পল্লীপর্ব্বত অরণ্য প্রান্তর মরুভূমি ইত্যাদির বর্ণনা যাহা বেদব্যাসের ভারতে আছে, কাশীদাসে তাহার প্রয়োজনীয় অংশের উহ্য নাই। অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনাও বিষয় পর্য্যন্ত কাশীদাসে খুঁজিলে পাইবেন। সংস্কৃত না জানিলে, কেবল কথকতা শুনিয়া বা পাঁচালী শুনিয়া কি এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মিল থাকা সম্ভবপর? এবং এত বড় কাব্য লেখা সম্ভব? বেদব্যাসের মহাভারতে কোন্ পর্ব্বে কত শ্লোক আছে কাশীদাস তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন।

(বনপর্ব্ব)

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং॥

(মূল মহাভারত)

প্রতিদিন জীবজন্তু যায় যম ঘরে।
শেষ থাকে যারা তারা ইহা মনে করে॥
আপনারা চিরজীবী হইব ক্ষয়।
অতঃপর কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয়॥

আরও দেখ—

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চমোদতেত।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলংপিব॥

(মূল)

কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে।
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারী।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥• (কাশীদাস)॥

উদ্যোগপর্ব্বে মূল মহাভারতের সংস্কৃত শ্লোক কাশীদাসের মহাভারতে উদ্ধৃত আছে। ঐ পর্ব্বে বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন উপলক্ষে অবতারদিগের সংস্কৃত ভাষায় স্তব আছে। শান্তিপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের স্তবে কেবল সংস্কৃত ভাষায় স্তোত্র পড়ুন। এই সকল স্তব ও স্তোত্র কাশীদাসের নিজের, মূল হইতে উদ্ধৃত নহে।

(ঙ) কাশীদাসের মহাভারতের অনেক স্থানের ভাষা ও রচনা পাঠ করিলে তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আদৌ সন্দেহ থাকে না। অসংখ্য স্থান হইতে অসংখ্য কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে

১। দেখ দ্বিজ, মনসিজ, জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র, যুগ্মনেত্র, পরশয়ে অতি॥

২। আমার লপিতে দাও কুন্তীর নন্দন।
মৎস্যরাজে পুত্রোপরে করহ অর্পণ॥

৩। ঈশাক্ষের উশার্ব্বুদে মারা গেল মার।
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার॥

৪। মুষল মুদ্গর শূল ঈষু চক্র শেল।
পরশু পট্টিশ জাঠি ভগ্ন কুন্ত মেল॥

৫। দন্তপাটি বিনা কাঠি জিহ্বা লহ লহ।
দীর্ঘ কর্ণ রক্তবর্ণ চক্ষু কূপ গৃহ॥
কৃষ্ণ অঙ্গ অতি ব্যঙ্গ শিরা দীর্ঘতর।
সেই কালে ছিল সেই মহীর উপর॥

৬। কলঙ্কবিহীন কালানিধি মুখ আভা।
বিহঙ্গম চঞ্চু জিনি বিরাজিত নাসা॥
দশন মুকুতাপাতি সুমধুর ভাষা॥
কামের কামুক জিনি তার যুগ্ম ভুরু।
মৃণাল জিনিয়া বাহু রামরম্ভা উরু॥

৭। অনুরুচি নীলাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
ঘোরতর তিমির বিনাশ।
ভীম পার্থ অনুব্রজী, গোবিন্দে ষড়ঙ্গে পূজি,
লইয়া গেলেন নিজ বাস॥

৮। হংসে পদ্মাসন, বৃষে পঞ্চানন,
পার্ব্বতী কেশরী যানে।
দেব জলেশ্বর, আইল সত্বর,
চড়িয়া নিজ বাহনে॥

হরিণে পবন, নর বৈশ্রবণ
মূষিকেতে গজানন।
হইয়া কৌতুকি, চাহি মত্ত শিখি,
আইলেক ষড়ানন॥
শমন মহিষে, পবন হরিষে,
আইল দেখিতে রণ।
অষ্টলোকপাল, সজ্জা করি ভাল,
করিলেন আগমন॥
দিবা নিশাপতি রমণী সংহতি,
করি রথে আরোহণ
যত সিদ্ধগণ, না যায় গণন,
আইল যুদ্ধ সদন॥

৯। বাজি যোজকাস্তদয়াশ্রয়াঃ সারথী মহাবলী।
সুরোপমব্রবীহি প্রসমীক্ষিতং রণস্থলী॥

সংস্কৃতে অধিকার না থাকিলে এরূপ রচনা লেখনী হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না; হওয়া খুব কঠিন; কেবল কঠিন নহে, অসম্ভব।

(চ) বেদব্যাসের অনেকগুলি সর্ব্বজন সমাদৃত প্রবাদ কবিতা কাশীদাসের মহাভারতে অবিকল অনুবাদ আছে। (উদ্যোগপর্ব্ব দেখ)। একটির অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম—

জলহীন নদী যেন নহে সুশোভন।
ফলহীন বৃক্ষ যেন অতি কুলক্ষণ॥
চন্দ্র বিনা রাত্রি যেন সব অন্ধকার।
গায়ত্রী বিহনে যেন ব্রাহ্মণ কুমার॥
ধনহীন গৃহী যেন ধর্ম্মহীন নর।
বেদহীন বিপ্র যেন পদ্মহীন সর॥

পিতৃহীন পুত্র তথা শোভা নাহি পায়।
সে কারণে কহ মাতা জিজ্ঞাসি তোমায়॥

(ছ) কাশীদাস প্রত্যেক পর্ব্বের প্রথমেই "নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং" ইত্যাদি শ্লোক ঠিক মূল মহাভারতের মত রাখিয়া তাহার পর অনুবাদ করিয়াছেন ; বেদব্যাসের

"তেষাং সমিধ্যতানগ্নীন্মন্ত্রবচ্চ জুহাব সঃ।"
এবং "অগ্নিন্ প্রদক্ষিণী ব্রাহ্মণাংশ্চ তপোধনান্।
যাজ্ঞসেনাং পুরস্কৃত্য ষড়েবাথ প্রবব্রজঃ॥
এবং "উৎপথে হি বনে জাতা মৃগব্যাল নিষেবিতে।
সমীপে চ শ্মশানস্থ গহনস্থ বিশেষতঃ॥"

প্রভৃতি প্রখ্যাতি ও প্রিয়তর শ্লোক, কাশীদাসেরও নিকটে খুব প্রিয় ছিল, তিনি ইহাদের অনুবাদ দিয়াছেন। (বনপর্ব্ব দেখুন)।

(জ) এইবারে এক আশ্চর্য্য অনুবাদ পড়ুন। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা স্থলে বেদব্যাসবর্ণিত বীর, রাজা, রথী, রথ, অস্ত্র, শস্ত্র, বাণ প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে কাশীরামদাস কেমন সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন দেখুন। প্রথমে মূল হইতে উদ্ধৃত করিব।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্॥
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥
দুইদল মধ্যে রথ রাখহ ক্ষণেক।
যতেক বিপক্ষ পক্ষ দেখিব প্রত্যেক॥
কাহার সহিত রণ হইবে প্রথম।
কাহে কাহে যুদ্ধ হবে কেবা কার সম॥
দুই দল মধ্যে রথ রাখিলেন হরি।
একে একে ধনঞ্জয় দেখেন বিচারি॥

যাহা দেখিলেন, মূলে ও অনুবাদে তাহা অক্ষরে অক্ষরে মিল আছে। মূলে ও অনুবাদে রাজা বীর, সারথী, অস্ত্র প্রভৃতির নাম অক্ষরে অক্ষরে মিল আছে।

(অনুবাদ দেখ)

শরীর লোমাঞ্চযুক্ত কম্পে ঘনে ঘন।
হস্ত হৈতে খসিয়া পড়িল শরাসন॥
সকরুণে কৃষ্ণেরে কহেন ধনঞ্জয়।
নিজ পরিবারে বধ উচিত না হয়॥

(ইত্যাদি)।

(মূল দেখ)।

দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্চৈব পরিদহ্যতে।

অতি সামান্য সামান্য ঘটনার বিবরণেও মূলের সহিত অনুবাদের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য আছে। আর প্রমাণ দিব না; সময় ও স্থান নাই, প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, নতুবা এক সহস্রাধিক স্থল হইতে আরও দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিতে পারিতাম। এখন বল দেখি, কাশীরাম দাস সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন কি না? তাঁহার 'অমৃত সমান মহাভারত' পাঠ করিয়া এবং 'পুণ্যবানেরা শ্রবণ' করিয়া তাঁহার সংস্কৃতে অধিকার ও অভিজ্ঞতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। গদাপর্ব্বের দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ অধ্যায়ে কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন—

ব্যাসের বচন ভাবি অনুক্ষণ
পাঁচালী কৈল রচন।
গদাপর্ব্ব বাণী অপূর্ব্ব কাহিনী
কাশীদাসের কথন॥

বাস্তবিকই তিনি ব্যাসের মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া এবং ব্যাসের বচন (মূল মহাভারত) অবলম্বন করিয়াই এই অপূর্ব্ব বাঙ্গালা মহাভারত প্রণয়ন ও প্রচার দ্বারা বঙ্গদেশ, বঙ্গসমাজ, বাঙ্গালীজাতি এবং বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। কাশীদাসের স্বহস্তলিখিত অথবা তাঁহার সমসাময়িক অনেক পুঁথিতে কাশীরামদাস, সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে সংস্কৃত স্তোত্র উদ্ধৃত করিয়া বেদ-ব্যাসের স্তুতি করিয়াছেন।

"নমোস্তু তে ব্যাসবিশালবুদ্ধে! ফুল্লারবিন্দায়ত পদ্মনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারতৈতৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥"

কাশীদাসের গ্রন্থে কাশীরামদাস লিখিয়াছেন—

গান্ধী গঙ্গা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী॥
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থ জ্ঞানমঞ্জরী॥

এই রচনা সম্পূর্ণ সংস্কৃত। যাহার সংস্কৃতে অধিকার নাই সে ব্যক্তি এরূপ রচনা করিতে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কাশীরামদাসের মহাভারত মধ্যে এরূপ কবিতা বহুলপরিমাণে দৃষ্ট হয়। ফলতঃ কাশীরাম দাসের ন্যায় ভগবৎভক্ত মহাপুরুষের মর্য্যাদা হানি অথবা তাঁহার কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া কেহ আনন্দ বা পুণ্য সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়েন না, বরং এই মহানুভবের অমৃত সমান মহাভারত মহাকাব্য পাঠ করিয়া এবং কবিবরের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, কবিত্বশক্তি ও ভগবৎভক্তির অনুকরণ করিয়া পুণ্যাত্মা হইতে পারেন।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষণে

হিন্দুজাতির লাভালাভ।

জড়জগতে এবং মানসিকজগতে মানবের উন্নতির যে চেষ্টা তাহারই সাধারণ নাম সভ্যতা। এই উন্নতিলাভ চেষ্টায় যে জাতি যত সফল-কাম সে জাতি জগতে তত সভ্য বলিয়া পরিচিত। ইউরোপীয়গণ কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন করিয়া আপনাদের সামাজিক ও মানসিক নানাবিধ উন্নতি লাভ করিয়াছেন; ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যগণও নানারূপ পন্থানুসরণ করিয়া আপনাদের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। দেশ, কাল, অবস্থা ভেদে উন্নতির আদর্শ ভিন্ন হইলে সভ্যতার নিয়মপ্রণালীও ভিন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতার যাহা আদর্শ, হিন্দুদের তাহা আদর্শ নহে, অন্ততঃ সম্পূর্ণ ভাবে সে আদর্শ নহে ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। ইউরোপীয় ও হিন্দু সভ্যতার আদর্শের সংঘর্ষণে বর্ত্তমান হিন্দুজাতির কি লাভালাভ তাহাই উপস্থিত প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। দুই সভ্যতার সংঘর্ষণে আমাদের কি লাভ তাহাই আমরা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিব, তৎপরে ক্ষতি কি তাহাও দেখাইব।

লাভ।

১। হিন্দু ও ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শের বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই ইউরোপীয় সভ্যতার গতি বহির্মুখী আর হিন্দুসভ্যতার গতি অন্তর্মুখী। ইউরোপীয়গণ বাহ্যিক উন্নতিকল্পে যতটা ঝোঁক দিয়াছেন আভ্যন্তরিক উন্নতি কল্পে ততটা চেষ্টা করেন নাই। ইউরোপীয়

কোন্ সভ্যতার আদর্শ অপেক্ষাকৃত ভাল, তাহার বিচার করিতেছি না, কিন্তু জড়জগৎ বশ ও আত্মবশ উভয়ই যে মানবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপ জড়জগৎ বশে আনিবার জন্য হইয়া প্রকৃতির নানাবিধ নিয়ম ও গূঢ়তত্ত্ব এত দূর আয়ত্ত করিয়াছে ও করিতেছে যে তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে যাহা কল্পনা মাত্র বিবেচিত হইত, তাহা এখন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বলে সম্ভবপর ও প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। "সাধনায় সিদ্ধি হয়" এই মূল সূত্র অবলম্বনে ইউরোপ তাহার জড়প্রকৃতি বশে আনিবার শত সাধনায় বহুল পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছে। তাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিতুষ্ট হইয়া প্রকৃতি আপনার অনেক গোপনতত্ত্ব তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। বাহিক সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যে ইউরোপীয়গণের সমকক্ষ অন্য জাতি আর ভূপৃষ্ঠে নাই, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতে পঞ্চভৌতিক দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রামাদি লইয়া থাকিতে হইলে জড়প্রকৃতির উপর একটু প্রভুত্ব থাকা চাই। এই ভীষণ জীবনসংগ্রামের দিনে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য সম্বন্ধেও একটু প্রতিযোগিতাও যে না চাহি এমন নহে। হিন্দুসভ্যতা এতকাল এই জড়প্রকৃতিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা ও অবহেলার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। সংসার কিছু নহে, পৃথিবী কিছু নহে, সকলই অবিদ্যা ও মায়ার খেলা সুতরাং উহার গূঢ়তত্ত্ব বিশেষ কিছু যেন না জানিলেও চলে, এই ভাবটি জাতীয় জীবনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই এ পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় লোকে জড়প্রকৃতিকে বশে আনিয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লইতে বিশেষ চেষ্টা করে নাই। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া, হিন্দুসভ্যতার এই ত্রুটি, জড়প্রকৃতির উপর এই অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের ভাব, ক্রমে কাটিতেছে এবং দিন দিনই

্ম অংশও আমরা চাষ করি নাই। এ ক্ষেত্রে আমাদের । করিবার আছে, বহু কার্য্য করিবার আছে, অনেক সাধনা রহিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের অন্তরে দিন দিন জড়জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান-পিপাসা বৃদ্ধি করিতেছে এবং তাহারই ফলে বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু নানা আবিষ্কার দ্বারায় ইউরোপকেও চমৎকৃত করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। জড়প্রকৃতির নিয়মাবলী অবগত হইয়া তাহাকে সেবাদাসীর মত করিবার চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিতে আমাদের যে আগ্রহ জন্মিয়াছে, আমরা যে বুঝিতে পারিয়াছি যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিতে হইলে জড়বিজ্ঞানেও উন্নত হইতে হইবে ইহাই পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বা সংঘর্ষণে প্রথম লাভ।

২। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যে সমুদয় উন্নতি স্রোতে অন্যান্য দেশকে উন্নততর পথে অগ্রসর করিয়াছে এখানেও তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। যে সমুদয় রত্ন সাহিত্যজগতে আছে তাহা সর্ব্বশ্রেণীতে সমভাবে প্রচারিত হইবার সুযোগ ও সুবিধা এখন উপস্থিত। এখন দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ আপনাদের চিন্তাশীলতা, আপনাদের জ্ঞান, আপনাদের গবেষণা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচারিত করিয়া দেশের চিন্তাস্রোত ও শিক্ষাস্রোত অভীষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিয়া প্রকৃতিদত্ত গুণে দেশের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিতেছেন। এক উদ্দেশ্যে, একপ্রাণে, এক সত্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা এখন ধাবিত হইলে সংবাদপত্র, মাসিকপত্র, এবং গ্রন্থাদির প্রকাশদ্বারা হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং চট্টগ্রাম হইতে কচ্ছপ্রদেশ

হইতে চলিয়াছে। স্বাধীনচিন্তাশীলতা, ও স্বাবলম্বনের রাজবর্ত্ম প্রসারিত হইয়াছে। বহুকাল যাবৎ এতদ্দেশীয় জ্ঞানরাজ্যের চারিপাশে একটি গণ্ডী ছিল, সর্ব্বসাধারণের তথায় প্রবেশের অধিকার ছিল না, জ্ঞানরাজ্যে স্রোতেরও একান্ত অভাব ছিল, ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষে সে গণ্ডী আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞানরাজ্যে বিপুল বন্যার আবির্ভাব হইয়াছে। এই প্রবল কুসংস্কার-দলন-স্রোত-সংঘাতে বহুকালসঞ্চিত জঞ্জালের সহিত অনেক মণিমাণিক্য ভাসিয়া গেলেও, জীবনের সূত্রপাত দেখিয়া আনন্দ ও আশার সঞ্চার হয়।

দেশের শিক্ষাস্রোত এখন কেবল দেশকেই অবলম্বন করিয়া নাই, ইহা ভারতবর্ষের বাহিরের অনেক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রস্রবণ হইতেও এখন পরিপুষ্ট হইতেছে। ভারতীয় ও ইউরোপীয় এই উভয় শিক্ষার প্রচলনে, কোন্ শিক্ষা কিসে কতটা ভাল তাহা তুলনা করিবার সুবিধা এখন উপস্থিত, সুতরাং জ্ঞানালোক-উদ্ভাসিতচক্ষে আমাদের নিজেদের প্রকৃত মূল্য কি তাহা আমরা ক্রমেই বুঝিতে সক্ষম হইতেছি। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের সঙ্গে আমাদের কূপমণ্ডুকের আত্মম্ভরিতা টুটিয়া যাইতেছে, এক কথায় বলিতে গেলে অন্ধতমসাচ্ছন্ন বর্ব্বরতা ও অজ্ঞতাময় মধ্যযুগের শেষ হইয়াছে।

এখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের মিশ্রণে, ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যে নবীন সাহিত্যের সৃষ্টিপাত হইয়াছে তাহা আমাদিগকে দিনদিনই উন্নততর করিবে বলিয়া আমার ধারণা। এই নব শক্তি ও নব সুষমাসম্পদসম্পন্ন সাহিত্যের বিকাশ প্রতীচ্য সভ্যতার শিক্ষা সংঘর্ষের ফল। ইহাই আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের উপযোগী দ্বিতীয় লাভ।

৩। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এক মহান্

করিতেছি ইহাই প্রাচ্য প্রতীচ্যের সভ্যতাসংঘর্ষের তৃতীয় লাভ। এই ভাব এই আদর্শ আমাদের পুরাতন সভ্যতার আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও নূতন। পূর্ব্বে এদেশে "রাজ্য" বলিলে রাজার সম্পত্তি বুঝাইত, দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বুঝাইত না। রাজা কোন যুদ্ধে হত হইলে সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া বিজয়ীর বশ্যতা স্বীকার করিত, স্বদেশেরও যে একটা স্বাধীনতা আছে তাহা তাহাদের মনে উদয়ই হইত না। সমস্ত বসুধা কুটুম্বিতার সূত্রে সম্বদ্ধ হইলে, কেহ কাহারও স্বার্থে, উন্নতির পথে বাধা প্রদান না করিলে এই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ভাব না হইলেও চলিতে পারে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতা এবং একজাতির সহিত অন্যজাতির বিপুল স্বার্থসংঘর্ষের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে সে পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অকর্ত্তব্য বলিতে পারি না। বহুদিন যাবৎ পরপদলেহনে নিজেদের শাসন ও রক্ষণে নিজেদের কোন ক্ষমতা না থাকায়, বর্ত্তমানে আমাদের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা হইতেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আবশ্যক আছে কিনা, স্বায়ত্বশাসন ও স্বাবলম্বনের উপযোগিতা আছে কিনা, তাহা বুদ্ধিমানমাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শ হইতে আমরা এই রাষ্ট্রীয় ভাবে শিক্ষিত হইতেছি, এবং তাহারই ফলে মহারাষ্ট্রে, মান্দ্রাজে, গুজরাটে, পাঞ্জাবে, রাজপুতনায়, অযোধ্যায়, বিহারে, বঙ্গে একটি ভ্রাতৃভাব অনুভূত হইতেছে। একের আনন্দে আমরা আনন্দ এবং একের দুঃখে আমরা সমবেদনা বোধ করিতেছি। আমাদের মধ্যে যেন এখন একটা জীবন সঞ্চার হইয়াছে, আমরা যে অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ তাহা যেন কতকটা টের পাইয়াছি। তাই আমরা অধুনা এই বৃহৎ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ যাহাতে একীভূত হইয়া সমবেতশক্তি লাভে সমর্থ হয়, যাহাতে অন্যান্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারে তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া

পড়িয়াছি। এই ভাবজনিত ফল ও তাহার বহিঃপ্রকাশ জাতীয় মহাসমিতি। ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া এই যে মহা ফলটি উৎপন্ন হইয়াছে, আশা করি ইহা আমাদিগকে দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর একপ্রাণতায় সঞ্জীবিত করিয়া স্থিরভাবে কর্ত্তব্যের পথে লইয়া যাইবে।

৪। ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষে সংস্কৃত শাস্ত্ররূপ লুপ্তরত্নের উদ্ধার হইতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী আপনাদের অনন্ত জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য সংস্কৃত সাহিত্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, আর আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অতীত স্মৃতি ও গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য, পুরাতনের ভিত্তির উপর নববিধি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংস্কৃত শাস্ত্রানুশীলনে আগ্রহশীল। এই উভয়বিধ চেষ্টার ফলে, বিশেষতঃ ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর উদ্যম ও যত্নে আমাদের শাস্ত্রসমূহ ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে এবং জগতের চিন্তাস্রোতে হিন্দুদের প্রভুত্ব কত, কোন্ যুগে, কোন্ নূতনতত্ত্ব কোন্ নূতন প্রণালী হিন্দুমস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়া অন্যান্য সভ্যজাতির ভিতর দিয়া পুরাতন পৃথিবীর সর্ব্বস্থলে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার তথ্য সমুদয় প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। যদিও আধুনিক হিন্দু পুরাতন হিন্দু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, যদিও আমরা আমাদের পূর্ব্বতন আর্য্যগণের বিশুদ্ধ বংশধর কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অনেক কারণ আছে, তবুও ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের কোন কীর্ত্তি কাহিনী শ্রবণ করিলে, অবনতির গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত থাকিয়াও আমরা আশায় উৎফুল্ল হই; আমরাও ভাবিয়া থাকি কোন না কোন দিন আমরা উন্নত হইব। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নানারূপ মহতী সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাদের অনুপযুক্ত অধম সন্তানগণের ধরাবক্ষে অন্ততঃ তিষ্ঠিয়া থাকিবারও যে শক্তিটুকু আছে এরূপ মনে ভাবা বোধ হয় অন্যায় হয় না। এই আশা এই ভাবী-উন্নতির কল্পনাও শুভলক্ষণ, ইহা নব জীবনের নব উদ্যমের পূর্ব্ব সূচনা মাত্র।

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতি, আমাদের পূর্ব্বপ্রচলিত শাস্ত্রাদি দেখিয়া তাহার ভুয়সী প্রশংসা করিতেছেন, সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া আমরা যে অন্ধতাশূন্য হইয়া প্রকৃত আত্মমর্য্যাদা কি, তাহা বুঝিতেছি এবং তাহারই দৃঢ় ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে চেষ্টা করিতেছি ইহা বিপুল লাভের কথা।

৫। হিন্দুগণ জড়জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার আদর্শ দ্বারা চালিত না হইয়া আত্মবশ বা আত্মজয় করিতে সচেষ্ট ছিলেন, আমরা ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই আত্মবশের আদর্শ হইতে তাঁহারা মানসিক উন্নতির এমন একটি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এমন একটি ধর্ম্মভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, তাহা এই প্রতিযোগিতা ও জড়বাদের রাজত্বের দিনে মহা দুর্লভ বস্তু। ইউরোপ বাহ্যসম্পদে মহা ধনী হইলেও এই ধর্ম্মভাবসম্পন্ন অধ্যাত্মজগতে বড়ই দরিদ্র। বহির্মুখী প্রতিভা ইউরোপে যথেষ্ট বিকশিত হইয়াছে সত্য, এবং তাহারই বলে তাঁহারা বিজ্ঞান জগতে সুরম্য সৌধ নির্ম্মাণে সক্ষম হইয়াছেন সত্য, কিন্তু অন্তর্মুখে তাঁহাদের প্রতিভা এ পর্য্যন্তও বিশেষ প্রবেশ লাভ করে নাই।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই কোন না কোন দর্শনশাস্ত্রের সহিত অনুস্যূত। ধর্ম্ম দার্শনিক মতের উপরই আপনার মন্দির প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় ছয়টি শ্রেণী বর্ত্তমান থাকিলেও, বেদান্তই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি। এই বেদান্তে জগৎ ও ব্রহ্মের যে সমুদয় তত্ত্ব বহুপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছিল, আধুনিক ইউরোপও ততদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আর সন্দেহেরই বা প্রয়োজন কি, জর্ম্মনীই আধুনিক ইউরোপে দর্শনসম্বন্ধে উন্নত দেশ, যখন সেই জর্ম্মানদেশীয় দর্শনেই এতদিনে বেদান্তের প্রভাব আরম্ভ হইয়াছে তখন ইউরোপের অন্যান্য দেশের কথা না তুলিলেও চলিতে পারে।

এই সভ্যতাসংঘর্ষে ধর্ম্ম ও দর্শনে আমরা যে ইউরোপ হইতে এখনও উন্নত, আমরা এখনও যে এক বিষয়ে অন্ততঃ সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষক হইতে পারি, তাহা জানিতে পারিয়াছি। আমাদের দেশে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা আরম্ভ হইয়াছে, অনেক কবি, অনেক উপন্যাসলেখক ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইউরোপও এই ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ব্যাপারে পশ্চাৎপদ নহেন সুতরাং এই সুযোগে আমরা আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শন হইতে সার-রত্ন সংগ্রহ করিয়া জগৎময় তাহা ছড়াইয়া দিয়া সমগ্র পৃথিবীতে না হউক অন্ততঃ ইউরোপে এক নব সাহিত্যজীবনের (Renaissance এর) ভিত্তিভূমি পত্তন করিয়া পুনরায় মস্তকোত্তলনে সমর্থ এবং ধন্য হইতেছি। হিন্দু ও ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া রাজা রামমোহন রায় জগতের সম্মুখে যে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মভাব দেখাইয়া গিয়াছিলেন আমাদের কর্ত্তব্য তাঁহারই অনুসরণ করিয়া সমস্ত জগতকে এক অখণ্ড আনন্দ ও উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া। যে দেশ ইতিপূর্ব্বে সমস্ত প্রাচীন পৃথিবীর ধর্ম্মগুরু ছিল, ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষে সে আজ নিজের মূল্য নিজে টের পাইয়াছে, আবার তাহার পৃথিবীর ধর্ম্মগুরু হইবার দিন আসিয়াছে, এই আশা এই লক্ষ্য এই আদর্শানুরক্তি হিন্দুজাতির পঞ্চম লাভ। পৃথিবীর ধর্ম্মগুরু হইবার কল্পনা যদি সফলও না হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই, উহা সফল করিবার চেষ্টাই আমাদিগকে উন্নত করিবে।

ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মোটামুটি লাভ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইতে পারে তাহা একরূপ বলা হইয়াছে, এখন আমরা ইউরোপীয় সভ্যতা সংঘর্ষের বিপরীত দিক—ক্ষতির সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ক্ষতি।

১। ইউরোপীয় সভ্যতা যখন প্রবল বন্যার মত এদেশে আসিয়া পড়িয়াছিল, যখন স্বাধীন চিন্তাপূর্ণ পাশ্চাত্য সাহিত্য ভারতবর্ষে প্রথ

প্রবেশ করিয়াছিল, তখন নব্য সম্প্রদায়ে একটা উচ্ছৃঙ্খলতার জোয়ার উপস্থিত হইয়াছিল। পুরাতন সমাজনিয়ম, পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী, পুরাতন ধর্ম্মমত তখন সকলই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্তঃসারবিহীন ও অলীক-বোধে নব্য সম্প্রদায় তাহাদের হাত হইতে মুক্তিলাভে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কালে, ক্রমে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্ব্বগ্রাসী-বিশৃঙ্খলার ভাব মন্দীভূত হইয়াছে; কিন্তু পুরাতন সমাজ-প্রণালীর, শিক্ষাপ্রণালার ভগ্নদশা এখনও রহিয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষত এখনও শুষ্ক হয় নাই। পুরাতন সমাজরূপ নালীঘায়ের কোন্‌টুকু রাখিয়া কোন্‌টুকু অস্ত্র করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহা এখনও আমরা জানি না। সমাজের এই ভয়ঙ্কর দশায় পুরাতন নেতারা হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছেন, কি করিলে ভাল হয় তাঁহারা জানেন না, তাঁহারা কেবল বলেন, নব্যের দোষে সোণার দেশ মাটী হইল। নূতন দল হইতে, নানা জনে নেতা হইবার চেষ্টা করিতেছেন সত্য, কিন্তু সমাজের সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতির অভাবে তাঁহারা এখনও প্রকৃত নেতৃ-পদবাচ্য কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। নূতন নেতারা বাক্যে প্রকাশ না করিলেও কার্য্যতঃ ইংরেজী শিক্ষিত লোকদিগকেই সমাজভুক্ত মনে করেন, এবং ভাবেন সাধারণ লোক নিজের পথ নিজেরাই খুঁজিয়া লইবে। পূর্ব্বে অশিক্ষিত জনসাধারণ শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর সংস্পর্শে উচ্চ আদর্শ প্রাপ্ত হইত; সঙ্গীতে, পুরাণশ্রবণে, কথকতায় জীবনের উন্নতির পথ ঠিক করিয়া লইত। এখন শিক্ষিতগণ কার্য্য-ব্যপদেশে সহরবাসী, পুরাণপাঠ কুসংস্কার মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং জনসাধারণ ক্রমেই আদর্শশূন্য হইতেছে এবং মোকদ্দমায় ও অর্থ-চিন্তায় মাত্র ব্যাপৃত রহিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে ভদ্রসম্প্রদায় বলিয়া যাঁহারা পরিচিত এখন তাঁহাদের সহিত অশিক্ষিত সমাজের প্রভেদ অনেক বেশী, অতএব এপ্রকার শিক্ষিত

এরূপ মনে করেন। এবং মনে করেন বলিয়াই নিম্ন শ্রেণীর সহিত মিলিতে মিশিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। ফলে এই হইতেছে যে নিম্ন-শ্রেণী ক্রমেই আদর্শবিহীন হইতেছে, উচ্চ শ্রেণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত ইহাদের কোন সংশ্রব নাই, ইহারা উচ্চ শ্রেণীকে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত নহে, সুতরাং নিম্ন শ্রেণীর পতনের সহিত উচ্চ শ্রেণীর পতনও অবশ্যম্ভাবী। দুই শ্রেণীর এইরূপ পার্থক্য দেশের ঘোরতর অমঙ্গলের কারণ। ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষে আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং অন্য কোন আদর্শ সংস্থাপিত না হইলে কি উচ্চ কি নীচ সকল শ্রেণীরই মহদনিষ্ট সাধিত হইবে। এই আদর্শ-বিহীনতাই ইউরোপীয় সভ্যতাসংঘর্ষের প্রথম কুফল।

২। রাষ্ট্রীয় ভাবের অতি ক্ষীণ আদর্শ যাহা আমাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমি ইউরোপীয় সভ্যতাসংঘর্ষে লাভ মনে করিয়াছি, তাহাতে বঙ্গে, বিহারে, মান্দ্রাজে, গুজরাটে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা সম্মিলনের ভাব প্রস্ফুটিত হইবার উপক্রম থাকিলেও আমরা ইউরোপীয় আদর্শের বলে পারিবারিক জীবনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছি। একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা ক্রমেই শিথিল নির্জ্জীব ও কলহের হেতু হইয়া পড়িতেছে। একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা ভাল কি পৃথকান্নভুক্ত পরিবার প্রথা ভাল আমি তাহার বিচারে এখানে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা এদেশে প্রচলিত থাকায় দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনের একটা উপায় ছিল, তাহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার হাত হইতে এ পর্য্যন্তও রক্ষা পাইয়াছে। দেশের দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য এ পর্য্যন্তও এদেশে দরিদ্রকরের আইন (Poor law) করিতে হয় নাই। এখন ক্রমে সেই একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা উঠিয়া গেলে দেশের অবস্থা কি হইবে তাহা

কতকটা ব্যক্তিত্বের বিরোধী। ব্যক্তিত্বের বিকাশের কিছু প্রয়োজন আছে, অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু অতিরিক্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশ সমাজধ্বংসকারী। উভয়দিক বজায় রাখিতে হইলে অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সমাজ সংরক্ষণ উভয়দিকেই সমান ঝোঁক দিলে আমাদের দেশের একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা যে তাহার বিরোধী এমন মনে হয় না, পরন্তু ইহাই মনে হয় আমাদের আদর্শানুযায়ী উহার প্রয়োজনীতা অত্যন্ত বেশী। আমরা ইউরোপীয় আদর্শে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে যাইয়া আমাদের পুরাতন লক্ষ্য বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি, এবং কেবলই নিজের সুখশান্তির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া পড়িতেছি। আমরা ক্রমে ক্রমে ঘরে স্নেহশূন্য হইয়া, পাশ্চাত্য আদর্শানুযায়ী বাহিরে মায়ার ভাব দেখাইলে, কতটা সফলকাম হইব ভগবান্ জানেন। যে ব্যক্তি এক রক্তমাংসে গঠিত ভ্রাতাকে ভাল না বাসিয়া স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি প্রেম বলিয়া চীৎকার করে তাহার কথা বিশ্বাস করিতে কাহার প্রবৃত্তি হইবে! এই পারিবারিক আদর্শবিহীনতা ইউরোপীয় সভ্যতাসংঘর্ষের দ্বিতীয় কুফল।

৩। পাশ্চাত্য সভ্যতা জড়জগতের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের আদর্শে গঠিত হওয়ায় ইহা আপনার ভোগ, বাসনা, সুখশান্তির উপর যতটা লক্ষ্য করে অন্যের জন্য ততটা করে না। এই আদর্শের ফলে জড়-জগত পদানত হইতে আরম্ভ করিলেই বিলাসলালসা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তাহার উপর যাহাদের পরিবারসংখ্যা অল্প, দূরতর আত্মীয় আত্মীয়াকে এমন কি বয়স্থ পুত্রকে প্রতিপালন করিতেও যাহারা বাধ্য নয়, তাহাদের পক্ষে স্বোপার্জ্জিত অর্থদ্বারায় বিলাসিতার অঙ্গে গা ঢালিবার যথেষ্ট অবসর আছে। কিন্তু পরার্থেই জীবনধারণ যাহার আদর্শ, পরের আহার যোগাইতে, বসন যোগাইতে, অতিথির সেবা করিতে যাহার

দিবার উপায় কি ? কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার রংদার বাহ্য চা
আমরা এমনি মোহিত যে, আমাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা দিন দিন
চলিয়াছে। যাহা আমাদের দেশে কোন কালেই প্রয়োজনীয়
এমন কি যাহা প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিজনক, প
অনুকরণের অভ্যাসদোষে আমরা তাহাই প্রয়োজনীয় করি
তুলিতেছি। ইহার ফল হইতেছে এই যে বিলাসিতায় অতিরিক্ত মু
ব্যয় হওয়ায়, খরচ সঙ্কুলনে বাধা জন্মিতেছে বলিয়া আমরা একদিকে
যেমন একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা সকল জঞ্জালের মূল বলিয়া তৎপ্রতি
খড়্গহস্ত হইয়াছি, অন্যদিকে আবার তেমনি ইউরোপীয় বিলাসলালসা
সামান্য অর্থে পরিতৃপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আমরা ক্ষিপ্তপ্রায়
হইয়া উঠিয়াছি। কূপখনন, পুকুরখনন জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি
আমরা আর করি না। অন্নসত্র বা অতিথিশালা খুলিতেও এখন ধনী
আর অর্থব্যয় করেন না। তাঁহার অর্থ এখন নাচে, গানে, সাহেব-
ভোজে, এবং উপাধিখরিদেই ব্যয়িত হয়, ইহাই এখন তাঁহার আদর্শ।
ইউরোপীয় সভ্যতার এই বাহ্য চাকচিক্যে বিলাসের ও স্বার্থ-
পরতার এমন অযথা সম্প্রসারণে আমাদের সমাজের চিরপূজিত
পবিত্র সংযমের ভাব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা এখন ভোগবিলাসের
পঙ্কিলকূপে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। আমাদের জাতীয় আদর্শ
আত্মজয় আজ কাল কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই,
ইহাই ইউরোপীয় আদর্শের সংস্পর্শে তৃতীয় ক্ষতির কারণ।

৪। স্বাধীন বাণিজ্যপ্রথা ইউরোপীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র। শিল্পজাত
দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ধনী হইবার জন্য ইউরোপীয়গণ পৃথিবীর বাজারে
ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং যেখানে পারিতেছেন সেইখানে এই
বাণিজ্য প্রসারের জন্য, রক্তপাত পর্য্যন্ত করিয়া [illegible]

াণিজ্য বলেন। নিজেদের সুবিধা বুঝিলেই স্বাধীন-বাণিজ্যের এবং অসুবিধা বুঝিলেই বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর ধার্য্য করা, ইহাই উহার মূল সূত্র। যেদেশে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের া বেশী, স্বাধীন বাণিজ্য সে দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করে। ন্তু ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে স্বাধীন বাণিজ্য মারাত্মক। উরোপীয় স্বাধীন বাণিজ্য প্রথার মূলমন্ত্র হইতে প্রতিযোগিতার ষ্টি হয়। প্রতিযোগিতা অনেক সময় ভাল হইলেও, অনেক সময় আমাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া গেলেও, অতিরিক্ত বিকশিত প্রতিযোগিতার আবার নানা বিষময় ফল আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "স্বাধীন বাণিজ্য" মুখের বুলি রাখিয়া এই প্রতিযোগিতার জন্য যে কত অসৎ পথ অবলম্বিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই, এবং ইহারই ফলে আমরা পূর্ব্বে যে রক্তপাতের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে ধরাবক্ষ কতবার প্লাবিত ও কলঙ্কিত হইতেছে, তাহা বলাও দুঃসাধ্য। প্রতিযোগিতা ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, দয়ামায়ার উপর পদাঘাত করিয়া আপনার রক্তরঞ্জিত সিংহাসন গড়িয়া তোলে। ইউরোপ এই প্রতিযোগিতার ভাবটা এমন অসাধারণ ভাবে কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন যে, এখন আর উহা উপেক্ষার চক্ষে দেখিবার উপায় নাই। পৃথিবীগ্রাসের আকাঙ্ক্ষা ও এই বাণিজ্য-প্রতিযোগিতায় কোন পার্থক্যই লক্ষিত হয় না।

বহু শতাব্দীর অন্ধকারের পর এই বিজ্ঞানালোক উদ্ভাসিতকালে আমরা নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে এখনও সক্ষম হই নাই, নিজেদের শাসন সংরক্ষণে এখনও আমাদের হাত নাই, সুতরাং এইরূপ নিস্ব ও দুর্ব্বল অবস্থায় বৈদেশিকগণ আমাদের শস্যসম্ভার ... করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আমাদিগকে কতকগুলি বিলাসিতার

বসাইতে বসাইতে তাহার মূলোৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছেন। পশ্চিমের দুরন্ত প্রতিযোগিতায় আমরা দিন দিনই দুর্ব্বল ও দরিদ্র হইতেছি। এই প্রতিযোগিতা এতদূর স্বার্থপরতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে, ইহা আমাদিগকে ধরাবক্ষে তিষ্ঠিয়া থাকিবার অধিকার হইতেও বঞ্চিত করিতেছে, এই স্রোত এরূপ অপ্রতিহত ভাবে বহুদিন চলিলে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের মত হিন্দু নামও যে ধরাবক্ষ হইতে একেবারে লুপ্ত হইবে না তাহা কে বলিবে? এই জীবনসংগ্রাম ও স্বার্থসংঘর্ষের দিনে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিদিনই আমাদের হৃদয়রক্ত শোষণ করিয়া লইতেছে ইহাই চতুর্থ ক্ষতি।

৫। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের লাভ কি তাহা দেখাইতে যাইয়া আমি হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা ও ব্রহ্মবাদের উল্লেখ করিয়াছি; এই অধ্যাত্ম জগতে এখনও আমরা বলবান্ হইয়া জগতের শিক্ষক হইতে পারি স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু পশ্চিমের বিলাসলালসা, পশ্চিমের জড়বাদ, পশ্চিমের ধর্ম্মহীনশিক্ষা, পশ্চিমের ভিন্ন আদর্শ আমাদিগকে চারিদিক হইতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বিলাতী চটক্‌দার সভ্যতার বাহির দেখিয়া আমরা এখন এমনই মোহিত যে গিল্‌টি করা পিত্তল ও স্বর্ণে পার্থক্য বুঝি না। জড়বাদে, সন্দেহবাদে, অতিরিক্ত ঐহিক সুখবাদে আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তি এত কলুষিত হইয়াছে যে, যাহা পাশ্চাত্য তাহাই ভাল এবং যাহা প্রাচ্য তাহাই খারাপ এরূপ ধারণা হইতেছে। আমরা পুরাতনকে ছাড়িয়া রাতারাতি বিলাতী ছাঁচে তৈয়ারি হইতে চলিয়াছি; ধর্ম্ম ত নাইই, আমরা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিয়া লইয়াছি। প্রাচীনকে ছাড়িয়া নূতন গড়িতে গেলে, যে ধর্ম্মজীবনের জন্য আমরা এখনও বড় হইতে পারিব বলিয়া আশা, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং আমাদের সকল আশা যে

নিরাশায় পরিণত হইবে তাহা একবারও ভাবিতেছি না। পুরাতন-বিহীন নূতন, কালস্রোতে, দৃঢ় ভিত্তির অভাবে, বালির বাঁধের মত ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন আমাদের আপনার বলিতে কিছুই থাকিবে না। পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য জড়বাদে আমাদের ব্রহ্ম-বাদের উপর, আমাদের অধ্যাত্মবাদের উপর একরূপ কুহেলিকা-জাল বিস্তার করিয়া, তাহা হইতে আমাদিগকে দূরে সরাইয়া লইতেছে, এই বেলা হইতে সাবধান হইয়া না চলিলে, হিন্দুজাতির শেষাবস্থা অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইবে। ধর্ম্মজগতে পুনরুত্থানই হিন্দুর ভবিষ্যৎ উন্নতির একমাত্র সোপান বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহক হইতে আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে এখন হইতে রক্ষা না করিলে শেষে আর কোন উপায় থাকিবে না।

বিষয়ের অনুপযোগী এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কথার বিশেষ বিবরণসহ উল্লেখ না করিতে পারিলেও মোটামুটী সকল কথারই উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। বোধসৌকর্য্যার্থে আমি ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষণে আমাদের লাভকেও যেমন পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি, ক্ষতিকেও তেমনই পাঁচ ভাগে দেখাইয়াছি। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইউরোপীয় জড়বাদের যেমন উপকারিতা আছে তেমনি তাহার অপকারিতাও আছে। ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষণে আমরা একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছি, অন্যদিকে আবার তেমনই পারিবারিক প্রীতিবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছি; ইহা আমাদের কুসংস্কার দূরীভূত করিতেছে সত্য, কিন্তু প্রাচীন রীতিনীতিকে দেশ হইতে তাড়াইয়া আমাদের ধ্বংসের পথও পরিষ্কার করিতেছে। ক্রমে আমরা ইউরোপীয় শিক্ষায় ব্রহ্মবাদ হারাইতেছি, বিলাসিতার পঙ্কে মগ্ন

করিয়াছে, অপকার করে নাই, সেটা মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার, তাহার স্বাধীনতা এবং দেশে নব সাহিত্যযুগের বিকাশ। এই বিষয়টি ভিন্ন, অন্য অন্য বিষয়ে যেস্থানে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা, সেই স্থানেই কুফলের আশঙ্কা রহিয়াছে যখন, তখন অতি সাবধানে আমাদিগকে চলিতে হইবে। পর্ব্বতসঙ্কুল সমুদ্রে পোতচালনা করিতে সুদক্ষ অধ্যক্ষের আবশ্যক।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ সেন।

আসামী বিবাহ।

বাঙ্গালার সুদূর উত্তরপূর্ব্বে প্রকৃতিদেবীর স্বহস্তরচিত পার্ব্বত্য প্রদেশ আসামের অধিবাসীগণের দেবারাধনা ও পূজার প্রথায় যেমন আমাদের সহিত অনেক পরিমাণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিতেও কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। ভারতবর্ষের প্রায় সকল হিন্দুজাতিদের পরিণয়কার্য্য হিন্দুশাস্ত্রের বিবাহ সম্বন্ধীয় মূল সূত্রের দ্বারা সাধিত হইলেও সকল দেশেই কতকগুলি স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে।

ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুজাতিসমূহের ন্যায় আসামিদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বংশে বাল্য বিবাহ পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত আছে। কোন ব্যক্তি কোন যুবককে তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া মনে মনে তাহাকে জামাতা

করিবার বাসনা করিলে, পুত্রের পিতা বা তদভাবে তাহার অভিভাবককে নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। যদ্যপি উভয়ের ইচ্ছার ঐক্য হয়, তাহা হইলে একজন উপযুক্ত জ্যোতিষীকে পুত্র ও কন্যার কোষ্ঠী দেখাইয়া কোষ্ঠী মিলিলে তবেই সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়।

পরিণয় সম্বন্ধ ও শুভবিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইলে পর বিবাহের আনুষঙ্গিক উৎসব আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব দিবস পাত্র ও পাত্রীর পক্ষীয় অভিভাবকগণ তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধু ও প্রতিবাসী ব্যক্তিদিগকে ও তাঁহাদের বাটির স্ত্রীলোকদিকে উৎসবে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণ করেন। বাঙ্গালায় জাতিবিশেষের ন্যায় ইহাঁরা বিবাহের নিমন্ত্রণ কালে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক তাম্বুল ও সুপারি প্রদান পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বিবাহ দিবসে বর বা কন্যাকে স্ব স্ব অবস্থানুযায়ী পরিধেয় উপহার দিয়া থাকে।

আসামী বিবাহের সর্ব্ব প্রথম আচার বা উৎসব কন্যাকে নববধূর পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে ভূষিত করা। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দিবসে বরের পিতা বা অন্য অভিভাবক কন্যার বাটীতে অলঙ্কার, পোষাক ও দধি, গুড়, তৈল, হিঙ্গুল এবং দুইটী মৃণ্ময় কলসিতে ঘৃত পূর্ণ করিয়া পাঠাইয়া দেন। এই শেষোক্ত সামগ্রীটি না পাঠাইলে এই তত্ত্বের অঙ্গ অপূর্ণ থাকে। এই সকল দ্রব্যাদির বাহকগণের সহিত পাত্রের বাটী হইতে কয়েকজন নরনারীও কন্যার বাটীতে গমন করে। তৎপরে উক্ত দ্রব্যাদি ও ব্যক্তিবৃন্দ পাত্রীগৃহে পৌঁছিলে কন্যাকে নবোঢ়াবেশে সীমন্তে তৈলাক্ত সিন্দূর শোভিত করিয়া সকলের নিকট আনা হয়, এবং সেই সময় গৃহস্থিত রমণীবর্গের মঙ্গলসূচক উলু উলু ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইয়া যায়। এইবার কন্যাপক্ষীয় সমাগত নারীগণের দ্বারা বিধি অলঙ্কারাদির সমালোচনা হইতে থাকে। আসামের নীচ শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে প্রায়ই এই গহনা ও পরিচ্ছদ

লইয়া গোলমাল হইয়া থাকে; পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত গহনাদি না পাইলে কন্যার পিতামাতা বিনা বাক্যে ছাড়িয়া দেয় না, সময়ে সময়ে বক্রী সামগ্রীর মূল্য ধরিয়া লইয়া থাকে।

নারীজাতির সুলভ সমালোচনা শেষ হইলে পর নিমন্ত্রিত পুরুষ ও রমণীদিগকে বরের বাটীর খাদ্য দ্রব্যাদি ভোজন করান হয়। তৎপরে পূর্ব্বোল্লিখিত সেই ঘৃতকলস দুইটীর মধ্যে একটী রাখিয়া দিয়া অপরটী কন্যার দ্বারা বারেকের জন্য স্পর্শ করাইয়া বরের গৃহে পুনঃপ্রেরিত হয়। বিবাহোৎসবের সর্ব্ব প্রথম বিধি এই প্রকারে পালিত হইয়া থাকে।

প্রাতে এই সকল লৌকিক আচারের পর, সায়ংকালে স্নানের উৎসব আরম্ভ হয় এবং নিম্নলিখিত প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। কন্যার এক বা ততোধিক কোন আত্মীয়া রমণী স্বর্ণ, রৌপ্য বা যে কোন ধাতুনির্ম্মিত একটী করিয়া ঘট লইয়া নিকটবর্ত্তী কোন নদী বা অন্য জলাশয়ের নিকটে গমন করেন। তাঁহাদের সহিত গায়ক বাদ্যকর ও অপর কয়েকটী স্ত্রীলোকও গমন করে। যখন একের অধিক ব্যক্তি জলপাত্র লইয়া যায়, তখন তাহাদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠাই দলের অগ্রণী হয়। সকলে ঘাটে পৌছিলে তাহাদের মধ্যে দুইজনের নিম্নলিখিত প্রকার দুর্ব্বোধ্য কথোপকথন হইয়া থাকে।

প্রথমে একজন জিজ্ঞাসা করে,—

প্রশ্ন। তোমরা এখানে কি কারণে আসিয়াছ?

উত্তর। আমরা হর ও গৌরীর বিবাহ কথা শুনিয়াছি।

প্রশ্ন। মহার্ঘ কি আর সুলভই বা কি?

উত্তর। অপ্রীতি ও হিংসা দুর্লভ এবং শান্তি ও ঐক্য সুলভ।

এই কথোপকথন শেষ হইলে ঘট-হস্তে রমণী চারি কড়া কড়ি

"সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, জল আপনারা সাক্ষী রহিলেন আমি অমুক এবং অমুকের (বর ও কন্যার নাম করিয়া) বিবাহের জন্য বারিগ্রহণ করিলাম।" তৎপরে একখানি ছুরিকা দ্বারা জলের উপরে তিনটি কাল্পনিক রেখা অঙ্কিত করিয়া প্রার্থনা করে,—"ও মা গঙ্গা যমুনা সরস্বতী! আমি তোমাদের একবিন্দু জল গ্রহণ করিলাম, অপরাধ গ্রহণ করিও না।" এইবার সেই রমণী ও তাহার সঙ্গিনীগণ কক্ষস্থিত পাত্র জলপূর্ণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে।

বাটীতে পৌঁছিয়াই প্রথমে ঘট হইতে সামান্য জল ছাঁইচতলায় ঢালিয়া দিয়া পরে ভিতরে প্রবেশ করে। তাহাদের অভ্যর্থনাকার্য্য পুররমণীবর্গের উলুধ্বনিতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তৎপরে সেই বারিপূর্ণ ঘট বা কলসিগুলি একটী দেবদেবীর চিত্রাদি শোভিত গৃহের মেঝের নানাবর্ণের রঞ্জিত বৃত্তের মধ্যে স্থাপিত করা হয়। ঘটস্থাপন হইলে স্নানার্থে বালিকার গাত্র তৈল হরিদ্রা প্রভৃতির দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া তাহাকে স্নানাগারে লইয়া যাওয়া হয়। এই স্নানের স্থানটী বিবাহস্নানের জন্যই নূতন নির্ম্মিত হইয়া থাকে; আসামীরা ইহাকে "বেই" বলে। বালিকাকে অগ্রে বেইয়ের চতুর্দ্দিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়, তৎকালে অন্য এক রমণী পূর্ব্বোল্লিখিত ঘৃতের কিছু অংশ প্রতিবার প্রদক্ষিণান্তে কুমারীর পদদেশে ছিটাইয়া দেয় এবং সেই সঙ্গে একখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত টুলের উপরেও প্রতিবার অল্প-পরিমাণে ঘৃত সিঞ্চন করিয়া থাকে। সপ্তবার প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হইলে কুমারী ঐ কাষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্ব্বক শুভকার্য্যের জন্য স্নান করিয়া পূতকলেবরা হয়। আর্দ্র বসন পরিত্যাগ করিলে কয়েকটী সম্মাননীয়া এবং গৃহিণী গোছের রমণী বালিকাকে ধান্য দূর্ব্বা প্রদানপূর্ব্বক শুভ আশীর্ব্বাদ করেন। আশীর্ব্বাদ কার্য্য শেষ হইলে বালিকাকে সেই পূর্ব্ববর্ণিত চিত্রাদিপূর্ণ সজ্জিত কক্ষে লইয়া গিয়া পরিচ্ছদাদির দ্বারা

উত্তমরূপে ভূষিত করা হয়। এই স্থানেই স্নানোৎসবের সমাপ্তি; আমন্ত্রিত নারীবৃন্দ এইবার সেই দিনের মত চলিয়া যান। বিবাহের দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন এই আচরণটি যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত বৈবাহিক আচারটি কোন শাস্ত্রে নাই বা প্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল না। ইহা আধুনিক সময়ের একটি লৌকিক আচরণমাত্র। পূর্ব্বকালে আসামিগণ বিবাহের পূর্ব্বদিন সায়ংকালে বর ও কন্যাকে তৈল ও সুবাসিত দ্রব্যাদি মাখাইয়া পোষাক অলঙ্কার সিন্দুর ইত্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত করিতেন, তাহাকে তাঁহারা বিবাহের অধিবাস বলিত। অধুনা বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথাগুলি কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে; অধিবাস কার্য্য এখনও বিবাহের পূর্ব্ব দিবসে বর ও কন্যা উভয়ের বাটিতেই পালন করা হয়। আসামিদের এই অধিবাস প্রকৃতপক্ষে পরদিবস বিবাহের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়!

অধিবাসের পর সেই দিনই আসামি বিবাহের আর একটি স্থানীয় লৌকিক আচার অনুষ্ঠিত হয়। আসামিরা ইহাকে "গাথিয়ান খণ্ড" কহেন। "গাথিয়ান" নামক একপ্রকার সুগন্ধি উদ্ভিদের মূল একখণ্ড প্রশস্ত শিলার উপর রাখিয়া একটি বৃহদাকার শিলাপুত্রের সাহায্যে সাতজন বিবাহিত রমণী একত্রে মিলিত হইয়া চূর্ণীকৃত করিয়া থাকে। যৎকালে সপ্ত রমণী দ্বারা ঐ কার্য্য হইতে থাকে সেই সময় একদল স্ত্রীলোক তৎসাময়িক গান গাহিতে গাহিতে প্রতি আঘাতের সহিত উলুধ্বনি দেয়। যখন মূলটী চূর্ণপ্রায় হইয়া যায় তখন উহা কুমারীর মস্তকে স্থাপন করা হয়।

এই প্রথাটি আসামের সকল স্থানে সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত

বিবাহের দিবস অতি প্রত্যুষে কুমারীকে শয্যা হইতে নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া গৃহের বাহিরে আনা হয় এবং দ্বারদেশের পার্শ্বস্থিত একখানি কাষ্ঠাসনে বসাইয়া বালিকার মাতা, ভগ্নী এবং অন্যান্য কতিপয় আত্মীয়া স্ত্রীলোক দুই করে দুইটী পান লইয়া জানু পাতিয়া তাহার সম্মুখে উপবেশন করেন। পরে পার্শ্বস্থিত তক্রপূর্ণপাত্রে ঐ পান দুইটী নিমজ্জিত করিয়া কন্যার গণ্ডস্থল, বাহু, ও পদদ্বয় পত্রদ্বারা স্পর্শ করিয়া নিজ নিজ বসনাঞ্চলে মুছাইয়া দেন। তিনবার এইরূপ করা হইলে বালিকাকে পুনরায় শয্যায় লইয়া যাওয়া হয়। যখন এই অনুষ্ঠানটি হইতে থাকে তখন কতিপয় অন্য স্ত্রীলোক উলুধ্বনির সহিত সময়োপযোগী সুমিষ্ট সঙ্গীত করিয়া থাকে। নিস্তব্ধ প্রত্যুষে প্রভাতী সমীরণে ভাসিয়া ভাসিয়া আসামী কামিনীগণের সেই গীতধ্বনি চতুর্দ্দিক অমিয়ময় করিয়া তুলে।

বিবাহের দিন প্রাতে এই প্রভাতী ক্রিয়া সমাধা হইলে পর পাত্রের পিতা বা তদভাবে বর স্বয়ং ও কন্যা সম্প্রদানকর্ত্তা শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে তাঁহাদের নিজ নিজ বাটীতে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে “নান্দিশ্রাদ্ধ” করেন। উদ্বাহোৎসবের প্রথম হইতে এই শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত যে সকল ক্রিয়াদি কন্যার বাটীতে অনুষ্ঠিত হয়, কেবল “গাথিয়ানখণ্ড” নামক প্রথা ভিন্ন সকল গুলিই বরের গৃহেও যথাপ্রচলিত নিয়মে পালন করা হইয়া থাকে।

যে সায়ংকালীন স্নানোৎসবের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বর ও কন্যার বাটীর দূরতা অনুসারে সময়ে সময়ে বিবাহ দিবসে পাত্রকে মধ্যাহ্নে বা তৎপূর্ব্বে উহা সম্পন্ন করিতে হয়। যখন বর কন্যার গৃহে গমনের জন্য সাজসজ্জাদির দ্বারা প্রস্তুত হইতে থাকে, তখন তাহার মাতা বা অন্য কোন রমণী কয়েকটি স্ত্রীলোকের সহিত নদী বা কোন জলাশয়ের ঘাটে গমন করেন। উহাদের মধ্যে একজন একখানি বংশ-

নির্ম্মিত পাত্রে সাতটি আলোকাধার লইয়া মস্তকে ধারণপূর্ব্বক গমন করে এবং আর এক রমণী একখানি পাখার উপর একখণ্ড বস্ত্রে বাঁধা একটি তাম্রমুদ্রা ও কিছু চালের গুঁড়ি স্থাপন করিয়া ঐরূপ মস্তকে লইয়া গমন করে। এই শেষোক্ত রমণীর নাম "কুলবুড়ি;" উক্ত রমণীর গমনকালে একটি কাঠির দ্বারা পাখাখানিতে মারিতে মারিতে আহ্লাদের সহিত নৃত্য করিতে থাকে। ঘাটে পৌঁছিয়া তাহারাও কন্যাপক্ষীয়দের ন্যায় সেই দুর্ব্বোধ্য কথোপকথন ও অন্যান্য কর্ম্ম যথা-কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আইসে। এই রমণীদল প্রত্যা-গমন করিবার পরই বর বিবাহার্থে কন্যা গৃহে গমনের জন্য উদ্যোগ করে। তৎপরে ঢাক ঢোল ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্র সহকারে মহাসমারোহের সহিত বর যাত্রা হয়।

আসামী পরিণয়ব্যাপারে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগেরই প্রয়োজন অধিক। বর কন্যাগৃহের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র কন্যার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্ববর্গের সহিত মাতা, ভগ্নী প্রভৃতি রমণী-বৃন্দ বাটীর বহির্ভাগে আগমনপূর্ব্বক বর ও বরযাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া যান। বর তাহার যান হইতে অবতরণ করিয়া বাটীর প্রাঙ্গনে স্থাপিত কাষ্ঠাসনের উপর দণ্ডায়মান হয়। তাহার হস্তপদ প্রক্ষালন হইলে পূর্ব্ব অভ্যর্থনাকারিণীগণ প্রথমে বরের ললাটে চন্দন ও গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ পূর্ব্বক নূতন পরিচ্ছদ ও কিছু মিষ্টান্ন উপহার প্রদান করিয়া বিবাহ বাসরে লইয়া যান।

যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া বর পূর্ব্বদিকে সম্মুখ করিয়া কন্যাসম্প্রদান-কর্ত্তার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করে। কুমারীর পিতাই সাধারণতঃ কন্যা দান করেন, তিনি জামাতার পার্শ্বে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধিদাতা

তনয়ার বিবাহ দিবেন এই প্রতিজ্ঞা করেন। পাত্রের পিতা এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। কন্যা কর্ত্তা যোড়করে জামাতাকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া বলেন—"সত্যই আমার তনয়া অদ্য হইতে তোমার পরিবারভুক্তা হইল, এইজল তুমি গ্রহণ করিবে কি?" ইহা বলিয়া পূর্ব্বকথিত হস্তস্থিত পাত্র হইতে বরের হস্তে জল ঢালিয়া দেন। এই ক্রিয়াটিকে হস্তোদক কহে।

এই হস্তোদক কার্য্য সমাপনান্তে কন্যাসম্প্রদানকর্ত্তা বরকে পঞ্চবিংশতি গাছি গাঁইটযুক্ত কুশ ও তিনটী পাত্রে করিয়া জল প্রদান করেন। বর উহা গ্রহণ পূর্ব্বক কুশগুলিকে নিজ আসনের নিম্নে রাখিয়া জল পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া নিজ পদদ্বয় ও মুখমণ্ডল সিক্ত করে। শ্বশুর মহাশয় এইবার একটি আবৃত পেয়ালায় করিয়া জামাতাকে মধুপর্ক প্রদান করেন। বর উহা গ্রহণ করিয়া ক্ষণেকের জন্য আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক আভ্যন্তরীন দধি, মধু ও ঘৃত দৃষ্টি করিয়া এক পার্শ্বে রাখিয়া দেয়। এই সময়ে একজন নাপিত একটী লাল বর্ণের গাভী লইয়া বিবাহের স্থানে প্রবেশ করে এবং তিনবার উহার নামোচ্চারণ করিলে পর কন্যাকর্ত্তা একগাছি পবিত্র কুশ দ্বারা গাভীটিকে আঘাতের ভাণ করেন। ইহা অবলোকন করিয়া বর শ্বশুরকে বাধা দেয় এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণ করে।

"গাভী হয় একাদশ রুদ্রের মাতা, অষ্টবসুর কন্যা, দ্বাদশ আদিত্যের ভগ্নী এবং আমাদের সুখের মূল বিশেষ; আমি সেই কারণে এই শান্ত জন্তুকে নিধন করিতে সকল জ্ঞানী ব্যক্তিকে বিনীত ভাবে নিষেধ করি।" ইহা শ্রবণ করিয়া গাভীটিকে মুক্তি প্রদান করা হয়।

এই কার্য্য শেষ হইলে কন্যার অভিভাবক বরকে পরিচ্ছদ অঙ্গুরীয়

ক্রিয়া শেষ হইলে একখানি মহাদেবের মূর্ত্তি বরের ললাট দেশে ও একখানি পার্ব্বতীর চিত্র কন্যার ললাটে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বর এইবার কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেবতার নিকট প্রার্থনা করে— "হে বায়ু ও জলের দেবতা বিশ্বদেব, হে বিধাত আমাদের উভয়ের অন্তঃকরণ পবিত্র কর।" কন্যাকর্ত্তা হরপার্ব্বতীকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট বালিকার শুভ কামনা করিয়া বালিকাকে সম্বোধন করিয়া কাতর কণ্ঠে নিবেদন করেন,—"আমি তোমার জন্মকাল হইতে যাহা কিছু দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি বা আমার জন্য তুমি যে কোন কষ্ট পাইয়াছ সৌভাগ্যদেবি সেই সকল আমায় ক্ষমা কর।"

এই সকল প্রথাগুলি শেষ হইলে সম্প্রদান কার্য্য শেষ হয়। অবস্থানুসারে কন্যাকে অলঙ্কার ও পরিচ্ছদাদির সহিত সজ্জিত করিয়া পাত্রস্থ করাই বিধেয়। বরের হস্তে কন্যা অর্পিত হইলে উভয়েই দেবতা সমীপে আপনাদের শুভ প্রার্থনা করে। তাহার পর বর বালিকাকে নিম্নলিখিত রূপ নিবেদন করে—"তোমায় কখন যেন নিষ্ঠুর হইতে না দেখি, স্বামীর অবাধ্য যেন কখন না হও, তোমার সৌন্দর্য্য যেন আকর্ষণীযুক্ত হয়, তোমার অন্তর যেন সুখও শান্তির আবাস হয়, আমাদের গো মেষাদি জন্তুদিগের প্রতি যেন যত্নবান হইতে দেখি, তুমি বীরপ্রসবিনী হও, তোমার দ্বারা সংসারের সকলেই যেন সুখী হয়, তুমি শ্বশুর, শাশুরী, যাতা, ননন্দা প্রভৃতি স্বামীর সকল আত্মীয়ের প্রিয় হও।" যৎকালে যুবক নবপরিণীতা ভার্য্যাকে এই সকল কথা বলিতে থাকে, সেই সময়ে তাহার এক প্রিয় সুহৃদ একটি ঘট লইয়া সেই স্থানে প্রবেশ করে এবং উহা দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া পবিত্র হোমাগ্নির দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয় এবং বিবাহের শেষ পর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাকে। উক্ত ঘটকে 'মিত্র কলস' নামে অভিহিত করা হয়।

আসামী বিবাহে অনেকবার হোম হইয়া থাকে। এইবার গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য দেবতাদিগের উদ্দেশে আর একবার পবিত্র অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া যথানিয়মে হোম করা হয়। ইহা সমাপ্ত হইলে বর কন্যার হস্তে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঘৃতমিশ্রিত অর্দ্ধদগ্ধ ধান্য প্রদান করে। বালিকা উহা গ্রহণ করিয়া জোড় হস্তে একটি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দেব সমীপে তাহাদের জীবনের শান্তির ও উন্নতির প্রার্থনা করে এবং উক্ত ধান্য হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ করে। এই ক্রিয়াটি তিনবার করিতে হয়।

এইবার পাণিগ্রহণ নামক প্রথাটি নিম্নলিখিত প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়। পাত্র কন্যার কর ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলে,—"আজ আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিলাম, কেবল মাত্র আমাদের সুখবর্দ্ধিত করিবার আশায়, তুমি আজীবন আমার সহিত বাস করিবে। কারণ ভগ, অর্য্যমন, সাবিত্রী, পুরন্ধ্রী ও অন্যান্য দেবতাগণ তোমায় আমাকে আমার সংসারের তত্ত্বাবধারণার্থে প্রদান করিয়াছেন। আমি সাম্ তুমি ঋক্‌বেদ, আমি আকাশ তুমি মৃত্তিকা, আমাদের মিলনে বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া বংশবৃদ্ধি করিতে থাকুক। শত বৎসর পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া আমরা সুখে শান্তিতে যেন জীবন অতিবাহিত করিতে পারি।" যুবকের কথা শেষ হইলে একখণ্ড প্রশস্ত শিলা ও তদুপরি একটি শিলাপুত্র বেদীর উত্তরদিকে স্থাপন করা হয়। বালিকা তাহার উপর দণ্ডায়মানা হয়, তখন স্বামী স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় বলে—"যে প্রস্তরের উপর তুমি দণ্ডায়মানা আছ উহারই মত স্থির ও দৃঢ় হও।" ইহা বলিয়া সে দূর গগনস্থিত অটলতার আদর্শস্বরূপ ধ্রুবতারার প্রতি তদীয় পত্নীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে বলে—"এই দূরস্থিত স্থিরতা ও ধৈর্য্যের আদর্শস্বরূপ ধ্রুবতারার প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং তুমি উহারই মত স্থির হও; বৃহস্পতিপ্রদত্ত ধর্ম্মপত্নী, তুমি বহু পুত্রের মাতা হও এবং শত বর্ষ জীবিত থাক।"

সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ প্রভৃতি আবশ্যকীয় কার্য্যগুলি একে একে সমাপ্ত হইলে পর আর একটি মাত্র ক্রিয়া পালন করিতে হয়, ইহার নাম 'সপ্তপদা'। হোমাগ্নির উত্তরদিকে গোধূম পূর্ণ বা চালের গুঁড়ির দ্বারা সাতটী বৃত্ত অঙ্কিত করা হয়। বালিকা ঐ সাতটি বৃত্তের মধ্যে এক একবার করিয়া পদচালন পূর্ব্বক ভ্রমণ করে; স্বামী সেই পদ বিক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া প্রতিবার একটি করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করে। সেই মন্ত্রগুলির ভাবার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। তোমার জীবিকা নির্ব্বাহের কারণ বিষ্ণু তোমায় একপদ লইয়া যান।

২। তোমার সুস্থতা লাভের কারণ বিষ্ণু তোমায় দুইপদ লইয়া যান।

৩। তোমার যজ্ঞাদি সাধনের কারণ বিষ্ণু তোমায় তিনপদ লইয়া যান।

৪। তোমার সুখবৃদ্ধির কারণ বিষ্ণু তোমায় চারিপদ লইয়া যান।

৫। তোমার গবাদি জন্তু লাভের কারণ বিষ্ণু তোমায় পাঁচপদ লইয়া যান।

৬। তোমার ধন রত্ন লাভের কারণ বিষ্ণু তোমায় ছয়পদ লইয়া যান।

৭। তোমার উত্তম পুরোহিত লাভের কারণ বিষ্ণু তোমায় সাতপদ লইয়া যান।

এই সপ্তপদী শেষ হইলে পর 'মিত্রকলস' বারি। বন্ধু কলস হইতে কিঞ্চিৎ বারি লইয়া নব দম্পতীর গাত্রে সিঞ্চন করিয়া তাহাদের উন্নতি এবং সুখ শান্তির জন্য আশীর্ব্বাদ করে। বর এইবার স্ত্রীর বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলে—"তুমি কি আমার আদেশ সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিপালন

পুনরায় মস্তক স্পর্শ করিয়া সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে। আর একবার প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশে হোম হয়, পরে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে পারিতোষিক প্রদান করা হয়। নববিবাহিত বর হোমাগ্নির পবিত্র ভস্ম স্পর্শ করিয়া পত্নীর ললাট কণ্ঠ, বক্ষ এবং বাহুদ্বয় স্পর্শ করে, তৎপরে বিষ্ণু ও সূর্য্যদেবকে শুভ বিবাহের সুখকর সমাপ্তির কারণ অর্চ্চনা ও ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক শুভকার্য্য সমাধা হয়।

আসামী বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রথাগুলি এই স্থানেই শেষ হইলেও বিবাহ সংলিপ্ত আরও কতকগুলি লৌকিক নিয়ম ইহার পর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সে গুলি বিশেষ আবশ্যকীয় নয়, এবং সকলে তাহা পালন করে না। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে গুলির বিবরণ দিতে বিরত রহিলাম।

বেজ ও বৈদ্য।

১

আষাঢ়ের ভারতীতে "বৈদ্যজাতির ইতিবৃত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় স্বশ্রেণীর মর্য্যাদাবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া যে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকগুলি যে আনুমানিক ভারতীর পাঠক মাত্রই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু স্থানে স্থানে অনুমানের মাত্রা এতটা বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহার লিখিত ইতিবৃত্ত উপন্যাসের গণ্ডীর ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। দুঃখের বিষয় তাঁহার এত অনুসন্ধান ও যত্নের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধটির মূল্য এইজন্য অনেক কমিয়া গেল। বৈদ্য শব্দ হইতে বেজ হইয়াছে, এই

অর্থ অবলম্বন করিয়া আসামের বেজবড়ুয়াদিগকে লেখক বৈদ্যশ্রেণীতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অথবা ব্রাহ্মণ বেজবড়ুয়াদের দলে বৈদ্যজাতিকে তুলিয়া বৈদ্যদের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। অবশ্য গুপ্তমহাশয়ের অনভিজ্ঞতা ক্ষমা করা যায়, কারণ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তিনি আসামের বিভিন্ন জাতি ও সমাজ বিষয়ে কিছুই অবগত নহেন। কিন্তু ইতিহাস লিখিতে গেলে একটু সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, নতুবা তাহার মূল্য থাকে না। আসামের বেজ বড়ুয়ারা উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রখ্যাত। তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক কুলজীগ্রন্থ প্রভৃতি আছে। অবশ্য সেই সকল এই স্থানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। গুপ্ত মহাশয় জানেন না যে, আসামের উপাধিগুলি রাজদত্ত, বঙ্গদেশের মত জাতিবাচক নহে। আসামের অনার্য্যজাতির মধ্যেও বেজ উপাধিধারী লোক আছেন, গুপ্ত মহাশয় তাহাদিগকে স্বশ্রেণীর মধ্যে স্থান প্রদান করিলে তাহাদের অনেকে কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি কি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারিবেন ?

শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া।
আসাম।

২

সুপ্রসিদ্ধ "ভারতী" পত্রিকার বিগত আষাঢ় মাসের খণ্ডে "বৈদ্য-জাতির ইতিবৃত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে "ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতিবাদ" এ প্রতিবাদক মহাশয় অনেকগুলি ভ্রমাত্মক কথার সন্নিবেশ করিয়াছেন। সেইগুলি নিরাকরণের নিমিত্ত নিম্নে এতদ্দেশীয় কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজের চিত্র উদ্ঘাটিত করিলাম।

"ভারতী"তে প্রকাশিত গণনীয় ১৫ জন বৈদ্য মহাত্মার নামের তালিকায় এক চট্টগ্রাম জিলাতেই কবিবর বাবু নবীন চন্দ্র সেন, রঘুবংশের পদ্যানুবাদক বাবু নবীন চন্দ্র দাস এবং তিব্বত ভ্রমণকারী

রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, এবং বারিষ্টার পি, সি, সেন এই চারি জনের উল্লেখ দৃষ্টে একথা কাহারও বুঝিবার বাকী নাই যে চট্টগ্রাম জিলা একটী বৈদ্যপ্রধান স্থান। এখানকার বৈদ্য সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এইরূপ।—

১। এতদ্দেশে কেবল কোন কোন কায়স্থগণের সহিতই বৈদ্য জাতির সম্বন্ধ প্রচলিত আছে এমন নহে, শূদ্র ও কচিৎ বহির্তন্ত্রী (বাহারুয়া) জাতির সহিতও বৈদ্যদের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। এবং বৈদ্যগণের মধ্যে পুরুষের "গুপ্ত" উপাধি ও স্ত্রীলোকের "দেবী" পাঠ নিতান্ত আধুনিক এমন কি ২০ বৎসরেরও অধিক নহে। এইক্ষণ চট্টগ্রামে এমন কোন বৈদ্য বংশ নাই যাহার সকল জ্ঞাতিরাই "গুপ্ত" ও "দেবী" পাঠ ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ "দাস" "দাস দাস" "দাস দাস দাস" "সেন দাস" "গুপ্ত দাস" "দত্ত দাস" প্রভৃতিরই সমধিক প্রচলন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রতিবাদক কেবল ৫টী জিলাতেই বৈদ্য কায়স্থের সম্বন্ধ থাকা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই অবগত আছেন বৈদ্যরাজ বল্লাল সেন ও রাজবল্লভের কীর্ত্তিভূমি ঢাকার সন্নিহিত মুন্সীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও ঐ প্রথা আছে।

২। প্রতিবাদকের আর একটা বিষম ভুল এই যে তিনি পূর্ব্ব বঙ্গে ঘোষ, বসু, গুহ, ও মিত্র উপাধিধারী কায়স্থগণ হইতে নন্দী, দত্ত, ধর, কর কায়স্থকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইহা সর্ব্বৈব অমূলক, এদেশে প্রাগুক্তেরাই কায়স্থ সমাজে কুলীন ও উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হন। প্রতিবাদক মহাশয় নন্দী, দত্ত, ধর, কর উপাধিধারী কায়স্থেরা বৈদ্য ছিলেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার এই উক্তির কোন ভিত্তি দেখিতে পাইতেছি না। গুপ্ত মহাশয়ের মতে বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থেরা শূদ্র; কোন ব্রাহ্মণ জাত্যন্তর হইয়া শূদ্র হইলে কোন সমাজে তাহার সম্মান বা প্রতিপত্তি থাকিতে পারে

না; সে সমাজে পতিত, হেয়, নিন্দিত থাকিবেই থাকিবে। আর একটী কথা এই, অনেকেরই বিশ্বাস বৈদ্য ও কায়স্থ এক জাতি, একই মূল বৃক্ষের দুই শাখা। তাঁহাদের মতে ঘোষ, বসু, গুহ মিত্রগণ বল্লালের কৌলিন্য পাইয়াছিলেন; যাঁহারা উক্ত কৌলিন্য মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টগণ) সুবিধা মতে কতক বৈদ্য শ্রেণী ও কতক কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহাতেই ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ব্যতীত অন্যান্য উপাধিও কায়স্থ ও বৈদ্য শ্রেণীতে পরিলক্ষিত হয়। গুপ্ত মহাশয়ের অনুমান অপেক্ষা এই মত সমধিক যুক্তিযুক্ত নহে কি?

৩। চট্টগ্রামে বৈদ্যগণের মধ্যে সগোত্রে ও সমান প্রবরে অবাধ বিবাহ চলিতেছে। ইহা কি তাঁহাদের দ্বিজত্বের লক্ষণ?

৪। প্রতিবাদক মহাশয় দস্তীদার, শিকদার, তরফদার, মাঝি, সরকার প্রভৃতি কায়স্থের উপাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; বাস্তবিক এতদ্দেশে বৈদ্যগণেরই দস্তীদার, শিকদার, করণ, সরকার, তালুকদার, ওয়াদ্দাদার, কাস্তগিরি, (বর্ত্তমানে খাস্তগির) মাঝি ও ঘরোজা উপাধি আছে। ইহাদের মধ্যে দস্তীদার, সরকার, করণ ও ওয়াদ্দাদারেরা বৈদ্য সমাজে মাননীয়ও বটেন। পিউন, গার্ড, মিস্তিরি (সূত্রধরের কার্য্য) দোকানদারী, পশারি, কৃষিকার্য্য বা চাষবৃত্তি ইত্যাদি ব্যবসাও বৈদ্যে পরিলক্ষিত হয়।

৫। চট্টগ্রামে কতকগুলি শূদ্র এবং ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যের গোলামগণের মধ্যে কেহ কেহ ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, শক্তি ও মৌদগল্য-গোত্র সেন; ভরদ্বাজ ও মৌদগল্য-গোত্র দাস; শাণ্ডিল্য-গোত্র দত্ত এবং কয়েক রকম গুপ্ত আছে; তাহারাও বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। আবার যাহারা এখানে সমাজে বৈদ্য বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদের কাহারও কাহারও গোত্র এবং উপাধি বৈদ্য রীতির অনুমোদিত নহে। অবস্থার

পরিবর্ত্তনের সহিত এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে ভিন্ন অপর কি অনুমান করা যাইতে পারে ?

৬। চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী "বড়ুয়া" নামে এক শ্রেণীর লোক আছেন, ইহাঁরা চিকিৎসা ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের কাহারও কাহারও অধিবাসস্থল (আহ্লা এবং নয়াপাড়া গ্রামে) "বৈদ্য পাড়া" নামে কথিত হয়, ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্ম যাজকের কার্য্য করেন তাঁহাদের "ঠাকুর" উপাধি। গুপ্ত মহাশয় চট্টগ্রামের বৈদ্যবড়ুয়াগণকে আসামের বেজবড়ুয়ার ন্যায় উপাধি ও ব্যবসা দৃষ্টে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিবেন কি ?

৭। চট্টগ্রামের কায়স্থগণের মধ্যেও "বৈদ্য বিশারদ" "বৈদ্যরত্ন" "কবিরঞ্জন" "ঠাকুর" প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয় ; তাহা বলিয়া ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যজাতি বলিতে হইবে কি ? বর্ত্তমানে "ভট্ট" "পরমহংস" "মহর্ষি" "বিদ্যারত্ন" প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-সুলভ উপাধিগুলিও যদৃচ্ছ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য চট্টগ্রামে কোন কোন মুসলমানেরও "পণ্ডিত" উপাধি আছে।

৮। চট্টগ্রামে স্মরণাতীত কাল হইতে বৈদ্য ও কোন কোন কায়স্থের পরস্পর আদান প্রদান থাকাতে এবং মাসিক অশৌচ গ্রহণ ইত্যাদি যাবতীয় শাস্ত্রীয় কার্য্যে সৌসাদৃশ্য থাকাতে এ দেশে প্রকৃত বৈদ্য কে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। এ দেশে যে একটী শ্লোক প্রচলিত আছে তদ্দৃষ্টে দেখা যায়—

"আদ্য বৈশ্বানরো শক্তি ধন্বন্তরী তথৈবচ।
দত্ত শাণ্ডিল্য পান্থশ্চ বড়েতে বৈদ্য-নায়কাঃ॥"

তদ্ভিন্ন ভরদ্বাজ-গোত্র দাস দাস ; কাশ্যপ-গোত্র গুপ্ত দাস ও বৈদ্য মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই আট ঘরের উপাধি ও গোত্র কায়স্থের মধ্যে নাই, শূদ্রের মধ্যে আছে। এমন কি এদেশে শূদ্র ও গোলামের মধ্যেও

ঐ আট গোত্রের কোন কোন গোত্র আছে। চট্টগ্রামের অনেক অনুন্নত গ্রামে ঐ সমস্ত উপাধিধারী বৈদ্যগণ নিজ হস্তে হালচাষ, মুটেগিরি ও বাসায় চাকরি করিয়া থাকে, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবস্থাপন্ন হইয়া অথবা উন্নত বা দূরস্থ সুগ্রামে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া, কেহ বা বৈদ্যগণের সহিত দুই চারিটী সম্বন্ধ করিয়া কোন কোন পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত বৈদ্যকে অর্থাদি প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার জ্ঞাতি বলিয়া, স্বীকার করাইতেছেন। দুই এক পুরুষ কিঞ্চিৎ কষ্ট পাইতে হইলেও ইহারা শেষে একেবারেই প্রকৃত বৈদ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

৯। হিন্দুস্থানের "মিশ্র" উপাধিবিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণগণকে গুপ্ত মহাশয় অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ করিতে যাইয়া মিশ্র শব্দের যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সেই নিয়ম মতে কেহ কেহ "গুপ্ত" শব্দেরও এইরূপ ব্যাখ্যা করেন :—গুপ্ত শব্দের অর্থ লুক্কায়িত, গোপন বা অপ্রকাশ অর্থাৎ যাহাদের জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিষয়গুলিন গুপ্ত করা হইয়াছে; কাজেই ইহারা কখন শূদ্রবৎ কখন বৈশ্য কখন অম্বষ্ঠ ও কখন ব্রাহ্মণ যখন যেরূপ সুবিধা বোধ করেন সেইরূপ বিধি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী।
চট্টগ্রাম।

ভূতাবেশ।

জ্যৈষ্ঠ মাস। সূর্য্য ডুবিয়াছে, কিন্তু তখনও ঠাণ্ডা পড়ে নাই। স্বহস্তে প্রস্তুত সিদ্ধির সরবৎ পান করিয়া শুকুলজি মহাশয় তামাকু চূর্ণ ও চূনে মিশাইয়া "গালী" মলিতেছেন। সামান্য চূন তামাকু মিশাইতে বেশি বলের প্রয়োজন নাই, কিন্তু অঙ্গনের ভৃত্যদের খাট ছাওয়া দেখিয়া তাঁহার যে বিরক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা নিঃশব্দে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও করতলে ঘর্ষিত হইতেছিল।

মিশ্রিত "গালী" নিম্ন-ওষ্ঠ ও দন্তশ্রেণীর মধ্যে টিপিয়া দিয়া অবশিষ্ট থর্সান ও সোনার মত চক্‌চকে পিতলের চূনাটিটি "বটুয়ার" (থলিয়া) মধ্যে পুরিলেন। বটুয়াটির মধ্যে বিস্তর জিনিস—পান, সুপারী হইতে জাঁতি, ছুরি, চিঠিপত্র সব সেই বটুয়াতে। অবশেষে সেই প্রকাণ্ড বটুয়া কোমরে ঝুলাইয়া খড়ম পায়ে দিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া নীচে নামিলেন। চাকর দুইটা তাঁহার চক্ষুভঙ্গী দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল।

"বুজারি পুত ছুছুন্দর নেইত! ছোড়ি দে।"

চাকরকে ধাক্কা দিয়া স্বয়ং বাবু খাট লইয়া বসিলেন। মুখ ভেঙ্গাইয়া বলিলেন, "খাটিয়া ছাড়্‌ল হইছে! কুত্তাক্ জন্মেইল শালা লোগ খাটিয়া কভি দেখ্‌লেইছেতঃ" (খাট ছাওয়া হচ্ছে! কুকুরের জন্মা শালারা কি কখনো খাট দেখেছে?)

ফুল কাটিয়া ছক্ দিয়া দ্রুত হস্তে তিনি দড়ি ঘুরাইতে লাগিলেন। চাকরটা ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল।

একজন বলিল, দেখ! হামরা আরোসেঁ হেন হোতেই। (দেখ, আমাদের কাছে এমন আসবে?)

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, একনাথ বাবু নিবিষ্টচিত্তে কার্য্য করিতেছিলেন, হঠাৎ বাহিরে গোলোযোগ হইল, গরুর গাড়ীর কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ হইতে লাগিল। একটা চাকর দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "পাহুঁনা, বাবু—সমধি দামাদ।" (কুটুম্ব, বেহাই, জামাই)—

শশব্যস্তে বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"সারথুবালা?" (সারথুর?) "হঁ! বর্সাইতিক ডালিয়া লেকে এলিইছ ত। (হাঁ, বর সাবিত্রীর ডালা নিয়ে এসেছেন।)

কুটুম নারাইন্দ্র প্রবেশ করিলেন, "রাম রাম শুকুলজি।"

"রাম-রাম তেবারীজি। আইয়ে, বইঠিয়ে।"

দুই বৈবাহিকে কোলাকুলী হইল। "খ্যঁা কুশল আচ্ছা তেবারিজি?"

"আচ্ছা, বহুত আচ্ছা, আপলোক খুসিসে হেঁ ?"

জামাতা শ্বশুরের "গোড়ে লাগিলেন।" (প্রণাম করিলেন।)

তেবারিজির সঙ্গে অনেক লোক। দুইজন দাই, চারিজন চাকর; আর এক গাড়ী ডালার দ্রব্যাদি। চাকরেরা একে একে সকল বস্তু অন্দরে লইয়া গেল, দাই দুইটা "পুজাক্ ডালিয়া" আর "কনিয়ানীক ডালিয়া" মাথায় করিয়া চলিল।

বাড়ীর মধ্যে মেয়েরা তখন গীত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

"আনান্দা ভেইল মেরে এইঙ্গানা,
সাফলো ভেইলা মেরে নয়ানা। ইত্যাদি—

অবশেষে সকলে আসিয়া "চিজ সব" (জিনিস সব) দেখিতে আরম্ভ করিলেন; সাত কুণ্ডা (হাঁড়ী) খাজা; দুই তাই দহি; একুশ সাবাসিনের নুঙ্গা; (কাপড়), একুশ জোড়া "লেইঠি" (চুড়ি), তদুপযুক্ত টিক্‌লি, সিঁদুর, বিঁধ্‌লী প্রভৃতি। সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর "পূজাক্ ডালিয়া"। তাহাতে সর্ব্বনিম্নে একুশ সের "আচ্ছদ্" (আতপ চাউল), তাহার উপর একুশটা "কাঁসার-অ" (চাউল গুঁড়া ও গুড়ের নাড়ু), একুশটা "ঠেকুয়া", "পিরাকিয়া", "আনার কলি", "সাঁচ"। এই নানা মূর্ত্তি "পাঁচ মিঠানের" উপর তিনটি প্রকাণ্ড "আনার কলি"; অসংখ্য ময়দার ফুল, পাখী, নক্সা শুদ্ধ ঘিয়ে ভাজা হইয়া চিনির রস মাখিয়া এবং ভিতরে কাঁচা সুজি লইয়া উপস্থিত রমণীগণের আনন্দ অতি বৃদ্ধি করিতেছিল। তাহার উপর অতি প্রকাণ্ডকায় এক ময়দার নৌকা, ইহারও পেটে চিনি ও সুজি, গায়ে নক্সা, তাহার উপর বর, কন্যা প্রভৃতি মূর্ত্তি। তাহারও উপরে বধূর চুনারী, লেইঠি, একরাসি টিক্‌লী, কুরতা, বটুয়া, মসেলা, ছোহারা, বাদাম, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি অনেক দ্রব্য। কনিয়ানীক্ ডালায় বেশি কিছু নাই, শুধু জোড়া জোড়া কাঁচের

পরা; লাহাঙ্গ (ঘাগরা) চাদর (ওড়না) পরা পুতুলগুলি বড়ই সুন্দর। আর সেই ডালাতে একটি কন্যাদানে যত জিনিস প্রয়োজন হয় সমস্তই ছিল। থারিয়া (থালা), লোটা (ঘটি), "সমধি বাহুঁরার" (বেহাই বেহানের কাপড়) জেবর (অলঙ্কার) সকলই তাহাতে সাজান আছে। এক জোড়া পুতুলের বিবাহ হইবে কি না!

জলধারা দিয়া মেয়েরা জিনিস "ঘর করিল।"

বলা বাহুল্য এ দেশে নিতান্ত গরীবের ঘরেও বর্সাইৎ বা তীজ উপলক্ষে তিন কুণ্ডা ও তদুপযুক্ত দ্রব্যাদি আনিতে হইবেই।

আর কন্যা পক্ষকেও বর বিদায় করিবার জন্য অনেক সময় "থারিয়া, লোটা" বন্ধক দিয়া টাকা আনিতে হয়। বরের সঙ্গে যতগুলি পুরুষ আসিবে সকলকেই "পাঁচটুক কাপড়া" (কাপড়, চাদর, জামা, পাগড়ী, গামছা) দিতে হইবে। তা ছাড়া "লোচ্না"তে ব্যক্তি বিশেষের মর্য্যাদাস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ রজতখণ্ড দানেরও যথেষ্টরূপ ব্যবস্থা আছে। ফলতঃ এইরূপ নিত্য নৈমিত্তিক বিধি বেহভারের জন্য আমাদের দেশের বড়মানুষের বড়মানুষী অতি অল্পকালেই শেষ হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণ সন্তান গরু চরাইয়া, গাড়ী হাঁকাইয়া খায়।

যাহা হউক উপস্থিত স্থলে সেরূপ করুণ রসাবির্ভাবের কোনই সম্ভাবনা নাই; ফুলবাড়িয়ার শুকুলরা নবীন বড় লোক। ইংরাজি শিক্ষার মঙ্গলে, এ সকল "অনর্থক" খরচায় ঘৃণাও আরম্ভ করিয়াছেন; সুতরাং বর্সাইং দেখাটা বিশেষ আনন্দজনক হইবে সন্দেহ নাই।

যথাবিধি বর ও বধূ "চৌকপর" (আলিপনার উপর মাদুর পাতা) বসিয়াছেন। "কোহবর" গীত হইতেছে। এমন সময় একটি পাঁচ বৎসরের বালক কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল "নানী গে, হামরা জনৌ কাঁহা গেল ?" (নানী, আমার পৈতা কোথায় গেল ?)

নানী উঠিয়া বলিলেন, "মরো, ঝাড়কাহা! জনৌ কাঁহা যে ভৌলরে ?" (আ মরণ, পৈতে কোথা যাবেরে, বোকা ছেলে ?)

গান থামিয়া গেল। ক্রন্দনের স্বরে ছেলেটা বলিল, "কি জান গেলা !"

"কাঁহা গিরি পড়লেই মালুম।" (কোথাও পড়েছে বোধ হয় ?)

"নেহি ; জনৌ খোলিকে হামে উধর গেলি রহাঁ, কে চোরাই লেল্ কে ! (না, আমি পৈতে খুলে রেখে ঐদিকে গিয়াছিলাম, কে চুরি করেছে।)

বালক অ্যাঁ অ্যাঁ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মেয়েরা হাসিয়া উঠিল। নানী বলিলেন, "ঝড় কাহা, অলছ্না ! ব্রাহ্মনক্ লেড়কা জনৌ ছেড়িকে যায় ছেই কাঁহা রে ? (অলুক্ষণে কোথাকার,—বামুনের ছেলে পৈতে ছেড়ে কোথাও যায় ?)

এই সময় একটি তিন বৎসরের মেয়ে আসিয়া নানীর কাছে দাঁড়াইল ; প্রাঙ্গণের হাস্যমুখী নর্ত্তনশীলা একটি নয় বছরের মেয়েকে দেখাইয়া বলিল, 'নানী গে, ব্যাহে, মৌছিনে চোরালি ছেই।" (নানী ! ওই মাসী চুরি করেছে।)

"সুন্দরী !"

সুন্দরী গর্জ্জন হইবে ইতিপূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল, দৌড়িতে দৌড়িতে বলিল ; "টেক্না, তোহর জনৌ ব্যাহে জামুলক গাছিপর ছেই রে, লে লে যো।" (তোর পৈতা ওই জাম গাছে ঝুল্‌ছে, নিগে যা !) বালক তাহার সঙ্গে ছুটিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই বয়স্কাগণ কার্য্যে চলিয়া গেলেন ; বাড়ীতে কুটুম, তাঁহাদের অবসর নাই। তখন যুবতীরা আসর জাঁকাইয়া বসিল। গীতের স্বর আরও দীর্ঘ, আরও উচ্চ হইল।

সকলে লক্ষ্য করিবেন, এই দলে বঙ্গ-দুহিতা সরোজও স্থান পাইয়াছে, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য না করিলে চিনিতে পারা যায় না। তাহার বামে কোঁচাবাঁধা, নাভীর নীচে পরা কাপড়, পাটীপাড়া মুখশ্রী, সর্ব্বাঙ্গের "গোদ্না" (উল্কি), হাতভরা মুঙ্গেরিয়া লেইঠি তাহাকে

চুলের বাহার আর এলো খোঁপার নীচে ইয়ারিং দোলান কোমল বালভাবময় তাহার সুপরিচিত মূর্ত্তিখানি পাক্কা দেড়ভরি সোনার চাঁদ চিতিয়াদার প্রকাণ্ড নৎ ও কাণের গণ্ডস্পর্শী দীর্ঘ তর্কিতে নিতান্ত অপরিচিত করিয়া ফেলিয়াছে। দেশবালী কথায় (পশ্চিমে কথায়) সে বিশেষ পারদর্শিনী হইয়াছে। বলা বাহুল্য গীতেও তাহার কণ্ঠ নিতান্ত নীচে ছিল না।

একজন রসিকা বলিলেন, "মরো, হে, কিস গীত গাবেইছ! ঝুম্মর উম্মর নেই হোতেই? ইস ছোর হেন কি! (কি সব গানই হচ্ছে!—ঝুমুর টুমুর হবে না? কি সব ছায়ের মত গান।)

যথার্থ; সকলেই একমত হইল, ঝুমুর গানগুলি এ দেশের সৌখিন ও সুন্দর গান। কিন্তু পাশ হইতে সরোজ বলিল, "হে জি পান সৌথা, পাহুঁনা ছেই জি! ঝুম্মর কেনা কে"—(প্রাণসখি, ভাই কুটুম আছে যে, ঝুমুর গাইবে কেমন—)

বাধা দিয়া পানসথা বলিল, "তঃ, সে কি হোতেই!—পাহুঁনাই ল্যা নেই গীত, ঝুম্মর আচ্ছা আচ্ছা গাব। (ওঃ তা কি হবে? কুটুম্বের জন্যই না গান, ভাল ভাল ঝুমুর গাহ!)

"নদীয়া কিনার মির্জা বেসরি বানাবে হো!—"

গানটা বেশ উঠিয়াছিল, কিন্তু একজন সুরসিকার পছন্দ হইল না, এ বার্সাতের দিন মির্জাকে দূর "নদীয়া কিনারে" রাখা কি সঙ্গত?—গান উঠিল,—

চুন্ চুন্ ফুলবাসে সেজিয়া বিছাওলা—
সেজিয়াই তর
সেজিয়াই তর
পিয়া রহলেই লুকাই, রহলেই লুকাই, পিয়া রহলেই লুকাই। (১)
হাত ধরি আনু, পেঁইয়া পড়ি আনু—
গলিয়াই মে

খুঁজিয়া ফুল আনিয়া বিছানা বিছাইলাম, বিছানার তলে স্বামী লুকাইল।১

গলিয়াই মে
পিয়া রহলে লুকাই, রহলে লুকাই পিয়া—(২)
এক চড় মারু দোসর চড় মারু
ওরিয়াই তর
ওরিয়াই তর
পিয়া কাঁদে হামার ; কাঁদে হামার ; পিয়া—(৩)
ঘরসে বাহার ভেলি শাশু হামার
কে মারে রে
কে মারে রে
মেরে বাবু দুলার, কে মারেরে মেরে রাজা দুলার।—(৪)
মারলাঁ তো মারলাঁ আপন পিয়া মারলাঁ
উস্‌মে ক্যা
উস্‌মে ক্যা
শাশু লাগে তোহার, উস্‌মে ক্যা শাশু—(৫)
তোহে বিয়াইলা শাশু টাটিয়া লাগাই—
ঢোলকেই পর
ঢোলকেই পর
মেরে আনে বিহাই, আনে বিহাই পিয়া—(৬)

সাবিত্রী ব্রতের দিন পিয়াকে নিকটে রাখা খুব উচিত, কিন্তু দিনের "বড়্ পূজা"র ফলে সকলের স্বামী এইরূপ বাধ্য হইবেন কিনা সন্দেহ।

পরদিন প্রভাতে গ্রামের সমস্ত "আহেবাতী" (সধবা) এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের তলে আসিয়াছে।—সকলের মাথায় এক এক ডালিয়া ; ফুল চন্দন প্রভৃতি পূজার সামগ্রী।

হাত ধরিয়া পায়ে পড়িয়া ডাকিলাম খাটের পাশে গিয়া লুকাইয়া থাকিল।২
(অবশেষ) এক দু চড় মারিলাম, সে সিঁড়ির নীচে কাঁদিতে লাগিল। (৩)
ঘর থেকে আমার শাশুড়ী বাহির হইয়া বলিল, কে আমার বাছাকে মারে ? ৪
মেরেছি ত কি ; আপনার স্বামীকে মারিলাম, তোমার তাতে কি কথা।" ৫
(আমি কি তোমার মত ?) তুমি অন্ধকার ঘরে প্রসব করিয়াছিলে
আর আমাকে ঢোল বাজাইয়া—বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছে। ৬

ইহার মধ্যে একনাথ বাবুর পৌতি ও সিংহেশ্বরলাল চৌধুরীর ভগিনীর প্রথম পূজা। তাহারা বরের সহিত "গেঁট বাঁধিয়া" (আঁচলে ও চাদরে গ্রন্থা দিয়া) বসিয়া আছে। পুতুলদের বিবাহ হইতেছে, বাজনা বাজিতেছে, গীত হইতেছে। অবশিষ্টা বালিকা, যাহাদের এখনও বিবাহ হয় নাই তাহারা ফুল আচ্ছদ্ কুড়াইতেছে, এবং শীঘ্র শীঘ্র বিবাহের জন্য—অন্ততঃ এইরূপ মহোৎসবে পূজা করিবার অধিকারিণী হইবার জন্য "বড়ির" (বটের) তলে মাথা ঠুকিতেছে। পুরোহিত ঠাকুর পুতুলের বিবাহ দাত্রীকে "স্থুত মমর গঁড়ে" মন্ত্র পড়াইতেছেন, এই সময় একটি বালিকা ভীতস্বরে বলিল, "পার, পার, হে গে পার্ব্বতীয়া !—কি ভেলৌন গে ?"

পারবতীয়া অনূর্দ্ধ সাত বৎসরের বালিকা, সে হঠাৎ মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে নীরব নিশ্চল ও চোখ বুজিয়া থাকিতে দেখিয়া সঙ্গী সঙ্গিনীরা ভীত হইয়া উঠিয়াছে।

এই বালিকা সিংহেশ্বরের সর্ব্ব কনিষ্ঠা ভগিনী ও কুমারী ; উপস্থিত আত্মীয়াগণ দৌড়িয়া তাহার নিকট আসিলেন।

"গে বেটি, পার !"

পারের গলা তখন ঘড় ঘড় করিতেছে, দুই চোখ বহিয়া জল পড়িতেছে, মাঝে মাঝে চোখ খুলিতেছে ও মুদিতেছে। তাহার সমস্ত অবস্থা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া পারের জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিল "কে ছ! কহো, আহা, কানেইছত।" (কে আছ বল,—আহা কাঁদিতেছেন !)

ক্ষুদ্রদেহা পার উঠিয়া বসিল, জ্যেষ্ঠার গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বেটি গে, দুলারো গে ! এহিন আমরা ভাগ গে !" (আমার এমন মন্দভাগ্য !)

বাস্! ক্রন্দন ধ্বনিতে সমস্ত আনন্দ ধ্বনি ডুবিয়া গেল। উপস্থিত

রমণীরা সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। "সিঙ্গেস্রক্ মাই, হে,—সিঙ্গেস্রক্ মাই এইলিহত।" (সিংহেশ্বরের মা আসিয়াছেন।)

বলা উচিত, সিংহেশ্বরের মাতা আজ দুই বৎসর পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু পার্ব্বণ বিশেষে প্রায়ই কন্যা ও বধূগণের উপর আবির্ভূতা হন। সম্প্রতি কন্যার পূজা দেখিতে আসিয়াছেন। কিন্তু জীবিতকালে কোন সাধ মিটে নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

সে ছোট মেয়েটির কথা শুনিলে কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য হইতে হয়; বড়ই ক্ষোভের সহিত সে স্বামী ও পুত্রের (পিতা ও ভ্রাতা) সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতে লাগিল।

তখন পারবতীয়ার সহচরীরা ভূতের ভয়ে পলাতকা বটে কিন্তু প্রায় সকলের স্কন্ধেই কেহনা কেহ নিশ্চয়ই আবির্ভূত হইয়া আছেন। অন্ততঃ ব্রহ্মদৈত্য ত বটেই! এ দেশের যুবতী, সধবা, এবং অল্পবয়স্ক পুরুষ মরিলে তাহার আত্মার এইরূপই সদ্গতি হয়।

ভূত বলিতে লাগিল, "হামরা নেই মানেইছে;"—

বাধা দিয়া কন্যা বধূরা বলিল "মাই, তোহরা নেই মানেইছি, ত কেক্‌রা মানেইছি! কুলদেওতা লগ তোহরা পাঁচো থাবা দেলেইছি, ডোরা আদ্রামে, হোলী দশ্‌হরামে, ভোগ লাগাইছি।" (মা, তোমাকে না মানি তো কাকে মানিব? কুলদেবতার থাবার নিকট তোমারও পাঁচটা থাবা দিয়াছি, সব পর্ব্বে ভোগ দিই।)

ভূত একটু স্বর টানিয়া বলিল, "আরোও চন্‌রিক সাদিমে হামরা বোলালি রহ? (চন্দ্রির বিবাহে আমাকে ডাকিয়াছ?)

ঠিক কথাই তো। বধূরা "কস্তুরী" মানিয়া লইলেন। এবং একখানা "রজ্‌লো নুসা" ও এক জোড়া লেইঠি মৃতা মাতাকে উপহার দিতে স্বীকৃত হইয়া শাশুড়ীর ক্ষুব্ধচিত্ত কথঞ্চিৎ স্থির করিলেন।

ইত্যবসরে সিংহেশ্বরের পিতা বির্যেশ্বর (ব্রজেশ্বর) ও পুত্র সিঙ্গেকার কামেশ্বর ও যাগেশ্বর লালেরা উপস্থিত হইল।

বিয্যু´ চোধ্‌রী বলিলেন, "ইস হামরা নসীব নেই ?—" (এ সকল আমার দুর্ভাগ্য নয় ?)

ততক্ষণে কন্যার দেহে আবির্ভূতা জননী পুত্রদের প্রত্যেকের প্রণাম গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ও "মর লাক পর" যে তাহাদের জন্য তিনি কোথাও স্থির থাকিতে পারেন না তাহাদের দশমাস দশদিন পেটে ধরিয়া "পোষ্‌ল পাল্‌ল" ছেলেদের লইয়া তিনি কোন "আরমানই" (সাধই) মিটাইতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে এই ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে বৃদ্ধ স্বামীকে যাহাতে পুত্র বধূরা কোনওরূপ অযত্ন না করে, পুত্রগণকে সে বিষয়ে মনোযোগ দিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ চৌধুরী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলিন ; বধূরা চিৎকার করিতে করিতে বলিতে লাগিল "মাই হেন ছিলা হে মাই! কাঁহা গেলা হে মাই! শ্বশুর হামরা আরো কে বাপ ছত হে মাই,—তোঁহে ওহ্‌না কথিলে বোলেই ছ হে মাই।"

অনেক কাঁন্নাকাটির পর স্বামীর পদধূলি লইয়া মুনুয়াদের মুখচুম্বন করিয়া মাতা সুল্‌তান গঞ্জর গেইবিনাথের মন্দিরে চলিয়া গেলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার সেইখানেই বাসস্থান হইয়াছে, পুণ্যবতী ছিলেন কিনা। তাঁহার মাতা ও মাতামহীও যথাক্রমে, "বটেশ্বর মান ও বৈজনাথক্ মন্দিলে," বাস করেন।

এদিকে এই সব কাণ্ড হইতেছে, অপর দিকে আরও হুলুস্থুল। একটি ভূতের আবির্ভাব হইলে আরও দুচারিটি তাহার সঙ্গে আসিয়া

খুলিল, সিন্দুর মুছিল, আঙ্গিয়া চাদর রঙ্গকরা কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া একখানি উজর (সাদা) "লুঙ্গা" বাঙ্গালীদের মত করিয়া পরিয়া মাথার কাপড় খুলিয়া দাঁড়াইল।

"মরো বাঙ্গালিন গোটি ফেণু এনেই হে ভৌজি! (আ মর সেই বাঙ্গলা ভূতটা এসেছে বৌ দেখ।)

বাঙ্গালিনী ততক্ষণ, সকলের হাত ধরিয়া ধরিয়া বলিতেছে, "ভল আছ, ভল আছ ত? কলকত্তা হ'তে রেল গাড়ীপর চড়ি এসেছি। হুগলী সহরে হামার ঘর রহেঁছে।"

হাসিতে হাসিতে এক নবীনা বলিল, "হ্যা ভে বাঙ্গালীন ছত! একরা সে ভেঁট ভেলৌন হে ভূতিন?" (ও ভূতনী, এই দ্যাখ এক বাঙ্গালিনী, এর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?)

ভূত বাঙ্গালিনী দৌড়িয়া সরোজের হাত ধরিল। সে পারবতীয়াকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছিল, তাহাদের পরিবারের ক্রন্দনে তাহার চোখ ছল ছল করিতেছিল। সহসা সে সজোর টানে চমকিত হইয়া ফিরিল। এ কি—চাম্পাক্ মাই দিদির এ দশা কেন?

ভূত তখন বলিতেছে, "বোন! আমিও যেথাকার ছি তুমিও সে হে ঠামের আছ, হামে তোমরা সাঙ্গে ভাব কারতে আসলাম।"

সরোজ মনে মনে হাসি থামাইয়া বলিল, "বাড়ি আচ্ছা নেই।"

ভূত ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না না, ওহ্না নয়, তোঁহে বাসা লেইতে কাথা কোন, আমি বাঙ্গালীই আছি!"

এই সময় দূরে মহা কোলাহল উঠিল, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা চীৎকার করিয়া ছুটিতেছে, বড় মানুষরাও কম দৌড়িতেছে না, সকলের পশ্চাতে একজন স্ত্রীলোক এক ময়লা কাপড় পরিয়া ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া তাহাদের ধরিতে দৌড়িতেছে; "জাত লে ভৌন, জাত লে ভৌন,"

(চণ্ডালনী এসেছে)—আপন আপন ডালা কুলা সকলে মাথায় তুলিয়া প্রস্থানের উপক্রম দেখিল। মেয়ের দল সুন্দর সারি দিয়া ছিল, ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

ভাগ্যবশতঃ শুকলজির বাড়ীর প্রায় আটজন চাকর সেইখানে ছিল, মধ্যপথে সকলে চামার ভুতনীকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। নানা কলরবের মধ্যে পূজা শেষ হইয়া গেল।

প্রবাসিনী।

অচলা-কাহিনী।

(রূপক)

আশা-বন-পারে একেলা রহিল
বেঁধে সে একটি বাসা ;
কাহারো নিকটে কিছু না পাইল
প্রশংসা বা ভালবাসা !

সরলা বালিকা সহজ প্রকৃতি
মোহের বিবশ যে সে,—
ভাবিতে জানে না বুঝিতে পারে না
কিবা যে ঘটিবে শেষে।

বাহিরের শুধু দৃশ্য দেখিয়া
ঘরটি বাঁধিয়া নিল ;—
এ ধরণী পরে এ বসতি তার
বাস-অসঙ্গত ছিল।

স্বজন বলিয়া যারা ছিল তাই
চিন্তায় মলিন সবে,
বুঝালে তাহারে—বৃথা বৃথা ওগো,
বসতি তুলিতে হবে,

কোনো মতে হায় হোথায় তোমার
বাসের যোগ্য নারে,
সকলে মিলিয়া নতুবা আমরা
বেঁধে দিতাম বাছারে।—

এমতে সকলে মধুরে গরলে
কত যে বুঝাল তারে,
অবোধ বালিকা বুঝিল না হায়,
শুনিল না একেবারে।

আরও সে মুগুধা শাপিত তাদেরে
ভাবিত নিতান্ত পর,
হিংসা করিয়া বলিছে তাহারা
ছাড়িতে এ হেন ঘর!

*　　*　　*

*　　*　　*

দেখিতে দেখিতে স্রোতের মতন
সময় বহিয়া গেল,
আশা কুসুমিল জীবনে তাহার
প্রথম ফাগুন এল।

মলয় পবন বহিতে লাগিল
কুসুম সৌরভ ভরে,

আমোদ উচ্ছ্বাস পিরীতি পিয়াস
কত যে হৃদয়ে তার,
সুখের স্বপনে জাগিয়া তখন
ছিল না ভাবনা-ভার।

*　　　*　　　*

সময়ের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
সকলি চলিয়া যায়,
মলয় পবন দূরে স'রে গেল
নিঠুর ঝড়ের ঘায়।

(যদিও সে এবে বুঝিতে পেরেছে
ভাবিতে জানে বিরলে,
সে ভাবনা তবু এতই কিঞ্চিৎ
'কিছু না' বলিলে চলে।—

সজল নয়নে মাথা নুয়াইত
যখন বকিত তারা,
আবার চকিত ভ্রমর-গুঞ্জনে
হয়ে যেত আত্মহারা!)

দ্বিগুণ প্রবলে ক্রমশ যখন
বাড়িয়া উঠিল ঝড়,
ভাবিল স্বজন এবার নিশ্চয়
ভেঙ্গে যাবে তার ঘর।

বলা-বলি তারা কোরেছিল সবে—
'এ যে আশু ভালবাসা!
দেখবে এখন দু'দিন পরে
কোথা গেছে তার বাসা!'

প্রকৃতই ওগো, দেখিয়াছি মোরা
দেখা যেত ধরা পরে,
কত কত ঘর হারায়ে গিয়াছে
উড়ায়ে এমনি ঝড়ে।

যত বার মোরা চেয়েছি কিন্তু
ভঙ্গুর কুটীর তবু,
বিস্ময় মেনেছি!—তুফান আঘাতে
ভাঙিতে দেখিনে কভু!

*　　　　*　　　　*

*　　　　*　　　　*

শ্রীনরেন্দ্র কিশোর বর্ম্মা।

অঙ্গুত্তর-নিকায়।

পুরুষের শ্রেণীভেদ।

পালিভাষার প্রাচীন গ্রন্থসমূহ সূত্র বিনয় ও অভিধর্ম্ম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। উহাদের সাধারণ নাম ত্রিপিটক। সূত্র-পিটকে যে সকল গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে অঙ্গুত্তর-নিকায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ডাক্তার রিচার্ড মরিস (Dr. Richard Morris, M. A, L. L. D, D. C. L,) উক্ত গ্রন্থ রোমান্ অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া লণ্ডন পালিটেক্‌স্‌ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন। চীন ভাষায় অঙ্গুত্তর-নিকায় গ্রন্থের কয়েকখানি অনুবাদ বিদ্যমান আছে। বৌদ্ধসংস্কৃতে ঐ গ্রন্থের নাম একোত্তরাগম বা একোত্তরিকাগম। ৩৮৪ খৃঃ অব্দে ধর্ম্মনন্দী নামক পণ্ডিত অঙ্গুত্তর-নিকায় গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদের শেষে লিখিত আছে মূল পালিগ্রন্থে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শ্লোক বা অশীতি লক্ষ শব্দ বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় ৩৯৭ অব্দে প্রজ্ঞারুচি নামক পণ্ডিত মূল গ্রন্থ পুনরায় চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। মূল পালিগ্রন্থ কোন্ সময়ে বিরচিত হইয়াছিল তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। অশোকের সময়ের খোদিত স্তম্ভাদিতে অঙ্গুত্তরের বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধগণ বলেন খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে প্রথম বোধিসঙ্গম কালে অঙ্গুত্তর-নিকায় গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। বস্তুতঃ তাঁহাদের মতে উক্ত গ্রন্থ বুদ্ধদেব স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। এই অঙ্গুত্তর-নিকায় গ্রন্থের পুগ্‌গলবগ্‌গের ভাবার্থ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন :—

"হে ভিক্ষুগণ! সংসারে তিন প্রকারের ব্যাধিত লোক আছে। এক প্রকারের ব্যাধিত লোক আছে যাহারা স্বাস্থ্যকর খাদ্য প্রাপ্ত হউক

করুক বা নাই করুক, রোগ হইতে কোন প্রকারেই মুক্তিলাভ করে না। আর এক প্রকারের ব্যাধিত লোক আছে যাহারা উপযুক্ত খাদ্য ঔষধ বা পরিচারক লাভ করুক বা নাই করুক, রোগ হইতে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে। অন্য এক প্রকারের ব্যাধিত লোক আছে যাহারা উপযুক্ত খাদ্য, ঔষধ ও পরিচারক প্রাপ্ত হইলে রোগমুক্ত হয় কিন্তু তদভাবে রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে না।

হে ভিক্ষুগণ যে সকল ব্যাধিত ব্যক্তি উপযুক্ত খাদ্য, ভৈষজ্য ও পরিচারক লাভ করিলে রোগমুক্ত হয়, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই চিকিৎসকগণ রোগীর খাদ্য, ঔষধ ও পরিচারকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক রোগীর দৃষ্টান্তে অপর রোগিগণের রোগমুক্তির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

হে ভিক্ষুগণ! সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে। এক শ্রেণীর লোক বুদ্ধকে দর্শন করুক বা না করুক ও বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম শ্রবণ করুক বা না করুক, ধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করে না। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা বুদ্ধকে দর্শন করিয়াও এবং বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াও ধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করে। অন্য এক প্রকারের লোক আছে যাহারা বুদ্ধের দর্শন পাইলেও বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে পারিলে ধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করে না কিন্তু তদভাবে ধর্ম্মের নিয়ম অতিক্রম করে।

হে ভিক্ষুগণ! যে সকল লোক বুদ্ধের দর্শন লাভ করিলে এবং বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিলে ধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করে না তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বুদ্ধগণ ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন।

হে ভিক্ষুগণ! সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে। এক শ্রেণীর লোক হিংসাপূর্ণ কায়কর্ম্ম, হিংসাপূর্ণ বাক্‌কর্ম্ম ও হিংসাপূর্ণ মনঃকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া হিংসাপূর্ণ লোকে জন্মপরিগ্রহ করে ও তথায় নানা যন্ত্রণা অনুভব করে; যথা নৈরয়িক সত্ত্ব। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা হিংসাপরিশূন্য কায়কর্ম্ম, বাক্‌কর্ম্ম, ও মনঃকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া হিংসাপরিশূন্য লোকে জন্মগ্রহণ করে ও তথায় নানাবিধ সুখভোগ করে; যথা শুভকৃৎস্ন দেবগণ। অন্য এক প্রকারের লোক আছে যাহারা হিংসাপূর্ণ ও হিংসাপরিশূন্য উভয় প্রকারের কায়কর্ম্ম, বাক্‌কর্ম্ম ও মনঃকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া হিংসা ও অহিংসা উভয় দ্বারা পরিপূর্ণ লোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনুভব করিয়া থাকে; যথা মনুষ্য।

হে ভিক্ষুগণ! বক্ষ্যমাণ তিন প্রকারের লোক মনুষ্যের বহুপকারক। যে লোকের সাহায্য লাভ করিয়া মনুষ্য বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের শরণাগত হন তিনি উক্ত মনুষ্যের বহুপকারসাধক। আর যাঁহাকে লাভ করিয়া মনুষ্য দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখধ্বংসের উপায় এই চারিটী আর্য্যসত্যের উপলব্ধি করিতে পারেন তিনি উক্ত মনুষ্যের বহুহিতসাধক। পুনশ্চ যাঁহাকে লাভ করিয়া মনুষ্য আশ্রবসমূহের ক্ষয়সাধন করিয়া অনাশ্রব চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করিতে পারেন তিনি উক্ত মনুষ্যের বহুপকারসাধক। হে ভিক্ষুগণ এই তিন প্রকারের লোক মনুষ্যের বহুহিতসাধক। সংসারে ইহাঁদের অপেক্ষা অধিকতর হিতকারী লোক আর নাই। অভিবাদন, প্রত্যুৎথান, অঞ্জলিকর্ম্ম, চীবরপিণ্ডপাতদান ও শয়নাসন ভৈষজ্য প্রদান এই সকলের নিয়ত অনুষ্ঠান করিয়াও ইহাঁদের কার্য্যের প্রতিশোধ করা যায় না।

"হে ভিক্ষুগণ! সংসারে তিন প্রকারের লোক আছে। যথা, (১) অর্কোপমচিত্ত, (২) বিদ্যুদুপমচিত্ত ও (৩) বজ্রোপমচিত্ত। এক প্রকারের লোক আছে যাহারা ক্রোধী, নৈরাশ্যযুক্ত, এবং অল্প কথায় বহুকোপ প্রকাশ করে। যেমন আকন্দ গাছ কাঠ দ্বারা ঘর্ষণ করিতে হইলে অনেক কষ্ট পাইতে হয়, সেইরূপ এই সকল লোকের সহ ব্যবহার করা অতি কষ্টকর। এই শ্রেণীর লোককে অর্কোপমচিত্ত বলে।

আর এক প্রকারের লোক আছেন যাঁহারা দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখধ্বংসের উপায় এই চারিটী আর্য্যসত্য সম্যকপ্রকারে উপলব্ধি করিয়াছেন। যেমন চক্ষুষ্মান্ লোক তমসাচ্ছন্ন রজনীতে বিদ্যুদালোকের সাহায্যে পদার্থসমূহ অবলোকন করে সেইরূপ এই সকল লোক চারিটী আর্য্যসত্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোককে বিদ্যুদুপমচিত্ত বলা যায়।

পুনশ্চ এক প্রকারের লোক আছেন যাঁহারা আশ্রবসমূহের ক্ষয় সাধন করিয়া চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করিয়াছেন। যেমন মণিই হউক বা পাষাণই হউক, বজ্রের অভেদ্য কিছুই নাই, সেইরূপ এই সকল লোক আশ্রবসমূহের ক্ষয় সাধন করিয়া সম্যক্ বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই প্রকারের লোককে বজ্রোপমচিত্ত বলা যায়।

নহে। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহাদিগকে সেবা, ভজনা ও উপাসনা করা উচিত। পুনশ্চ এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহাদিগকে সম্মানপুর্ব্বক মহা আগ্রহ সহকারে সেবা, ভজনা ও উপাসনা করা বিধেয়।

হে ভিক্ষুগণ! কোন্ লোককে সেবা ভজনা বা উপাসনা করা উচিত নহে? যে সকল লোক শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই তিন বিষয়ে হীন তাহাদিগকে সেবা ভজনা বা উপাসনা করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাদের প্রতি দয়া ও অনুকম্পা প্রকাশ করা বিধেয়।

কোন্ লোককে সেবা, ভজনা ও উপাসনা করা উচিত? যিনি তুল্যশীলসম্পন্ন, সমান সমাধিযুক্ত ও সদৃশ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট তাঁহাকে সেবা, ভজনা ও উপাসনা করা কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহার দৃষ্টান্তে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা অভ্যাস করা যায়।

কোন্ পুরুষকে মহাসমাদরপূর্ব্বক আগ্রহসহকারে সেবা, ভজনা ও উপাসনা করা কর্ত্তব্য? যিনি শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বিষয়ে তোমার অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাকে মহাসমাদরপূর্ব্বক আগ্রহসহকারে সেবা, ভজনা ও উপাসনা করা বিধেয়। কারণ তাঁহার দৃষ্টান্তে অপরিপূর্ণশীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা লাভ হয় এবং পরিপূর্ণশীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার পুনরভ্যাস হয়।

হে ভিক্ষুগণ! কথিত আছে :—

অপেক্ষাকৃত হীনব্যক্তির সেবা করিলে পুরুষ হীনতা প্রাপ্ত হন, তুল্য ব্যক্তির সেবা করিলে পুরুষ কখনই হীন হন না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট অবনত হইলে পুরুষ শীঘ্রই উন্নত হন। অতএব নিজের অপেক্ষা উচ্চতর ব্যক্তিকে ভজনা করা কর্ত্তব্য।

হে ভিক্ষুগণ! সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে। এক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদিগকে ঘৃণা করা উচিত, সেবা ভজনা বা পর্য্যুপাসনা করা উচিত নহে। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদিগকে উপেক্ষা করা উচিত, সেবা ভজনা বা পর্য্যুপাসনা করা উচিত নহে। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহাদিগকে সেবা ভজনা ও পর্য্যুপাসনা করা কর্ত্তব্য।

হে ভিক্ষুগণ কোন্ পুরুষকে ঘৃণা করা উচিত, সেবা ভজনা ও পর্য্যুপাসনা করা উচিত নহে? যে পুরুষ দুঃশীল, পাপধর্ম্মা, অশুচি, শ্রমণের উপযুক্ত কার্য্য করে না অথচ শ্রমণ বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করে, যে ব্রহ্মচারী নহে অথচ ব্রহ্মচারী বলিয়া প্রতিপন্ন

হয় না বটে কিন্তু তাহার পাপময় কীর্ত্তিশব্দ শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয়। যেমন অহিগর্ত্তে সর্প দৃষ্ট হয় না বটে কিন্তু উহার মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ বিষময় দংশন লাভ করে, সেইরূপ উক্ত ব্যক্তির অনুষ্ঠিত বিশেষ বিশেষ পাপকর্ম্ম দৃষ্ট হয় না বটে কিন্তু উহার দুর্নাম শীঘ্র শীঘ্র চতুর্দ্দিকে প্রচার লাভ করে।

হে ভিক্ষুগণ! কোন্ পুরুষকে উপেক্ষা করা উচিত, সেবা ভজনা পর্য্যুপাসনা করা উচিত নহে? যে পুরুষ ক্রোধশীল ও নৈরাশ্যবহুল, যাহাকে কোন কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ সমান প্রত্যুত্তর করে এবং যে কোন কথায় বিশ্বাস করে না, তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত, সেবা ভজনা ও পর্য্যুপাসনা করা উচিত নহে। যেমন প্রজ্বলিত তিন্দুক কাষ্ঠে আঘাত করিলে উহা বহুমাত্রায় চিট্ চিট্ করিয়া উঠে, অথবা যেমন আবর্জ্জনা রাশিতে আঘাত করিলে উহা হইতে বহু পরিমাণে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়, সেইরূপ ঐ ব্যক্তির সহ কথা বলিলে সে কুপিত হয় ও আক্রোশ প্রকাশ করে, ঐরূপ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করা উচিত, সেবা ভজনা ও পর্য্যুপাসনা করা উচিত নহে।

হে ভিক্ষুগণ! কোন্ পুরুষকে সেবা ভজনা ও পর্য্যুপাসনা করা উচিত; যে পুরুষ শীলবান্ ও কল্যাণধর্ম্মা তাঁহাকে সেবা ভজনা ও পর্য্যুপাসনা করা উচিত। ঐ ব্যক্তির সৎকর্ম্মসমূহ প্রশংসিত হয় ও উহাঁর পুণ্যময় কীর্ত্তিশব্দ সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করে।

হে ভিক্ষুগণ! সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে। সেই তিন শ্রেণী কি? গূথভাণী, পুষ্পভাণী ও মধুভাণী।

হে ভিক্ষুগণ গূথভাণী পুরুষ কাহাকে বলে? যে পুরুষ সভাস্থলে, পরিষদে, জ্ঞাতি-মধ্যে, জনতাসমীপে, রাজকুলে অথবা আনীত হইয়া জিজ্ঞাসিত হয় "হে পুরুষ তুমি যাহা জান তাহা বল," এবং সে যদি না জানিয়াও বলে "আমি জানি," না দেখিয়াও বলে "আমি দেখিয়াছি," স্বার্থহেতুই হউক, পরার্থহেতুই হউক অথবা কিঞ্চিৎ আমিষের লোভেই হউক সে যদি জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলে তাহা হইলে তাহাকে গূথভাণী বলে।

হে ভিক্ষুগণ পুষ্পভাণী পুরুষ কাহাকে বলে? যে পুরুষ সভাস্থলে, পরিষদে, জ্ঞাতিমধ্যে, জনতাসমীপে অথবা রাজকুলে আনীত হইয়া জিজ্ঞাসিত হয় "হে পুরুষ তুমি যাহা জান তাহা বল," এবং সে যদি অজ্ঞাত বিষয়সম্বন্ধে বলে "আমি জানিনা," জ্ঞাত বিষয় বলে "আমি জানি," অদৃষ্ট বিষয়ে বলে "আমি দেখি নাই,"

ও দৃষ্ট বিষয় বলে "আমি দেখিয়াছি ;" স্বার্থহেতুই হউক পরার্থহেতুই হউক, অথবা কিঞ্চিৎ আমিষের লোভেই হউক, জানিয়া মিথ্যা কথা বলেনা তাহাকে পুষ্পভাণী পুরুষ বলে।

হে ভিক্ষুগণ মধুভাণী পুরুষ কাহাকে বলে ? হে ভিক্ষুগণ ! যে পুরুষ কর্কশ কথা পরিহার করিয়া কর্ণ সুখকর, প্রেমপূর্ণ, হৃদ্য, কমনীয় ও বহুজনের তৃপ্তিদায়ক বাচ্য বলে তাহাকে মধুভাণী পুরুষ বলা যায়।

হে ভিক্ষুগণ ! সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে সেই তিন শ্রেণী কি ? অন্ধ, একচক্ষুঃ ও দ্বিচক্ষুঃ।

হে ভিক্ষুগণ অন্ধ কাহাকে বলে ? যে পুরুষের সেরূপ চক্ষু নাই যদ্দ্বারা অপ্রাপ্ত ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইতে পারে অথবা প্রাপ্ত ভোগ্যবস্তু বহুল করিতে পারে, এবং যাহার সাহায্যে কুশল ও অকুশল, প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, শুক্ল ও কৃষ্ণ বিষয় বিভাগ পুর্ব্বক উহাদের স্বরূপ জানিতে পারে, তাহাকে অন্ধ বলে।

হে ভিক্ষুগণ একচক্ষুঃ পুরুষ কাহাকে বলে ? যে পুরুষের সেরূপ চক্ষু আছে যদ্দ্বারা অপ্রাপ্ত ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইতে পারে অথবা প্রাপ্ত ভোগ্যবস্তু বহুল করিতে পারে, কিন্তু যে চক্ষুর সাহায্যে কুশল ও অকুশল, প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, শুক্ল ও কৃষ্ণ বিষয় বিভাগ করা যায় তাহা নাই, তাহাকে একচক্ষুঃ পুরুষ বলা যায়।

হে ভিক্ষুগণ দ্বিচক্ষুঃ পুরুষ কাহাকে বলে ? যে পুরুষের সেরূপ চক্ষু আছে যদ্দ্বারা অপ্রাপ্ত ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইতে পারে অথবা প্রাপ্ত ভোগ্যবস্তু বহুল করিতে পারে, এবং সেরূপ চক্ষুঃ ও আছে যাহার সাহায্যে কুশল ও অকুশল, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, শুক্ল ও কৃষ্ণ বিষয় বিভাগ করিতে পারে, তাহাকে দ্বিচক্ষুঃ পুরুষ বলা যায়।

হে ভিক্ষুগণ ! সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে। সেই তিন শ্রেণী কি ? অবকুব্জপ্রজ্ঞ, উৎসঙ্গপ্রজ্ঞ ও পৃথুপ্রজ্ঞ।

হে ভিক্ষুগণ অবকুব্জপ্রজ্ঞ পুরুষ কাহাকে বলে ? যে পুরুষ ভিক্ষুগণের নিক ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উদ্যানে গমন করে ; ভিক্ষুগণ তাহাকে আদি মধ্য-কল্যাণ ও পর্য্যবসান-কল্যাণ ধর্ম্মের উপদেশ দেন, স্বাস্থ্যকর, পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ বিষয় তাহার নিকট প্রকাশ করেন ; সে আস কথার আদি মধ্য ও অন্ত কোন দিকেই মন দেয় না, আস

সময়েও তাহাতে মনোনিবেশ করে না, গৃহে গমন করিয়াও তদ্বিষয় ভাবে না; তাহাকে অবকুব্জপ্রজ্ঞ পুরুষ বলা যায়। যেমন কোন কুম্ভকে অধোমুখ করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করাইলে উহাতে জল প্রবেশ করে না, কুম্ভের উপরিভাগ জলে অভিষিক্ত হয় কিন্তু অভ্যন্তরে এক বিন্দু জলও স্থান লাভ করে না। সেইরূপ ভিক্ষু-গণের পরিশুদ্ধ উপদেশ সমূহ উক্ত ব্যক্তির মনে কোন সংস্কারই উৎপাদন করে না। উক্ত পুরুষকে অবকুব্জপ্রজ্ঞ বলা যায়।

হে ভিক্ষুগণ! উৎসঙ্গপ্রজ্ঞ পুরুষ কাহাকে বলে? যে পুরুষ ভিক্ষুগণের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উদ্যানে গমন করে; ভিক্ষুগণ তাহাকে আদি-কল্যাণ, মধ্য-কল্যাণ, পর্য্যবসান-কল্যাণ ও পরিশুদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ দেন; সে আসনে বসিয়া তাঁহাদের কথার আদি মধ্য ও অন্ত সকল দিকেই মন দেয়। কিন্তু আসন হইতে উঠিয়া যাইবার সময়ে তদ্বিষয় ভাবে না; তাহাকে উৎসঙ্গপ্রজ্ঞ পুরুষ বলা যায়। যেমন কোন লোক আসনে বসিয়া উৎসঙ্গে (ক্রোড়ে) নানা খাদ্য, তিল, তণ্ডুল, মোদক, বদর প্রভৃতি রাখে। কিন্তু আসন হইতে উঠিবার সময় বিস্মৃতি হইলে তাহার উৎসঙ্গ হইতে সমস্তই পড়িয়া ছড়াইয়া যায়, সেইরূপ এই ব্যক্তি আসনে বসিয়া যাহা শ্রবণ করে, আসন হইতে উঠিয়া যাইবার সময় সে সমস্ত বিস্মৃত হয়। এইরূপ পুরুষকে উৎসঙ্গপ্রজ্ঞ বলা যায়।

হে ভিক্ষুগণ! পৃথুপ্রজ্ঞ পুরুষ কাহাকে বলে? যে পুরুষ ভিক্ষুগণের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উদ্যানে গমন করে; ভিক্ষুগণ তাহাকে আদি-কল্যাণ, মধ্য-কল্যাণ ও পর্য্যবসান-কল্যাণ ধর্ম্মের উপদেশ দেন; সে আসনে বসিয়া তাঁহাদের কথার আদি, মধ্য ও অন্ত সকল দিকেই মন দেয়, আসন হইতে উঠিয়া যাইবার সময়েও উহাতে মনোনিবেশ করে এবং গৃহে গমন করিয়াও তদ্বিষয় ভাবে; তাহাকে পৃথুপ্রজ্ঞ পুরুষ বলা যায়। যেমন কোন কুম্ভ উর্দ্ধমুখ করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করাইলে উহার অভ্যন্তরে জল প্রবেশ করে, কুম্ভ জল হইতে উঠাইবার সময়েও অভ্যন্তরের জল বহির্নিগত হয় না, সেইরূপ ঐ ব্যক্তি ভিক্ষুগণের উপদেশ সমূহ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করে, উঠিয়া যাইবার সময়েও ঐ সকল উপদেশ তাহার বিস্মৃত হয় না। ঐরূপ পুরুষকে পৃথুপ্রজ্ঞ বলা যায়।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

আমরা ও তোমরা।

১

তোমরা ও আমরা বিভিন্ন। কারণ তোমরা তোমরা এবং আমরা আমরা। তা যদি না হত তাহলে ইউরোপ ও এসিয়া এ দুই, দুই হত না এক হত। আমি ও তুমির প্রভেদ থাকৃত না। আমরা ও তোমরা উভয়ে মিলে হয় শুধু আমরা হতুম না হয় শুধু তোমরা হতে।

২

আমরা পূর্ব্ব, তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ, তোমরা শেষ। আমাদের জন্ম আগে, তোমাদের মরণ পরে। আমাদের দেশ মানব সভ্যতার সূতিকাগৃহ, তোমাদের দেশ মানবসভ্যতার শ্মশান। আমরা উষা, তোমরা গোধূলি। আমাদের অন্ধকার হতে উদয়, তোমাদের অন্ধকারের ভিতর বিলয়।

৩

আমাদের রং কালো, তোমাদের রং সাদা। আমাদের বসন সাদা, তোমাদের বসন কালো। তোমরা শ্বেতাঙ্গ ঢেকে রাখো, আমরা কৃষ্ণদেহ খুলে রাখি। আমরা খাই সাদা জল, তোমরা খাও লাল পানি। আমাদের আকাশ আগুন, তোমাদের আকাশ ধোঁয়া। নীল তোমাদের স্ত্রীলোকের চোখে, সোনা তোমাদের স্ত্রীলোকের মাথায়, নীল আমাদের শূন্যে, সোনা আমাদের মাটির নীচে। তোমাদের ও আমাদের অনেক বর্ণভেদ। ভুলে যেন না যাই যে তোমাদের দেশ ও আমাদের দেশের মধ্যে কালাপানির ব্যবধান। কালাপানি পার হলে আমাদের জাত যায়, না হলে তোমাদের জাত থাকে না।

৪

তোমরা দৈর্ঘ্য আমরা প্রস্থ। আমরা নিশ্চল তোমরা চঞ্চল।

আমরা ওজনে ভারি তোমরা দামে চড়া। অপরকে বশীভূত কর্‌বার তোমাদের মতে একমাত্র উপায় গায়ের জোর, আমাদের মতে একমাত্র উপায় মনের নরম ভাব। তোমাদের পুরুষের হাতে ইস্পাৎ, আমাদের মেয়েদের হাতে লোহা। আমরা বাচাল, তোমরা বধির। আমাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম—এত সূক্ষ্ম, যে আছে কি না বোঝা কঠিন। তোমাদের বুদ্ধি মোটা, এত মোটা যে কতখানি আছে তা বোঝা কঠিন। আমাদের কাছে যা সত্য তোমাদের কাছে তা কল্পনা, আর তোমাদের কাছে যা সত্য আমাদের কাছে তা স্বপ্ন।

৫

তোমরা প্রবল, আমরা দুর্ব্বল। তোমরা স্বাধীনতা, আমরা অধীনতা। তোমরা শাসন করো, আমরা শাস্তি পাই। তোমরা মার, আমরা মরি। আমরা অন্ন দেই, তোমরা খাও, তোমরা গালি দেও, আমরা খাই। তোমরা আমাদের ঘৃণা করো, আমরা তোমাদের ভক্তি করি। আমরা তোমাদের বাড়ী গেলে তোমরা বিরক্ত হও, তোমরা আমাদের বাড়ী এলে আমরা কৃতার্থ হই। তোমরা মা বাপ, আমরা শুধু ছেলে আর মেয়ে। তোমরা আমাদের দুহাতে লোটো, আমরা তোমাদের দুপায়ে লুটি। তোমাদের বিশেষত্ব ভণ্ডামি ও ষণ্ডামি, আমাদের বিশেষত্ব বকামি ও ন্যাকামি।

৬

তোমরা বিদেশে ছুটে বেড়াও, আমরা ঘরে শুয়ে থাকি। আমাদের সমাজ স্থাবর, তোমাদের সমাজ জঙ্গম। তোমাদের আদর্শ জানোয়ার, আমাদের আদর্শ উদ্ভিদ্। তোমাদের নেশা মদ, আমাদের নেশা আফিং। তোমাদের সুখ ছটফটানিতে, আমাদের সুখ ঝিমুনিতে। সুখ তোমাদের ideal, দুঃখ আমাদের real। তোমরা চাও দুনিয়াকে জয় কর্‌বার বল,

৭

তোমাদের মেয়ে প্রায় পুরুষ, আমাদের পুরুষ প্রায় মেয়ে। বুড়ো হলেও তোমাদের ছেলেমি যায় না—ছেলেবেলাও আমরা বুড়োমিতে পরিপুর্ণ। আমরা বিয়ে করি যৌবন না আস্‌তে, তোমরা বিয়ে করো যৌবন গত হলে। আমরা কাঁচায় ভাঙ্গি, জাগ দিয়ে পাকাই। তোমরা শুকিয়ে ঝরে পড়্‌লে তবে মাটি হতে কুড়িয়ে ঘরে তোলো। তোমরা যখন সবে গৃহপ্রবেশ করো তখন আমরা বনে যাই।

৮

তোমাদের আগে ভালবাসা পরে বিবাহ, আমাদের আগে বিবাহ পরে ভালবাসা। আমাদের বিবাহ "হয়," তোমরা বিবাহ "করো।" আমাদের ভাষায় মুখ্য ধাতু "ভূ," তোমাদের ভাষায় "কৃ।" আমাদের বিয়ে হয় বলে থাকে, তোমরা বিয়ে করো বলে ভাঙ্গো। তোমাদের স্ত্রীদের জীবন যায় স্বামীর সঙ্গে বিরোধে, আমাদের স্ত্রীদের স্বামীর গৃহে অবরোধে। তোমাদের রমণীদের রূপের দাম আছে, আমাদের রমণীদের গুণের মূল্য নেই। তোমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অর্থশাস্ত্রে, আমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অলঙ্কারশাস্ত্রে।

৯

অর্থাৎ এক কথায় তোমরা যা চাও আমরা তা চাইনে, আমরা যা চাই তোমরা তা চাও না, তোমরা যা পাও আমরা তা পাইনে, আমরা যা পাই তোমরা তা পাও না। আমরা চাই এক, তোমরা চাও অনেক। আমরা একের বদলে পাই শূন্য, তোমরা অনেকের বদলে পাও একের পিঠে অনেক শূন্য। তোমাদের দার্শনিক চায় যুক্তি, আমাদের দার্শনিক চায় মুক্তি। তোমরা চাও বাহির, আমরা চাই ভিতর। তোমাদের পুরুষের জীবন বাড়ীর বাইরে, আমাদের পুরুষদের মরণ বাড়ীর ভিতর। আমাদের গান, আমাদের কবিতা তোমাদের মতে

শুধু বিলাপ, তোমাদের গান তোমাদের কবিতা আমাদের মতে শুধু প্রলাপ। তোমাদের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সব জেনে কিছু না জানা, আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্য কিছু না জেনে সব জানা। তোমাদের পরলোক স্বর্গ, আমাদের ইহলোক নরক। কাযেই পরলোক তোমাদের গম্য, ইহলোক আমাদের ত্যজ্য। তোমাদের ধর্ম্মমতে আত্মা অনাদি নয় কিন্তু অনন্ত, আমাদের ধর্ম্মমতে আত্মা অনাদি কিন্তু অনন্ত নয়, তার শেষ নির্ব্বাণ। পূর্ব্বেই বলেছি প্রাচী ও প্রতীচী পৃথক্। তোমাদের latitude বেশি আমাদের longitude বেশি। তোমরা চাও আমরা জাগি, আমরা চাই তোমরা ঘুমাও। আমরাও ভাল তোমরাও ভাল, শুধু তোমাদের ভাল আমাদের মন্দ ও আমাদের ভাল তোমাদের মন্দ। সুতরাং অতীতের আমরা ও বর্ত্তমানের তোমরা এই দুয়ে মিলে যে ভবিষ্যতের ভারা হবে তাও অসম্ভব।

বীরবল।

বারণ।

"ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, অয়ি বৎসগণ,"
কলালক্ষ্মী রুদ্ধকণ্ঠে বলিলা সেদিন :—
"কৃত্রিম ভূষণে মোর নাহি প্রয়োজন
আমি যে ছিলাম ভাল আভরণহীন।

"যারা বসি প্রকৃতির গুপ্তনিকেতনে
ছিল মোর সেবাব্রত, গৌরবে বহিয়া,
অনুদিন বিল্বদলে, কুসুমচন্দনে
পূজিয়াছে আত্মহারা ধূলায় লুটিয়া ;

"তাহাদের গন্ধমাল্য, দূর্ব্বা, পুষ্পাঞ্জলি,
ভকতি-বাসিত শত পূজা-উপচার ;
কণ্ঠে কণ্ঠে সমীরিত সাম-স্তবগান
বহু যুগ যুগান্তের কাঙ্খিত আমার।

"কিন্তু বৎস, তোমাদের হিরণ্যচম্পক,
মণিমালা, রত্নদীপ-কীরিট-কেয়ূর,
নহে, নহে, নহে মোর যোগ্য উপচার,—
সে যে কুবেরের প্রাপ্য, অথবা বধূর।

"তোমরা ভুলিয়া গেছ, কুসুম চয়ন,
মুক্ত উপবন মাঝে প্রকৃতিলক্ষ্মীর ;
পুষ্পভ্রমে ফেণরাজি যত্নে আহরিয়া,
কল্লোলে ঘিরেছ, তাই, আমার মন্দির।

"তোমাদের করতাল কাংস্যঘণ্টারবে
দিবানিশি মুখরিত বহু দেবালয় ;
সে ত নহে আরতির নিষ্কাম উচ্ছ্বাস,—
সে যে আত্ম-ঘোষণার ছদ্ম অভিনয় !

"ত্রিভুবন-মূলবাহী অমৃত-উৎসের
সনাতন ঢেউগুলি শত ভঙ্গিমায়,—
উছলি উঠে না কেন ধ্রুবমূর্ত্তি লয়ে,
বৎসগণ, তোমাদের ছন্দে ও ভাষায়!

"হেমসূত্রে কুশমুষ্টি বাঁধিয়া কি ফল!
দু'দিনের বর্ষাতে যা'বে তা পচিয়া;
শত অলঙ্কারভারে সাজাতেছ যারে,
সে'ত বহুদিন আগে গিয়াছে মরিয়া।

"আমার ভোগের জন্য তোমরা সকলে
নিশিদিন আহরিছ সামগ্রী-সম্ভার;
সে যে পূতি, পর্য্যুষিত যুগ যুগান্তের—
এই কদাহার হ'তে শ্রেয় অনাহার।

"সুখে দুঃখে নিশিদিন এখনও যাহারা
সর্ব্বস্বহৃদয়ে মোরে করেছে বরণ;
তোমাদের কলরোলে যদিও পীড়িত
এখনও ছাড়েনি তারা আমার সাধন।

"শুদ্ধ অমৃতের নদী জীবনের মূলে
চিরদিন বহিতেছে নবীন নির্ম্মল;
অবগাহি নিরজনে কর অভিষেক;
ভেক ছাড়ি প্রাণকোষে লও ভক্তি বল।"

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

সুন্দরী।

নবম পরিচ্ছেদ।

বধূরা, কন্যারা, চতুর্দ্দিক হইতে, কেহ রান্না ফেলিয়া, রাখিয়া, কেহ বাটনা ছাড়িয়া, কেহ বা স্তন্যপানরত ভূমিতে নামাইয়া, ছুটিয়া আসিল। "কি করে পড়ে গেলে?' কোন্ খানটায় লেগেছে?"—"বেশী লাগেনি ত?" ইত্যাদি। যুগবৎ বর্ষিত হইতে লাগিল। গৃহিণী কাহারও কোনও প্রশ্নে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া, বড়বধূর পানে চাহিয়া বলিলেন—"বড়বউমা, রান্নাঘরে শিকল দিয়ে আসনি বোধ হয়? বেরালে সব খেয়ে ফেল্লে।" বড়বধূ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে কোনও চিন্তা নাই, তিনি শিকল উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া আসিয়াছেন।

মেজবধূ তখন শ্বশ্রূর হস্তধারণ করিয়া ভূমি হইতে তাঁহাকে উঠাইলেন। তাঁহার বস্ত্র কর্দ্দমাক্ত। স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। কাপড় ছাড়াইবার জন্য মেজবউ তাঁহাকে শয়নঘরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। গৃহিণী এক একবার বেদনাব্যঞ্জক উহু উহু শব্দ করিতে করিতে মেজবধূর স্কন্ধে হাত রাখিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিলেন। বারান্দায় উঠিয়া বলিলেন—"একবারে চান করে ফেলি। একটু তেল নিয়ে আয় কেউ।"

শুনিবামাত্র একজন ছুটিয়া গিয়া, একটা বাটী করিয়া খানিকটা সরিষার তৈল গরম করিয়া আনিল। মেজবউ সেই তৈল শ্বশ্রূদেবীর গাত্রে বিশেষতঃ বেদনাস্থানে উত্তমরূপ মালিস করিয়া দিতে লাগিলেন। বধূ বলিলেন, "মা আর ঘাটে গিয়ে কাজ নেই, বাড়ীতেই তোলাজলে স্নান করে ফেল।" কিন্তু গৃহিণী সম্মত হইলেন না। তখন মেজবউ তাঁহাকে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া খিড়কীর পুষ্করিণীতে স্নান করাইয়া আনিলেন।

রিচ্ছন্ন হইয়া হরিনামের মালা হাতে করিয়া গৃহিণী যখন
ত খোঁড়াইতে দালানে আসিলেন, সীতানাথ তখন আহার
ন।

থ বলিলেন—"মা নিজের দোষে কষ্ট পাও কেন? বউরা সবাই রয়েছে, কেউ ছেলেমানুষ নয়, ওরা করছে কর্ম্মাছে, কেন আঁকু পাঁকু কর বল দিখিনি? ব্যথা রয়েছে এখনও? এক র, খাওয়া দাওয়া হলে, রোদ্দুরে শুয়ে, খানিকটে তার্পিণ তেলে রে মিশিয়ে, বেশ করে গরম করে, মালিস করাও দিখিন। তা হলে আর ব্যথাটা বেশী হতে পাবে না।"

গৃহিণী বলিলেন তাহাতে কোনও আবশ্যক নাই। আপনিই ভাল হইয়া যাইবে।

এই বলিয়া পুত্রকে পূজার ঘরে যাত্রা করাইতে লইয়া গেলেন। কক্ষটির মধ্যস্থলে একখানি কুশাসন বিছান আছে। তাহার সম্মুখে আলেপনচিত্রের উপর একটি জলপূর্ণ পিত্তলের ঘটী বসান। একটি ভগ্ন আম্র-শাখা জলে ডুবান রহিয়াছে। সীতানাথ গিয়া আসনের উপর উপবেশন করিলেন। ঘটকে প্রণাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ ভাষায় দেবতাকে প্রার্থনা জানাইতে হইবে, তাহা মা শিখাইয়া দিলেন। সম্মুখে কুলুঙ্গিতে সিংহাসনে নারায়ণ-শিলা। ঘট প্রণাম শেষ হইলে, জননী নারায়ণকে দেখাইয়া বলিলেন—"জয় বাবা সত্য-নারায়ণ, মধুসূদন,—বাবাকে ভক্তিভরে প্রণাম কর।" সীতানাথ তাহাই করিলেন। দেওয়ালে একখানি কালীঘাটের পট পেরেক দিয়া আঁটা ছিল। সেখানিকে দেখাইয়া গৃহিণী বলিলেন—"জয় মা কালীঘাটের কালী—করালবদনী মনস্কামনা পূর্ণ কোরো মা। ওঁকে প্রণাম কর।" সীতানাথ তাহাই করিলেন।

দুয়ারের উপর একখানি ফ্রেমে বাঁধানো আর্টষ্টুডিও কর্ত্তৃক অঙ্কিত

দশভূজার ছবি টাঙ্গানো ছিল। সেখানির প্রতি পুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জননী বলিলেন—"জয় মা জগজ্জননী আদ্যাশক্তি ভগবতী ভক্তের প্রতি মুখ তুলে চেও মা—মাকে প্রণাম কর।—মার ডানদিকে মা সরস্বতী রয়েছেন,—ওঁকে প্রণাম কর—জয় মা, দোহাই মা, কণ্ঠে অধিষ্ঠান হোয়ো মা বাগ্‌দেবী।—সিদ্ধিদাতা গণেশকে প্রণাম কর।—বাবা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গজানন লম্বোদর,—যেন কার্য্যসিদ্ধি হয় বাবা।"

দেবতাকুলকে প্রণাম করা শেষ হইলে, সীতানাথ অবশেষে জননীকে প্রণাম করিলেন। জননী আশীর্ব্বাদ করিলেন, "রণে জয়ী হয়ে এস।" পূর্ব্বে আমরা যখন বীরজাতি ছিলাম, তখন যে প্রকার আশীর্ব্বচন প্রচলিত ছিল, এখনও তাহা চলিয়া আসিতেছে। রণজয়ের অর্থের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা ঘটিয়াছে মাত্র। এখন রণজয় অর্থে অধিকাংশ সময়েই সাহেবের চাকরি লাভ বা মোকর্দ্দমায় জিতিয়া আসা অথবা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় পাস করা।

সীতা রায় দণ্ডায়মান হইবামাত্র গৃহিণী তাঁহার ললাটে দধি ও হরিদ্রার তিলক পরাইয়া দিলেন। একটি বিল্বপত্র দিয়া বলিলেন—"এটি বেশ করে শুঁকে, কাণে গুঁজে রাখ।" কিঞ্চিৎ সিদ্ধি অঞ্চল হইতে খুলিয়া দিয়া বলিলেন—"এইটুকু চিবিয়ে খেয়ে ফেল।"

অতঃপর সীতানাথ বাহিরে আসিলেন। পালকীর বেহারাগণের আহার তখনও শেষ হয় নাই দেখিয়া সীতানাথ আর একবার তামাক আদেশ করিলেন। তামাক খাইতে খাইতে বেহারাগণ প্রস্তুত হইল, সীতা রায় পালকীতে উঠিয়া শয়ন করিলেন। গৃহিণী দুয়ার অবধি আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"দুর্গা দুর্গা দুর্গা। সিদ্ধিদাতা গণেশ—সিদ্ধিদাতা গণেশ।" বেহারাগণ পালকী উঠাইয়া লইয়া প্রচলিতরূপ অদ্ভুত শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পরেই সীতানাথ রায়ের পালকী সূর্য্যপুর গ্রামে

প্রবেশ করিল। গ্রাম্যবধূগণ তখন কুম্ভকক্ষে গা ধুইতে পথে বাহির হইয়াছে। তাহারা ঘোমটার ভিতর হইতে সুকৌশলে সীতানাথের কৃষ্ণমূর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইল।

গ্রামখানি ক্ষুদ্র। ইহা "সূর্য্যপুর খালের" উপর অবস্থিত। সূর্য্যপুর প্রাচীনকাল হইতে ধান্য-ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। জমিদার হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবন গ্রামের প্রান্তে, খালের অনতিদূরে। সীতা রায়ের আগমনসংবাদ পত্রদ্বারায় পূর্ব্বাহ্ণেই হরিহরবাবু অবগত ছিলেন। তাঁহার একজন উচ্চ কর্ম্মচারী বাটীর বাহিরে আসিয়া সীতানাথকে অভ্যর্থনা করিল। সীতানাথের জন্য নির্দিষ্ট বাসভবনে তাঁহাকে আনিয়া খানসামা ডাকিয়া, হস্তপদাদি ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, বাবুকে সংবাদ দিতে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই মোটা সোটা, নাদুসনুদুস, মোলায়েম চেহারা হরিহরবাবু আসিয়া উপস্থিত। "আরে রায়জি রায়জি ভালত হে? বাড়ীর সব মঙ্গল? কতক্ষণ পৌঁছলে বল?"

সীতানাথ সহাস্য মুখে তাঁহার প্রশ্নাবলীর উত্তর দিয়া হরিহরবাবুর কায়িক মানসিক ও পারিবারিক কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে একজন ভৃত্য আসিয়া জলযোগ প্রস্তুত থাকার সংবাদ দিল। হরিহরবাবু সীতানাথকে লইয়া বৈঠকখানামহলে প্রবেশ করিলেন। দুইজনে একত্র উপবেশন করিয়া জলযোগ সম্পন্ন হইল।

সীতারায় পথশ্রমে কাতর ছিলেন, এই কারণে হরিহর বাবু আদেশ করিলেন, সান্ধ্যভোজন সত্বর যাহাতে প্রস্তুত হয়। আহারাদির পর হরিহরবাবু বলিলেন—পরদিন প্রভাতে আসল কথাবার্ত্তা হইবে। সীতানাথ স্বস্থানে উপস্থিত হইয়া, শয্যায় লম্বমান হইলেন, একজন খানসামা তাঁহার গা টিপিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে উঠিয়া সীতানাথ হরিহরবাবুর নিকট উপস্থিত হইতেই দেখিলেন তাঁর মেজাজ অপ্রসন্ন। হাতে একখানি অমৃতবাজার পত্রিকা, নিকটে চায়ের পেয়ালা। হরিহরবাবু সংবাদপত্রের একটা স্থানে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—"মাথা আর মুণ্ডু।"

সীতানাথ কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি ?"

হরিহরবাবু কাগজটা টেবিলে ফেলিয়া, একটা স্থানে সজোরে আঘাত করিয়া বলিলেন—"সকালে উঠে এই একজনকার চিঠিটা পড়ে, মেজাজ ভারি বিগড়ে গেছে।

"কেন কি হয়েছে ?"

হরিহরবাবু কাগজটা উঠাইয়া লইয়া মনে মনে অনুবাদ করিতে করিতে, বলিতে লাগিলেন—"একজন হিন্দু ভদ্রলোক একখানি সেকেণ্ড-ক্লাসের টিকিট নিয়ে, কোন্নগর থেকে আসানসোল যাচ্ছিলেন। গাড়ীতে একটা ফিরিঙ্গি ছিল। বাবুটির হঠাৎ ভারি তামাক খাবার ইচ্ছে হয়, তাই ব্যাগ থেকে একটি রূপোবাধানো হুঁকো বের করে, এক ছিলিম তামাক সেজে, খাচ্ছিলেন। এই দেখে ফিরিঙ্গিটা তাঁকে তামাক খেতে বারণ করে, তাতে তিনি কর্ণপাত করেন না। তাতে ফিরিঙ্গিটা রেগে মেগে, বাবুটিকে গালমন্দ দিয়ে, হাত থেকে হুঁকো কেড়ে, টান মেরে বাইরে ফেলে দিয়েছে। পরের ষ্টেশনে পুলিশের কাছে বাবুটি নালিশ করতে গিয়েছিলেন, পুলিশ নালিশ নেয়নি, তাই বাবুটি খবরের কাগজে চিঠি লিখে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন।"

শুনিয়া সীতানাথ রুষ্টভাবে বলিলেন—"তা ঠিকই হয়েছে। তুই বাবু বাঙ্গালীর ছেলে, তোর সেকনকেলাসে যাবার দরকার কি ! কেন, থার্ডক্লাস নেই ? ইণ্টারমিডিয়েড নেই ? আর সেকেন-ক্লাসে গেলি

গেলি, যখন দেখলি একজন সায়েব রয়েছে তাতে, তখন সে গাড়ীতে চড়বার দরকার কি ? অন্য গাড়াতে যায়গা ছিল না ?"

হরিহরবাবু একথা শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"তুমি কি বল ঠাকুর! এই রকম মন্তব্য করে করেই ত তোমরা দেশের সর্ব্বনাশটা করেছ।"

"কেন, তা হলে আপনার মতে বাবুটির কি করা উচিত ছিল ?"

"আমার মতে কি করা উচিত ছিল ? উচিত ছিল সে ফিরিঙ্গি বেটার কাণটা ধরে, ঠাস্ ঠাস্ করে ঘা কতক ধরিয়ে দেওয়া। তারপর, তার সিগারেটের বাক্সটা কি আর কিছু নিয়ে, জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া। তার পর গম্ভীর হয়ে বসে থাকা। পুলিশে নালিশ না করা। খবরের কাগজে কাঁদুনি না গাওয়া।"

সীতানাথ বলিলেন—"তা বাঙ্গালী কখনও ইংরাজের জোরে পারে ? সায়েব বুঝি অমনি তাকে ছেড়ে কথা কইত ? গায়ে জোর নেই, কাযেই চুপ করে থাকতে হয়।"

হরিহরবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"ঢের এমন বাঙ্গালী আছে, যাদের গায়ে সাধারণ ইংরেজের চেয়ে বেশী জোর। তারাও যখন ও অবস্থায় পড়ে, তখন কি ল্যাজ গুটিয়ে পালায় না ? আর যারা আছে, যারা সাধারণ ইংরেজের চেয়ে দুর্ব্বল, তাদের গায়ে এমন জোরটুকু যথেষ্ট আছে যাতে অন্ততঃ ইংরেজকে গোটাকতক ঘুঁসি বসিয়ে দিতে পারে। গোটাকতক ঘুঁসি মারতে কতটুকু জোরের প্রয়োজন ? সে যদি পাঁচটা ঘুঁসি মারে, আমি ত তাকে দুটোও মারতে পারব। দুর্ব্বলতার দোহাই দিওনা। যা বল আছে, প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট আছে। সেই টুকুর তারা সদ্ব্যবহার করে না কেন ?"

সীতানাথ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"সদ্ব্যবহার করে না কেন ; তার অনেক কারণ। একটা কারণ বাঙ্গালী- গরীব, মারামারি

করে ফৌজদারী বাধিয়ে বসবে, তার কি অর্থবল আছে, যে উকীল মোক্তার দিয়ে লড়াই করবে?"

"ইংরেজের সঙ্গে মারামারি করলে ফৌজদারীই যে বাধবে তার মানে নেই। যদি ঐ রকম গাড়ীর কামরায় বা অন্য কোথাও, যেখানে পুলিসের কড়া পাহারা নেই, সেখানে যদি মারামারি হয়, তাহলে আদালতে আসার কোনই আশঙ্কা নেই। মারামারি ক'রে ইংরেজ যদি মার খায়, তাহলে সে আর পুলিশে নালিশ করবে না এটা নিশ্চিত একবারে। মার খেয়ে বা অপমানিত হয়ে কবুল করা তাদের কুষ্টীতেই লেখেনি। যদি সে নিজে জয়ী হয়, তাহলে তার আর পুলিশে যাওয়ার কোনও আবশ্যক থাকে না। তবে যদি প্রকাশ্য স্থানে,—যেমন কলকাতার রাস্তায় বা ট্রামগাড়িতে মারামারি হয়, তবে ফৌজদারীর আশঙ্কা আছে বটে। তা আছে আছেই, না হয় জেলেই যাবে হে। তার জন্যে এত ভাবনা কিসের? এইত রাসিয়াতে হাঙ্গাম বাধছে, লোকগুলোকে ধরে ধরে সাইবিরিয়ায় বনবাস দিয়ে পাঠাচ্ছে। তবু কি তারা ক্ষান্ত হচ্চে? সাইবিরিয়ার তুলনায় আমাদের এ সব জেল ত বিশেষ আরামের জায়গা হে!"

সীতানাথ মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ শ্বশুরবাড়ী। শ্বশুর-বাড়ী থেকে ফিরে গেলে সমাজে তখন মুখ দেখাবে কি করে? সবাই বলবে—এটা অতি হতভাগা, জেল খেটে এসেছে।"

হরিহর বাবু পূর্ব্ববৎ উত্তেজিতভাবে বলিলেন—"ভারি দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমাদের দেশের যেমন পাব্লিক, তেমনি পাব্লিক ওপিনিয়ন। এরকম লোক, যারা নিজের আত্মসম্মানের পরিচয় দিয়েছে, জেল থেকে বেরিয়ে এসে, সমাজে তাদের আরও বেশী সম্মান হওয়া উচিত। হার্ব্বার্টস্পেন্সর দুঃখ করেছেন, ইংলণ্ডের এখন এমনি অধোগতি হয়েছে, বিদ্যাবুদ্ধির সম্মান সাধারণের কাছে এতই কম, গায়ের জোরের প্রতি

ভক্তি এমনি বেশী যে, ইউনিভার্সিটির যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা দিয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিলে, তার নাম সাধারণে জানেনা, তার ছবি কখনো কেউ দেখতে পায় না; আর সেই ইউনিভার্সিটির বোট্‌রেসে যারা জয়লাভ করেছে, তাদের নাম মুখে মুখে, তাদের ছবি ঘরে ঘরে টাঙ্গানো। স্পেন্সারের এ লেখা পড়ে আমার মনে হল,—হায় হায় আমাদের দেশের এ অধোগতি কবে হবে?”

সীতানাথ বলিলেন—“তা বলে গুণ্ডামিটাই কি ভাল?”

হরিহর বাবু বলিলেন—“এরকম অপমানিত হয়ে, সংবাদপত্রে চিঠি লেখার চেয়ে গুণ্ডামি শত সহস্রগুণে ভাল। আর এই খবরের কাগজ গুলো এই সব অপমানের কথা প্রকাশ করে করে দেশের আরও সর্ব্বনাশ করেছে।”

“কেন, এতে ত আরও লোকের রক্ত গরম হয়ে ভাল ফল হবার কথা।”

“ঠিক তার উল্টো। দিনের পর দিন এরকম অপমান কাহিনী পড়ে পড়ে, লোকের মন শিথিল হয়ে যায়। একটা দুর্গন্ধ গলিতে বাস করলে, প্রথম প্রথম গন্ধটা কষ্টকর বোধ হয়। তারপর এমনি অভ্যাস হয়ে আসে যে, আর জানতেও পারে না। কাগজওয়ালাদের উচিত, এ রকম চিঠি প্রকাশ না করা। যারা অপমানিত হয়ে সেই মুহূর্ত্তে মানুষের মত প্রতিশোধ নিয়েছে, তাদের কাহিনী সংগ্রহ করে যত পারে ছাপাক। তাদের ছবি বের করুক। তাদের জীবনচরিত বের করুক। পাঁচজনে তাদের সম্মানের চক্ষে দেখছে জানলে আরও দশজন তাদের সম্মানের চক্ষে দেখবে। য়ুরোপে যেমন রয়্যাল-হিউমেন-সোসাইটি আছে, যারা নিজের বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করে পরের প্রাণরক্ষা করেছে, বৎসর-বৎসর তাদের মেডেল দেওয়া হয়—সেইরকম আমাদের দেশে এমন একটা সমাজ হয়, যারা আবশ্যকস্থলে সাহসের, বলের ও মনুষ্যত্বের

পরিচয় দিয়েছে, সব তুচ্ছ করে নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখতে পেরেছে, তাদের মেডেল দেবার জন্যে, তাদের প্রাইজ দেবার জন্যে, তাদের সমবেত করে সমস্ত দেশের একদিনকারও সম্মান তাদের উপহার দেবার জন্যে—তাহলে খুব কাজ হয়।”

সীতানাথ বিজ্ঞের মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“হ্যাঁ হ্যাঁ—তা বটেইত,—তা বটেইত। কিন্তু সমাজ না হয় করলেন, বছরে কজন করে মেডেল পাবে মনে করেন? সমস্ত বাঙ্গলাদেশ থেকে বছরে দুজন কি পাঁচজনের বেশী বেরুবে না।”

হরিহর বাবু বলিলেন—“বছরে যদি পাঁচজনও মানুষের মত মানুষ বেরোয় তা হলে ঢের কায হবে। তাদের দেখাদেখি অন্যলোকের উৎসাহ বাড়বে। যে কোনও একটা সমাজে সবাই যে ভীষ্ম দ্রোণ হয় তা নয়। জন কতক মানুষের মত লোক থাকলেই সমাজের বাকী লোকও তাদের পুণ্যে তরে যায়। প্রাণীবিজ্ঞানে পড়েছিলাম যত সাপ আছে, তার মধ্যে চৌদ্দ আনা রকম বিষহীন। ঐ যে দু আনা আন্দাজ সাপের মারাত্মক রকম বিষ আছে, সেইজন্যে সমস্ত সর্প-জাতিটাকে মানুষ যমের মত ভয় করে।”

সীতানাথ আর উত্তর না করিয়া, গম্ভীরভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন। হরিহর বাবুও মৌন হইয়া রহিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

শ্রামণ্যফল সূত্র।*

অজাতশত্রু সংবাদ।

মগধরাজকুমারগণের চিকিৎসক জীবকের রাজগৃহস্থ মনোহর আম্রবাটিকায় ভগবান বুদ্ধদেব দ্বিশতপঞ্চাশতাধিক এক সহস্র সংখ্যক শিষ্য পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন।

একদা মগধাধিপ মহারাজ অজাতসত্তু (অজাতশত্রু) স্বীয় রাজ-প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিয়া মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে নৈশগগনের শোভা উপভোগ করিতেছিলেন, তখন শরতকালের প্রসন্ন অম্বরে পূর্ণচন্দ্র শীত সুন্দর রশ্মি বিতরণ করিতেছিল। বিমুগ্ধ নেত্রে সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রাজা অনাহূত কাব্য-কথায় তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন—

"বন্ধুগণ! এই জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী কি সুন্দর! কি প্রিয় দর্শন! কি সান্ত্বনাদায়িনী! পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের কি মহৎ চিহ্ন!

আজ এই জ্যোৎস্না-শীতল যামিনীতে এমন কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহার নিকট গেলে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে পারিব?"

এই প্রশ্নের উত্তরে একজন সচীব বলিলেন, "মহারাজ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত লোকপূজ্য প্রবীণ পূরণকস্সপ (পূর্ণকাশ্যপ) মুনির নিকট চলুন, তাঁহার উপদেশে অভীপ্সিত শান্তিলাভ করিতে পারিবেন।" এই কথা শুনিয়া রাজা নীরব হইয়া রহিলেন।

তৎপর আর পাঁচজন সচীব পূর্ব্বোক্তভাবের প্রশংসাবাদ করিয়া মখ্‌খলিপুত্ত গোসাল (মস্করিপুত্র গোশাল), অজিত কেশ কম্বল, ককুদ-

---

* শ্রামণ্যফল সূত্রের ইহা একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী। মাসিক পত্রিকার উপযোগী করিবার জন্য অনেকাংশ, বিশেষ বুদ্ধদেবের স্বীয় মতটির একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা এ বিষয়টি বিস্তৃতরূপে জানিতে চাহিবেন, তাঁহাদের মূল পালী পাঠ করা কর্ত্তব্য।

কচ্চায়ন (ককুদকাত্যায়ন), সঞ্জয়বেলঠ্ঠ (সঞ্জয়বৈরাট), নিগণ্ঠনাতপুত্ত (নিগ্রন্থজ্ঞাতিপুত্র) এই পঞ্চ পণ্ডিতের উল্লেখ করিলেন; কিন্তু রাজা তাঁহাদের কথা শুনিয়া পূর্ব্ববৎ নীরব রহিলেন।

এই সময়ে ভিষকপ্রবর জীবক মহারাজা অজাতশত্রুর অনতিদূরে নিঃশব্দে বসিয়াছিলেন, অজাতশত্রু তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সুহৃদ্‌শ্রেষ্ঠ জীবক, তুমি কিছু বলিলে না যে?"

জীবক বলিলেন, "সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধদেব আমাদের আম্রো-দ্যানে বাস করিতেছেন, তিনি জ্ঞান এবং পবিত্রতার আধারস্বরূপ, তিনি মুমুক্ষুবৃন্দের একমাত্র পথ-প্রদর্শক, মহারাজ তাঁহার নিকট চলুন, শান্তি পাইবেন।"

"প্রিয় জীবক, তুমি আমার হস্তিগুলি সুসজ্জিত করিতে বল।"

তখন রাজাদেশে পাঁচশত হস্তিনী সুসজ্জিত হইল, সেই ৫০০ হস্তিনীর উপর সুবেশপরিহিতা পাঁচ শত সুন্দরী আলোকবর্ত্তিকা ধারণ করিয়া নানা ভূষণশোভিত বিশালকায় দ্বিরদে সমারূঢ় মহারাজ অজাতশত্রুকে বেষ্টন করিয়া চলিল। রাজা সেই রাত্রিকালে মহা-সমারোহের সহিত রাজগৃহ হইতে জীবকের আম্রবাটিকাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিশাল আম্রোদ্যানের নিকটবর্ত্তী হইয়া রাজা সহসা ভয়াভিভূত হইয়া পড়িলেন, আশঙ্কায় তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি ভীত ও উত্তেজিত কণ্ঠে জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জীবক! তুমি কি আমাকে ছলনা করিয়া আনিয়া শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতেছ? দ্বিশতপঞ্চাশতাধিক এক সহস্র ব্যক্তি যে স্থানে সমবেত, সে স্থান এমন নীরব কিরূপে হইতে পারে? একটি কাশী কিংবা হাঁচির শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে না।"

"মহারাজ, আমি আপনাকে ছলনা করিয়া শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে

আনি নাই, আমি তদ্রূপ পাষণ্ড নহি। ঐ পটমণ্ডপে দীপ জ্বলিতেছে ঐ দিকে চলুন।”

রাজা হস্তিপৃষ্ঠে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া যেস্থানে হস্তী আর চলে না, সেই স্থানে অবতরণ করিলেন এবং বস্ত্রমণ্ডপের সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “জীবক ভগবান বুদ্ধদেব কোথায় ?”

“ঐ যে মধ্যস্থ স্তম্ভের সম্মুখে পূর্ব্বমুখ হইয়া শিষ্য পরিবেষ্টিত বুদ্ধদেব উপবিষ্ট আছেন।”

তখন রাজা অগ্রসর হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। রাজা দাঁড়াইয়া একবার সেই নিঃশব্দ বিশাল জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, উর্ম্মিহীন, নির্ম্মল হ্রদের ন্যায় শিষ্যমণ্ডলী নীরব ও প্রশান্ত। রাজা উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, “কি সুন্দর! কি প্রশান্ত! আমার প্রাণাধিক কুমার উদায়িভদ্দের (উদায়িভদ্রের) জীবন যেন এইরূপ শান্তিপূর্ণ হয়!”

তৎপরে রাজা করজোড়ে ভগবান বুদ্ধ এবং তৎশিষ্যমণ্ডলীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন, “ভগবান বুদ্ধদেবের আদেশ হইলে আমি কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।”

“মহারাজ, আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।”

“হে দেব! সংসারে নানাশ্রেণীর লোক কাজ করিয়া থাকে, সারথী, অশ্বরক্ষক, তীরন্দাজ, নিশানবাহক, সেনাপতি, সৈনিক, পাচক, নাপিত মালাকর, মোদক, তন্তুবায়, কুম্ভকার, জ্যোতিবিদ, সচীব প্রভৃতি শত শত শ্রেণীর লোক জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। ইহারা স্বীয় স্বীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইহজীবনেই স্বকৃত কর্ম্মের পুরস্কার লাভ করিতেছে। তাহারা স্বীয় পরিশ্রমজাত অর্থে পরিবার পালন করিয়া বন্ধু বান্ধবসহ নানারূপ সুখভোগ করিয়া জীবনযাপন করিতেছে। শ্রমলব্ধ অর্থ দান-ধ্যানাদি ব্যাপারে ব্যয় করিয়া পরকাল সম্বন্ধেও তাহারা সুখের পথ স্থির

করিয়া রাখিতেছে। গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম্মের পুরস্কার ইহজীবনেই লক্ষিত হইতেছে কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের কোন পুরস্কার কিংবা লাভ আপনি এইরূপ দেখাইতে পারেন কি? যাহার ফল এই জীবনেই ভোগ করা যায়।" বুদ্ধদেব বলিলেন "মহারাজ, আপনি কি এই প্রশ্ন আর কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন?"

"হাঁ, করিয়াছিলাম।"

"আপনার আপত্তি না থাকিলে, তাঁহাদের নিকট আপনি কি উত্তর পাইয়াছেন, আমাকে বলিতে পারেন।"

"আমি একবার পূরণকস্তপ (পূর্ণকাশ্যপ) মুনির নিকট গিয়াছিলাম, নানারূপ ভদ্রতা এবং সৌজন্যসূচক আলাপের পর আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া এইপ্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে উত্তরে বলিলেন, 'যে ব্যক্তি লোক পীড়ন করে, দস্যু কিংবা চৌর্য্যবৃত্তি করে, তাহার কোন পাপই হয় না। যে অসত্য কথা বলে, পরদার প্রভৃতি সামাজিক গর্হিত কাজ করে,তাহার প্রকৃতপক্ষে কোন পাপই হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। যদি কেহ তীক্ষ্ণধার অসিহস্তে সমস্ত মানবমণ্ডলীর দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া এক স্তূপাকার মাংসপিণ্ডে পরিণত করিত তথাপি সে কোন পাপকার্য্য করিল বলিয়া আমি মনে করিতাম না। যদি কোন ব্যক্তি গঙ্গার দক্ষিণ উপকূলস্থ সমস্ত জনপদ নির্ম্মনুষ্য করিয়া ফেলে, তথাপি সে কোন দুষ্কর্ম্ম করিল বলিয়া আমার প্রতীতি হইবে না। যদি কেহ গঙ্গার উত্তর উপকূলের সমস্ত জনপদ ব্যাপিয়া মুক্তহস্তে দান করিয়া অগ্রসর হয় এবং প্রতিস্থানে পূজা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া, স্বীয় মনে কৃতকৃতার্থ হয়, তথাপি সে কোন পুণ্যকর্ম্ম করিল বলিয়া আমি মনে করিব না। পরোপকার, আত্মসংযম, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতির দ্বারা কোনরূপ পুণ্যসঞ্চয় হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।" হে দেব, কাশ্যপ এই ভাবে "সন্ন্যাসাশ্রমের ইহকালের পুরস্কার কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে কর্ম্মের

অসারতা সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কেহ আম্রফল সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে তদুত্তরে নিম্বফলের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিলে যেরূপ হয়, এই উত্তর তেমনই হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে আমি তাঁহার এই কথাগুলির নিন্দা বা প্রশংসা কিছুই করি নাই, এবং যদিও এ উত্তরে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও তৃপ্তি হয় নাই, তথাপি আমি অসন্তোষসূচক কোন কথা বলি নাই, এবং তাঁহার কথা গ্রাহ্য কিংবা অগ্রাহ্য কিছুই না করিয়া আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নীরবে প্রস্থান করিয়াছিলাম। অতঃপর মখ্খালিপুত্ত (মস্কালিপুত্র) গোশালের নিকট গিয়াছিলাম, তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন।

"জীবগণের পাপপুণ্যের কারণ নাই। কোন ব্যক্তির জীবন যে ভাবে গঠিত হইতেছে, তাহার উপর তাহার কিছুমাত্র হাত নাই। পুরুষকার বলিয়া কোন বস্তু নাই। সমস্ত জীবজন্তু উদ্ভিদ ও জড়-পদার্থ একই অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী, তাহাদের কিছুমাত্র স্বশক্তি নাই, তাহারা অন্ধভাবে ভাগ্যের অধীন। তাহারা যে শ্রেণীতে, যে অবস্থায়, যেরূপ প্রকৃতি লইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই অপরি-বর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে কাজ করে এবং সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। প্রত্যেক জীবই, ৮৪ লক্ষবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অসংখ্য উপায় এবং অসংখ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকে। জ্ঞানীব্যক্তি ভাবিতে পারেন 'আমি এই সকল, পুণ্যানুষ্ঠানদ্বারা কর্ম্মক্ষয় করিব', মূর্খও তাহার জ্ঞানানুসারে সেইরূপ চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি স্বীয় মানদণ্ডে জীবের সুখ দুঃখ পরিমাণ করিয়া-ছেন, তাহার তিলমাত্রও ব্যতিক্রম হইবার নহে, জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিয়া তাহা অবশ্যম্ভাবীরূপে জীবের ভোগ করিতে হইবে। তীর হইতে গুলি নিক্ষেপ করিলে তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত গমন করে, সেই সীমা হইতে নিকটে কিংবা দূরে পড়ে না। সেইরূপ জ্ঞানীই

হউন কিংবা অজ্ঞানীই হউন, কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই। জন্মজন্মান্তরক্রমে স্বভাবাধীনভাবে কর্ম্মক্ষয় হইলে জীব চরমশান্তি পাইয়া থাকেন।”

হে দেব! মখ্‌খালিপুত্ত গোশাল ‘সন্ন্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি ?’ এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে জন্মজন্মান্তরদ্বারা কিরূপে পাপক্ষয় হয় তদ্বিষয়ক উপদেশ দিয়াছিলেন।

অজিতকেশ কম্বলকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “যাগযজ্ঞের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এই পরিদৃশ্যমান জগত কিছুই নহে, পরকাল বলিয়াও কিছু নাই। কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারে না, মানবের পক্ষে তাহা সুদূর পরাহত। মৃত্যুর পর পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, কিছুই থাকে না। মৃত্যুর পর পিণ্ডাদি প্রদান বিড়ম্বনামাত্র। যাঁহারা মৃত্যুর পর পিণ্ডাদি প্রদান বা সংকারাদির দ্বারা মৃতব্যক্তির উপকারের কথা বলেন, তাঁহারা এক হয় অজ্ঞ, না হয় মিথ্যাবাদী। মৃত্যুর পর মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেরই অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহাদের কিছুই থাকে না।”

“দেব! এই ভাবে অজিত কেশ কম্বল—সন্ন্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে দেহ, এবং আত্মার ধ্বংসসম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।”

তৎপর আমি ককুদকচ্চায়ণকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন—“সপ্তপ্রকার দ্রব্যে জগত নির্ম্মিত, ইহাদিগকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, ইহারা নির্লিপ্ত এবং অবিনশ্বর, এ গুলি হইতে আর কিছু উৎপন্ন হয় নাই, গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ইহারা অটল। জল, মৃত্তিকা, অগ্নি, বায়ু, সুখ, দুঃখ এবং আত্মা এই সপ্ত দ্রব্য, ইহাদিগকে কেহ নিধন করিতে পারে না, ইহারা চিরস্থায়ী। যদি কেহ তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা কাহারও জীবন

নষ্ট করে, তবে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সপ্তদ্রব্যের অভ্যন্তর দিয়া অসি চলিয়া গিয়াছে মাত্র।” এই ভাবে ককুদকচ্চায়ন সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ পুরস্কার কি? এই প্রশ্নের উত্তরে, ভিন্ন এক বিষয়ের ব্যাখ্যা শুনাইয়াছিলেন।

তৎপর আমি নিগ্রন্থ-জ্ঞাতিপুত্রকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “নিগ্রন্থগণ চারিপ্রকার সংযম অভ্যাস করেন, তাঁহারা জলপান করেন না (জীব হননাশঙ্কায়) এবং সর্ব্বদা পাপ হইতে বিরত থাকেন,”—সন্ন্যাসাশ্রমের ফল কি ইহার উত্তরে, নিগ্রন্থ-জ্ঞাতিপুত্র আমাকে চারি-প্রকার সংযম সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দিয়াছিলেন। তৎপর আমি সঞ্জয়বেলঠ্‌ঠকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর পরকাল আছে কি না, আমি কি উত্তর দিব মনে ভাবিতেছ? পরকাল আছে কিংবা পরকাল নাই, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিব না। এইভাবে পাপপুণ্যের ফলাফল এবং সত্যরক্ষণশীল ব্যক্তির পরকালের পুরস্কার কি? প্রভৃতি প্রশ্ন সম্বন্ধেও আমি সেই একই উত্তর দিব।”

সঞ্জয়বেলঠ্‌ঠ—সন্ন্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতি কিংবা পূর্ব্বোক্ত অপরাপর পণ্ডিতগণের প্রতি আমি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করি নাই। সেই সকল কথার কোন নিন্দা বা প্রশংসা করি নাই। তাঁহাদের বাক্য গ্রাহ্য কিংবা অগ্রাহ্য না করিয়া আমি নিঃশব্দে প্রস্থান করিয়াছি।

এইক্ষণ ভগবন্, আমি আপনাকে সেই প্রশ্ন করিতেছি। এই সংসারে সন্ন্যাস অবলম্বনদ্বারা কি পুরস্কার লাভ হইতে পারে, সংসারা-শ্রমে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অনুসরণ করিয়া যেরূপ ফললাভ হইয়া থাকে, সন্ন্যাস-লব্ধ তদ্রূপ কোন প্রত্যক্ষ ফলের বিষয় আমাকে বলিতে পারেন কি?

একটি প্রশ্ন করিব। মহারাজ, আপনার দাসগণ প্রত্যূষে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রমে আপনার সেবা করিয়া থাকে। তাহারা শুধু পরিশ্রম করিবার জন্য, কিন্তু আপনি সমস্ত সুখসম্ভোগ করেন। ইহাদের মধ্যে যদি একজন মনে করে, অপরের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? সে যদি গেরুয়া কাপড় পরিয়া ভিক্ষুর বৃত্তি অবলম্বন করে, ক্রমে যদি তাহার সন্ন্যাসের খ্যাতি প্রচারিত হয় এবং আপনি শুনিতে পান যে, আপনার ভৃত্যগণের মধ্যে একজন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনে সামান্য আহারে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিতেছে, তখন আপনি কি তাহাকে পুনশ্চ দাসবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিবেন?"

"কখনই না, বরং তাহার সহিত দেখা হইলে, আমি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সম্মান দেখাইব, তাহার সেবা শুশ্রূষার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিব।"

"এরূপ হইলে, মহারাজ, আপনাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে সন্ন্যাসধর্ম্মের কিছু ফল ইহজীবনেই লাভ করা যাইতে পারে।"

"হাঁ, ভগবান, তাহা স্বীকার্য্য, কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোন ফলের বিষয় আপনি আমাকে বলিতে পারেন কি?"

তখন বুদ্ধদেব, স্বাধীনজীবী গৃহস্থ যদি সম্পত্তি ছাড়িয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করে, সেও নির্জ্জনে ইন্দ্রিয়সংযমাদি যতিঃধর্ম্ম আচরণের জন্য লোক পূজিত হয়, এই উদাহরণ দিলেন। রাজা এবারও সন্ন্যাসাশ্রমের কতক ফল ইহকালেই লব্ধ হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিয়া বলিলেন—"অন্য কোন উৎকৃষ্টতর ফলের বিষয় আমাকে বলুন।"

"সেরূপ ফল অনেক আছে, বলিতেছি মনোযোগপূর্ব্বক শুনুন।"

যদি পৃথিবীতে এরূপ কোন প্রবুদ্ধ সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ হয়, যিনি

জয়ী, লোভমোহাদি যাঁহাকে ক্রীড়নকের ন্যায় করিয়া রাখে নাই, যিনি নিজবৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযম করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত উদ্বেগশূন্য, যিনি পরমরম্য, পরমপ্রিয় সত্যের অনুসন্ধান করিয়া তল্লাভে চিরপ্রসন্ন হইয়াছেন, এইরূপ সন্ন্যাসীর দর্শনমাত্র অন্ধ গৃহস্থগণের মায়াপাশ কাটিয়া যাইবে, এই বিপদ ও বিঘ্নসংকুল সাংসারিকজীবন তখন তাহার ভাল লাগিবে না। শৃঙ্খলিত পক্ষী যেরূপ উড্ডীয়মান পক্ষীদর্শনে তাহার স্বীয় স্বাধীনশক্তির কথা স্মরণ করে, মুক্তপুরুষের দর্শন লাভ করিয়া বিড়ম্বিত গৃহস্থ সেইরূপ মুমুক্ষু হইবেন, এক উন্নততর উৎকৃষ্ট জীবনের চিত্র তাহার চক্ষে পড়িবে! সে তখন ভিক্ষু হইয়া শান্তিলাভ করিবে। ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিলে নির্জ্জনে তাহার আত্মানুসন্ধানের প্রবৃত্তি জন্মিবে, সে প্রতিপদে সতর্ক হইবে; যে কামনা বিপদসংকুল, যাহার সূচনায় লোভের উদ্রেক করিয়া পরিণামে কষ্টের প্রান্তসীমায় উপস্থিত করে, সেইরূপ বাসনার অনুসরণে তাহার স্বাভাবিক ভীতি উৎপন্ন হইবে। সে শয়নে, উপবেশনে, ভোজনে প্রতিকার্য্যে মহান্ আত্মসংযমের উদ্দেশ্য স্মরণ করিবে। এইভাবে ভিক্ষু মুক্তবিহঙ্গের ন্যায় স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে শিক্ষা করে, শেষে কামনা আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, ভোগের ইচ্ছা তাহার ক্রমে নিবৃত্তি হইয়া যায়। সংসারাশ্রমে তাহার এই নিবৃত্তিশিক্ষার পক্ষে বহু অন্তরায় আছে।

মহারাজ, যেমন কোন রোগ-ক্লিষ্টব্যক্তি অতি কষ্ট পাইতেছিল, তাহার অগ্নিমান্দ্য ও চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, সে যদি পুনরায় স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়, তবে পূর্ব্বাবস্থা ও পরের অবস্থা স্মরণ করিয়া সে কত সুখী হয়।

মহারাজ, যেরূপ কোন কারারুদ্ধ ব্যক্তি শৃঙ্খলিত অবস্থায় এক প্রকোষ্ঠে পড়িয়া ছিল, সে যেরূপ মুক্তি পাইলে

মহারাজ, যেমন কোন ক্রীতদাস পরের আদেশপালনে নিযুক্ত ছিল, তাহার স্বচ্ছন্দ গতিবিধির শক্তি ছিল না, সহসা যদি সে মুক্তি পায়, তবে সে কত সুখী হয়।

মহারাজ যেরূপ কোন সম্পন্নব্যক্তি মরুভূমির পথে পড়িয়া অনাহারে, তৃষ্ণায় বিপদ আশঙ্কা করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, সে যদি সহসা এক ধনধান্যশালিনী পল্লীর উপান্তে উপস্থিত হয়, সে কত সুখী হয়।

সেইরূপ ভিক্ষু ক্রমে আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া যখন কামনা হইতে মুক্তিলাভ করেন তখন সেই রোগমুক্ত, কারামুক্ত, মরুভূমি-উত্তীর্ণ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার আনন্দ লাভ হয়। তাঁহার প্রফুল্লতা হৃদয়ের অন্তঃপুর হইতে উৎপন্ন হয়, বাহিরের অবস্থাচক্রে তাহার হ্রাস উপচয়ের সম্ভাবনা থাকে না, যেরূপ কোন নদী স্বর্গ হইতে বৃষ্টিধারা পড়ুক বা না পড়ুক, দুইকূল স্পর্শ করিয়া পরিপূর্ণ প্রবাহে চলিয়া যাইবে।

হে মহারাজ সন্ন্যাসাশ্রমে এই সকল ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে কিন্তু ইহা ছাড়া আরও আছে।

আত্মসংযমের ফলে তাহার সমস্ত হৃদয় পবিত্রতায় ভরপুর হইয়া যায়। যেরূপ এক পদ্মপুকুরে অনেকগুলি পদ্ম বিকাশ পাইয়াছে, জলদ্বারা তাহাদের প্রত্যেকটি পুষ্ট, সেই শীতল জীবন স্পর্শে তাহারা নির্ম্মল এবং নবীনভাব ধারণ করিয়াছে, রক্তবর্ণ, শ্বেতবর্ণ অথবা নীলবর্ণ পদ্মের কোনটির একটি অংশ নাই, যাহা সুরভি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

যেরূপ আপাদমস্তক শ্বেতবর্ণের পরিষ্কার বস্ত্রাবৃত হইয়া কেহ উপবিষ্ট আছেন, তাহার শরীরের এমন কোন স্থান নাই, যাহা সেই শ্বেতপরিধেয়ের সংস্পর্শ পায় নাই। সন্ন্যাসাশ্রমে নিষ্কলঙ্ক জীবন লাভ করিয়া এইরূপ পবিত্রতা লব্ধ হইয়া থাকে।

স্পর্শ করিতে পারে না। তখন দেহ-সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। এ দেহ ক্ষণভঙ্গুর তৃষ্ণা ও ক্ষুধার উপর নিঃসহায়ভাবে নির্ভরশীল। ধান্যের সঙ্গে খোসার যে সম্পর্ক, তরবারীর সঙ্গে কোষের যে সম্পর্ক, দেহের সঙ্গে আত্মারও সেইরূপ সম্পর্ক। দেহ হইতে আত্মাকে ইচ্ছানুসারে বিচ্যুত করা যায়, ইন্দ্রিয়াদি সংযমশীল মুক্তসন্ন্যাসীর এই লাভ হয়, যে কোন মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তিনি তাহা পরিগ্রহ করিতে পারেন। তিনি কঠিন ভূমি ভেদ করিয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন, জলের উপর ছুটিয়া যাইতে পারেন, এক হইয়া বহুরূপ গ্রহণ করিতে পারেন; তিনি ইচ্ছানুসারে দৃশ্য বা অদৃশ্য হইতে পারেন, বিহঙ্গের ন্যায় শূন্যমার্গে উড্ডীন হইতে পারেন। কুম্ভকার যেমন ইচ্ছানুসারে যে কোনরূপ ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারে, স্বর্ণকার কিংবা হস্তিদন্ত-ব্যবসায়ী যেরূপ যে কোন মূর্ত্তি গঠন করিতে পারে, এই ভাবে সন্ন্যাসী যে কোন আকার ধারণ করিতে পারেন।

ইহা ছাড়াও সন্ন্যাসের আরও ফল আছে। চিত্তবৃত্তি প্রশান্ত হইলে তাহার জন্মজন্মান্তরের অবস্থা স্মৃতিতে উদয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বহু জীবনের বিবরণ তাহার মনে জাগরিত হয়। অমুক স্থানে আমি অমুক নামে পরিচিত ছিলাম, অমুক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতাম, আমি অমুক পরিবারভুক্ত ছিলাম, আমার আয়ুর পরিমাণ এইরূপ ছিল; সেই স্থান হইতে আমি অমুক স্থানে পুনশ্চ জন্ম গ্রহণ করিলাম, তথায় আমি এই এই কাজ করিয়াছিলাম, তার পর আবার আমার অমুক স্থানে জন্ম হয়, ইত্যাদি। এই ভাবে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয়।

মহারাজ, যেরূপ কোন ব্যক্তি এক গ্রাম হইতে অন্যগ্রামে, সে গ্রাম হইতে পুনরায় গ্রামান্তরে যাইয়া শেষে নিজগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করে,

আমি অমুক স্থানে গিয়াছিলাম, তথা হইতে অমুক স্থানে যাইয়া এই এই কার্য্য করিয়াছি, অমুক স্থানে উপবেশন করিয়াছি, অমুক স্থানে দাঁড়াইয়া কথা বলিয়াছি এবং শেষে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছি। সন্ন্যাসাশ্রমের এই প্রত্যক্ষফল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহা ছাড়া উৎকৃষ্ট ও উন্নততর আরও ফল লব্ধ হইয়া থাকে।

মুক্তসন্ন্যাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ হয়, তিনি বস্তু ও জীবের স্বরূপ দর্শন করেন। কোন্ ব্যক্তি কি কর্ম্ম করিতেছে, এবং তাহার কি প্রকার অবশ্যম্ভাবীফল ভোগ করিতে হইবে, তিনি তাহা প্রত্যক্ষবৎ বুঝিতে পারেন। যেরূপ, মহারাজ, প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া কেহ নিম্নে জনস্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পায়, লোকগণ কে কিভাবে কাজ করিতেছে, কে আসিতেছে, কে কোন্ পথে যাইতেছে ইত্যাদি।

মুক্তসন্ন্যাসী কামনার পরিণতি সূচনায়ই দেখিতে পান, কোন্ কামনার পরিণাম বিষময়, কোন্ পথ কণ্টকময়, কোন্ কার্য্যদ্বারা উদ্বেগ ও অনর্থ সৃষ্ট হয়, কোন্ কার্য্যদ্বারা উহা নিবারিত হয়, তিনি ইহা জানিয়া কামাসব, ভাবাসব, এবং অবিদ্যাসব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হন। তাঁহার বর্ত্তমান কামনা, ভাবী কল্পনা এবং অজ্ঞানজনিত মোহ এই ত্রিবিধ কষ্টের কারণ একবারে দূর হইয়া যায়, ঈদৃশ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া জ্ঞানময়, পরম আনন্দপূর্ণ জীবন লাভ করিয়া চিরপ্রশান্তিতে সুস্থিত হন। যেরূপ, মহারাজ, কেহ পর্ব্বত-শিখরে দাঁড়াইয়া নির্ম্মল জল-স্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সেই নির্ম্মল জলের ভিতর যে সকল শঙ্খ, কাঁকর, প্রস্তর এবং হাঙ্গর রহিয়াছে, তিনি তাহা পরিষ্কার দেখিতে পাইবেন, বাসনাতাড়িত জীবনের কষ্টগুলিও মুক্ত সন্ন্যাসী সেইরূপ দেখিতে পান। এই জ্ঞানই সন্ন্যাসজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ, এই জ্ঞানের তুল্য উৎকৃষ্ট ফল মনুষ্য ... পারে না।”

ভগবান বুদ্ধ যখন এই ভাবে উপসংহার করিলেন, অজাতশত্রু তখন বলিলেন,—"হে পরমারাধ্য দেব, পতিত দ্রব্যকে পুনঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া দিলে, অথবা যাহা লুক্কায়িত ছিল, তাহা সম্মুখে ধরিলে, অথবা ঘোর তিমিরাবৃত স্থানে আলো ধরিলে, অথবা পথহারা বিপন্ন পথিককে পথ দেখাইয়া দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ ভগবন, আপনি নানা উজ্জ্বল এবং বিচিত্র উপমাদ্বারা আমাকে সত্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, এখন হে দেব, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে আশ্রয়দানে যেন ত্রুটী না হয়। ভগবন, আমাকে আপনার শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন, আমি যাবজ্জীবন আপনাতে অনুরক্ত থাকব। আমি মহাপাপী, মলিনতাপূর্ণ এবং দুর্ব্বল, ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন। আমি রাজ্যলাভের জন্য আমার পরম পূজনীয় সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ পিতৃদেবকে হত্যা করিয়াছি। তিনি পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ নৃপতি, এবং অতি উদারচরিত্র দেবসদৃশ ব্যক্তি ছিলেন। আমার ন্যায় নরাধমকে আশ্রয়দান করুন, যেন ভবিষ্যতে আর আমি পাপ না করিতে পারি।"

"মহারাজ, তুমি পাপাসক্ত হইয়া এরূপ কার্য্য করিয়াছিলে, কিন্তু তুমি যখন ইহা পাপ বলিয়া মনে করিতেছ এবং সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না, তখন আমরা তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি। কারণ যে ব্যক্তি পাপকে পাপ বলিয়া জানিয়াছে, সে ভবিষ্যতে আর পাপ করিতে পারে না।"

সেই রমণীয় জ্যোৎস্নাশীতল নিশীথে রাজা হৃদয়ের ব্যথা জুড়াইবার জন্য ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট গিয়াছিলেন, অজাতশত্রু বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর কিরূপ ন্যায়নিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতি হইয়াছিলেন তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। শারদনিশীথের পূর্ণচন্দ্র অনুতপ্তপ্রাণে পিপাসা জাগাইয়া তাহা এই ভাবে পুণ্যপন্থায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল।

শোভাবতীর বিবাহ।

কুচক্রী চক্রধর পট্টনায়ক তাঁহার পালকপুত্র উদয়নাথের সঙ্গে শোভাবতীর বিবাহ দিবেন মনস্থ করিয়া বিবাহের দিন ঠিক করিয়াছেন। ২৭শে বৈশাখ দিন ঠিক হইয়াছে। এই দিন ভিন্ন শীঘ্র আর ভাল দিন নাই।

আজ বিবাহের পূর্ব্ব দিন। আজ বর-কন্যার গায়ে হলুদ দিতে হয়। সূর্য্যমণি তাঁহার দাসীদিগকে সঙ্গে করিয়া শোভাবতীর গায়ে হলুদ দিতে চলিলেন। বেলা তখন দুইপ্রহর। শোভাবতী তাহার নিজের ঘরে বসিয়া স্নানের জন্য তেল মাখিতেছিল। সূর্য্যমণি আজ হাসিভরা মুখে শোভাবতীর কাছে গিয়া বসিলেন ও নিজহাতে একটু হলুদ লইয়া তাহার গায়ে মাখাইয়া দিলেন। দাসীদিগকে উলু দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাই কেহ উলু দিল না। শোভাবতী ভীত ও চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও বলিল—

"ও কি মা! আমার গায়ে এখন হলুদ দিচ্চ কেন?"

সূর্য্যমণি হাসিয়া বলিলেন—

"মা শোভা! কা'ল যে তোমার বাহা!"

"বাহা? কার? আমার?"

"তবে কার? মা, দেখ তোমার বিবাহের বয়স হইয়াছে। মর্দ্দরাজ সাও বাঁচিয়া থাকিলে, এতদিন তোমার বিবাহ দিয়া ফেলিতেন। এই এক বৎসর অকাল ও কালাশৌচ ছিল, তাই এতদিন আমি চুপ করিয়াছিলাম। সে জন্য আমি যে কি মনঃকষ্টে ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এখন কালাশৌচ অতীত হইয়াছে, তাই যত শীঘ্র পারিয়াছি

বিবাহের কথা শুনিয়া শোভাবতীর মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইল। সে মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে উদয় নাথের সম্বন্ধে উজ্জলাদাসী তাহাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা স্মরণ করিল। তাহার মুখ ম্লান হইল ও চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল। সে আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া অনেক কষ্টে বলিল—

"মা! আমার "বাহার" জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন? এই সেদিন বাবা মরিয়াছেন, আমি এখন পর্য্যন্ত তাঁহার শোক ভুলিতে পারি নাই। আমার এখন বিবাহের ইচ্ছা নাই।"

ইহা বলিয়া সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই ক্রন্দন শুনিয়া উজ্জলা দাসী সেখানে আসিল। সে আসিয়াই ব্যাপার কি বুঝিতে পারিল। সে সূর্য্যমণিকে বলিল—

"একি মা ঠাকুরানী! উহাকে তোমরা কাঁদাইতেছ কেন?"

সূর্য্যমণি ক্রোধে মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন "তা'তে তোর কি লো?

"কি, আমার কিছু না? আমি জানিতে চাই কার "বাহা," কে দেয়? তুমি শোভার "বাহা" দিবার কে?"

"কি বল্‌লি, বাঁদী হারামজাদী? আমি তার 'বাহা' দিবনা ত দেবে কে? তুই পারিস্‌ যদি তবে ঠেকা।" এইরূপ চীৎকারে সূর্য্যমণি শরীরের গুরুভারে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পানের পিপাসায় গলা শুকাইয়া গেল। একজন দাসী পানের বাটা হইতে একটী পান তাঁহার হাতে দিল। তিনি তাহা মুখে ফেলিয়া দিলেন। তারপর তিনি শোভাবতীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন—

"মা! আমি তোমার ভালর জন্যই এই বিবাহ ঠিক করিয়াছি।

হঠাৎ তাঁহার "সময়" হইল। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে এই বিবাহই দিতেন। উদয়নাথ ত মন্দ ছেলে নয় ?—"

উজ্জ্বলা আর সহ্য করিতে পারিল না। সে সূর্য্যমণির কথায় বাধা দিয়া বলিল—

"মিথ্যা কথা ! মৰ্দ্দরাজ সাণ্ড এ বিবাহে কখনও মত দেন নাই। তাঁহার নিকট কখনও এ বিবাহের প্রস্তাব করা হয় নাই। প্রস্তাব করিলেও, কখনও তিনি এ বর পছন্দ করিতেন না। তোমার উদয় নাথের যে কত গুণ !"

"কি বল্‌লি বাঁদী ! তোর ছোট মুখে বড় কথা ? তোকে ঝাঁটা পেটা করিব, জানিস্ ? তুই কিরকমে জান্‌লি যে মৰ্দ্দরাজ সাণ্ডমত দেন নাই ?"

"কি ! আমাকে ঝাঁটা পেটা করিবে ? তুমি ? এস দেখি ঝাঁটা নিয়ে ! আমার আর এ অপমান সহ্য হয় না !"

ইহা বলিয়া উজ্জ্বলা চক্ষু মুছিতে মুছিতে কাঁদিতে লাগিল। পরে বলিল—"মৰ্দ্দরাজ সাণ্ড যে, মত দেন নাই, তাহা বুঝি আমি জানি না ? যদি উদয়নাথের সহিত বিবাহে মত দেওয়াই তাঁহার মত হইবে, তবে তিনি মৃত্যুকালে বাবাজী ও মান্ধাতা সাণ্ডকে একটী ভাল বরের সহিত শোভাবতীর বিবাহ দিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া গেলেন কেন ? আমি বুঝি কিছু জানি না ? শোভাবতীকে একটা "গুণ্ডার" সহিত বিবাহ দিয়া জলে ডুবাইয়া দিতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তাঁহারাই তাহার বিবাহ দিবার প্রকৃত মালিক !"

"আমি তাহা মানি না। আমি সে উইলও মানি না। আমি কালই উদয়নাথের সহিত শোভাবতীর বিবাহ দিব। দেখিস্ আমি পারি কি না !"

ইহা বলিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সূর্য্যমণি সদলবলে প্রস্থান

সূর্য্যমণি চলিয়া গেলে উজ্জ্বলা শোভাবতীর চুল লইয়া বসিল। সেই সুচিক্কণ কেশরাশিতে অযত্নে জটা ধরিয়া গিয়াছে। এই এক বৎসর শোভাবতী ভাল করিয়া কেশবিন্যাস করিতে দেয় নাই। মাথায় তেলও মাখে নাই। তাহার সেই তপ্তকাঞ্চন গৌরকান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে। সে উজ্জ্বলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। উজ্জ্বলাও কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে উজ্জ্বলা বলিল—

"এখন এই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় কি? এখন বাবাজীকেই বা কি করিয়া সংবাদ দেই? মান্ধাতা সাওই বা কোথায়? আমি কোনক্রমে পলাইয়া মান্ধাতা সাওের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসি। তুমি ভাবিও না।"

উজ্জ্বলা গোপনে গিয়া মান্ধাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। কিন্তু সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শোভাবতীকে কোন আশাপ্রদ সংবাদ দিতে পারিল না।

আমাদের বঙ্গদেশে দিবাবিবাহ নিষেধ। কিন্তু উড়িষ্যায় সাধারণতঃ বিবাহ দিবাভাগেই হইয়া থাকে। অথচ কন্যা পুত্রবর্জ্জিতা হয় না, এবং স্বামীকেও হত্যা করে না। বিবাহের যে লগ্ন ঠিক হয়, সে সময়ে বর নিজের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে যাইবার জন্য যাত্রা করেন। পরে বিবাহ সুবিধামত অন্য সময়ে হয়।

উদয়নাথ ২০শে বৈশাখ সন্ধ্যাকালে গোধূলি লগ্নে যাত্রা করিয়া চক্রধর পট্টনায়কের সহিত কোদণ্ডপুর অভিমুখে রওনা হইল। উড়িষ্যার করণজাতির বিবাহে বরপক্ষ সাধারণতঃ পাল্‌কীতে চড়িয়া কন্যার বাড়ীতে আগমন করেন। বর তান্‌জানে (খোলা পাল্‌কী) কিম্বা দোলায় চড়িয়া আসেন। যিনি যত অধিক পাল্‌কী আনিতে

লোকের স্কন্ধে আরোহণ করিবার সুখ উপভোগ করে। চক্রধর পট্ট-নায়ক এই বিবাহ নিতান্ত গোপনে দেওয়ার উদ্যোগ করিয়াছেন, সে জন্য কিছু মাত্র ধূমধাম করেন নাই। একখানা পাল্কীতে তিনি, আর একখানা পাল্কীতে উদয়নাথ, এইরূপে তাঁহারা দুইজনে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে একজন মশালচি আর দুই জন ভৃত্য চলিল।

এদিকে সূর্য্যমণি বিবাহের আয়োজন করিয়া বসিয়া আছেন। এই বর আসে বর আসে করিয়া একবার ঘরের বাহিরে যাইতেছেন, একবার ভিতরে আসিতেছেন। থঞ্জার ভিতরে বিস্তৃত উঠানে বিবাহের আয়োজন হইয়াছে। প্রাঙ্গনের পশ্চিম ভাগে বিবাহের বেদি বাঁধা হইয়াছে, তাহার উপরে বর ও কন্যা পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিবেন। পুরোহিত ঠাকুর পূজার উপকরণাদি লইয়া সেই বেদির পার্শ্বে কুশাসনে বসিয়া আছেন; আর থাকিয়া থাকিয়া মশার কামড়ে অস্থির হইয়া মশা তাড়াইতেছেন এবং হাঁই তুলিতেছেন, ও হাতে তুড়ি দিতেছেন। এই বিবাহবাড়ীতে একটুও বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতেছে না। কয়েক জন বাদ্যকর আনিয়া বাহিরের ঘরে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, বিবাহ হইয়া গেলে তাহারা বাজাইবে। শোভাবতী তাহার ঘরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া এখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উজ্জ্বলার চক্ষে ঘুম নাই, সে পার্শ্বে শুইয়া আছে।

এই সময়ে হঠাৎ দূরে বাদ্যধ্বনি শুনা গেল। ক্রমে ক্রমে তাহা নিকটে আসিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বোমের গুড়ুম্ গুড়ুম্ নিনাদ ও হাউইবাজির হুস্ হুস্ শব্দও শুনা গেল। মধ্যে মধ্যে দুই একটী বন্দুকের আওয়াজও হইতে লাগিল। পরে অনেকগুলি পাল্কী-বাহকের "হাইরে-ভাইরে" শব্দ ও লোকের কোলাহল শুনা গেল। এই সকল শুনিয়া সূর্য্যমণি "হায়! হায়!" করিতে লাগিলেন ও তাঁহার

উজ্জ্বলা এই গোলমাল শুনিয়া শোভাবতীকে জাগাইল ও নিজে উঠিয়া বাহিরে আসিল।

সেই গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া যখন সে বরযাত্রি-দল কোদণ্ডপুর গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শয্যাত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের চক্ষু স্থির হইল। এরূপ জাঁকজমক তাহারা কখনও চক্ষে দেখে নাই। সেই বরপক্ষীয় লোকের অগ্রভাগে মশাল হাতে করিয়া এক জন লোক চলিয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে একটা ঘোড়া, একটা বাঘ, একটা ষাঁড়, দুইটা দৈত্য, এবং দুইটা নর্ত্তকীর প্রকাণ্ড মুখসপরা, কয়েক জন লোক তালে তালে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। সেই বিবিধবর্ণে চিত্রিত ভীষণ মূর্ত্তি সকল ও তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া মাতৃক্রোড়ে শিশুগণ কাঁদিয়া উঠিল, বালকগণ ভয়ে চক্ষু মুদিল, অন্য সকলে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। ইহাদের পশ্চাতে দুইটা বড় বড় হাতী বিচিত্র ঝালরে ও রজত আভরণে ভূষিত হইয়া মন্থর গতিতে চলিয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে চারিটী প্রকাণ্ড ঘোড়া লালবর্ণের গদি ও ঝালরে সজ্জিত হইয়া তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে। পরে একখানা রৌপ্যমণ্ডিত চতুর্দ্দোলে বহু-মূল্য বেশভূষা ও স্বর্ণাভরণে সজ্জিত বর বসিয়া আছেন। আটজন সুসজ্জিত বাহক সেই চতুর্দ্দোল বহন করিয়া চলিয়াছে। তাহার অগ্রে ও পশ্চাতে দুইজন করিয়া চোপদার রূপার "আসাছোটা" লইয়া চলিয়াছে। তাহার পশ্চাতে ষোলখানা পাল্‌কী। তাহার পশ্চাতে আর একদল মশালচি। তাহার পশ্চাতে ৫০ জন বাদ্যকর ঢোল, কাড়া, সানাই, ইত্যাদি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া বোম ও হাউই বাজি জ্বালান হইতেছে।

যাইতেছেন, তখন তাহারা হাঁ করিয়া সেই চতুর্দ্দোলারোহী রাজাকে দেখিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কোথায় যাইতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিল না। অনেক লোক তামাসা দেখিবার জন্য বরযাত্রিদলের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সেই বরযাত্রিদল মর্দ্দরাজ সাওের বাটীর সম্মুখে গিয়া থামিল। তখন বাসুদেব মান্ধাতা যোড়হস্তে সকলকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি একটী নারিকেল ফল, নববস্ত্র ইত্যাদি লইয়া বরকে বরণ করিলেন। নরোত্তম দাস বাবাজি এক খানা পাল্‌কী হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। অভিরাম সুন্দর আর একখানা পাল্‌কী হইতে নামিয়া বরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি লোকজন বাহিরের বৈঠকখানা পরিষ্কার করিয়া সকলের বসিবার জন্য বিছানা পাতিয়া দিল। ভীমজয় সিং তাহার দলবল লইয়া আসিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সকলকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বাবাজি সূর্য্যমণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সূর্য্যমণি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, যে চক্রধর পট্টনায়কই তাঁহার বর লইয়া এইরূপ জাঁকজমক করিয়া আসিতেছেন। পরে তিনি দাণ্ডঘরে গিয়া জানালা দিয়া যখন দেখিলেন যে তাহারা কেহ আসে নাই, তাঁহার অপরিচিত অনেকগুলি লোক বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহারা কে, কোথায় যাইতেছে তাহা জানিবার জন্য তিনি একজন দাসীকে বাহিরে পাঠাইলেন। সে আসিয়া কহিল, কোন রাজার ছেলে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন। সূর্য্যমণি মনে করিলেন, তাহারা বুঝি ভুল করিয়া এখানে আসিয়াছে। কিন্তু যখন বাসুদেব মান্ধাতা ও নরোত্তম বাবাজী তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে দিলেন

তিনি অন্তঃপুরে গিয়া শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

নরোত্তম বাবাজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দাসী দ্বারা সূর্য্যমণিকে সংবাদ দিলেন এবং নিজে তাঁহার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সূর্য্যমণি বাহিরে আসিলেন না, কি কোন সংবাদ পাঠাইলেন না। বাবাজী তখন দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মা! তোমার জামাই আসিয়াছেন, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ। মা! আমাদের বড়ই সৌভাগ্য, তাই কনকপুরের রাজাকে জামাতা-স্বরূপে পাইয়াছি। রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, বিদ্যা, বুদ্ধিতে এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট জামাতা পাওয়া কঠিন। মা! শোভাবতী আজ রাজরাণী হইতে চলিল, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? মা! তুমি এখন উঠিয়া আসিয়া তোমার জামাতাকে বরণ কর।"

বাবাজীর কথা শুনিয়াও সূর্য্যমণি নড়িলেন না। তিনি সংবাদ পাঠাইলেন, তাঁহার শরীর অসুস্থ, তিনি উঠিতে পারিবেন না।

তখন বাবাজী নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে শোভাবতীর ঘরে চলিলেন। উজ্জলা এতক্ষণ নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিল; সেও তাঁহার সঙ্গে গিয়া শোভাবতীকে ডাকিয়া তুলিল।

শোভাবতী বাবাজীকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বাবাজী বলিলেন—

"মা! এতদিনে তোমার সকল দুঃখের অবসান হইল। আশীর্ব্বাদ করি তুমি সাবিত্রীসমা হও—তুমি রাজরাণী হইয়া পরমসুখে থাক।"

শোভাবতী কি স্বপ্ন দেখিতেছে? সে জাগ্রত না নিদ্রিত? প্রথমে তাহার মনে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল। পরক্ষণেই প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। যুগপৎ হর্ষবিষাদের

সে অসমর্থ। তাহার কথা কহিবার শক্তি নাই। তাই সে কাঁদিতে লাগিল। আজ এক বৎসর শোক, দুঃখ, নির্য্যাতন ভোগ করিতে করিতে তাহার হৃদয় হতাশার নিম্নতম গহ্বরে নিমগ্ন হইয়াছিল। তাহার নিবিড় অন্ধকারময় জীবনে কখনও উষার কনক-কিরণময়ী আশাচ্ছটা ফুটিবে এরূপ স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু আজ অকস্মাৎ কোন স্বর্গের দেবতা আসিয়া তাহার গাঢ়তিমিরময় কক্ষে মধ্যাহ্নের প্রদাপ্ত সুখোচ্ছ্বাস-ময় আলোকচ্ছটা বিকীরণ করিলেন, আজ হতাশার গভীরতম গহ্বর হইতে হঠাৎ সে সুখোল্লাসের প্রবাহে ভাসিয়া উঠিল। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন সে সহ্য করিতে পারিবে কেন? তাই শোভাবতী কাঁদিতে লাগিল। তাহার এই মহা সুখের সময়ে তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তাহার আজীবন স্নেহমমতার একমাত্র আধার, সেই পিতা কোথায়? তিনি বাঁচিয়া থাকিলে, আজ তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। সেই স্নেহময় পিতার কথা স্মরণ করিয়া, শোভাবতী কাঁদিতে লাগিল।

বাবাজী তাহার সেই নিহারসিক্ত-ফুল্ল-কমলবৎ অশ্রুসিক্ত মুখখানি ও সরল সকরুণ দৃষ্টি দেখিয়া সহজেই তাহার হৃদয়ের অব্যক্ত ভাবগুলি বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাহাকে বস্ত্রাভরণে সজ্জিত করিবার জন্য উজ্জ্বলাকে উপদেশ দিয়া বাহিরে আসিলেন। উজ্জ্বলা তাঁহার পশ্চাতে কিছুদূর আসিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল "এই রাজার আর কয়টী রাণী আছেন?"

বাবাজী তাহার কথায় একটু হাসিয়া বলিলেন "না মা! সেজন্য তোমার কোন ভাবনা নাই। রাজার এই প্রথম বিবাহ হইবে। আমি সে সব না দেখিয়াই কি এ বর ঠিক করিয়াছি?"

বাবাজীর তিরস্কারে উজ্জ্বলা লজ্জিত হইল ও মনে মনে বিশেষ

বাক্স খুলিয়া গহনা বাহির করিয়া শোভাবতীকে সাজাইতে লাগিল। বাবাজী একখানা বহুমূল্য পট্টসাটী উপরে পাঠাইয়া দিলেন, তাহা তাহাকে পরাইল।

বাবাজী এদিকে "দাণ্ডে" আসিয়া অতিথিগণের অভ্যর্থনা ও বিবাহের আয়োজনে মন দিলেন। তাঁহার বন্দোবস্ত অনুসারে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজনের জন্য পুরী হইতে ভারে ভারে মহাপ্রসাদ আসিতে লাগিল। পুরীজেলার ঐ এক সুবিধা। সেখানে ইচ্ছা করিলে বাড়ীতে রন্ধন না করিয়াও জগন্নাথ মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ দ্বারা যত ইচ্ছা তত লোককে ভোজন করান যায়। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে মৎস্যমাংসের কারবার নাই, কিন্তু ঘৃতান্ন, "কণিকা" খিচুড়ী, বিবিধ নিরামিশ ব্যঞ্জন, পিষ্টক পরমান্নাদি নানা প্রকার রসনাতৃপ্তিকর বস্তুর আয়োজন অতি অল্প সময়ের মধ্যে হইতে পারে। আর মহাপ্রসাদ বলিয়া সকলেই তাহা ভক্তির সহিত পরম পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করে, তাহার একটী কণাও নষ্ট হয় না।

বাবাজী এই সকল বন্দোবস্ত করিতেছেন, এমত সময়ে ভীমজয়সিং আসিয়া বলিল "বাবাজী! চক্রধর পট্টনায়ক ও তাহার বরকে আমি আটক করিয়া রাখিয়াছি। তাহাদের প্রতি কি হুকুম হয়?"

বাবাজী বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি? তুমি তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছ? কি সর্ব্বনাশ! তাহা এতক্ষণ বল নাই কেন? তুমি এখনই তাহাদিগকে খুলিয়া দিয়া এখানে নিয়া এস। কি সর্ব্বনাশ!"

বাবাজীর কথা শুনিয়া জয় সিং কি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। "বাবাজীর যেমন সকলের প্রতিই দয়া! আমরা যদি তাহাকে ধরিয়া না রাখিতাম, তবে এই রাজার বিবাহ কিরূপে হইত? পূরা বদমাইস!

পুর গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মর্দ্দরাজের বাড়ীতে যাইতে হইলে একটা জঙ্গলের মধ্যদিয়া যাইতে হয়। তাঁহাদের পাল্‌কী যখন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন হঠাৎ কে একজন লোক আসিয়া, তাঁহাদের মশাল কাড়িয়া নিয়া নিবাইয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ আর ২০।২৫ জন লোক মার মার শব্দে আসিয়া উপস্থিত হইল, ও সেই পাল্‌কী ঘিরিয়া দাঁড়াইল। পাল্‌কী-বাহকগণ প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারিল, সেই জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারে লুকাইল। দস্যুগণ তখন চক্রধর ও উদয়নাথকে পাল্‌কী হইতে জোরে টানিয়া বাহির করিল। চক্রধর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমাদের মারিও না। আমাদের-নিকট কোন টাকাকড়ি নাই। এই কাপড়চোপড় যাহা আছে তাহা তোমাদিগকে খুলিয়া দিতেছি। আমাদের ছাড়িয়া দেও।"

দস্যুদলপতি ওরফে ভীমজয় সিং বলিল, "তুমি কোন কথা বলিও না, চেঁচাইও না, চুপ করিয়া থাক। নচেৎ মারা পড়িবে। আমরা তোমার টাকাকড়ি কাপড়চোপড় কিছুই চাই না।"

ইহা বলিতে বলিতে ২।৩ জন লোক চক্রধর ও উদয়নাথের গায়ের চাদর দিয়া তাহাদের মুখ বাঁধিল ও হাত পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিল। পরে তাহাদিগকে নিজ নিজ পাল্‌কীর মধ্যে বসাইয়া সেই দস্যুগণ তাহাদিগকে কাঁধে করিয়া নিয়া গেল। এতক্ষণ তাহাদিগকে হেফাজাতে রাখিয়াছিল। এখন ভীমজয় সিং তাহাদের বন্ধন খুলিয়া দিয়া বাবাজীর নিকটে তাহাদিগকে লইয়া গেল।

বাবজীকে দেখিয়া চক্রধর কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। বাবাজী তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। কনকপুরের রাজা শোভাবতীকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন, ইহা চক্রধর আগেই শুনিয়া-

ছিল, তাহা দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় এখন তাহার হৃদয়েই লীন হইল। তাহার বরের পোষাক পরিয়া পাল্‌কী চড়াটাই কেবল লাভ হইল।

কিন্তু চক্রধর হটিবার লোক নহেন। তিনি বাবাজীর অভয় বচনে আশ্বস্ত হইয়া, যেন কিছুই হয় নাই, যেন পূর্ব্ব হইতেই তিনি বাবাজীর সঙ্গে বরযাত্র হইয়া আসিয়াছেন, যেন তাঁহারই উদ্যোগে এই বিবাহ হইতেছে, এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন। যাহা নিবারণ করিবার সাধ্য নাই, তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বাবাজীর অনুরোধে তিনি সূর্য্যমণিকে নানারকম প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন।

এই সকল গোলযোগে রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া আসিল। তখন বিবাহের আয়োজন হইল। বাড়ীর ভিতর প্রাঙ্গনে বিবাহের সভা হইল। বর ও কন্যা পট্টবস্ত্র ও বিবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া সেই বেদীর উপর বসিলেন। দেশীয় প্রথার অনুরোধে নবঘনকেও বালা, হার প্রভৃতি নানাপ্রকার অলঙ্কার পরিতে হইল। যাহার এ সকল গহনা নাই, সে যখন শুদ্ধ বিবাহের সময়ের জন্য অন্যের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া তাহা পরে, তখন নবঘন তাহা পরিবেন না কেন? বাসুদেব মান্ধাতা বরের হস্তে শোভাবতীকে সম্প্রদান করিলেন। বর-কন্যার মালা বদল হইল। সেই বেদীর উপরে পুরোহিত হোম করিলেন। বিবাহান্তে সেই বেদীর উপরে বসিয়া বর-কন্যার মধ্যে একবার কড়ি খেলা হইল। তখন সেই নবোঢ়াকন্যার সলজ্জ-রক্তিম মুখশ্রীর ন্যায় পূর্ব্বগগণে অরুণরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সানাইয়ের তানের সহিত কোকিলের ঝঙ্কার, পাপিয়ার স্বরলহরী ও কাকের

গৃহে বসিয়া বর ও কন্যার মধ্যে আর একবার কড়ি খেলা হইল। উড়িষ্যায় "বাসর ঘর" নাই। বর বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

সেই দিন অপরাহ্নে শোভাবতীকে লইয়া নবঘন কনকপুরে চলিয়া আসিলেন। শোভাবতীর সঙ্গে একটী মাত্র দাসী গেল—সে উজ্জ্বলা।

শ্রীযতীন্দ্র মোহন সিংহ।

ভাষা-রহস্য।

(ভাষার উৎপত্তি প্রচলন ও উন্নতি)।

ভাষা মানবের একান্ত নিজস্ব সামগ্রী হইলেও, মানুষ, সৃষ্টি-প্রারম্ভ হইতে ইহার অধিকারী কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে আদিম মনুষ্যকে শিশুর সহিত তুলনা করিয়া দেখান যে, শিশু যেমন জন্মিয়াই কথা কহিতে শিখে না, তেমনিই প্রকৃতির শিশু আদিম মানবও বাক্যপটু হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহার নিদর্শন স্বরূপ বহুজাতি সভ্য-সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিয়া আজ পর্য্যন্ত মূক রহিয়াছে। যথা আফ্রিকার গ্রেবোজাতি।* অতএব মানুষ কি করিয়া প্রথমে কথা কহিতে শিখিল তদ্বিবরণ নিশ্চয়ই অতি কৌতূহলজনক। এ সম্বন্ধে বহুপণ্ডিত বহুমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভাষা, মানসিক চিন্তা ও ভাবের সমষ্টি ও প্রকাশক বহিরাবরণমাত্র। ভাষা ভাবপ্রকাশক আবার ভাবই ভাষার জনক। ভাষা মানব ও

পশুজাতির মধ্যে এক প্রধান পার্থক্য-সাধন। ভাষা যে কেবল উচ্চার্য্য শব্দেরই উপর নির্ভরশীল তাহা নহে; ভাষা হাবভাব, ইঙ্গিত ইসারা দ্বারাও গঠিত হইতে পারে। যে সকল সাধনদ্বারা আমরা আমাদের মানসিক চিন্তা, ভাব প্রভৃতি অন্যকে জ্ঞাপন করিয়া থাকি, তত্তৎমাত্রই ভাষা বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে, অতএব প্রধানতঃ ভাষা দুই প্রকার—(১) সাঙ্কেতিক ও (২) শাব্দিক।

মূক, শিশু ও কোন কোন অসভ্যজাতি (পূর্ব্বোক্ত গ্রেবোজাতি) যে অঙ্গভঙ্গী ও সঙ্কেতদ্বারা মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া থাকে তাহা সাঙ্কেতিক-ভাষা, এবং আমাদের চিন্তা ও অনুভূতি জ্ঞাপনের জন্য যে উচ্চারিত শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহারই নাম শাব্দিকভাষা। শাব্দিক ভাষা কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি; এই সকল বাক্যসমষ্টিদ্বারা সমাজ মধ্যে যে পরস্পরের মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা তাহারই নাম ভদ্রভাষা বা সভ্যভাষা। সভ্যভাষার নানারূপে শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, কথিত ও লিখিত। যে ভাষা পুস্তকাদি রচনায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাহা হইতে কথিতভাষার অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা বলিবার সুবিধার জন্য বাক্য বা পদকে সম্প্রসারণ বা বিপ্রকর্ষণ ও সঙ্কোচন দ্বারা সহজসাধ্য করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু লিখিতসাহিত্যে যেরূপ একবার গৃহীত হইয়াছে তাহার আর বড় ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না। কিন্তু কথিত-ভাষা ও লিখিতভাষা উভয়ে উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উভয়ে উভয়কে পুষ্ট ও স্বসদৃশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। লিখিতভাষার প্রভাব কিঞ্চিৎ অধিক লক্ষিত হইলেও কথিতভাষা সর্ব্বদাই লিখিত-ভাষাকে পুষ্ট করিতেছে তাহা ক্রমশঃ দেখাইবার চেষ্টা করিব। দ্বিতীয়তঃ, ভাষাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ভাষার

একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশভেদে কথিত ভাষায় যে তারতম্য লক্ষিত হয় তাহাকে **প্রাদেশিকতা** আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বঙ্গদেশে কথিত ভাষাকে প্রধানতঃ চারিটী প্রাদেশিক ভাষায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) পূর্ব্বপ্রাদেশিক; ইহা সাধারণতঃ বাঙ্গাল* নামে পরিচিত। (২) পশ্চিমপ্রাদেশিক; ইহা বর্ত্তমান লিখিত-ভাষার অনুরূপ। (৩) উত্তরপ্রদেশীয়; ইহা বাঙ্গালা ও বিহারী ভাষার সংমিশ্রণে বিকারপ্রাপ্ত। (৪) দক্ষিণপ্রদেশীয়; ইহা উড়িয়া সংশ্রবে পরিবর্ত্তিত।

---

* চন্দ্রবংশীয় বলিরাজের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র ছিল। বঙ্গশাসিত দেশই বঙ্গ নামে পরিচিত হইয়াছিল। এক্ষণে বঙ্গ বলিলে যতটা রাজ্য বুঝি, তখন সে রাজ্যের এতটা বিস্তৃতি ছিল না। পূর্ব্বপ্রদেশের কিয়দংশই তখন বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল; এবং এখনও তাহারই নিদর্শনস্বরূপ বঙ্গ, বঙ্গজ, বাঙ্গাল বা বঙ্গদেশী বলিলে পূর্ব্ববঙ্গ বা তদ্দেশবাসীকেই বুঝায়। যবনরাজাদিগের সময়ে 'সুবে বাঙ্গালার' সীমাবৃদ্ধি হইয়া বঙ্গদেশ প্রথম 'বাঙ্গালা' নাম প্রাপ্ত হয়। ইহা, বোধ হয় সমসুদ্দিনের সময়। আইন-আকবরিতে লিখিত আছে যে বঙ্গের নিম্ন-ভূমিতে দেশীয় রাজারা অনেকগুলি বাঁধ বা আল দিয়াছিলেন, কারণ তখন সবেমাত্র নিম্নবঙ্গ সমুদ্রগর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে। সেই বঙ্গ ও আল শব্দদ্বয়ের যোগে বাঙ্গাল ও বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। প্রাচীন য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীরা বলেন পূর্ব্বে 'বেঙ্গালা' নামে একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল; সেখানে তাঁহারা বাণিজ্য করিতেন। কেহ কেহ ইহা বর্ত্তমান ঢাকা বলিতে চাহেন, কারণ ঢাকার একটি বাজারের নাম বাঙ্গালা বাজার। যাহা হউক ঐ বেঙ্গালা যে সহরই হউক, উহা হইতে বাঙ্গালা নাম হওয়া বিচিত্র নহে। গৌড় ও বঙ্গ নাম অনেক পুরাণ ও তন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালা নাম প্রাচীন গ্রন্থে কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

যে প্রদেশে যখন রাজা বা রাজধানী থাকে সেই প্রদেশ তখন সভ্যতায় ও যোগ্যতায় অন্যান্য প্রদেশকে পরাভূত করিয়া থাকে। তখন সেই প্রদেশের ভাষা অন্যান্য প্রদেশের অনুকরণীয় হইয়া উঠে। মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকার কথা আদর্শস্থানীয় ছিল; তৎপরে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে কৃষ্ণনগরের ভাষা প্রাধান্য লাভ করে; এক্ষণে তাহার প্রভাব হ্রাস হইয়া কলিকাতা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে।

মনু অর্থে মননশীল বা চিন্তাশীল। তাঁহার অপত্য মানবও চিন্তাশীল; এবং তাহাদের চিন্তার প্রথম বিকাশ তাহাদের ভাষা। এই ভাষা সৃষ্টি সম্বন্ধে নানামুনির নানামত। প্রধানগুলি এস্থলে আলোচিত হইতেছে।

১। কেহ কেহ বলেন যে ভাষা বা ভারতী অনিত্য, স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ম্ভুব। বেদে সরস্বতীকে (বাণীকে) এই বলিয়াই স্তুতি করা হইয়াছে। মানবজাতির সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহাই আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইঁহাদিগের মতে ভাষা মানুষের সহজ বুদ্ধিজাত (Instinctive) বা দৈবীপ্রকাশ (miraculous revelation) কারণ তাঁহারা বলিতে চাহেন যে মানুষের মনে আদিম অবস্থায় যদি চিন্তা থাকিয়া থাকে, তবে তাহা প্রকাশের ভাষাও ছিল। চিন্তা ও ভাষা অচ্ছেদ্যবন্ধনে সংযুক্ত; ভাবহীন বাক্য মৃতশব্দ ভিন্ন কিছুই নহে, এবং ভাষাহীন চিন্তাও বুঝি অসম্ভব; চিন্তা অর্থাৎ অব্যক্ত কথা কহা এবং কথা কহা মানেই ব্যক্তচিন্তাস্রোত, বাক্যই ব্যক্তচিন্তা, তাহাদের বন্ধন অভেদ্য।

২। অপর একদল আছেন, যাঁহারা অনুমান করেন, ভাষা মানুষের

বাইবেল খুলিয়া দেখান যে আদমই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার নামকরণ করিতেছেন, ঈশ্বর নহেন; এবং পুরাণাদিতেও স্বায়ম্ভুব মনুই সৃষ্ট-পদার্থের নাম-কর্ত্তা।

অজ্ঞতাবশতঃ মানুষ কোন অবোধ্য দৃশ্যে আশ্চর্য্য হইয়া থাকে। এই আশ্চর্য্যের ভাব হইতেই তাহার জ্ঞানলিপ্সা, এবং জ্ঞানলিপ্সা হইতেই বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক লক্ বলিয়াছেন যে সৃষ্টির পর মানুষকে কিছুকাল মৌনাবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। এবং তাহার মানসিক ভাব জ্ঞাপনের একমাত্র সাধন ছিল অঙ্গভঙ্গী ও ইসারা। যখন এই ইসারা, স্পষ্টভাব সকল প্রকাশে সম্যক সক্ষম হইল না, তখন তাহারা শব্দ করিতে আরম্ভ করিল।

(ক) এই শব্দ প্রথমে পশুপক্ষীর শব্দ হইতে অনুকৃত হইয়াছিল, ইহার নাম দ্রব্যানুগতিক শব্দোৎপত্তি। ইংরাজিতে 'কুকু,' 'ক্রো,' 'কক্,' এবং সংস্কৃতে কুক্কুট, কাক প্রভৃতি তাহাদিগের শব্দানুকরণে সংজ্ঞিত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ শব্দ বর্ত্তমান ভাষায় অতি অল্পই দেখা যায়।

(খ) কাহারও মতে আদিমভাষায় কতকগুলি অব্যয় ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। যথা, হা, হে, এ, এই, ও, ওঃ, ইঃ ইত্যাদি। যখন এই সকল সহজ শব্দ অভ্যাসবশতঃ আয়ত্ত হইয়া আসিল অথচ তাহাতে ভাবস্ফূর্ত্তি হইল না, তখন তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি উক্ত অব্যয়গুলির পরস্পর সংমিশ্রণে (Permutation and Combination) নানারূপ শব্দ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, তাঁহার অনুচরগণ তাহারই অনুসরণ করিতে লাগিল। তৎপরে কোন দ্রব্যের

একই বস্তুর বিভিন্ন নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। Adam Smith তাঁহার "Essays on the Origin of Language," নামক গ্রন্থে এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

এই দুইটির প্রথম মত যাস্ক তাঁহার নিরুক্তগ্রন্থে (খৃ-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বিরচিত) নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, নাম অর্থশূন্য একটা চিহ্নমাত্র। কাক, কুক্কুট প্রভৃতির নাম তাহাদের শব্দানুকরণে রক্ষিত হইয়াছে। ঔপমন্যবও প্রথম পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু তিনি শব্দানুগতিক (যাস্কের) মতের বিরোধী। তিনি কাক প্রভৃতি নাম গুণানুগতিক বলিতে চাহেন অর্থাৎ তাহাদের বিশেষ কোন গুণ হইতে ঐ নাম রক্ষিত হইয়াছে। কাক = অপকালয়িতব্য, অর্থাৎ যে পক্ষী তাড়িত হইবার উপযুক্ত; তিত্তিরি = যে লম্ফ দেয় (তর্ধাতু) বা যাহার অঙ্গে তিলমাত্র চিত্র বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ আছে।

গার্গ্য শব্দানুগতিক ও গুণানুগতিক উভয় মতের বিরোধী। তিনি ইহার বিরুদ্ধে সাতটি যুক্তি দিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধানতমগুলির সারাংশ সঙ্কলিত হইল। "কেবল যৌগিক নামগুলিই ধাতু হইতে (অর্থাৎ শব্দ বা গুণানুসারে) সমুৎপন্ন, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত নামগুলি ধাতুর ন্যায় স্বতঃপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ রূঢ়শব্দ, প্রকৃতি প্রত্যয়যোগে সমুৎপন্ন নহে"। যদি সমস্ত সংজ্ঞাই পদার্থের কোন বিশেষ গুণ হইতে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তদ্‌গুণবিশিষ্ট অপর পদার্থও সেই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া একাকার প্রযুক্ত অর্থপ্রাপ্তি বিষয়ে অন্তরায় উপস্থিত করিতে পারে। যথা, অশ্ব = অশ্ (ব্যাপ্ত্যর্থে) + ব (সংজ্ঞার্থে) অর্থাৎ যে ব্যাপিয়া থাকে; এইরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট প্রত্যেক পদার্থই

ব্যবহারে সকল লোকেরই ইচ্ছা জন্মিতে পারে; যথা পুরুষস্থলে পুরিশয়, অশ্ব স্থানে অষ্টৃ বা তৃণ স্থানে তর্দ্দন হইতে পারে।

যাস্ক এই মতের খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন, শব্দ এক এক পদার্থের এক এক বিশেষ গুণ লইয়া বিশেষভাবে 'স্বভাবতঃ' রচিত হইয়াছে। ইহা কখন বা দৈবাৎ এরূপ স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়, কখন বা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিবিশেষের (যথা কবি, শাস্ত্রকর্ত্তা প্রভৃতির) ক্ষমতা-পরিচালিত হইয়া একটা স্থায়ী আকার প্রাপ্ত হইয়া প্রচলিত হইয়া পড়ে। যখন একটা শব্দের যথেষ্ট প্রসার হইয়া যায়, তখন তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব হয়, এবং কেহ তাহার চেষ্টা করিলেও সর্ব্বসাধারণে তাহার অভিলষিত অর্থগ্রহণ করিতে সক্ষম ও সম্মত হয় না। ভাষা, ব্যবহারক সমাজের রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। যে শব্দ দ্বারা যে দ্রব্য সূচিত হইয়া থাকে, সেই দ্রব্যের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে শব্দেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা যায়। যাস্ক স্বীকার করেন যে, দ্রব্যসকল তাহাদের প্রত্যেক গুণ হইতেই সংজ্ঞিত হইতে পারে, কিন্তু সামাজিক রীত্যনুসারে একটি গুণ লইয়াই সংজ্ঞা প্রস্তুত হয়, এবং তাহা চলিত হইয়া যাইলে আর কোন গোল থাকে না। (একটা পদার্থের ২।৩টা প্রধান গুণ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা ২।৩টা নামও প্রস্তুত হয়। যেটা বেশী চলিত হয় সেইটাই প্রধান সংজ্ঞা, অপরগুলি অল্প ব্যবহার দ্বারা ঢাকা পড়িয়া থাকে, কিন্তু তাহারা পর্য্যায়শব্দ বা সমার্থক (Synonym) রূপে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। যথা—সূর্য্য, চলিত নাম; তপন, ভানু, রবি, অর্যমা প্রভৃতি তাহার সমার্থক। যেমন দ্রব্যবিশেষের প্রধান বা সহজবোধ্য গুণবিশেষের অনুসরণে নামকরণ হইয়া থাকে, তেমনি আবার কখন কখন বিরুদ্ধধর্ম্ম হইতেও হইতে দেখা যায়।*

"মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের" কারকের টীকায় দুর্গাদাস ভাষার উদ্ভব ঈশ্বরেচ্ছাশক্তির উপর আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'শব্দেন উচ্চার্য্যমানেন যৎবস্তু প্রতিপাদ্যতে, তস্য শব্দস্য তৎবস্তু জ্ঞায়তাম্ অর্থ-সংজ্ঞয়া ইতি প্রাজ্ঞঃ। এবম্ অস্মাৎ শব্দাৎ অয়ম্ অর্থো বোদ্ধব্য ইতি ঈশ্বরেচ্ছাশক্তিঃ—ইতি অর্কিকাশ্চ। তৎজ্ঞানস্তু ব্যাকরণাদিভ্যঃ, অতএব শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান কোষাপ্তবাক্যাৎ—ব্যবহারতশ্চ—ইতি প্রাজ্ঞঃ' ইত্যাদি। শব্দ ঈশ্বরেচ্ছাশক্তিসম্ভূত, পরে ব্যবহারবশে তাহা স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়। রূঢ়শব্দ যেখানে ব্যবহৃত হয় সেখানে তিনি এ মত খাটাইতে না পারিয়া এক প্রতিপ্রসব সৃষ্টি করিয়াছেন। 'যত্র তু কেবলো রূঢ়শব্দো প্রযুজ্যতে তত্র বাক্যত্বাভাবাৎ তৎ ন্যায়স্য (ঈশ্বরেচ্ছা-শক্তিবশাৎ শব্দোৎপত্তিরিতি ন্যায়স্য) অবসরো নাস্তীতি।'

শাকটায়ন এই সকল মতের কতকটা সামঞ্জস্য করিয়া, শব্দানুগ, গুণানুগ উভয় মতই গ্রহণ করিয়াছেন। রূঢ়শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি নামকর্ত্তার খেয়ালকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

সর্ব্বত্রই দ্রব্য ও তদ্বোধক শব্দের মধ্যে সকল সময়েই যে কোন একটা সম্বন্ধ থাকিতে হইবে তাহা বলা যায় না ; তাই বলিয়া ভাষার শব্দ-গঠন যথেচ্ছও নহে, আকস্মিকও নহে। তাহা মানুষের গঠন, বুদ্ধি ও অবস্থার উপরই নির্ভর করে। দেখা যায় যে কোন দুই জাতির মধ্যে কোন সংস্রব সংস্পর্শ না থাকা সত্ত্বেও অবস্থাসাম্য থাকায় একই বস্তুর সংজ্ঞা উভয় জাতিতেই একই প্রকার হইয়াছে। শব্দানুগ বাক্যোৎপত্তি মানুষের অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়া থাকে বোধ হয়, আবার অন্যান্য শব্দে মানুষের সজ্ঞানভাব কিঞ্চিদধিক থাকিতে পারে, এবং রূঢ়শব্দ সম্পূর্ণ সজ্ঞানে গঠিত বলিয়াই মনে হয়। আবার কেহ কেহ বলেন—

৩। ভাষা একটি কারণে গঠিত হয় নাই, পরন্তু ঘটনা পরম্পরায়

ব্যক্তিবর্গের শব্দ হইতে (যথা কোন গুরুদ্রব্য তুলিবার সময় মুটে মজুরেরা শব্দ করিয়া থাকে) বা একই প্রকার সুখদুঃখভাব চালিত হইয়া মানুষ প্রথম কথা কহিতে শিখে। ভাষা সমাজকর্তৃক জ্ঞাতসারে গঠিত ও উদ্ভাবিত, এবং ইহা সমাজের প্রত্যেক একের (unit) মধ্যে এক সুদৃঢ় বন্ধন। প্রাত্যহিকজীবনের অভাব সম্পূরণ করিতে যাইয়া প্রথম ভাষার আবশ্যক হইয়াছিল। অতএব ইঁহাদের মতে, যখন সমাজ গঠিত হইয়াছিল তখনই ভাষা সৃষ্ট হইয়াছিল তৎপূর্ব্বে নহে।

উপরোক্ত সমস্ত মতগুলি হইতে প্রধানতঃ ভাষার গঠন সম্বন্ধে দুইটি দল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। (১) যাঁহারা বলেন শব্দ ও তদর্থের মধ্যে এক অবিযুক্ত সম্বন্ধ রহিয়াছে। য়ুরোপে Aristarchus এবং ভারতে শাকটায়ন ও যাস্ক এই মতাবলম্বী। (২) যাঁহারা শব্দ ও তদর্থের মধ্যে অবিযুক্ততা স্বীকার করেন না, অর্থাৎ যাঁহারা বলেন কোন একটা শব্দ বলিলেই যে দ্রব্যবিশেষকেই বুঝিতে হইবে তাহার কি কারণ আছে, সুবিধা হইলে অন্য পদার্থও বুঝিতে পারি। প্রথম গ্রীক-বৈয়াকরণ Crates of Mallos ইহার য়ুরোপীয়সমর্থক, ভারতে গার্গ্যই এ মতবাদীর প্রধান।

এই উভয় মতের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে, কাহাকেও ত্যাগ করিবার যো নাই। একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। আপ্ অর্থে সংস্কৃতে জল, হিন্দিতে আপনি, ইংরাজিতে একটি অব্যয় বুঝিতে হয়। কেহ যদি আপ্ কথাটি উচ্চারণ করে, তবে আমাদিগকে অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অর্থগ্রহ করিতে হইবে। পানার্থবোধক তিন ভাষার তিনটি ধাতু যোগ করিলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বুঝিতে হইবে। আপঃ পিবতু (জলপান কর), আপ্ পিজিয়ে (আপনি পান করুন), ড্রিঙ্ক আপ্ (পান করিয়া ফেল)। অতএব সুবিধা হইলে যে কোন শব্দে গণ্ডী ভাঙ্গিয়া নূতন অর্থ সংযুক্ত হইতে পারে। সংস্কৃততেই

এক শব্দের নানা অর্থ হইতে দেখা যায়; মিত্র = বন্ধু ও সূর্য্য; তীর্থ= না হয় এমন জিনিষ খুব অল্পই আছে; ইত্যাদি। কিন্তু প্রথম মতের পক্ষেই বহু মহারথী যুদ্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু সকল নিয়মেরই 'ব্যবহারে ব্যতিক্রম' দেখা যায়, এ ক্ষেত্রেও হইতে পারে দেখাইলাম। অতএব একটা বিয়োজক রেখা উভয়ের মধ্যে টানিয়া দেওয়া অসম্ভব। উভয় মতকে মিলাইয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

হর্ন্ টুক্ (Horne Tooke) কিন্তু এ সকলের সম্পূর্ণ বিপরীত মত আশ্রয় করিয়া বলিয়াছেন যে, দ্রব্য সকলই বাক্যের প্রতিরূপ মাত্র, এবং বাক্য মনুষ্যের যত্নপ্রসূত। 'Things are but the reflection of words and words are what men *deliberately* make them'. কিন্তু তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া অধ্যাপক সেস বলিয়াছেন যে, ভাষা মানুষের যত্নলব্ধ ধন নহে, তাহা আপনা আপনি মানুষের অজ্ঞাতসারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 'But language, like all things else connected with man and his mind is a self-developing organism.'—Science of Language.

কেহ কেহ বলেন ভাষা চিন্তা ও বুদ্ধির রূপকমাত্র; চিন্তা ও বুদ্ধি ভাষারূপ বহিরাবরণের সাহায্যে আপনার চরিত্রের বিকাশ করে মাত্র। এইজন্য তাঁহারা শব্দের সহিত তদ্বোধক দ্রব্যের একটা সাদৃশ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন 'কোমল,' 'হাল্কা,' 'মলিন' প্রভৃতি শব্দ উক্তিমাত্রেই অর্থবোধ করাইয়া দেয়।

আমাদের মতে ভাষার কতকাংশ মানুষের চেষ্টায় ও কতক অজ্ঞাতসারে সৃষ্ট হইয়া ঐ দুই উপায়েই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। কতক শব্দদ্বারা দ্রব্য সূচিত হয়, অনেক দ্রব্য শব্দসৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে। শব্দকর্ত্তা যে অর্থে শব্দপ্রয়োগ করে শ্রবণকারীও

যে সেই অর্থে সেই শব্দকে কেন গ্রহণ করে, তাহার কারণ বোধ হয় যে ভাষার প্রথম সৃষ্টি সময়ে সকলের জ্ঞাতসারে একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ লইয়া শব্দবিশেষকে সজীব করা হইয়াছিল।

ভাষার উদ্ভব সম্বন্ধে একরূপ বুঝা গেল। এক্ষণে প্রথম রচিত পদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার চেষ্টা করিব।

১। কেহ কেহ বলিতে চাহেন প্রথমসৃষ্ট বাক্যাবলী গুটিকয়েক ধাতু ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং তাহারা এক একটি দ্রব্য বা ক্রিয়ার শাব্দিক চিহ্ন মাত্র, ইহার সমর্থনার্থ তাঁহারা চীনভাষার উল্লেখ করিয়া দেখান যে, চীনভাষা বহু পুরাতন হইলেও তাহাতে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তাহাতে একটি পদে গুটিকয়েক ধাতুমাত্র ব্যবহার করিয়া মনোভাব জ্ঞাপন করিতে হয়; কারক, বিভক্তি প্রভৃতির বালাই নাই। এজন্য সংস্থানানুসারে একই পদের বহু অর্থ হইতে পারে। একটি শব্দ স্থান পরিবর্ত্তনে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়ার বিশেষণ, অব্যয় প্রভৃতি বহুরূপ ধারণ করিতে পারে। এ বিষয় প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ্ ম্যাক্সমূলর, মরিস, কারসিয়স্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। কেবল প্রসঙ্গতঃ ইহার উল্লেখ করিলাম। প্রাচীন সংস্কৃত হইতেও এক ধাতুর বহুরূপে ব্যবহার দেখান যাইতে পারে। ম্যাক্সমূলর বলিয়াছেন যে, বেদে এক 'যুধ্' ধাতু বিশেষ্য ও ক্রিয়া উভয় পদেই প্রত্যয়াদি নিরপেক্ষ হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। কারক, বিভক্তি, কাল, পাশাপাশি ব্যবহৃত ২।৩ টি ধাতু হইতে বুঝিতে হইত; কালে ঐ সকল ধাতুই পরস্পর মিলিত হইয়া, বিভক্তি প্রত্যয়াদি গঠন করিয়াছিল। সংস্কৃত ও চীনভাষায় পার্থক্য এই যে, চীনভাষা বিভক্তি প্রত্যয়াদিরও ভিন্ন অর্থ আজ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু সংস্কৃতে উহারা কোন

যুদ্ধ মধ্যে ; এই 'ই' যুধ্‌ সংযোগে অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ঐ অর্থে স্বতন্ত্র ব্যবহার কোথাও দেখা যায় না। চীনভাষা কিন্তু বিভক্তি-চিহ্নেরও স্বতন্ত্র অর্থ রক্ষা করিতে পারিয়াছে (বিশদ বিবরণ অধ্যাপক মূলরের 'Selected Essays' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

(ক) কেহ বলেন এই সমস্ত ধাতু প্রাকৃতিক শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ম্যাক্সমূলর ইহার নাম রাখিয়াছেন Bow-wow Theory (প্রাকৃতিক শব্দানুকরণ মত)।

(খ) অন্যে বলেন, আদিমধাতু সকল হর্ষ বিষাদসূচক শব্দ (Interjections) ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার নাম Pooh-pooh Theory (হর্ষ বিষাদসূচক শব্দানুকরণ মত)।

ডাক্তার মারে বলেন যে আদিম ধাতু কেবলমাত্র নয়টি। তিনি তাহাদের অদ্ভুত উচ্চারণ সকলও আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন, অগ্‌, বগ্‌, ইত্যাদি। ডাক্তার স্মিড্‌ তাঁহাকেও জিতিবার জন্য আদিম ধাতুকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌' করিয়াছেন।

আমাদের বোধ হয় আদিমকালে অগণিত ধাতু বহুব্যক্তিদ্বারা সৃষ্ট হইতে ছিল, এবং কালক্রমে একার্থক ও সদৃশাকারের বহুধাতু পরস্পরের সংঘর্ষণফলে মিশ্রিত, নিরাকৃত, ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া সসীম অবস্থা (১৭০০) প্রাপ্ত হইয়াছে। মূলর এই মতের কতক সমর্থন করিয়াছেন (Science of Language)। এই সমস্ত ধাতু হইতে ক্রমশঃ যাবতীয় ব্যবহার্য্যদ্রব্য, জন্তু প্রভৃতির নাম ও তাহাদের ক্রিয়াদি নির্ণীত হইয়াছিল।

২। আডাম স্মিথ বলিতে চাহেন যে প্রথমগঠিত বাক্যাবলী কেবল ক্রিয়াপদ। তাঁহার বিবেচনায়, বিশেষ্যপদ ক্রিয়াপদ অপেক্ষা অধিক আবশ্যকীয় নহে, কোন বস্তু বা ব্যক্তির নামকে বিশেষ্য কহে ; এই বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষকে বুঝাইতে হইলে তাহার নাম বলিতে না

পারিলেও সেই দ্রব্যকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাই
কিন্তু ক্রিয়া বুঝাইতে অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান সকল
হইতে পারে।

আমাদের দেশে প্রথম ইংরাজী আমলের হা
সকলও এ মতের পোষকতা করিতেছে। সাহেব
'ঘরের দেয়াল পড়িয়া গিয়াছে', ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ
দেখাইয়া শুইয়া পড়িল, সাহেব আভাসে তথ্য সংগ্রহ ক
কিন্তু 'কুকুর মরিয়া গিয়াছে' এই সংবাদ দিতে হইলে কুকুরকে দেখাইয়া সে কিরূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া মৃত্যু বুঝাইবে তাহা বুঝা সুকঠিন। এ জন্য

৩। Dugald Stuart ইহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি বলেন যে 'বাঘ আসিতেছে' বলিতে হইলে বাঘকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া 'আসিতেছে' বলিবার অবসর ব্যাঘ্র মহাশয় রাখিবেন কি না সন্দেহ; কিন্তু 'বাঘ বাঘ' বলিয়া ছুটিয়া পলাইলে সকলেই ব্যাপার বুঝিতে পারে।

ইহাদের উভয়েরই অনুমানে সত্য আছে বলিয়া মনে হয়। একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। 'মা মরিয়াছেন' বলিতে ঐ দুইটি কথাই জানা থাকা আবশ্যক; কিন্তু সামাজিক বা পারিবারিক সম্বন্ধের নাম, ভাষা ও সমাজগঠনের বহুপরে হইয়াছিল, তাহা পরে দেখাইব। 'নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে,' বুঝাইবার জন্য আমার সম্বল সুধু 'ডুবিয়া গিয়াছে' (Adam Smithএর মতে)। 'ডুবিয়া গিয়াছে' বলিয়া ইসারায় 'নৌকা' বুঝান অনেক সময় কষ্টকর হইতে পারে, নদী দূরে হইলে ত' কথাই নাই, আবার যদি কেবল মাত্র 'নৌকা' শব্দটি জানা থাকে (Dugald Stuart) তাহা হইলে 'ডুবিয়াছে' বুঝানও সব সময় সকলকে সুবিধা-জনক নহে।

বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ উভয়েই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, অস্তিত্ব অনুমতি হয়। কোন বাহ্যবস্তু জানিতে মাদের উপর তাহাদের প্রভাব ও কার্য্য দ্বারা জানিয়া যকরণ সময়ে বস্তুবিশেষের বিশেষগুণ বা বিশেষত্ব নামকরণ হইয়াছিল। এখন নাম যেমন অর্থবিহীন তখন তেমন ছিলনা; নামের দ্বারা গুণেরও আভাস পাওয়া। প্রত্যেক শব্দে denotation ও connotation উভয়ই হইত (যথা জগজ্জ্যোতি,কালাচাঁদ ইত্যাদি)। এতদ্দ্বারা এই প্রমাণিত হইতেছে, যে নাম করণের অর্থাৎ বিশেষ্য সৃষ্টির পূর্ব্বে নিশ্চয় গুণপরিচায়ক বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। আবার অপরপক্ষে বস্তু অজ্ঞাত থাকিলে, তাহার গুণ বা ক্রিয়া কিরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে? "Concrete ideas must precede abstract ones" (Marsh)—এজন্য আমরা বিশেষ্য নিরপেক্ষ হইয়া বিশেষণ বা ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারি না। অতএব ইহাদিগকে পরস্পর-সম্বন্ধী বলিয়াই বোধ হয়। বিশেষ্য বা ক্রিয়ার দ্বারা উভয়েই সূচিত হয়। বিশেষ্য বা বিশেষণের ব্যুৎপত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও ইহা স্পষ্ট হইবে। বিশেষ্য = যাহা বিশিষ্ট হয়, গুণাদিদ্বারা প্রভেদ্য। এবং বিশেষণ = যাহা সম্যক্ রূপে বোধ করায়, প্রভেদকারক গুণ, ক্রিয়াদি। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে বিশেষ্য বিশেষণ যেরূপ অবিচ্ছেদ্য, ক্রিয়াও ইহাদের হইতে বিশেষ দূরগত নহে; ইহাদের সকলের উদ্ভব যুগপৎ বলা যাইতে পারে। এবং যদি তাহা না হয়, তবে খুব সম্ভব, বিশেষ্য পদই সর্ব্বপ্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল।

এই সমস্ত নাম আদিমঅবস্থায় কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিশেষ পদার্থ দেখিয়া রাখা হইত, না, সাধারণ শ্রেণী হইতে সূচিত হইয়াছিল তৎবিষয়েও মতদ্বৈধ আছে।

(১) পাশ্চাত্য দার্শনিক পূর্ব্বোল্লিখিত Adam Smith বলেন যে কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থ হইতেই (particular) নাম কল্পিত হইত। কিন্তু

(২) Liebniz (১৬৪৬—১৭১৬) অন্য মতের (general) প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রথমতঃ আমরা অদ্বিখণ্ডিত খুর, চামরের ন্যায় লাঙ্গুল ও কেশরযুক্ত, দ্রুতগতিশীল জন্তু দেখিয়া একটা সাধারণ নাম রাখিয়াছিলাম অশ্ব। তৎপরে তাহা হইতে আমার প্রতিবেশীর তদ্রূপ যে জন্তু আছে তাহাকেও আমরা 'অশ্ব' বলিয়া জানিলাম, এবং তখন আবার প্রতিবেশীর এই নির্দ্দিষ্ট অশ্বই আমাদের নিকট তাহার সমস্ত জাতির প্রতিভূ হইয়া রহিল। ইহাই হইল সংজ্ঞাকালের তিনটি স্তর অধ্যাপক, মূলরও পরোক্ষভাবে এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে প্রত্যেক সংজ্ঞা একটা নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যবাচক হইলেও (signs of individual conceptions derived from general ideas) তাহার সাধারণভাব প্রসূত।

(৩) Sir W. Hamilton এই উভয় মতই গ্রহণ করিয়া একটা সামঞ্জস্য করিয়াছেন। Adam Smith বলেন যে 'গুহা' এই নাম একটি বিশেষ গর্ত্তকেই প্রথমে দেওয়া হইয়াছিল, তৎপরে তাহা হইতে প্রত্যেক গর্ত্তই ঐ নামের অধিকারী হইয়াছিল। Liebniz বলেন যে একটা নির্দ্দিষ্ট গর্ত্তের নাম 'গুহা' রাখিবার সময় নামকর্ত্তার মনে গর্ত্তের একটা সাধারণ ধারণা বর্ত্তমান না থাকিলে, নির্দ্দিষ্ট জিনিষটাকে সে কখনই গর্ত্ত বলিয়া চিনিতে পারিত না। Hamilton বলেন যে আদিমমনুষ্যের মনের অবস্থার আমরা শিশুচরিত্রে কতকটা আভাস পাইয়া থাকি; অতএব শিশুচরিত্রে যাহা সত্য, তাহা প্রকৃতির শিশু আদিমমনুষ্যেরও পক্ষে সম্পূর্ণ না হউক, আংশিকভাবে সত্য হইতে পারে। শিশুর অর্দ্ধস্ফুট ভাষা আদৌ একেবারে ঠিক সাধারণ (general) বা বিশেষ (particular বা individual) নহে, পরন্তু

উভয়ের সংমিশ্রণে একরূপ অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট; এবং ইহা হইতে ক্রমশঃ সাধারণ ও বিশেষভাব তাহার মনে প্রকটিত হইয়া থাকে।*

ভাষার আদিম সৃষ্টি সময়ে সর্ব্বপ্রথম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল দ্রব্যসমূহেরই নামকরণ হইয়াছিল, তৎপর উপমা ও তুলনাদ্বারা মানসিকবৃত্তি ও বস্তু নিরপেক্ষ গুণাবলী (abstract and spiritual ideas) চিহ্নিত বা সংজ্ঞিত হইয়াছিল।

শাকটায়ন ও তাঁহার শিষ্য নৈরুক্তবাদীগণ মনে করিতেন সকল বিশেষ্যই ক্রিয়াসম্ভব। অন্য পক্ষে গার্গ্য প্রভৃতি বৈয়াকরণেরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে অন্ততঃ কতকগুলিরও জন্ম অন্য উপায়ে সিদ্ধ হইয়াছে। অবশেষে কিন্তু নিরুক্তবাদীদিগেরই জয় হয়, এবং সেই জয়ের ফলে মূল ধাতুমালার আবিষ্কার হইয়াছে। পরে পাণিনিও এ মতের সমর্থকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যদিও পাণিনীয় ব্যাকরণ (৪র্থ শতাব্দী খৃঃ পূঃ) যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থকে অপসারিত করিয়াছে তথাপি তিনিই প্রথম যথার্থ ব্যাকরণস্রষ্টা।

এইরূপে ভাষা সৃষ্ট হইয়া তাহার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই পরিবর্ত্তন সকল দেশে সকল সময়ে অল্পাধিক পরিমাণে চলিয়া আসিতেছে। চীনভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* "As our knowledge proceeds from the confused to the distinct, from the vague to the determinate, so, in the mouths of children, language at first expresses neither the precisely general nor the determinately individual, but the vague and confused, and out of this the universal is elaborated by generification, the particular and singular by specification and individualisation."

আর্য্য অস্ত্রচিকিৎসার শিক্ষাপদ্ধতি।

অনেকের বিশ্বাস, অস্ত্র-প্রয়োগশিক্ষার বিশেষ উপযোগী শারীর বিদ্যা (Anatomy) এবং শবচ্ছেদাদি (Dissection) ইয়ুরোপীয় চিকিৎসক-শিরোমণিগণের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতবাসী ইহা কখন কল্পনা করিতেও পারে নাই। আমরা এই ভ্রমদূরীকরণ-মানসে সুশ্রুতের শারীরাধ্যায় হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব; অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া কর্ম্মাভ্যাস ব্যতীত কেহ কখনও অস্ত্র-চিকিৎসক-সমাজে বরণীয় হইতে পারেন নাই। প্রাচীন কি আধুনিক, প্রাচ্য কি প্রতীচ্য চিকিৎসক-মাত্রই শুধু পুস্তকের বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করা অসম্ভব জানিয়া কর্ম্ম শিক্ষার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে ছাড়েন নাই। তাই সুশ্রুতে লিখিত আছে "অস্ত্রচিকিৎসায় নিঃসংশয়িত রূপে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ দ্বারা আভ্যন্তরিক পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ করা কর্ত্তব্য। কারণ শাস্ত্রও প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হইলে জ্ঞান সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং যে শরীর বিষদুষ্ট কিম্বা পুরাতন রোগ বা জরাজীর্ণ নহে, এইরূপ মৃতদেহ (শিক্ষার জন্য) ব্যবচ্ছেদার্থ সংগ্রহ করিবে এবং শবচ্ছেদ করিয়া শরীরস্থ ত্বক্, স্নায়ু প্রভৃতি আস্তে আস্তে প্রত্যক্ষ করিবে।" (১)

ইহাতে মানব দেহের বাহ্য ও আভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি উত্তমরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে দেহস্থ সূক্ষ্মতম বস্তু জ্ঞান-চক্ষু ব্যতীত সাধারণ দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহে, অতএব যিনি শাস্ত্রে ও কর্ম্মে বিশেষ অভিজ্ঞতা

(১) সুশ্রুত শারীর স্থান ৫ম অঃ শেষ অংশ। শবচ্ছেদ এখন যে রীতিতে সম্পাদিত হয়, পুরাকালে সেরূপ ছিল না, মৃতদেহ স্রোতোজলে কিছু দিন রাখিয়া দিত এবং ভালরূপে পচিলে বাঁশের ছালের কুচি প্রভৃতির সাহায্যে শরীরস্থ ত্বক, মাংস, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি আস্তে আস্তে প্রত্যক্ষ করা হইত। আমাদের বিশ্বাস শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি পদার্থ দর্শনের পক্ষে ঐ রীতি মন্দ ছিল না।

লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি বস্তুতঃ চিকিৎসক শব্দ বাচ্য; চিকিৎসকমাত্রেরই চক্ষু কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করা কর্ত্তব্য। (১) বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ সরকারি চিকিৎসা-বিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন স্থানে শবচ্ছেদ করিতে হইলে সরকার বাহাদুরের অনুমতির আবশ্যক হয়, পূর্ব্ব কালেও রাজার অনুমতি ব্যতীত কেহ চিকিৎসা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। (২) এই জন্য সম্ভবতঃ হোমিওপ্যাথিক স্কুলের ছাত্রগণ, রাজ-প্রসাদ-লভ্য শব প্রাপ্ত না হইয়া মৃত-পশু-শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এই রীতিও পরিলক্ষিত হয়। (৩) পাঠক পাঠিকাদিগের ধৈর্য্য-চ্যুতি ভয়ে এই নীরস বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি।

ব্রণবন্ধন ও শিক্ষাপ্রণালী।

অস্ত্রক্রিয়ার পর বন্ধনকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হওয়া আবশ্যক। (৪) পূর্ব্বে বিবিধ বন্ধন (Bandage) কার্য্য শিক্ষার জন্য বস্ত্রনির্ম্মিত মানব-মূর্ত্তি ব্যবহৃত হইত। (৫) বন্ধন রীতি ও উপকারিতা সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের কোন মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয় না।

গ্রন্থপাঠ ও শবচ্ছেদাদি দ্বারা ছাত্রবৃন্দ পারদর্শী হইলে কার্য্যক্ষেত্রে ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য হইয়া ধীরতা ও সাহসের সহিত অগ্রসর হইবে। যে

কার্য্যপ্রণালী বা ব্রণপরীক্ষা।

চিকিৎসক অস্ত্র-বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া প্রসার প্রতিপত্তির বিমল কিরণচ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতে ইচ্ছা করেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার "ইতি-কর্ত্তব্যতাবিমূঢ়ভাবে বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে।" (৬)

---

(১) সুশ্রুত শারীর স্থান—৫ম অধ্যায়। (২) সুশ্রুত সূত্র স্থান—১০ম অধ্যায়।
(৩) সুশ্রুত সূত্র স্থান—৯ম অধ্যায়। (৪-৫) সুশ্রুত সূত্র স্থান—৯ম অধ্যায়।
শিক্ষার্থীগণ মিলিত পশু ও শবচ্ছেদ ব্যতীত নানাবিধ পুষ্প, ফল, লাউ, ভিজিও মোমলিপ্ত কাষ্ঠ প্রভৃতিতে পূর্ব্বে শিক্ষা লাভ করিত। সুশ্রু-সূত্র ৯ম অঃ।
(৬) সুশ্রুত সূত্র স্থান—১ম অধ্যায় শেষ শ্লোক।

কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দর্শন, স্পর্শ ও জিজ্ঞাসাদি দ্বারা প্রথমতঃ রোগ নির্ণয় করিবে, ব্রণাদি অস্ত্র করিবার উপযুক্ত হইয়াছে কি না তাহা নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিবে। পাশ্চাত্য চিকিৎসাতন্ত্রে কষ্টিক পুল্টিস প্রভৃতি যেরূপ ব্রণাদির প্রাথমিক চিকিৎসারূপে নির্দ্ধারিত, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও ব্রণাদির প্রথমাবস্থায় তদ্রূপ নানাবিধ প্রলেপাদির ব্যবস্থা বিহিত আছে। পাশ্চাত্যমতে উক্ত প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্রণদোষ দূরীকৃত না হইলে যেরূপ (পাকিলে) অস্ত্র করাই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, প্রলেপাদি দ্বারা ব্রণাদির স্ফীতি প্রশমিত না হইলে দেশীয় চিকিৎসকগণও অস্ত্র করাই আবশ্যক মনে করিতেন। অস্ত্রধারণের পূর্ব্বে ব্রণাদির তিনটী অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—(১) ব্রণশোথ (ফোঁড়াদির স্ফীতি) অভ্যন্তরে ঈষৎ উষ্ণ, ত্বকের সমান বর্ণ, স্থির, অল্প বেদনাযুক্ত ও অল্প স্ফীত হইলে ইহাকে আম (কাঁচা) বলা যায়, ব্রণশোথে যদি সূচীবিদ্ধবৎ, পিপীলিকা ও বৃশ্চিক দংশনবৎ বেদনা অনুভূত হয় এবং শোথে যদি শস্ত্রাদির দ্বারা ছেদনাদির ন্যায় বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ উত্থান শয়ান ও উপবেশনে যদি বিশেষ ক্লেশ অনুভূত হয় তবে বুঝিতে হইবে, ব্রণের পচ্যমান অবস্থা, ব্রণের পচ্যমান অবস্থায় ব্রণশোথের চর্ম্ম বিবর্ণতা প্রাপ্ত, আয়ত (টনটনে) স্ফীতি-বৃদ্ধি, জ্বর, দাহ, পিপাসা অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব, উদ্ভূত হয়। ব্রণের পক্কাবস্থায় বেদনার শান্তি, স্ফীতির অল্পতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলে স্ফীতি নিম্নগত এবং অঙ্গুলি ছাড়িয়া দিলে উন্নমিত হয়। ব্রণের একদেশে চাপ দিলে পূঁযের সঞ্চরণ লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ জ্বরদাহাদিও দূরীভূত হয়। এই সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য

---

* (১) তিন অবস্থা যথা, আম (কাঁচা), পচ্যমান (পাকিতেছে), পক্ব (পাকা)। সুশ্রুত ১৭ অঃ (সূত্রস্থান) এবং ব্রায়েন্ট সার্জ্জরী (Bryant's Surgery ১ম ভাগ ৪র্থ সংস্করণ ৭৪ পৃঃ।)

রাখিয়া পরিপক্ক ব্রণাদিতে অস্ত্র চালনা বিধেয়। অনেক সময় পূঁযের গতি গভীর হইলে পক্ক লক্ষণ প্রকাশিত না হওয়ায় চিকিৎসককে ভ্রমে পড়িতে হয়।

যে চিকিৎসক ব্রণাদির এই অবস্থাত্রয় (১) সম্যক্ পরিজ্ঞাত না হইয়াও অস্ত্র করিতে প্রস্তুত হয়, তাহাকে চিকিৎসক না বলিয়া দস্যু তস্কর বলাই উচিত। (২) ব্রণাদির কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র করিলে মাংস স্নায়ু প্রভৃতিতে অন্যায় আঘাতজনিত অতিশয় রক্তনির্গমন, অত্যন্ত বেদনা প্রভৃতি বহু উপদ্রব এবং ক্ষতবিধ্রধি রোগও উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সন্দিগ্ধচেতাঃ চিকিৎসক যদি ভয় বা ভ্রমবশতঃ উপযুক্ত সময়ে (পক্কাবস্থায়) অস্ত্র প্রয়োগে বিরত থাকে, তবে পূঁয নির্গমনের দ্বার না পাইয়া স্বকীয় আশ্রয় ভেদ করিয়া নিম্নাভিমুখী হয়। ইহাতে ব্রণে বৃহৎ অবকাশ (ফাঁক) হওয়াতে নালী জন্মিয়া থাকে। এইজন্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সুশ্রুত চিকিৎসকদিগকে সাবধান করিবার অভিপ্রায়ে অযথা অস্ত্র প্রয়োগের দোষ তীব্রভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, এবং অযথা অস্ত্রকারী চিকিৎসকদিগকে মর্ম্মস্পর্শীভাষায় গালি দিয়া বলিয়াছেন, "যে অর্থ-গৃধ্নু চিকিৎসক ব্রণের কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র প্রয়োগ ও পক্কাবস্থায় উপেক্ষা প্রদর্শন করে সে অপরিণামদর্শী চিকিৎসক চণ্ডাল।" (৩)

অযথা অস্ত্র প্রয়োগের দোষ।

বর্ত্তমান সময়ে অস্ত্র করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যেরূপ রোগীর অবস্থানুসারে ক্লোরফরম করা হয় আর্য্য চিকিৎসা-ক্ষেত্রেও এইরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। (৪) অস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে কিরূপ ব্রণাদি কি দ্বারা

অস্ত্র প্রয়োগের অব্যবহিত পূর্ব্বে করণীয়।

---

(১) (২) সুশ্রুত সূত্র স্থান ১৭ অঃ।

(৩) সুশ্রুত সূত্র স্থান ৯ম শ্লোক।

(৪) পূর্ব্বে ক্লোরফরমের ন্যায় কোন তীব্র পদার্থ সাহায্যে রোগীর চৈতন্যলোপের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু "অস্ত্র করিবার সময় রোগীকে ভীত কিম্বা বেদনা সহ্য করিতে

কি ভাবে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। (১)

অস্ত্র করিবার অব্যবহিত পরে করণীয়।

ডাক্তারি মতে অস্ত্র প্রয়োগের পর ক্ষতস্থানে যেরূপ পুল্টিস্ ও Idoform প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, হিন্দু চিকিৎসকগণও অস্ত্র করার পর তদ্রূপ নানাপ্রকার ঔষধ প্রলেপাদি ব্যবহার করিতেন, এই সম্বন্ধে উভয় মতের পদার্থ পার্থক্য বিনা কোন প্রক্রিয়া ভেদ দৃষ্ট হয় না। শুষ্ক ক্ষত স্থানের চর্ম্ম যাহাতে বিবর্ণতা প্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য বহু উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

ব্রণ বন্ধনের আবশ্যকতা।

অস্ত্রক্রিয়ার পর ঔষধ প্রলেপাদি দিয়া উত্তমরূপে বন্ধন করা কর্ত্তব্য, এই বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। অকৃতবন্ধন অযথা ও যথারীতি বন্ধনের দোষ গুণ ডাক্তারির ন্যায় আয়ুর্ব্বেদেও বর্ণিত আছে। (২)

বন্ধনের বিশেষ গুণ।

সন্ধিচ্যুত স্থানচ্যুত অস্থি চূর্ণ ভগ্ন কিম্বা স্নায়ু শিরাদি ছিন্ন হইলে আশু প্রতিকারের জন্য বন্ধন অবশ্য কর্ত্তব্য। (৩)

অসমর্থ বিবেচনা করিলে তখন প্রচুরপরিমাণে ভোজন এবং রোগী মদ্যপায়ী হইলে মদ্যপান করিতে দেওয়া" হইত। সুশ্রুত সূঃ স্থাঃ ১৭শঃ ১৪ শ্লোক। এই রীতি আধুনিক চিকিৎসক সমাজে উপহাসাস্পদ হইতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধ সুশ্রুতের এই চিন্তা অস্ত্রচিকিৎসা প্রচলিত থাকিলে সময়ে হয়ত 'ক্লোরফরমের' ন্যায় পদার্থ বিশেষের জননী হইত। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ একদিনে এক ব্যক্তির দ্বারা কখনও সাধিত হইয়াছে কি?

(১) সুশ্রুত সূঃ স্থাঃ। ১৮ অধ্যায়।

(২) সুশ্রুত সূঃ স্থাঃ ১৮ শ অধ্যায়ের ১৮ পংক্তি এবং ১৮, ১৯ শ্লোকের তাৎপর্য্যই অবিকল ড্রুইট্ সার্জরী (Druitts Surgery) দশম সংস্করণ ৭৩৬ পৃষ্ঠায় দেখিতে

অবস্থাভেদে বন্ধন নিষেধ।

কুষ্ঠগলিত মাংস কিম্বা বিষজনিত ব্রণাদিতে বন্ধন নিষিদ্ধ। বিদ্বান্ ভিষক্ ব্রণাদির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া বন্ধন বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। (১)

কৃতাস্ত্র রোগীর কর্ত্তব্য।

অস্ত্র ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে রোগীরও কিছু কর্ত্তব্য আছে। অস্ত্র করার পর শরীর পরিচালনা পরিত্যাগপূর্ব্বক রোগীর এক স্থানে অপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ইহাতে ব্রণক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

রোগী-শুশ্রূষা।

অস্ত্রক্রিয়া বিহিত হইলে রোগীকে পরিস্কৃত, নির্ম্মল বাতাসযুক্ত বাসগৃহে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শয্যায় শয়ান করাইবে (২) পরিচর্য্যার জন্য নীরোগ, সবল, বিশ্বস্ত কর্ম্মপটু ও লোভশূন্য পরিচারক নিযুক্ত করিয়া দিবে। (৩) আহারাদির বিধি ব্যবস্থা অবশ্য পালনীয়।

এইত হইল অস্ত্র চিকিৎসার স্থূল বিবরণ।

উপসংহারে এখন দুইটি বিষয়ের উল্লেখ অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে।

বাহ্বট, সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারদিগের প্রাচীনতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত সম্ভবতঃ আমাদিগকে কোন যুক্তিতর্কের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে না। কারণ ইঁহারা যে বহুশতাব্দী পূর্ব্বে এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত, সুতরাং এই সকল গ্রন্থকারলিখিত গ্রন্থসমূহও যে পাশ্চাত্য কোন গ্রন্থদর্শনে বিরচিত হয় নাই ইহাও নিঃসন্দেহ স্থিরীকৃত।

---

(১) ,, ,, ২১ শ্লোক।

(২) সুশ্রুত সূঃ স্থাঃ ১৯ অঃ এবং ড্রুইট্ সার্জ্জরী (Druitts Surgery) ১০সং

দ্বিতীয় কথা, এই প্রকার পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও অতি প্রয়োজনীয় "অস্ত্র-চিকিৎসা" কোন্ সময়ে কেন কিরূপে দেশ হইতে বিলুপ্ত হইল? ইহার উত্তরে আমরা অভ্রান্তরূপে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি না।

আমাদের বিশ্বাস, আর্য্যজাতির অত্যন্ত আধ্যাত্মিকতা, শুচিপ্রিয়তা এবং প্রলেপাদি ঔষধে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্যতা এই চিকিৎসা বিলোপের প্রধানতম হেতু। অন্ত্যজ জাতিবিশেষের উপর পূয রক্তাদি ঘাটারূপ অস্ত্রক্রিয়ার ভার অর্পিত হওয়ায় ইহাই অনুমিত হয় না কি?

সময়ের অনুল্লঙ্ঘনীয় পরিবর্ত্তনও কারণান্তর কল্পিত হইতে পারে।

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র গুপ্ত।

সালগম-সংবাদ।

(নাতিনীর নিকট হইতে সালগম উপহার পাইয়া)

দাদামহাশয়ের পত্র।

সালগম পাইয়া আমি হর্ষে আটখানা,
গান করিলাম সুরু তোম্ তানা নানা;
পাইতাম যদি কাছে গাউন-পরা বুড়ি
ওয়াল্জ-নাচ নাচিতাম মিলাইয়া জুড়ি।
[illegible] তুমি কান্তা হও যোগ্য বরজনের,

দিলেন মটন রোষ্ট এস্‌-পি-জি বাবাজি
চারিধারে সালগম দাঁড়াইল সাজি ;
আঁটিনু দুপাটি দাঁত না করি বিলম্ব,
করিনু তাহার পরে কারয আরম্ভ ;
সালগমে মটনে দোঁহে সোহাগে গলিয়া
মুহূর্ত্ত মাঝারে গেল কোথায় চলিয়া।
কোথায় চলিয়া হায় কোথায় চলিয়া
পেটের কথা পেটেই থাক—কি হবে বলিয়া।

দাদামহাশয়।

নাতিনীর পত্র।

শ্রীচরণেষু

দাদামহাশয়

খেয়েছ যে সালগম না করিয়া কালগম,
এই আমি বহু ভাগ্য মানি ;
তারপরে মিঠি মিঠি লিখেছ স্নেহের চিঠি,
তার মূল্য কি আছে না জানি।
তুচ্ছ এই উপহার, কে জানিত কমলার
পদ্ম-সরোবর দিবে নাড়া,
সালগম মটন রোষ্টে কবির অধর ওষ্ঠে,
খুলি দিবে কাব্যের ফোয়ারা।
কিন্তু দাদামহাশয় তাই

শুনিতে হইল এও　　ভাগ্যবান্ তোমারেও,
নাচের দোসর নাহি মেলে॥
না হয় না হল বুড়ি,　　তবুও ত ঝুড়ি ঝুড়ি
নাতিনীতে ঘরটি বোঝাই,
যারেই লইবে বাছি　　সেইতো উঠিবে নাচি,
নাচিবার ভাবনাতো নাই।
এ কথা ভুলিলে যবে,　　বুঝায়ে কি আর হবে,
ধিক তবে মোর সালগমে!
বুঝিলাম তরকারী,　　যত হোক দরকারী,
তাহাতে কবিত্ব নাহি জমে।
আর না করিব ভুল,　　এবারে বসন্তে ফুল,
তুলিয়া আনিবো ভরি ডালা
সালগম পেঁয়াজকলি,　　জলে দিয়া জলাঞ্জলি,
পাঠাইব বকুলের মালা॥

তোমার এক নাতিনী।

দাদামহাশয়ের পত্র

বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সালগমই ভাল,
কাটা ঘায়ে কেন আর লবণাম্বু ঢালো।
গুম্ফ-আক্রমণ-কাব্য উড়াইয়া তোপে
কলপ লাগাতে হ'ল দাড়ি-চুল-গোঁপে।
দাঁতের জন্য ভাবিনে—বেল্‌কুল্ ফাঁক্,

গজাইয়া উঠিয়াছে দু-পাটি সুন্দর,
তার সাক্ষী বেয়া'য়ের শ্রীমুখ-কন্দর।
শান্তা জানি পদ্মিনীরে দিয়াছিনু নাড়া,
কিন্তু এবে দেখিতেছি গতিক বেয়াড়া।
যে মকরন্দের বৃষ্টি! মিষ্টিতে মজিল সৃষ্টি!
বুড়দা'র শুন পরামর্শ।
মকরন্দ অত ব্যয়, আগে ভাগে ভাল নয়,
ধৈর্য্য ধর দুই এক বর্ষ॥
আসিবে যখনি অলি, সাধিবে কত কি বলি,
তার জন্য এই ব্যালা থেকে
জমাইয়া মকরন্দ, করি রাখো চাবি বন্ধ,
নহিলে শিখিতে হবে ঠেকে।
এবে মোর বর সাজা, নিতান্ত কঠিন সাজা
তা নহিলে—ফুলমালা বদলি',
অলি যে আসিবে মাতি, ফুলায়ে বুকের ছাতি
দেখাতেম তাহারে কদলী।

দাদামহাশয়।

অতীত ও বর্ত্তমান।

উন্নত পর্ব্বতে আরোহণ করিলে নিম্নস্থ ভূভাগ সুদৃশ্য সমতলরূপে প্রতীয়মান হয়। হয়ত সে প্রদেশ অতিশয় বন্ধুর, বহু গহ্বরাদিপূর্ণ; হয়ত সেখানে কর্দ্দমপূর্ণ জলাভূমি অথবা অনুর্ব্বর বালুকাস্তর বিদ্যমান। কিন্তু এই সকল অপ্রীতিকর লক্ষণের সুস্পষ্ট, অবিকল প্রতিবিম্ব সুদূরশৃঙ্গে পৌঁছায় না,—দর্শকের দূরত্বের তুলনায় দৃষ্ট পদার্থসমূহের আকারাদিগত বৈষম্য, অসামঞ্জস্য ও অপ্রীতিকরত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাই পাদদেশগত চিত্রার্পিতবৎ প্রাকৃতিক দৃশ্য শিখরস্থিত দর্শকের নয়নাভিরাম হইয়া থাকে। চন্দ্রমণ্ডলের ভীষণ গহ্বর পৃথ্বীতলে সুন্দর অশ্বত্থবৃক্ষবৎ প্রতিভাত হয়।

সায়াহ্নে শিশুদিগের ক্রন্দন, বালকবালিকাদিগের আনন্দকোলাহল, বিবদমানাদিগের তীব্র আত্মীয়ানির্য্যাতন, সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চরোল, কৃষকদিগের তৎকালসুলভ ডাকহাঁক, কুক্কুরের সুদূরগামী চীৎকার, ইত্যাদিতে লোকালয় মুখরিত হইয়া উঠে। কিন্তু প্রান্তরপথবর্ত্তী পথিকের কর্ণ ঐ সকলের কর্কশতাদ্বারা আহত হয় না; বিভিন্ন ভাবাত্মক বহুশব্দের সমকালবর্ত্তিত্ববশতঃ সকলেরই কোমলত্ব সম্পাদিত হইয়া এক সুমিষ্ট, অনুচ্চ, অস্ফুটধ্বনিমাত্র তাহার কর্ণগোচর হয়।

এইরূপে দেখা যায় দূরত্ব পদার্থের অপ্রীতিকরত্ব হ্রাস করে। সর্ব্ববিষয়েই এই কথা প্রযুজ্য। আজ যে প্রতিবেশীর স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত আত্মরক্ষা-চেষ্টাকে নীচ স্বার্থপরতা ভাবিয়া উত্যক্ত হইতেছি, তাহার সহিত সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ঘটিলে আবার নূতন প্রতিবেশীদিগের হইতে ঠিক তাদৃশ ব্যবহার পাইয়া পুনরায় যখন প্রথম প্রতিবেশীর সাক্ষাৎকার

আগ্রহ জন্মিবে, তাহার নিকট উহাদের অসদ্ব্যবহারের কথা অকপট-হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া শান্তি পাইব; কিন্তু সেও যে একদিন তেমনি ভাবে আমার অভিযোগের কারণ হইয়াছিল, তাহা মনে আসিবে না, মনুষ্যের প্রকৃতিগত এই ভাবই আমাদের নিকট অতীতের মনোহারিত্ব বর্দ্ধিত করে।

প্রায় সকল জাতিরই সাধারণ জনগণের বিশ্বাস স্বর্গযুগটা অতীতেই বর্ত্তমান ছিল। বর্ত্তমান অতীত অপেক্ষা অনেক ভাল হইতে পারে, ভবিষ্যতে আরো উন্নতির সম্ভাবনা সূচিত হইতে পারে; কিন্তু তথাপি সাধারণ লোকের কল্পনা-চক্ষু সমীপে অতীত এমনি এক মোহনবেশে উপস্থিত হয় যে, তাহার নিকট বাস্তব বর্ত্তমান নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়। অতীতের দুর্নীতি, জ্ঞানাভাব, অত্যাচার প্রভৃতি কিছুরই স্মৃতি থাকেনা; কিন্তু জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখৈশ্বর্য্য প্রভৃতির অতিবর্ণিত কিম্বদন্তী প্রতিগৃহে পিপাসু বালকবালিকার কর্ণগোচর হয়। অধিকন্তু সময়ে সময়ে অতীতের অন্ধকারও আলো বলিয়া ভ্রম জন্মে। মহাভারত পাঠ করিয়া দুর্য্যোধনের তেজোগর্ব্বে বিস্মিত হই; কিন্তু তাঁহার ঈর্ষা, ছলনা, জ্ঞাতিদ্রোহ; রমণী-লাঞ্ছনা প্রভৃতি বহুপরিমাণে উপেক্ষা করি।

ইতিহাস সুরঞ্জিত অতীত গৌরবকাহিনী উচ্চনিনাদে ঘোষণা করে; পরন্তু কলঙ্ক যথাসাধ্য বিস্মৃতির গভীরতলে চিরতরে প্রোথিত করিয়া যায়, অথবা বাগ্‌জালবিস্তারে কৃষ্ণকে শ্বেত বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পায়। যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণের মাহাত্ম্যে স্বজাতির মুখোজ্জ্বল হইয়াছে, নিরন্তর তাঁহাদের পবিত্র চরিত্র শ্রবণ ও অধ্যয়ন করি; কিন্তু তাঁহাদেরই চতুর্দ্দিকে যে, অধুনা রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির চারিদিকে আমাদের ন্যায় অসংখ্য অজ্ঞাতনামা ক্ষুদ্রপরনারী বিনাপ্রত্যাপকারে অথবা প্রত্যক্ষভাবে

কেহই তাহাদের খবর লয় না। কাজেই অতীত প্রীতি অতি স্বাভাবিক।

বাত্যাতাড়িত সমুদ্র বক্ষে যে সকল বিপন্ন আরোহী দেবোদ্দেশে পূজা মানত করিয়া জলমজ্জন হইতে রক্ষা পাইত, তাহাদের বহুসংখ্যক চিত্র এক দেববিরোধী গ্রীককে প্রদর্শিত হইয়াছিল; অভিপ্রায়, সে দেবমহিমা অনুভব করুক। কিন্তু ঈদৃশ লোক কখনও সহজে নিরস্ত হয় না; সে বলিয়া উঠিল "যাহারা পূজামানত করিয়াও জলমগ্ন হইয়াছে, তাহাদের চিত্র কোথায়?" এদেশে প্রায় প্রত্যেক পেটেণ্ট-ঔষধবিক্রেতা স্বীয় ঔষধের গুণবত্তা জ্ঞাপনার্থ সহস্র সহস্র রোগীর আরোগ্যের সংবাদ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু ততোধিক রোগী যে কোনও ফল পায়না, সে সংবাদ কি বিজ্ঞাপিত হয়? মানিলাম মনীষীগণের জন্মদ্বারা অতীত পূত হইয়াছে; মানিলাম তাঁহারা বহুবিধ সংকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন! কিন্তু ইতর লোকের সংখ্যা কি তদপেক্ষা বহুগুণ ছিল না? তাহারা কি রাত্রিন্দিব ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুধ্যানে আমাদেরই ন্যায় দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করে নাই?

প্রাচীন ভারত বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক উচ্চে ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক 'আর্য্যসন্তানের' অতীতপ্রীতি দেখিলে বোধ হয়, প্রাচীন হিন্দুসমাজ প্রলুব্ধা হবার পতনের পূর্ব্ববর্ত্তী ইডেন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেকালে দস্যু, তস্কর, গণিকা, ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী প্রভৃতির কোনই অভাব ছিল না; সংস্কৃত সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। হিংসাদ্বেষ, জ্ঞাতিবিরোধ প্রভৃতিও প্রচুর ছিল। আজকাল ভ্রাতাগণ একান্নবর্ত্তিত্বশৃঙ্খল কর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলে সমাজ বিরক্তি-ব্যঞ্জক কটাক্ষ করে, অনেকে বলে উহারা একবারে সাহেব হইয়া গেল। ইহারা একথা ভুলিয়া যায় যে সেকালেও লোক পৃথকান্ন হইত;

হইত। কৈকেয়ীও সেকালেরই বিমাতা। চাণক্যের জন্ম খৃষ্টেরও কয়েকশতাব্দী পূর্ব্বে। পিতা ও ভ্রাতাদিগের প্রতি অবান্ধবোচিত ব্যবহারের দরুণ যত দোষ 'কলিকালের' আওরংজেবের; কিন্তু মহারাজা অশোক যে কলে কৌশলে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে রাজত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, সে কথা মুখে আনে কে? কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি অত্যাচারের জন্য আধুনিক শ্বেতাঙ্গের বড়ই নিন্দা; কিন্তু 'ভারতীয় আর্য্যসন্তানদিগের' শ্বেতাঙ্গ পূর্ব্বপুরুষগণ কি তদানীন্তন কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি ন্যূনাধিক পরিমাণে তাদৃশ ব্যবহারই করেন নাই? নৌরজী মহোদয়কে 'blackman' বলাতে লর্ডসলিস্‌বেরী কত কটুই না শুনিয়াছেন; কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে কি কি নামে অভিহিত করিতেন, তাহা কি মনে পড়ে?

ইংরেজ লেখকগণ স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়াছেন যে যাহাকে Merry England বলা হয়, বর্ত্তমান ইংলণ্ড তদপেক্ষা অনেক বেশী Merry; কিন্তু তথাপি তথাকার প্রকৃতিপুঞ্জ সেই প্রাচীন Merry ইংলণ্ডের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হয়!

চক্ষুর অতি নিকটে একটী পয়সা ধরিলে দূরবর্ত্তী গুম্বজও অন্তরালে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র তাম্রখণ্ড সুদূর প্রকাণ্ড অট্টালিকা অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া ভ্রম জন্মে। সেইরূপ আমাদের বর্ত্তমানের সামান্য অভিযোগও কল্পনায় বৃহত্তম আকার ধারণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী মঙ্গলের অনুভূতির বাধা জন্মায়। পক্ষান্তরে অতীতের ভাল মন্দ দুইই সমদূরবর্ত্তী; তাই আমাদের দৃষ্টিতে মন্দের আয়তন ভালর তুলনায় অতি বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ নিজ দুঃখ অতি সহজেই হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করে; তাহার তীব্রতা ভুলিতে দীর্ঘকাল দরকার। মধ্যে মধ্যে যে সুখের কারণ উপস্থিত হয়, দুঃখস্মৃতি বশতঃ তাহাও

তত বেদনা পাই না ; কিন্তু তাহার মঙ্গলচিত্রটীর সহিত তুলনা করিয়া বর্ত্তমান অমঙ্গলের জন্য অধিকতর হাহাকার করি।

এই গেল সাধারণভাবে মানবজাতির কথা। কিন্তু দেশভেদে অতীত-প্রীতির ন্যূনাধিক্য দেখা যায়। উন্নতিশীল জাতিসমূহ অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াও অতাতকে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করেন না। আপনাদের শক্তিতে তাঁহাদের পূর্ণ-বিশ্বাস ; পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপের তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাধনায় নিজেদের যোগ্যতা নাই বলিয়া কিছুতেই তাঁহাদের ধারণা হয় না ; কারণ জ্ঞাতসারেই তাঁহারা প্রত্যহ উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিতেছেন। তাই অতাতের প্রতি ভক্তির কিঞ্চিৎ হ্রস্বতা, অতীতগত চিন্তার মিতভাব, বর্ত্তমানে গৌরব এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতর আদর্শ ও পূর্ণতর আশা, উন্নতিশীল জাতির স্বাভাবিক ; অধিকন্তু এগুলির অস্তিত্ব জাতীয় উন্নতিশীলতার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে, অধঃপতিত জাতিসমূহ পদে পদে আহত, অবজ্ঞাত ও বিফল মনোরথ হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা হারাইয়া ফেলে। তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পায় তাহাদের বর্ত্তমানে কলঙ্ক, ভবিষ্যতেও অন্ধকার। কিন্তু তাহাদের অতীত ন্যূনাধিক গৌরবান্বিত ; কাজেই তাহাদের পক্ষে অতীত বাস্তবিকই বর্ত্তমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাই অধঃপতিত জাতির দৃষ্টি অতীতে, তাহাদের আস্ফালন অতীত লইয়া, চিন্তার বিষয়ও অতীত। কল্পনাপটে চিত্রিত ভবিষ্যৎও সৌন্দর্য্যে অতীতকে অতিক্রম করিতে পারে না ; অতীতব্যত্যয়ী হইলে ভবিষ্যৎ মঙ্গলপ্রদ হইবে বলিয়াও তাহাদের প্রত্যয় জন্মে না। অতএব আত্যন্তিক অতীত-প্রীতিই অধঃপতিত জাতির পক্ষে স্বাভাবিক, এবং তাহার অস্তিত্ব পতিতাবস্থা প্রমাণিত করে।

আমরা পূর্ব্বপুরুষের গৌরবান্বিত আসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছি ; তাই এদেশের লোক অহর্নিশ সেকালের দোহাই দেয়। আমাদের

এদেশে প্রতি বৎসর বহু প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থও তাহাদের অনুবাদের কাট্‌তি হয়; তাহার তুলনায় বাঙ্গলা গ্রন্থ পাঠকের সংখ্যা অল্প। মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি অতীতস্পর্শপূত বিষয়াবলম্বনে লিখিত কাব্য দ্বারা আমাদের সাহিত্য পরিপুষ্ট; কিন্তু নবযুগের নবীন সাধনা, বর্ত্তমানের লক্ষ্য ও উদ্যম এবং ভবিষ্যতের আশা অবলম্বনে বঙ্গীয় কবির প্রতিভা সহজে স্ফুরিত হয় না। বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকার চিরন্তন প্রধান বিষয় প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্যদর্শন প্রভৃতি; কিন্তু কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর অভিনব ব্যবস্থা, চিনির শুল্ক, কুলি আইনের পরিবর্ত্তন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত সংস্কার, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ প্রভৃতি যে সকল বর্ত্তমান ব্যাপারে আমাদের সুখদুঃখ বিজড়িত, তাহাদের সুন্দর সময়োচিত আলোচনা এক 'ভারতী' ব্যতীত এতদ্দেশীয় সাময়িক পত্রে প্রায়ই দেখা যায় না। বঙ্গদেশে আজকাল স্বাধীন ভাবে ঐতিহাসিক গবেষণা প্রবৃত্তির উন্মেষ লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু এখনও সমসাময়িক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি অল্প। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতে অভিলাষী, ইংরাজীতে লিখিত নানাবিধ সত্য মিথ্যা গল্পাদি দ্বারা তাঁহারা হিন্দুদিগের সর্ব্ববিধ চিরাগত মত ও বিশ্বাসের সমর্থন করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাচীন কুসংস্কার দূর করিয়া প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের নবযুগোপযোগী বিশুদ্ধতা সাধনের প্রত্যক্ষ চেষ্টা অতি অল্প। বঙ্গের যে সকল সুসন্তান পঙ্গু বাঙ্গালীজাতির যষ্টি স্বরূপ, তাঁহারা প্রায় সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রাচীন হিন্দুসমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বশক্তি বিকশিত করিয়াছেন, সমাজ পিঞ্জরের সুদৃঢ় নিগড়বদ্ধ পাখী হইলে তাহা পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তথাপি আমরা কথায় ও লেখায় নিরন্তর ঘোষণা করিতে উন্মুখ যে প্রাচীন হিন্দু রীতিনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত আর আমাদের উদ্ধার নাই। যাঁহারা জীবনে না হউক, অন্ততঃ বাক্যে মহাকবি কালিদাস লিখিত—

এই শ্লোকের প্রতিপোষক হন, এদেশে তাহারাই বাহবা পান। কিন্তু ইহা যে আমাদিগকে পশ্চাতের দিকে টানিয়া অগ্রসর হওয়ার বাধা জন্মায়, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন ?

যাহা হউক পতিত জাতির অতীত-প্রীতির পক্ষে একটা কথা আছে। তাহাদের অতীত গৌরবময়, তাই অতীতের আলোচনা দ্বারা তাহাদের আত্মাদর বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং তাহা পরম লাভ। অধিকন্তু অতীত প্রীতিবশতঃ অতীত-গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেও কিছু উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্। বিশেষতঃ অতীত লব্ধ গৌরবকে চরমলক্ষ্য করিলে উন্নতি লাভ হইবে কিনা সন্দেহ। কারণ ঠিক অতীতের আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব নয়; কাল ও পাত্রভেদে লক্ষ্যের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতাই স্বাভাবিক। অধিকন্তু অতীত ও বর্ত্তমানের আদর্শসাম্য সত্ত্বেও সাধনপ্রণালীর বৈষম্য অনিবার্য্য বলিয়া বোধ হয়। পিতামহও বারাণসীধামে গিয়াছেন, পৌত্রও যায়। কিন্তু পিতামহের ন্যায় নৌকাপথে সুন্দর বন দিয়া না গেলে পৌত্রের কাশীপ্রাপ্তি ঘটিবেনা বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাচীন তীর্থযাত্রার আধুনিক লৌহবর্ত্মের সাহায্য যাঁহারা মারাত্মক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ভ্রমান্ধতা প্রদর্শন বাহুল্যমাত্র।

অতীত আমাদের গৌরবজনক ছিল, একথা সত্য, কিন্তু হে বাঙ্গালী ভাই দৃঢ়নিশ্চয় হও আমাদের বর্ত্তমান আরও গৌরবান্বিত হইবে। আমরা পতিত হইয়াছি—নিজেদের উঠাইব। এ সংকল্পসিদ্ধির মহা-সৌভাগ্য অতীতে কোথায় ছিল ?

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাশীদাস সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

বিগত শ্রাবণ মাসের "ভারতী"তে শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহোদয় "কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদিগের চিরন্তন ধারণাকে নিরাশনের চেষ্টা করিয়াছেন; তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি স্বীয়মত স্থাপন করিতে যাইয়া যে দশটী প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া কিন্তু আমাদিগের চিরসংস্কার বিদূরিত হইল না। লেখকমহোদয় প্রতিপাদ্য বিষয়ে অর্থাৎ কাশীদাস যে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ করিতে কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন বটে, এবং তজ্জন্য শেষ সাতটী প্রমাণই তৎপক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু প্রথম তিনটী প্রমাণে "কথকের কথকতা ও পাঁচালীকারের পাঁচালী শ্রবণ করিয়া কাশীদাসের মহাভারত রচনা" বিষয়ক মতের ভ্রম প্রদর্শনার্থ যে চেষ্টা পাইয়াছেন বস্তুতঃ সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমাদের এই "ভ্রমাত্মিকা ধারণা" তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের পরেও "যে তিমিরে সে তিমিরে" রহিয়া গেল। তিনি প্রথম প্রমাণে, যে যুক্তিবলে বলিতেছেন যে "কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে.........কোন্ পাঁচালী পড়িয়া মহাভারত লিখিয়া ছিলেন?" অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে তথা বঙ্গসাহিত্যে পাঁচালীর প্রচলনই হয় নাই, সুতরাং তিনি কোন পাঁচালী পুস্তক বা পাঁচালীকারের সাহায্য লয়েন নাই। সেই যুক্তিবলে একথাও কি বলা যাইতে পারে না যে, কাশীরামের পূর্ব্বে পাঁচালীর প্রচলন যদি না থাকিত তবে তিনি মহাভারতের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ভণিতার স্থলে "পাঁচালী প্রবন্ধ" এই কথা প্রয়োগ করিবেন কেন? মহাভারতী মহোদয়ও ষষ্ঠ প্রমাণে এ কথা একপ্রকার স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং

লেখকমহোদয় দ্বিতীয় প্রমাণে এক প্রকার "শিবের গীত" গাহিয়াছেন, অর্থাৎ বলিয়াছেন "কাশীদাসের পূর্ব্বে…মহাভারতীয় সাহিত্য বা মহাভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষায় কোন গ্রন্থ ছিল না।" এ কথা কিন্তু সাহিত্য-সেবীগণের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সাহিত্য-সেবী "মহাভারতী" মহোদয় কি অবগত নহেন যে "বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ" বা তৎপ্রচারিত "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা" ও "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" প্রভৃতি কর্ত্তৃক বহুতর অপ্রকাশিত প্রামাণিক প্রাচীন পুঁথির দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে কাশীদাসী মহাভারত বিরচিত হইবার পূর্ব্বে "বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত" এবং ইহার সমসময়ে 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' ("পরাগলী") "শ্রীকরনন্দী"র ("ছুটীখানের") ও "সঞ্জয়" প্রভৃতির মহাভারত বিরচিত হইয়াছিল। লেখক ইচ্ছা করিলে "পরিষৎ" প্রকাশিত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত ও "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী"তে প্রকাশিত "ছুটীখানের মহাভারত" ও তাহাদের বিবরণ পাঠ করিতে পারেন।

তারপর লেখক বলিতেছেন "কথক ঠাকুর যে গ্রন্থ লইয়া কথকতা করিতেন তাহার নাম কি ?" লেখকের এরূপ প্রশ্নের তাৎপর্য্য কি ? হিন্দুমাত্রেই এই প্রশ্ন শুনিয়া হাসিবেন! যাঁহারা কথকতা শুনিয়াছেন বা কথকতাসম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন যে কথক মহাশয়গণ কোন বিশেষ পুস্তক অবলম্বনে কথকতা করেন না। কথকতার বিষয় পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-কথিত নানা উপাখ্যান। আর একস্থলে লেখক বলিতেছেন "কাশীদাসের পূর্ব্বে এমন কোনও দিগ্‌গজ বাঙ্গালী কথকের নাম শুনা যায় নাই।" কিন্তু যিনি কথকতার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু তথ্য রাখেন তিনিই বলিবেন যে কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী চৈতন্যদেবের অব্যবহিত

ছিল। আর এক কথা, কাশীদাস যে কথকতার সাহায্য লয়েন নাই তাহারই বা সন্তোষজনক প্রমাণ কই? তিনি স্বয়ং যখন ইহার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে কোন কথাই বলেন নাই, তখন আমরা কোন বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় করিতে অক্ষম। একসময়ে* বঙ্গদর্শনে ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবনা" পুস্তকের সমালোচনকালে বঙ্গের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থকারের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন "মহাভারত মূলসংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ নহে, অনেকস্থলে তিনি (কাশীরাম) ভূরি ভূরি বিষয়ের পরিবর্জ্জন ও ভূরি ভূরি বিষয়ের নূতন যোজন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কোন কোন উপাখ্যান একেবারে নূতন সঙ্কলিতও হইয়াছে। বনপর্ব্বের মধ্যে শ্রীবৎসোপাখ্যান মূলসংস্কৃতে একেবারে নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়া বোধ হয় কথকের মুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া এই রচনা করিয়াছেন। যে হেতু তিনি নিজেই কয়েকস্থলে লিখিয়াছেন :—

"শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার।"

এইরূপ উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন "আমরা বলি দেশে কথকতার প্রচলন না থাকিলে এরূপ হওয়া সম্ভবই হইত না।" এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে "শ্রুতমাত্র" কথার অর্থ কি? উত্তর— "কেবল শুনিয়া"! কিন্তু কাহার নিকট শুনিয়া? হয় শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট, নয়তো তৎকালীন প্রচলিত কথক অর্থাৎ পুরাণাদি ব্যাখ্যাকারের নিকট। শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণপণ্ডিত তখনকার দিনে নিঃস্বার্থভাবে বৃহৎ মহাভারতখানি যে, কাশীদাসকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়াছিলেন এ কথা বিশ্বাস হয় না, বরং কথকতা উপলক্ষে স্বভাবকবি

* বঙ্গদর্শন — ১ম খণ্ড।

কাশীরাম শ্রোতাস্বরূপে মহাভারত শুনিয়া তাহা ক্রমশঃ কবিতায় প্রকটিত করেন, এ কথা কতকটা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতী মহাশয়ের প্রবন্ধপাঠের পর আমরা জনৈক কথককে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন আমরা গুরুপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি যে কাশীদাস কথকতা শুনিয়া মহাভারত রচনা করেন এবং তাহা বিশ্বাস করিবারও হেতু আছে। কারণ আমাদের কথকতার বিষয় ঠিক মূলসংস্কৃতের অনুযায়ী নহে বরং কাশীদাসী মহাভারতের সহিত অধিক মিল দৃষ্ট হয়, সুতরাং কাশীরামের পূর্ব্বের প্রচলিত কথকতা হইতে তাঁহার (কাশীরামের) মহাভারত রচনা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

ঐ প্রমাণে আর একস্থলে লেখক বলিতেছেন "কাশীরাম কথকতা শুনিবার জন্য কাহারও বাড়ী কখন গমন করেন নাই।" এখানে লেখক "অভোজী" শব্দ লইয়া শব্দতত্ত্ব বিষয়ে একটী কষ্টকল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যেমন "অশূদ্র-পরিগ্রাহী" শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ দ্বিজাতি ভিন্ন কখন কাহারও দান গ্রহণ করেন না, তেমনি "অভোজী" কায়স্থ বংশধর কাশীরাম অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ (এখনও) কাহারও বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে গমন করেন না, এমন কি জ্ঞাতি ভিন্ন কাহারও হাতের তৈয়ারী আহারও ভোজন করেন না, এই কারণে নাকি এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরেরা "অভোজী" নামে অভিহিত! বস্তুতঃ ইহা লেখকের কষ্ট-কল্পনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কারণ কায়স্থ কাশীরাম অন্যের বাড়ী ভোজন করিতেন না বলিয়া কি কথকতা পাঁচালী যাত্রা শুনিতেও যাইতেন না? তাহাতেও কি জাতিপাত হইত? পরন্তু ঐরূপ শ্রেণীর পৌরাণিক কবিগণ চিরকালই কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতির আসরে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিতেন, এবং "সমজদার" বলিয়া আদৃত

অনুষ্ঠানে অবশ্য নিমন্ত্রণ যাইতে না পারিতেন, কিন্তু সমাজের চিরপূজ্য উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের অথবা স্বশ্রেণী কায়স্থের বাড়ীতেও কি যাইতেন না? হিন্দু সমাজে এরূপ অদ্ভুত লোক থাকা কি সম্ভব? অশূদ্রপরিগ্রাহী শুদ্ধাচারী আধুনিক ব্রাহ্মণেও কখন কাহারও বাড়ী কথকতা প্রভৃতি শুনিতে যাইতে দ্বিধা বোধ করেন না। তৃতীয় প্রমাণে লেখক বলিতেছেন "সংস্কৃত-মহাভারতের সহিত কাশীদাসী মহাভারতের অমিল থাকায় অনেকে কাশীরামের সংস্কৃতভাষায় অজ্ঞতাবিষয়ে বলিয়া থাকেন।" লেখক বলেন "অমিল কথাটা কল্পনা-ব্যাকরণের শব্দবিশেষ।" প্রকৃত কথা "সংক্ষেপ হইবে।" কাশীরাম মূল মহাভারতের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া যে মহাভারত রচনা করেন, তৎসম্বন্ধে ৩য় ভাগ ২য় সংখ্যার "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" পত্রিকায় বঙ্গভাষার আদি মহাভারত-লেখক "বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত" শীর্ষক প্রবন্ধে "বিশ্বকোষ" সঙ্কলয়িতা শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। অবশিষ্ট প্রমাণগুলি সম্বন্ধে আমাদের আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। আরম্ভেই সে কথা এক প্রকার বলিয়াছি। আমাদের মোটকথা কাশীদাস সংস্কৃত জানিলেও মহাভারত রচনাকালে যে কথকতা বা পাঁচালীর সাহায্য লয়েন নাই, তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। ষষ্ঠ প্রমাণে একস্থানে লেখক বলিতেছেন "কাশীদাসের মহাভারত ভিন্ন অন্য কাব্য ছিল না ও নাই!" এটী কাশীদাসসম্বন্ধে লেখকের অজ্ঞতা ভিন্ন আর কি বলিব। বস্তুতঃ কাশীরামদাস প্রণীত "যানপর্ব্ব," "দানপর্ব্ব," প্রভৃতি আরও কয়েকখানি চটী পুস্তক আছে। সেগুলি শীঘ্রই কোন সংবাদপত্র-সংশ্লিষ্ট কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইবে।

ভারতবাসীর জাপানে শিল্পশিক্ষা।

ভারতবর্ষের ম্রিয়মাণ শিল্পের উদ্ধারের জন্য আজকাল নানাস্থানে নানারূপ চেষ্টা হইতেছে। গত বৎসর কলিকাতা কন্‌গ্রেসে এবং আরও দুই এক প্রদেশে শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং আগামী কন্‌গ্রেসের সময় আমেদাবাদে ও রাজার অভিষেক উপলক্ষ্যে দিল্লীতে অপর একটী শিল্প-প্রদর্শনীর জন্য বিপুল আয়োজন চলিতেছে। এই সকল অনুষ্ঠানেরই উদ্দেশ্য স্বদেশের লুপ্তপ্রায় লুপ্ত ও লুক্কায়িত শিল্পের উদ্ধার। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে কেবলমাত্র আমাদের পূর্ব্বপ্রচলিত শিল্পের পুনঃ প্রচার দ্বারাই আমরা ইউরোপীয়দের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিতে সমর্থ হইব না। মুখ্যতঃ শিল্পজাত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য ও বিলাসের উপকরণ। ইউরোপের সহিত আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য লইয়া। কলকারখানার প্রসাদে ইউরোপ আমাদের নিত্য-আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল এত সস্তায় বিক্রয় করিতে পারে যে, আমাদের দেশের শিল্পীদের হস্তরচিত অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র আর দেশে বিক্রয় হয় না। এ কথাও বোধ হয় জোর করিয়া বলা চলে যে সৌখীন শিল্পের উন্নতি সাধারণ শিল্পের উন্নতির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। বহুলোক কাপড়-বোনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে, তবেই তাহাদের ভিতর অল্পসংখ্যকের পক্ষে উৎকৃষ্ট কাপড়-বোনা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়তঃ সৌখীন শিল্পের প্রচলন জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। গরীবের সখ পোষা নিষ্ফল। সাধারণ শিল্প নষ্ট হইয়া গেলে দেশ দরিদ্র [illegible] সৌখীন শিল্পও লোপ পায়।

আর একটি কথা অপ্রিয় হইলেও স্বীকার করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের ধনী লোকদের নিকট দেশী শিল্পজাত দ্রব্যের এখন আর আদর নাই। সুরুচি গুণটী শিক্ষার উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের অধিকাংশ ধনীদের মধ্যে এই শিক্ষার অভাববশতঃ রুচির অভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। তাঁহারা দেশীয় শিল্পের মর্য্যাদা জানেন না বলিয়া তাহার আদর করেন না। তাহা ব্যতীত এই শ্রেণীর অনেকের ভিতর এইরূপ একটি ধারণা আছে যে, ইউরোপীয় জিনিসের আদর দেখাইলে নিজেকে সভ্য বলিয়া প্রমাণ করা হয়। নিজেদের যথার্থ ইংরাজি শিক্ষার অভাব দেহ ও গৃহ ইংরাজি কাপড় ও ইংরাজি আস্‌বাবে ভারাক্রান্ত করার দ্বারা পূরণ করিতে সর্ব্বদা প্রয়াস পান। এ সম্বন্ধে দুই একটি দুর্ল্লভ ব্যতিক্রম দেখা যায় মাত্র। সুতরাং আমাদের শিল্পজাতের প্রচলন সম্বন্ধে অনেক বাধা আছে।

সাধারণ শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে আমাদিগকে নূতন পথ অবলম্বন করিতে হইবে, সে পথ ইউরোপের পথ। অর্থাৎ কল কারখানার সাহায্যে অল্পব্যয়ে জিনিস প্রস্তুত করা এবং সস্তায় জিনিস বিক্রয় করা ইউরোপীয় জিনিসকে দেশ হইতে তাড়াইবার একমাত্র উপায়। ভারতবর্ষে শিল্পশিক্ষার উপায় এখন এক রকম নাই বলিলেই চলে। ইউরোপে গিয়া শিক্ষা করাও প্রায় অসম্ভব। কারণ প্রথমতঃ—ইউরোপে শিক্ষা বহু ব্যয়-সাধ্য, দ্বিতীয়তঃ—ইউরোপে ভারতবাসীদিগকে শিল্পশিক্ষা দিতে প্রায় কেহই রাজী হয় না। আমাদের একমাত্র আশার স্থল জাপান। ভারতবর্ষীয় ভদ্রসন্তান ও জাতব্যবসায়ী কারিগর উভয়ের পক্ষে কোন্ কোন্ লাভজনক শিল্পশিক্ষার দ্বার জাপানে উন্মুক্ত আছে তাহারএকটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। তালিকাটি কোন জাপানী সম্ভ্রান্তপুরুষ আমাদিগকে দিয়াছেন।

ভদ্র সন্তানের পক্ষে।

খনির কাজ	(Mining.)
কাঁচের কাজ	(Glass.)
দেশী মাটির কাজ	(Pottery.)
চীনে মাটির কাজ	(Porcelain)
তৈল-পরিশোধন	(Oil-Refining.)
যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ারিং	(Mechanical Engineering.)
বৈদ্যুতিক ঐ	(Electrical Engineering.)
জাহাজ নির্ম্মাণ	(Ship building.)
স্থাপত্য	(Architecture.)
কাগজতৈরি	(Paper-manufacturing.)
চিত্র-নক্মা	(Decorative Designing.)
রঙান	(Dyeing.)
চিত্রবিদ্যা	(Art.)
চিকিৎসাবিদ্যা	(Medicine.)
ঔষধ প্রস্তুত করণ	(Pharmacy.)

কারিগরের পক্ষে।

কাংস্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের কাজ	
গালার কাজ	
ছুতারের কাজ	
ঢালাই (মূর্ত্তি প্রভৃতি)	(Casting.)
পোড়া মাটির কাজ	(Ceramics.)
চিনা মাটির কাজ	(Porcelain.)
সিম্মণ্ট	(Cement.)
কাঁচের কাজ	

মিনার কাজ (Enamel.)

রেসম ও জরির কাজ (Embroidery.)

তাঁতবোনা

ঘড়ি নির্ম্মাণ

ল্যাম্প নির্ম্মাণ

জাপানে যে কত অল্প ব্যয়ে শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে তাহা সম্ভবতঃ অনেকেই অবগত নহেন। একটি ভদ্রলোকের মাসিক ৮০৲ টাকায় এবং একজন কারিগরের মাসিক ৪০৲ টাকায় সেখানে সকল খরচ সঙ্কুলান হয়। ইহা আমাদের সকলের পক্ষেই বিশেষ আনন্দের কথা যে অদ্যাবধি যতগুলি ভারতবর্ষীয় শিক্ষার্থী জাপান গমন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের শীলতা ও অধ্যবসায়ে জাপানে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই স্থলে আমরা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি যে, নানারূপ গাছ গাছড়া এবং ধাতু প্রভৃতি হইতে ঔষধ প্রস্তুত করা শিক্ষা করিয়া আসাটা আমাদের দেশে আশুলাভপ্রদ হইবে ও তাহাতে বিলাত হইতে ঔষধ আমদানি করিবার আবশ্যকতা সত্ব দূরীভূত হইবে। ভারতবাসীর উদ্ভাবনীশক্তি সুযোগ পাইলেই আত্মবিকাশ করে পদে পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—পুরাণসিং নামক একটি পাঞ্জাবী যুবক একটি নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়া জাপানে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর নিকট বিশেষ খ্যাতিভাজন হইয়াছেন।

যদি কোন ভদ্রসন্তান শিল্পশিক্ষার্থে স্বয়ং জাপানে গমনেচ্ছু হন বা কোন দেশীয় কারিগরকে পাঠাইবার অভিলাষ করেন, জাপানে তাঁহাদের থাকিবার বন্দোবস্তাদি সম্বন্ধে ভারতী-কার্য্যালয়ে সম্বাদ লইলে সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

৺স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন।

কালব্যাধি-আক্রান্ত বিবেকানন্দ স্বামী তাঁহার সমস্ত কল্পনা অসিদ্ধ রাখিয়াই অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "মিশন" এখনও ভাগীরথীতীরে সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া খাড়া রহিয়াছে। সেই সৌধ বা 'মঠ'বাসী পুরুষগণের উপর আমাদের এখনও অনেক ভরসা। তাঁহারা নামে সন্ন্যাসী, গৃহস্থাশ্রম বর্জ্জন করিয়াছেন, মুক্ত। অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-মাতা-পিতা-আত্মীয়-পরিবার প্রতিপালনের কর্ত্তব্য হইতে নিজেদের বিমুক্ত করিয়াছেন, সাধারণ গৃহীর যে দায়িত্বভার ততটুকু দায়িত্বও তাঁহাদের নাই। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত দায়িত্বের পরিবর্ত্তে কোন্ বৃহৎ জাতীয় দায়িত্বভার তাঁহারা স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন? দেশের লোকের তাঁহাদের প্রতি এপ্রশ্ন করিবার অধিকার আছে।

সর্ব্বসাধারণের ন্যায় প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান, চাযোগ, স্বেচ্ছামত কিছু অধ্যয়নাদি বা অনধ্যায়, স্নানাহার, দিবানিদ্রা, সান্ধ্যবিহার, খোসগল্প আহার ও শয়ন—ইহার বেশী তাঁহাদের জীবনচরিতের বর্ণিতব্য বিষয় যদি কিছু না থাকে তবে ঐ মঠভানী সৌধ ভাগীরথীজলে লীন হইয়া গেলেও দেশের কোন ক্ষতি নাই।

একবার একজন ইংরাজললনার উৎসাহে ও উত্তেজনায় রামকৃষ্ণ মিশনের দুই একজন সন্ন্যাসী প্লেগের সময় অনেক প্রকৃত কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহাঁর স্বদেশে অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনও নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তর্হিত করিয়াছিল। উক্ত ইংরাজ-ললনা পুনরাগতা; তাঁহার ধনজন, শরীর ও মন সমস্তই আমাদের দেশের কল্যাণোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া, একান্ত নিষ্ঠার সহিত তিনি

আমাদের মধ্যে আমাদেরই মত করিয়া বাস করিয়া কাজ করিতেছেন, তাঁহাকে দেশের সকল সদনুষ্ঠানেই সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি,—এবার দেখিতেছি না তাঁহার পার্শ্বে, পার্শ্বচর রামকৃষ্ণসন্ন্যাসীদের। বিবেকানন্দ স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি প্রকাশ্যতঃ সম্বাদপত্রে রামকৃষ্ণমিশনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধবিচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছেন।

ভালই। বিদেশীয়া রমণীর অঞ্চল ধরিয়া লোকসমাজে উপস্থিত না হইয়া, রামকৃষ্ণমিশন নিজের পুরুষকারে নিজের উপর ভর করিয়া আসিয়া দাঁড়াক। দেশে এই মিশনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সপ্রমাণ করুক। রামকৃষ্ণমিশনের সন্ন্যাসীর দল ভাগীরথী তীরের নিকর্ম্মা অলসজীবন ছাড়িয়া নিষ্কাম-কর্ম্ম জগতে নামিয়া আসুন। কলিকাতার পাড়া পাড়া, বাঙ্গলা দেশের গ্রাম গ্রাম মৌমাছির চাকের মত তাঁহাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হউক। উক্ত মিশনের পরলোকগত প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হউক। দেশে অনন্ত কাজ করিবার পড়িয়া রহিয়াছে—করিবার মুক্ত লোকেরই অভাব। রামকৃষ্ণমঠে দেশের সেই মুক্ত-লোকবল রহিয়াছে। মঠধারী ও তাঁহার অনুচরগণ যদি এখনও কূর্ম্মের ন্যায় নিজেদের আত্মশরীরে লুপ্ত ও গুপ্ত রাখেন—কর্ম্মীর অপ্রতিহত তেজে বাহির হইয়া না আসেন, তবে এই হতভাগ্য দেশকে ধিক্।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপ ও আমেরিকায় কীর্ত্তিমান্ স্বামী বিবেকানন্দ যখন বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে "ভারতী"তে আলোচনা হয়। সেই আলোচনা উপলক্ষে বর্ত্তমান ভারতী-সম্পাদিকার সহিত তাঁহার কিছু পত্র ব্যবহার হইয়াছিল। নিম্নে আমরা তাহার মধ্যে তিনখানি পত্র প্রকাশ করিতেছি। ভূমিকায় পাঠক সাধারণকে একটি কথা বলা আবশ্যক। নিম্ন-প্রকাশ্য পত্রাবলীতে ভারতী-সম্পাদিকা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অত্যুক্তিগুলি পরিহার

পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। যাহা সৌজন্যমূলক ও স্পষ্ট অতিরঞ্জন, এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিবিশেষ নহে, কিন্তু শ্রেণীবিশেষই যাহার লক্ষ্য সে সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এই পত্রগুলির মধ্যে যে উচ্চ সংকল্প, যে স্বদেশপ্রেম, যে তেজঃপুঞ্জ সমাহিত রহিয়াছে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ তাহা অনুধাবন করিয়া তাঁহাদের নেতৃপুরুষের উচ্চকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান্ হইবেন এই আশা করা যায়।

ওঁ তৎসৎ।

ROSE BANK.
বর্দ্ধমান রাজবাটি, দার্জ্জিলিঙ্গ ;
৬ই এপ্রেল, ১৮৯৭।

মান্তবরাসু—

মহাশয়ার প্রেরিত ভারতী পাইয়া বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিতেছি, এবং যে উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্র জীবন ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যে ভবদীয়ার ন্যায় মহানুভাবাদের সাধুবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহাতে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

এ জীবন সংগ্রামে নবীন ভাবের সমুদ্যাতার উত্তেজক অতি বিরল, উৎসাহয়িত্রীর কথাত দূরে থাকুক; বিশেষতঃ আমাদের হতভাগ্য দেশে। এজন্য বঙ্গ-বিদুষী-নারীর সাধুবাদ সমগ্র ভারতীয় পুরুষের উচ্চকণ্ঠ ধন্যবাদাপেক্ষাও অধিক শ্লাঘ্য।

প্রভু করুণ যেন আপনার মত অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতি-কল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।

আপনার লিখিত ভারতী পত্রিকার মৎসম্বন্ধী প্রবন্ধ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ মন্তব্য আছে; তাহা এই—

পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছে এবং হইবে। পাশ্চাত্যেরা সহায়তা না করিলে যে আমরা উঠিতে পারিব না ইহা চিরধারণা। এদেশে এখনও গুণের আদর নাই, অর্থবল নাই, এবং সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে কৃতকর্ম্মতা (Practicality) আদৌ নাই।

উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এ দেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত মত আছে, কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্য বাদ আছে, আমাদের কার্য্যে মহা ভেদ বুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যে আমরা অতি নির্দ্দয়, অতি হৃদয় হীন, নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না।

তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল মন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে কিন্তু তিনিই বীর যিনি এই সমস্ত ভ্রম প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া, এক হস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। এক দিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্য দিকে অস্থির ধৈর্য্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক, কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম যে সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে যদি ক্রীড়া পুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায় সে জীবিত হইবে। জাপানি বালিকা কখনও পুতুল ভাঙ্গে না। হে মহাভাগে আমারও বিশ্বাস যে যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাস ভোগ-সুখেচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্ত্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটী কোটী স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে সদুদ্দেশ্য, অকপটতা ও অনন্তপ্রেম বিশ্ববিজয় করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটী কোটী কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্ব্বুদ্ধিনাশ করিতে সক্ষম।

আমার পুনর্ব্বার পাশ্চাত্য দেশে গমন অনিশ্চিৎ, যদি যাই তাহাও জানিবেন ভারতের জন্য—এদেশে লোকবল কোথায়? অর্থবল কোথায়? অনেক পাশ্চাত্য নরনারী ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতীয় ভাবে ভারতীয় ধর্ম্মের মধ্যদিয়া অতি নীচ চণ্ডালাদিরও সেবা করিতে প্রস্তুত আছেন। দেশে কয়জন? আর অর্থবল!! আমাকে অভ্যর্থনা করিবার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কলিকাতাবাসিরা টিকিট বিক্রয় করিয়া লেকচার দেওয়াইলেন এবং তাহাতেও সংকুলান না হওয়ায় ৩০০৲ টাকার এক বিল আমার নিকট প্রেরণ করেন!!! ইহাতে কাহারও দোষ দিতেছি না বা কুসমালোচনাও

করিতেছি না, কিন্তু পাশ্চাত্য অর্থবল ও লোকবল না হইলে যে আমাদের কল্যাণ অসম্ভব ইহারই পোষণ করিতেছি। ইতি সং

চিরকৃতজ্ঞ ও সদা প্রভু সন্নিধানে
ভবৎকল্যাণ-কামনাকারী
বিবেকানন্দ।

Darjeeling.
C/o M. N. Banerjey, Esq.
24th April 1897.

মহাশয়াঃ—

আপনার সহানুভূতির জন্য হৃদয়ের সহিত আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু নানা কারণবশতঃ এ সম্বন্ধে আপাততঃ প্রকাশ্য আলোচনা যুক্তিযুক্ত মনে করিনা। তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, যে টাকা আমার নিকট চাওয়া হয় তাহা ইংলণ্ড হইতে আমার সমভিব্যাহারী ইংরেজ বন্ধুদিগের আহ্বানের নিমিত্তই অধিকাংশ খরচ হইয়াছিল। অতএব এ কথা প্রকাশ করিলে, যে অপযশের ভয় আপনি করেন তাহাই হইবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা, আমি উক্ত টাকা দিতে অপারক হওয়ায়, আপনা আপনি মধ্যে উহা সারিয়া লইয়াছেন শুনিতেছি।

আপনি কার্য্যপ্রণালিসম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—তদ্বিষয়ে প্রথম বক্তব্য এই যে "ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ" হওয়া উচিত, তবে আমার অতি প্রিয়বন্ধু মিঃ মূলরের প্রমুখাৎ আপনার উদারবুদ্ধি স্বদেশবাৎসল্য ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের অনেক কথা শুনিয়াছি এবং আপনার বিদুষীত্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। অতএব আপনি যে আমার ক্ষুদ্র জীবনের অতি ক্ষুদ্র চেষ্টার কথা জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া, অত্র ক্ষুদ্র পত্রে যথাসম্ভব নিবেদন করিলাম। কিন্তু প্রথমতঃ আপনার বিচারের জন্য আমার অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ভবৎসন্নিধানে উপস্থিত করিতেছি; আমরা চিরকাল পরাধীন, অর্থাৎ এ ভারতভূমে সাধারণ মানবের আত্মস্বত্ব বুদ্ধি কখনও উদ্দীপিত হইতে দেওয়া হয় নাই। পাশ্চাত্যভূমি আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দ্রুতপদে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এ ভারতে কৌলীন্য প্রথা হইতে

ভোজ্যাভোজ্য পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় রাজাই নির্দ্ধারণ করিতেন। পাশ্চাত্যদেশে সমস্তই প্রজারা আপনারা করেন।

এক্ষণে রাজা সামাজিক কোনও বিষয়ে হাত দেন না, অথচ ভারতীয় জনমানবের আত্মনির্ভরত দূরে থাকুক আত্মপ্রত্যয় পর্য্যন্ত এখনও অনুমাত্রও হয় নাই। যে আত্মপ্রত্যয় বেদান্তের ভিত্তি তাহা এখনও ব্যবহারিক অবস্থায় কিছুমাত্রও পরিণত হয় নাই। এই জন্যই পাশ্চাত্য প্রণালী অর্থাৎ প্রথমতঃ উদ্দিষ্ট বিষয়ের আন্দোলন, পরে সকলে মিলিয়া কর্ত্তব্য সাধন এ দেশে এখনও ফলদায়ক হয় না, এই জন্যই আমরা বিজাতীয় রাজার অধীনে এত অধিক স্থিতিশীল বলিয়া প্রতীত হই। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাধারণে আন্দোলনের দ্বারা কোনও মহৎকার্য্য সাধন করার চেষ্টা বৃথা, "মাথা নেই তার মাথা ব্যথা"—সাধারণ কোথা? তাহার উপর আমরা এতই বীর্য্যহীন যে কোনও বিষয়ের আন্দোলন করিতে গেলে তাহাতেই আমাদের বল নিঃশেষিত হয়, কার্য্যের জন্য কিছুমাত্রও বাকি থাকে না। এজন্যই বোধ হয় আমরা প্রায়ই বঙ্গভূমে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" সতত প্রত্যক্ষ করি। দ্বিতীয়তঃ যে প্রকার পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—ভারতবর্ষের ধনীদিগের নিকট কোনও আশা করিনা। যাহাদের উপর আশা, অর্থাৎ যুবক সম্প্রদায়—ধীর স্থির অথচ নিঃশব্দে তাহাদিগের মধ্যে কার্য্য করাই ভাল। এক্ষণে কার্য্য ;—"আধুনিক সভ্যতা"—পাশ্চাত্য দেশের—ও "প্রাচীন সভ্যতা—ভারত মিসর রোমকাদি দেশের—মধ্যে সেই দিন হইতেই প্রভেদ আরম্ভ হইল, যে দিন হইতে শিক্ষা সভ্যতা প্রভৃতি উচ্চজাতি হইতে ক্রমশঃ নিম্নজাতি-দিগের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার মূল কারণ ঐটি, দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসন ও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয় তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। আজ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধুম উঠিয়াছে। ১০ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম সমাজ সংস্কারক সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা "ভদ্রলোক" নামে প্রথিত ব্যক্তিরা "ভদ্রলোক" হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না! মুসলমান কয়জন সিপাহি আনিয়াছিল? ইংরাজ কয়জন

তার গলা কাটিতে পারে এমন লক্ষ লক্ষ
১০০ বৎসর মুসলমান রাজত্বে ৬ কোটি
ক্রিশ্চিয়ান্—কেন এমন হয়?
? আমাদের দক্ষ হস্ত শিল্পী
না পারিয়া দিন দিন উৎসন্ন
শ্রমজীবীর বহুশতাব্দপ্রোথিত

হুনগর পর্য্যটন করিয়া তাহাদের
দের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া
হইল?—শিক্ষা, জবাব পাইলাম।—শিক্ষা-
বলে … হত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন, আর আমাদের
চ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম Irish Colonists আসিতেছে—
বিগতশ্রী, হতসর্ব্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও
একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি
আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চল্‌ছে, তার বেশভূষা বদ্‌লে গেছে,
তার চা… চলনে আর সে ভয় ভয় ভাব নাই! কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বল্‌ছেন যে ঐ Irishmanকে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি এক বাক্যে বল্‌ছিল "Pat তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস্ গোলাম্, থাক্‌বি গোলাম্"—আজন্ম শুনিতে শুনিতে Patএর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে Pat hypnotize কর্লে যে সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সংকুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠিল—"Pat তুইও মানুষ আমরাও মানুষ, মানুষেই ত সব করেছে, তোর আমার মত মানুষ সব কর্ত্তে পারে, বুকে সাহস বাঁধ",—Pat ঘাড় তুল্লে, দেখ্‌লে ঠিক কথাইত, ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বল্লেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত &c."

ঐ প্রকার আমাদের বালকদের যে বিদ্যা শিক্ষা হচ্চে তাও একান্ত অনস্তি-ভাবপূর্ণ (negative)। স্কুল-বালক কিছুই শিখেনা কেবল সব ভেঙ্গে চুরে যায়,—ফল "শ্রদ্ধাহীনত্ব"। যে শ্রদ্ধা বেদ বেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ

চলিতেছে সে " শ্রদ্ধার " লোপ। " অজ্ঞশ্চ।
বিনাশের এত নিকট। এক্ষণে উপায়
বল্লেই যে জটাজুট দণ্ড ক' গুলু
তবে কি যে জ্ঞানে ভববন্ধন
বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অ
আদর্শ, কিন্তু " স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্ম
শৈবসিদ্ধান্ত বৈষ্ণব শাক্ত এমন
ভারতে উঠিয়াছে সকলেই এইখানে
নিহিত আছে. পিপীলিকা হতে উচ্চতম
তফাৎ কেবল, " প্রকাশের তারতম্যে "
যোগসূত্র। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশ কাল ই সেই
বিকাশ হউক বা না হইক সে শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্ত্তমান—অ
শক্তির উদ্বোধন কর্ত্তে হবে দ্বারে দ্বারে যাইয়া। দ্বিতীয়, এই স
দিতে হবে। কথা ত হল সোজা, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয়
আমাদের দেশে সহস্র সহস্র নিঃস্বার্থ দয়াবান ত্যাগী পুরুষ আছেন, ই
এক অর্দ্ধেক ভাগকে যেমন তাঁহারা বিনা বেতনে পর্য্যটন করে ... দিচ্ছেন
ঐ প্রকার বিদ্যাশিক্ষক করান যেতে পারে। তাহার জন্য চাই প্রথমতঃ এক এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেথা হইতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হওয়া। মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় সম্প্রতি দুইটি কেন্দ্র হইয়াছে, আরও শীঘ্র হইবার আশা আছে। তার পর দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই, স্কুল ইত্যাদির এখনও সময় আইসে নাই, ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখান যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয় তদুপায়ে কর্ম্মশালা খুলা যাবে, ঐ কর্ম্মশালার মাল বিক্রয় যাহাতে ইউরোপ ও আমেরিকায় হয় তজ্জন্য উক্ত দেশসমূহেও সভা স্থাপনা হইয়াছে ও হইবে। কেবল মুস্কিল এক, যে প্রকার পুরুষদের জন্য হইবে ঠিক ঐ ভাবেই স্ত্রীলোকদের জন্যও চাই, কিন্তু এদেশে তাহা অতীব কঠিন আপনি বিদিত আছেন। পুনশ্চ, এই সমস্ত কার্য্যের জন্য যে অর্থ চাই তাহাও ইংলণ্ড হইতে আসিবে। যে সাপে কামড়ায় সে নিজের বিষ উঠাইয়া লইবে ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এবং তজ্জন্য আমাদের ধর্ম্ম ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচার হওয়া চাই।

খৃষ্টাদি ধর্ম্মের ভিত্তি একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার উ
নষ্ট করিয়া প্রায় ফেলিল। ইউরোপ ও আমেরিকা আশাপূর্ণনেত্রে
তাকাইতেছে—এই সময় পরোপকারের, এই সময় শত্রুর দুর্গ অধিকার
শ্চাত্যদেশে নারীর রাজ্য, নারীর বল, নারীর প্রভুত্ব। যদি আপনার
নী বিদুষী বেদান্তজ্ঞ কেউ এই সময়ে ইংলণ্ডে যায়, আমি নিশ্চিৎ
এক এক বৎসর অন্ততঃ দশ হাজার নরনারী ভারতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া
... এক রমাবাঈ অস্মদ্দেশ হইতে গিয়াছিলেন, তাঁহার ইংরাজী ভাষা বা
াত্য বিজ্ঞান শিল্পাদি বোধ অল্পই ছিল, তথাপিও তিনি সকলকে স্তম্ভিত
করিয়াছিলেন। যদি আপনার ন্যায় কেউ যান ত ইংলণ্ড তোলপাড় হইয়া যাইতে
পারে, আমেরিকার কা কথা। দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষি মুখাগত-
ধর্ম্মপ্রচার করিলে আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি এক মহান্ তরঙ্গ উঠিবে যাহা সমগ্র
পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এ মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী সাবিত্রী ও
উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনও নারীর এ সাহস হইবে না? প্রভু
জানেন।* ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড আমরা ধর্ম্মবলে অধিকার করিব, জয় করিব।
"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়", এ দুর্দ্দান্ত অসুরের হস্ত হইতে কি সভা সমিতি দ্বারা
উদ্ধার হয়? অসুরকে দেবতা করিতে হইবে। আমি দীন ভিক্ষুক পরিব্রাজক কি
করিতে পারি, আমি একা অসহায়। আপনাদের ধন-বল বুদ্ধি-বল বিদ্যা-বল, আপনারা
এ সুযোগ ত্যাগ করিবেন কি? এই এখন মহামন্ত্র—ইংলণ্ড বিজয়, ইউরোপ বিজয়
আমেরিকা বিজয়, তাহাতেই দেশের কল্যাণ। Expansion is the sign of
and we *must* spread the world over with our spiritual i
হায়! হায়! শরীর ক্ষুদ্র জিনিস, তায় বাঙ্গালীর শরীর, এই পরিশ্রমেই অ

---

* বিবেকানন্দ স্বামীর এই যে প্রচণ্ড বিশ্বাস যে দেশীয় নারী য়ুরোপে গিয়া বা
সহকারে এদেশের ধর্ম্ম প্রচার করিলে দেশের মহদুপকার হইবে—তাঁর এই বিশ্বা
ও উদ্বোধন ...ক্যে প্রবুদ্ধ হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করা আমার পক্ষে সম্ভাবিত ছিলনা।
অযোগ্যত ...হার মুখ্য কারণ। কিন্তু আমার অপেক্ষা যোগ্যতরা কোন হিন্দু
মহিলা ... এই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন, স্বদেশে বিদেশে
মাতৃভূ ... রবান্বিত করিয়া তুলিবেন—এ কল্পনা দুরপরাহত নয় এই
আশা ... নং

ুহর ব্যাধি আক্রমণ করিল ; কিন্তু আশা এই—"সম্পৎস্যতাে
ধর্ম্মা কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।

নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—প্রথমতঃ আমার
ছিলেন, তবে দেবীর প্রসাদ মাংস কেহ দিলে অঙ্গুলি দ্বারা মস্তকে
জীবহত্যা পাপ তাহাতে আর সন্দেহও নাই; তবে যত দিন রাসায়নিক
উদ্ভিজ্জাদি মনুষ্যশরীরের উপযোগী খাদ্য না হয়, তত দিন মাংস ভোজন
নাই। যতদিন মনুষ্যকে আধুনিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া রজোগুণের ক্রি
হইবে ততদিন মাংসাদন বিনা উপায় নাই। মহারাজা অশোক তরবারির দ্বারা
বিশ লক্ষ জানোয়ারের প্রাণ বাঁচাইলেন বটে, কিন্তু ১০০০ বৎসরের দাসত্ব, কি তদপেক্ষ
আরও ভয়ানক নহে? দু দশটা ছাগলের প্রাণনাশ বা আমার স্ত্রী কন্যার মর্য্যাদা রাখিতে
অক্ষমতা ও আমার বালক বালিকার মুখের গ্রাস পরের হাত হতে রক্ষা করিতে
অক্ষমতা এ কয়টির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর পাপ? যাঁহারা উচ্চশ্রেণীর এবং শারীরিক
পরিশ্রম করিয়া অন্ন সংগ্রহ করেন না তাঁহারা বরং না খান, যাহাদের দিবারাত্র
পরিশ্রম করিয়া অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিরামিষাশী
করা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য কি
করিতে পারে জাপান তাহার নিদর্শন। সর্ব্বশক্তিমতি বিশ্বেশ্বরী আপনার হৃদয়ে
অবতীর্ণা হউন। ইতি—

বিবেকানন্দ।

বেলুড়মঠ।
১৬ই এপ্রিল ১৮৯৯।

়াশয়াবু—

আপনার পত্রে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। যদি আমার বা আমার গুরু-
ভ্রাতাদিগের কোনও একটি বিশেষ আদরের বস্তু ত্যাগ করিলে, অনেক শুদ্ধসত্ত্ব এবং
যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমাদের কার্য্যে সহায় হন, তাহা হই । সে ত্যাগে
আমাদের মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইবে না বা এক ফোঁটাও চক্ষের জল প জানিবেন
এবং কার্য্যকালে দেখিবেন। তবে এতদিন কাহাকেও ত দে প্রকার
সহায়তায় অগ্রসর। দু এক জন আমাদের Hobbyর জায়গায় Iobby

পর্য্যন্ত। যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, থা, কোনও উৎকট পাপ করিয়া খৃষ্টীয়ানদের অনন্ত নরক আছি জানিবেন। তবে মানুষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বৃদ্ধ হতে সার বড়ই কঠিন স্থান। গ্রীকদার্শনিকের লাণ্টান হাতে করিয়া হই বেড়াইতেছি। আমার গুরুঠাকুর সর্ব্বদা একটি বাউলে গান ইটি মনে পড়্‌ল।

"মনের মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তার যায় গো জানা
সে দু এক জনা
সে রসের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা"

তরফ থেকে। এর একটিও অতিরঞ্জিত নয় জানিবেন এবং

ল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাড়্‌লেই আমাদের সঙ্গে াঁদের সম্বন্ধেও আমার এইটুকু খুঁৎ আছে। বলি এত দেশের লজা ছেঁড় ছেঁড়, প্রাণ যায় যায়, কণ্ঠে ঘড় ঘড় ইত্যাদি—আর করে দিলে?

রঙ্গশালিনী নদী যার বেগে পাহাড় পর্ব্বত ভেসে যেন যায় হিমালয়ে ফিরিয়ে দিলে! বলি ওরকম দেশহিতৈষিতাতে করেন, বা ওরকম সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হতে পারে? াত কিছুই বুঝিতে পারি না। তৃষ্ণার্ত্তের এত জলের বিচার, অন্নবিচার এত নাক সিঁটকান? কে জানে কার কি মতি । হয় ও সব লোক গ্লাসকেশের ভিতর ভাল, কাজের সময় ততই কল্যাণ।

প্রীত্‌ না মানে জাত্‌ কুজাত্‌
ভুখ্‌ না মানে বাসি ভাত্‌।

তবে আমার সব ভুল হতে পারে, ঠাকুরের আঁটিটি গলায় তা না হয় আঁটিটি ছাড়িয়ে দেওয়া যায়।

যাহা হউক এ সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে অনেক কথা কহি রহিল।

এ সকল কথা কহিবার জন্য রোগ শোক মৃত্যু সকলেই দিয়াছেন, বিশ্বাস এখনও দিবেন।

এই নববর্ষে আপনার সমস্ত কাম

কিমধিকমিতি
বিবেকানন্দ

উল্লিখিত পত্রখানি লিখিবার অল্পকাল পরেই বিবে পুনর্ব্বার য়ুরোপযাত্রা করিতে বাধ্য হন। তদবধি অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কট থাকায় আমাদের সহিত অভীষ্ট আর ঘটে নাই।

গ্রন্থ সমালোচনা।

শব্দার্থমঞ্জরী। সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীশিবনারায়ণ শিরোমণি সঙ্কলিত। আর্য্যাবর্ত্তে যেমন বারাণসী, দক্ষিণাপথে যেমন পুণা, বঙ্গদেশে নবদ্বীপ সেই প্রকার পণ্ডিতের উৎপত্তি স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থান ধারাবাহিকক্রমে বহুকাল পর্য্যন্ত ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। শুনা যায় পূর্ব্বে নবদ্বীপে পাড়ায় পাড়ায় অন্য শাস্ত্রের চতুষ্পাঠীর ন্যায় অনেকগুলি ব্যাকরণের চতুষ্পাঠী ছিল। ঐ সকল চতুষ্পাঠীকে "আখড়া" বলিত। আখড়ায় সাধারণতঃ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, অমরকোষ ভট্টি প্রভৃতি কাব্য অধীত হইত। ঐ সকল আখড়ায় পড়িয়া পরে ছাত্রেরা অন্য চতুষ্পাঠীতে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। নবদ্বীপের ব্যাকরণের চতুষ্পাঠীর শব্দ-শাস্ত্রের অধ্যয়নপ্রণালী অতি সুন্দর ছিল। ঐ সকল চতুষ্পাঠীর প্রতিভাশালী ছাত্রেরা শব্দশাস্ত্রে অসীম ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন। উপরিলিখিত অভিধানের প্রণেতা নবদ্বীপনিবাসী পণ্ডিত শিরোমণি মহাশয় নবদ্বীপের সেই প্রাচীন প্রণালীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন অতি ব্যুৎপন্ন শাব্দিক। ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে ইঁহার ন্যায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি অতি বিরল। আলোচ্যমান গ্রন্থ "শব্দার্থমঞ্জরী" তাঁহার জ্ঞানের বিশেষ পরিচায়ক হইয়াছে। ইহাতে প্রচলিত সাহিত্যশাস্ত্রে ব্যবহৃত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ, বাচ্যসহ প্রকৃতি প্রত্যয় এবং শব্দের প্রকৃত আকার, লিঙ্গ ইত্যাদি সংক্ষেপে অথচ অতি বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোন স্থলেই অপ্রমাণ স্বকপোলকল্পিত অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই ইহাও গ্রন্থের একটি বিশেষ উপাদেয়তার কারণ। সাধারণ অভিধান অপেক্ষা ইহার আরও একটি গৌরবের কথা এই যে ইহাতে একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছে। ঐ পরিশিষ্টে নানা শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, প্রাচীন গ্রন্থকারগণের জীবনচরিত ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যদিও পরিশিষ্ট-ধৃত বিষয়গুলি নানা প্রত্নতত্ত্ববিদের গভীর গবেষণার ফল,—যেমন, ইহাতে যে নৈষধচরিত প্রণেতা শ্রীহর্ষের জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে, উহা ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ভারতী পত্রিকায় প্রথম লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল,—তথাপি শিরোমণি মহাশয় নানা স্থানে হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া সুপ্রণালীতে

যথাবস্থভাবে যে বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। এতদিনে ছাত্র ও শিক্ষকগণের ব্যবহার্য্য একখানি অভিধানের অভাব দূর হইল, তজ্জন্য আমরা আনন্দিত হইলাম। আশা করি সাধারণে "শব্দার্থমঞ্জরী" গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকারের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

লীয়ার। মহাকবি সেক্ষপীয়র প্রণীত "কিং লীয়ার" নাটকের বঙ্গানুবাদ। চোরবাগান ইউনিয়ান লাইব্রেরী ও লিজার আওয়ার ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক অভিনয়ার্থে, শ্রীযতীন্দ্র মোহন ঘোষ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য এক টাকা।

প্রথমতঃ এই চোরবাগান সমিতির সভ্যগণের নিকট আমাদের কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। তাঁহারা আত্মপরিচয় প্রদানের জন্য বাছিয়া গুছিয়া এরকম একটা ইংরেজী বদ্‌খৎ নাম গ্রহণ করিলেন কেন? কোন একটা বাঙ্গলা নাম জুটিল না কি? যদি না জোটে, তবে তাঁহাদের অনুবাদক যতীন্দ্রবাবু এই সুদীর্ঘ ইংরেজী নামের একটা তরজমা অবশ্যই করিয়া দিবেন।

অনুবাদ করা কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ সেক্ষপীয়রের ন্যায় কাব্যগ্রন্থের। তাহাও আবার ছন্দোবন্ধ ঠিক রাখিয়া। যিনি এই জগৎপূজিত মহাকবির ভাব-সাগরের অন্তস্তলে ডুবিয়া গিয়াছেন, তিনিই ভাসিয়া উঠিয়া তাহার কথঞ্চিৎ ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন। যেমন সেক্ষপীয়রে বিভোর না হইলে সেক্ষপীয়র অভিনয় করা যায় না, সেইরূপ সেক্ষপীয়রে বিভোর না হইলে, তাহা অনুবাদও করা যায় না। এরূপস্থলে এই নবীন গ্রন্থকার যে অনেকস্থলে অকৃতকার্য্য হইবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তবুও তাঁহার সাহস প্রশংসনীয়। আর দুই একস্থলের রচনা বেশ ভালও হইয়াছে, যেমন—

(মূল)

"She that is a maid now, and laughs at my departure"
"Shall not be a maid long, unless things be cut shorter."

Act I. s. 5.

(অনুবাদ)

"কুমারী সব হাস্‌ছো বড় যাচ্ছি আমি দেখে।
চিরকুমারী থাকবে নাক কালে যদি রাখে॥"

(মূল)

"Fathers that wear rags,
Do make their children blind;
But fathers that bear bags,
Shall see their children kind.
Fortune, that arrant whore,
Ne'er turns the key to the poor.
Act II. s. 4.

(অনুবাদ)

"টানাপরা বাপ হ'লে অন্ধ হবে ছেলে
বাপের দুঃখ জান্‌বেনা সে কোন কালে
টাকার বোঝা আছে যার, বড় ভাল ছেলে তার
ভাগ্যদেবী বড় নটী খুলে দেয় না চাবিকাটি,
গরিবের কপালে।"

কিন্তু তেমনি অনেক স্থলে অনুবাদটী বাঙ্গালায় হইয়াছে, কি আর কোন ভাষায় হইয়াছে তাহা ঠিক করা কঠিন। সময় সময় এই বাঙ্গালা অনুবাদের অর্থ বুঝিবার জন্য মূল ইংরেজী গ্রন্থ খুলিতে হয়। অনেক স্থানে মূল গ্রন্থের ভাব পরিস্ফুট হয় নাই, কোন রকমে "রফারফি" ভাবে অনুবাদ করা হইয়াছে। কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি।

"জীবনের যত ভোগ, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুখ যে ভোগ আধার, সব শত্রু মম কাছে"—
এখানে "ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুখ যে ভোগ আধার" ইহার অর্থ কি? মূলে আছে—

"That I profess
Myself an enemy to all other joys
Which the most precious square of sense possesses."

"Nothing will come of nothing." ইহার তরজমা হইতেছে—

"নীরবে রবে না কিছু।"

ইহা কে বুঝিবে?

"দ্বিতীয়াংশ রাজ্য মম করিনু অর্পণ
মূল্যে সম এই অংশ গণেরিল সহ।"

(মূল)

"No less in space, validity and pleasure,
Them that conferred on Goneril."

"বোধ হয় সম্প্রতি কোপবশতঃ কুঞ্চিতকপোল হয়েছিলে ?"

এখানে কপোল অর্থে যে কপাল তাহা মূলগ্রন্থে না পড়িলে কে বুঝিবে ?

"Me thinks you are too much of late in the frown."

"তার পক্ষে আমার পাণিগ্রহণ করা তোমার প্রভুপত্নী অপেক্ষা সাজে" ইহার অর্থ কি ? না—

"And more convenient is he for my hand.
Than for your lady's."

এরূপ বিসদৃশ অনুবাদের উদাহরণ অনেক আছে।

ভ্রম সংশোধন।

৪৭২ পৃষ্ঠায় ২৪ লাইনে 'অজ্ঞাতনামা ক্ষুদ্রপরনারী'র স্থলে—'অজ্ঞাতনামা ক্ষুদ্রনরনারী' পড়িতে হইবে।

পথিক।*

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

এক অঙ্কে সমাপ্ত পদ্যময়ী নাটিকা।

১ দৃশ্য।

জ্যোৎস্না-ধৌত প্রাকৃতিক দৃশ্য—রঙ্গমঞ্চের দক্ষিণপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রমোদ-ভবন; ক্রম-ঢালু সোপানাবলী ভূতলে নামিয়া আসিয়াছে; রঙ্গমঞ্চের দূর-পশ্চাতে বারাণসী নগরী অস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান; আকাশ তারকাকীর্ণ। মালতী শয়নোপযোগী একখানি সাদা সাড়ী পরিয়া, সিঁড়ির গরাদের উপর কুনুই রাখিয়া, স্বপ্নময় ভাবে ভোর হইয়া, প্রাকৃতিক দৃশ্যটি অবলোকন করিতে করিতে চিন্তামগ্ন।

মালতী। কন্দর্পের মুখে ছাই! অশ্রুবিন্দু নাহি আর
এ পোড়া নয়নে!
সারাটা যৌবন মোর কাটায়েছি আত্ম-পূজা
শুধু আহরণে।
নিষ্ঠুর রাণীর মত' কৃপা-চক্ষে ভক্ত-বৃন্দে
করেছি দর্শন;
চুম্বিলে এ হস্ত মোর একটি হৃদয়-তন্ত্রী
হয়নি কম্পন;
—কে করে বিশ্বাস ইহা? এত প্রেম আরাধনা
পাইয়া মালতী

* এই নাটিকাটি ফরাসী থিয়েটারে যখন অভিনীত হয়, তখন প্রসিদ্ধ ফরাসী অভিনেত্রী Sarah Bernhardt নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

তবুও হৃদয় তার তৃপ্তি-হীন, অবসন্ন,
ম্রিয়মান অতি ?
প্রতিদিন দেখি সেই সুনীল গগন ঊর্দ্ধে
রহে প্রসারিত ;
সেই সে সুন্দর নিশি, প্রশান্ত নিদাঘ সেই
রহে বিরাজিত ;
পাইতেছি প্রতিদিন কত ভকতের হাতে
পুষ্প উপহার ;
কত রাজা মহারাজা খুলি দেয় মোর কাছে
রত্নের ভাণ্ডার,
তবু তারা নাহি পারে উৎপাদিতে হৃদে মোর
একটু বিস্ময় ;
তাদের সে শূন্য-গর্ভ উপহার মোর কাছে
তুচ্ছ অতিশয় !
হায় কি বিষম কষ্ট ! কাহারে না ভালবাসি'
জীবন ধারণ
—সে তো গো জীবন নয়, সে তো শুধু জীবনের
মিথ্যা বিড়ম্বন।
আমার যে কিছু নাই ; নাহিক একটি ফুল
—আদরে শুথায় যাহা
পুঁথির ভিতরে ;
নাহিক কেশের গুচ্ছ, রক্ষিত হয়গো যাহা
পুরাণো সুখের স্মৃতি
জাগাবার তরে ;
মরমের কোন কথা নাহি গাঁথা এই শূন্য মনে
—যাহার করিয়া ধ্যান হই সুখী শয়নে স্বপনে।
সুখের নাহিক লেশ, শূন্যময় হেরি সব
—সর্ব্বেতে ঔদাস্য ;

কেমনে কাঁদিতে হয়　　ভুলিয়া গিয়াছি যেন
তাহারো রহস্য!

(দূরস্থ বারাণসী নগরীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া)

ওই যে গো বারাণসী,　　এই যে এমন নিশি
শশাঙ্ক-উজ্জ্বল;
আমা-সম সুখ-হীন　　হয় তো প্রেমিক কোন
যুবক সরল,
এ সময়ে কোন গৃহে　　ছাদের উপরে বসি'
ঊর্দ্ধে চাহি' ঘন ঘন
ফেলিছে নিশ্বাস;
হয় তো সে কোন দিন　　আমারেই চক্ষে হেরি'
আমারি প্রেমের লাগি
হয়েছে উদাস;
সে যদি কখন আসে　　মোর এই সর্ব্বনাশী
কুলনাশী পথে,
সুখ-আশা সে যেন রে　　নাহি করে মুহূর্ত্তেক
এ সাপিনী-হতে।

(নেপথ্যে মলয়কুমার গাহিতে গাহিতে)

গান।

এসো প্রিয়ে! আসে মধু-মাস;
মধুর ভানুর কর, মধুর আকাশ!
কুঞ্জে পিক গাহে মাতি'　　প্রফুটিত যুঁথি জাতি,
মৃদু বহে মলয়-বাতাস;
এস প্রিয়ে! আসে মধু-মাস॥

মালতী। কিছুই লাগেনা ভাল;　　এমন মধুর স্বর
এমন নিশিতে—
কেবলি জাগায় মোরে　　—সূচ-সম পশে যেন

আমার এ চিতে।

অন্যের প্রমোদ-লীলা কেন বৃথা অনুসরে'
মোর পিছে পিছে ;
মনে সুখ নাহি মোর, তবে এ বসন্ত-রাতে
কে গায় মিছে ?

(মলয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ আরও নিকটতর)

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার গান)

লঘু প্রজাপতি কত সদা ভ্রমে' যেই পথ,
আর যত সুতন্বী ললনা ;
এসো সেই পথ দিয়া তোমাতরে প্রতীক্ষিয়া
জান তো গো আছে কোন্ জনা !
সেই পথে সরোবর আছে এক মনোহর,
পিয়ে যেথা হরিণ হরিণী ;
তারি ধারে আছে কুঞ্জ, ফুল ফুটে পুঞ্জ পুঞ্জ
সেথা হবে মিলন মোহিনি !

মালতী। সুরটি মধুর অতি মর্ম্ম-স্পৃক্ কণ্ঠস্বর
কিন্তু আমি বুঝিনে যে আর
এই সব প্রণয়ের মিছাকথা জলপনা
বস্তুহীন অলীক ব্যাপার।
কি হবে হেথায় ?—যাই ঘরের ভিতরে
এ স্থান ছাড়িয়া দি সুখীজন তরে।

(ধীরে ধীরে আবার বারাণ্ডার উপর উঠিয়া, যেদিক হইতে কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল—সেইদিক পানে আকুল ভাবে অবলোকন)

২ দৃশ্য।

(বীণাস্কন্ধে এবং উত্তরীয়ের কিয়দংশ তৃণভূমির উপর লুটাইয়া যাইতেছে—এই ভাবে মলয়কুমারের প্রবেশ)

মলয়। ধন্যরে বসন্ত রাতি ! ভ্রমিতেছি কেমন আরামে !
আহার করিনু সাঁজে —পঁহুছিয়া ক্ষুদ্র এক গ্রামে—

বাগিচা-বেড়ার তলে　　　অস্তমান ভানুর সম্মুখে ;
হ'ল যবে চন্দ্রোদয়　　　যাত্রা পুন আরম্ভিনু সুখে।
গাহিতে গাহিতে গান　　　চলিয়াছি অবিরত
ভুলি' পথ-শ্রম ;
ধন্যরে বসন্ত-রাতি　　　মুক্তহস্তে শশি কিবা
ঢালিছে কিরণ !
তরু-পুঞ্জ-ফাঁক দিয়া　　　হাসিছে একটি তারা
একদৃষ্টে চাহি' মুখপানে
ঠিক্ মানুষেরি মত ;　　　ধন্যরে বসন্ত-রাতি !
কত আশা জাগে মোর প্রাণে।
এই তো আইনু হেথা ;　　　জানিতে পারিব কল্য,
ভালবাসে কি না
প্রেম-গান বারাণসী　　　—চাহে কি না শুনিবারে
মোর এই বীণা।
এখনো বিলম্ব আছে　　　হইতে গো রজনীর শেষ,
তাহে যদি দ্যাখে এই　　　চীর-বস্ত্র ভিখারীর বেশ,
আর এই বীণা স্কন্ধে　　　কে করিবে দ্বার উদ্ঘাটন ?
হেথা তবে করি আজি　　　কোন মতে রজনী যাপন।
শুই তবে এইখানে ;　　　ভূমিটা কঠিন বড়,
কিন্তু নিশি এমন মধুর !
আর, এ শৈবাল-পুঞ্জে　　　রচি' শির-উপাধান
শুয়ে হেথা করি শ্রান্তিদূর।
নিদ্রিত হইলে যদি　　　শীত লাগে গাত্রে মোর
গরম হইব পুন প্রভাত-কিরণে ;
(ভূতলে শয়ন) তাহে কিবা আসে যায় ?　　　আরামে থাকিব বেশ
এই মোর উত্তরীয় বাস-আচ্ছাদনে !
লইনু আশ্রয় তোর　　　তারকা-শোভন-নির্মল
বিমুক্ত আকাশ !

বিশ্বমাতা প্রকৃতির এইতো রে চিরন্তন
পথিক-নিবাস !

(উত্তরীয়-বস্ত্রে গাত্র অর্দ্ধ আচ্ছাদন করিয়া শয়ন ও নেত্র নিমীলন)

মালতী। (উপর হইতে অবলোকন করিয়া)

বেচারা বালক যে গো সত্যই করিল কাজে
কহিল যা মুখে প্রকাশিয়া ;
আর কিনা আমি এবে করিনু আক্ষেপ কত
রজনীটি সুন্দর বলিয়া

(নীচে নামিয়া আসিয়া)

আমি কি পাপাত্মা ঘোর ! আচ্ছা, ওরে করি আহ্বান ;
আতিথ্য কর্ত্তব্য মোর, আশ্রয় উহারে করি দান।
কিন্তু এ বসন্ত-রাতি আমার যে নাহি ভাল লাগে ;
সদাই অন্তরে মোর গভীর বিষাদ এক জাগে।
আমি চাহি—এ রজনী ছেয়ে যায় ঘোর অন্ধকারে,
পথ-হারা পান্থ কেহ না পায় আশ্রয় কারো দ্বারে।

(মলয় কুমারকে নিদ্রিত দেখিয়া)

বেচারা বালক কিন্তু এরি মধ্যে কেমন ঘুমায় !
বোধ হয় অভ্যাস আছে, কিন্তু তাহে কিবা আসে যায় ?
এ নীরব বিজনতা ! এই নিশি গন্ধে আমোদিত !
এ সৌম্য মুরতি কিবা ! সব্‌ই মোরে করে উত্তেজিত।
মনে হয় বাড়িতেছে হৃদে মোর স্পন্দনের বেগ,
সহসা উদিত হয়ে কোন এক নূতন আবেগ
পাগল করে যে মোরে !

(আরো নিকটে গিয়া দর্শন) একি !—সেই স্বপন-পুরুষ ?

(মৃদুভাবে হাতটি ধরিয়া)

এসো পান্থ ওঠ ওঠ ! নিশি-বায়ু বড়ই পরুষ।

মলয়। (জাগিয়া উঠিয়া মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখিতে দেখিতে)

অপ্সরী না বিদ্যাধরী ?   তোমারেই আমি যে গো
দেখিনু স্বপন !
ও শুভ্র মূরতি তব   দেখিনু গো ছিনু যবে
নিদ্রায় মগন ॥

মালতী। না, না, তুমি দেখিয়াছ   শাখা-পত্র-ফাঁকে বুঝি
তারকা কিরণ।

মলয়। না না আমি তোমারেই   করিয়াছি স্বপ্নে দরশন ;
সেই তব কণ্ঠস্বর   করি যেন এখনো শ্রবণ।
মানুষ ঘুমায় যবে   এ চক্ষে না দেখিলেও
দ্যাখে দিব্য চোখে ;
আরো, আমি শুনিলাম   সঙ্গীত হতেছে যেন
কোন স্বর্গ-লোকে।

মলতী। সঙ্গীতের শব্দসম পশিল যা' তোমার শ্রবণে
—পল্লব-মর্ম্মর-ধ্বনি   —সমুত্থিত পবনতাড়নে !

মলয়। কে তুমি বলগো তবে ;

মালতী   আমি তব সাক্ষাৎ বিস্ময়,
বলিতে আইনু হেথা   লবে কিনা আমার আশ্রয়।
হ'ল কিগো সুখ-নিদ্রা   আলিঙ্গিয়া কঠিন বসুধা ?
আহার করিয়া কিছু   নিবৃত্তি করিবে কিগো ক্ষুধা ?

মলয়। (একদৃষ্টে মুখের পানে চাহিয়া)—
বড় অনুগ্রহ তব ;   কিন্তু বিলম্বে আজি
করেছি আহার,
ক্ষুধা নাহি লেশমাত্র ;   নিদ্রা যাইতেও মোর
ইচ্ছা নাহি আর।

মালতী। (স্বগত) নিষ্ঠুর মালতী ওরে !   হোক্ তোর দয়ার উদয়
অন্ততঃ আজিকে তুই   হস্‌নে রে দারুণ নির্দ্দয়।
পাতিস্‌নে প্রেম-ফাঁদ,   হরে তুই ক্ষান্ত ;
তাহে পুন ও-বেচারি   বালক নিতান্ত।

(প্রকাশ্যে) জানিবার অধিকার নাহি কিগো আমার এখন
—কে মোর গবাক্ষতলে নিদ্রা-ছলে করিল শয়ন ?

মলয়। সঙ্গত এ প্রশ্ন তব ; শোনো, নহি ছদ্মবেশ-কামী,
মলয় আমার নাম সঙ্গীতের ব্যবসায়ী আমি।
শিশুকাল হতে আমি চঞ্চল-স্বভাব "ভব-ঘুরে"
ভ্রমণই জীবন মোর ঘুরিয়া বেড়াই দূরে দূরে।
আমার বিশ্বাস, আমি এক গৃহে তে-রাত্তির
করিনি যাপন ;
করেছি জীবিকা তরে কত কাজ—ভবে যার
নাহি প্রয়োজন।
যদি চাও শুনিতেগো খাঁটি কথা, তবে শোনো বলি,
অকেজো এ ভবে যাহা কেজো জেনো তাহাই কেবলি।
তরণী বাহিতে পারি ধীরে ধীরে সরসীর নীরে,
দোলনা দোলাতে পারি কৌশলে তরুশাখা-শিরে।
কবিতা রচিতে পারি রাশি রাশি মুহূর্ত্ত-মাঝারে,
আরো, পারি বাজাইতে বীণা-যন্ত্র মধুর ঝঙ্কারে।

মালতী। এ সব উপায়ে কিন্তু হয় কিগো ক্ষুধার নিবৃত্তি ?

মলয়। বিশ্বাস করিতে ইহা কার হয় সহজে প্রবৃত্তি ?
কথাটা তবুও সত্যি ; নাহি মোর বুদ্ধি সাংসারিক,
কখন্ জুটিবে অন্ন, কিছুমাত্র নাহি তার ঠিক্।
অনেক সময় আমি এই সব হর্ম্ম্য-হতে
দূরে চলি গিয়া
খাইয়াছি ফল-মূল গাছের তলায় বসি'
অরণ্যে পশিয়া।
তরু-লতা হতে আমি পাইয়াছি আদর-যতন,
মানুষের কাছে যাহা পাই নাই কভু গো তেমন !
স্থূল কথা,—অতি অল্প স্থান আমি করি অধিকার,
অল্প কিছু পাইলেই ভাবি—হ'ল যথেষ্ট আমার।

কখন কখন আমি　　ধনীর ভবনে প্রবেশিয়া
ধনীর আহার-স্থলে　　গাহিয়াছি বীণা বাজাইয়া ;
গাহিতে গাহিতে গান　　করিয়াছি দৃষ্টি আমি
লুবধ নয়নে—
পলান্ন পায়স আদি　　রাশি রাশি করে পার
গৃহ-বাসী জনে।
কেহবা বুঝিতে পারি'　　দেখি' মোর লোভের চাহনি,
বলে "ভিক্ষু দৃষ্টি দেয়　　দ্যাও কিছু উহারে এখুনি।"

মালতী। ভাল, শুনিলাম সব ;　　যাইবে নিশ্চয় কি গো
কাশী, হেথা-হতে ?

মলয়। কিছুই নিশ্চয় নাই ;　　যাব বটে আপাততঃ
বারাণসী পথে।
যাইতে যাইতে যদি　　অন্য কোন পথ দেখি
আরো মনোরম,
তবে সেই পথ ধরি'　　যাব চলি যেথা হবে
মনের মতন।
মনের খেয়াল মোর　　একমাত্র ভ্রমণের নেতা,
ঝরা-পাতা, মেঘ-সম　　ভ্রমি আমি হেথা হোথা সেথা।
কোথা হতে আসিয়াছি　　কোথা যাব, কিছু নাহি জানি,
জানি গো আকাশ শুধু　　খ্যাপা ভোলা মুগ্ধ কবি আমি।
মুক্ত বায়ু-তরে শুধু　　প্রাণ মোর উঠে আকুলিয়া
আকাশের পাখী সম　　ভ্রমি যেন উড়িয়া উড়িয়া।
একবার যে শুনেছে　　আমার গানের ধুয়া
নাহি শুনে আর ;
একবার মাত্র থামি　　কুড়াইতে বন-ফুল
—সাজাতে সেতার ;
আবার চলিতে থাকি ;　　কে না দেখিয়াছে রাতে
পথিক বালকে

গলি-ঘুঁচি সুঁড়ি-পথে   —যাহা শুধু আলোকিত
জোনাকি-আলোকে।
যখন বরষে' মেঘ   তরুপত্র-পুঞ্জ-তলে
থাকি দাঁড়াইয়া;
তার পর চলি পুন,   টস্ টস্ ঝরে জল
শরীর বাহিয়া;
উঠে যেথা ইন্দ্র-ধনু   সেইদিকে ছুটিগো অচিরে;
লক্ষ্মীরে পেনু না কভু   অযাচিত পাই প্রকৃতিরে!
তীর্থ-যাত্রী-সম চলি   সমুদিত শশাঙ্কের তলে,
তৃষ্ণা নিবারণ করি   কলনাদী স্রোতস্বিনী-জলে;
স্বল্প-তোয় খাল-নালা   অক্লেশে হাঁটিয়া হই পার;
চলিয়াছি ক্রমাগত   তবু শ্রান্তি না হয় আমার।

মালতী। হেন উনমত্ত-ভাবে   পথ দিয়া চলিতে চলিতে
থামিবার ইচ্ছা তব   কখন কি হয় নাই চিতে?
ফিরিয়া পথের বাঁক্   তব দৃষ্টি-পথে কি গো
পড়েনি কখনো
তাল-তমালের নীচে   কোন এক ক্ষুদ্র গৃহ
—শান্তির সদন?
ঘুমায় দুয়ারে যেথা   ধীর শান্ত পুরাতন
কুক্কুর একটি;
সে গৃহ-গবাক্ষে, কভু   দেখনি কি চাঁদ-মুখ
—কোন ক্ষীণ কটি?

মলয়। কচিৎ কখন; কিন্তু   ঝোপের মাঝারে যথা
ছুঁড়িলে প্রস্তর
বেরোয় সাপের ঝাঁক্—   শুনি মোর প্রেম-গান
আসিত বিস্তর
গুরু ও পিতার দল   বাহির হইয়া সবে
ভবন হইতে;

আমার এ বেশ দেখি'   তাদের না হত রুচি
          ভিতরে ডাকিতে।
উত্তরেরি ভিন্ন রুচি,   তাহাদেরো করিতাম
          আমি পরিহার,
বিশেষতঃ গৃহ-শান্তি   করি ভঙ্গ, এ ইচ্ছা
          ছিল না আমার।

মালতী। মুচকি মুচকি হাসি'   করিলে সুন্দরী কোন
          পুষ্প বরিষণ
মানস-কমল তব   হ'ত নাকি বিচঞ্চল
          —আনন্দে মগন?

মলয়। কি আর হইবে তাহে?   উদ্দেশে চুম্বন শুধু
          শূন্য-পথে দিতাম ছাড়িয়া,
তার পর আর কিবা? শোনো বলি, মোর কাছে
          স্বাধীনতা সব-চেয়ে প্রিয়া।
হত যদি ভালবাসা   লঘুচিত্তে না হইত
          এ মোর ভ্রমণ
কাঁধে লয়ে শুধু কাঁথা,   হস্তে শুধু বীণা খানি
          করিয়া ধারণ।
হৃদয়ে থাকিলে প্রেম,   সে বোঝা বহন করা
          বড়ই বিষম!

মালতী। তুমি যে পাখীর মত   কেহ কি পারে না তোমা
          পূরিতে পিঞ্জরে?

মলয়। কাহারো নাহিক সাধ্য!

মালতী।   পশিবে না কোনো দিন
          বাসার ভিতরে?

মলয়। ভাল বাসা-বাসি—তাহে   বড়ই আশঙ্কা হয় মম;
তুমি তো বোঝোনা, দেখ,   লঘুপক্ষ প্রজাপতি-সম

কভু বসি কভু যাই কভু আসি ফিরিয়া আবার
ইহাতে কেমন সুখ! করি আমি যা ইচ্ছা আমার।
মালতী। নাহি ওতে কোন সুখ; এই ভাবে তুমি তবে
যাইতেছ কাশী?
কোন আশা নাহি জাগে তোমার হৃদয়-মাঝে?
—নিতান্ত উদাসী?
"এ পথে যাইতে ভাল; উড়িয়া যাইছে হোথা
বলাকার পাঁতি,
যাই উহাদেরি পিছে; কিম্বা থাকি এইখানে
কি সুন্দর রাতি!"
—এইরূপ ভাবি' বুঝি যেথায় যখন যায় প্রাণ
অদৃষ্টের হাত ধরি' সেখানেই কর গো প্রয়াণ?
মলয়। প্রায় সেইরূপই বটে;
মালতী। সম্পূর্ণ নহে কি তাই?
আছে তবে আর কিছু কল্পনা মনে?
মলয়। সে এখন অনিশ্চিত!
মালতী। তবু বল দেখি শুনি।
মলয়। কাল যা' ঘটিবে তা' বলিব কেমনে?
মালতী। আচ্ছা ভাল, আমা হতে —তোমার সে কাজটিতে—
হতে পারে সাহায্য কি লেশ?
মলয়। সাহায্যে নাহিক কাজ; হয়তো গো হেথা হতে
দূরে না যাইব অবশেষ।
শোনো বলি, আমার মাথায় আসিয়াছে একটি গো
কল্পনা নবীন!
—আমা-সম কত আছে অসহায় নিরাশ্রয়
পিতৃ মাতৃ হীন—
আমি কে, জানিনা আমি কৃষকের পুত্র কিম্বা
রাজার কুমার,

এইমাত্র জানি আমি　　শুভক্ষণে হইয়াছে
জনম আমার।
আমার মস্তিষ্ক-মাঝে　　অবিরত জ্বলে যেই
আনন্দ-আলোক
—ভাবিতে দেয় না মোরে　　আমি কোনো নিরাশ্রয়
অনাথ বালক।
এতদিন হেথা-হোথা　　করিয়াছি ছুটাছুটী
অনর্গল মৃগ-শিশু-সম ;
আপনি আপন প্রভু　　—এ-হতে অধিক কিছু
চাহি নাই সুখের জীবন।
কিন্তু ঠাকুরাণি, আমি　　লুকাব না তোমা হতে
এই মাত্র সহসা যা' হয় মোর মনে ;
তব মিষ্ট কথা শুনি'　　তোমা-প্রতি ধায় মন
কিবা এক মধুময় স্নিগ্ধ আকর্ষণে !
বুঝিনু প্রসাদে তব　　—লোক-দৃষ্টি হতে দূরে
আছে এক শান্তির সদন ;
—একটি গো ক্ষুদ্র গৃহ　　—চামেলি-লতায় ঢাকা
যাহার গো প্রাচীর-বেষ্টন।
আজি এ প্রথম দিন　　শ্রান্ত হইয়াছি আমি
আর কভু শ্রান্তি মোর হয় নাই লেশ ;
সম্পূর্ণ তোমারি হাতে　　সঁপিনু গো আপনারে
যাহা ভাল, মোরে তুমি কর উপদেশ।
(স্বগত)　এমন রূপসী যে গো　　হৃদয়ো দয়ার্দ্র তার
হইবে অবশ্য !
(প্রকাশ্যে)　পরীক্ষা করিবে-গো　　—বনের বিহঙ্গ কভু
হয় কি না বশ্য ?
শোনো বলি, তেয়াগিব　　মোর এই উচ্ছৃঙ্খল
ভ্রমণ এখনি ;

যাপিব জীবন শুধু বসি' ওই পদতলে
দিবস রজনী।
ওই পদতলে বসি' গানে করিব গো তব
চিত্ত-বিনোদন ;
অলস কল্পনা কত জাগিয়া উঠিবে তব
প্রাণে অনুক্ষণ।

মালতী। নিতান্তই শিশু তুমি !
(স্বগত) কেন এই উদ্বেগ বিষম ?
—কেন এই ভয় ? ওকে পাব যে গো কাছে অনুক্ষণ !
আদরে যতনে ওকে রাখিব গো সতত ঘিরিয়া
নিত্য নব ফুল-মালা দিব ওর কণ্ঠে পরাইয়া।
প্রেয়সী বলিয়া মোরে করিবে গো সম্বোধন যবে
মিটিবে প্রাণের সাধ, কেন চিন্তা করিস্‌রে তবে ?

মলয়। শুনিলে বলিনু যাহা ?— কি ইচ্ছা এবে তব শুনি ;
মালতী। (স্বগত) নানা, মোর নাহি ইচ্ছা, কিন্তু ও-যে চাহিছে আপনি।
মলয়। জানি ওগো ঠাকুরাণি ! তোমাকাছে করিয়াছি
আমি কিছু অধিক প্রার্থনা ;
তথাপি জানিতে চাহি—
মালতী। (স্বগত) কল্যই জানিবে ও যে
সুনিশ্চিত আমি কোন্ জনা।
মলয়। পার কি রাখিতে মোরে ?—জিজ্ঞাসি গো এই শেষ বার ;
মালতী। শোনো, আমি পারিব না।
মলয়। পারিবে না ?—কি হেতু তাহার ?
মালতী। ভুল বুঝিয়াছ তুমি, আমি সে মহিলা নই
তুমি যা' ভাবিছ মনে মনে ;
রাণীর মতন যেগো —সেই তো রাখিতে পারে
তোমা-হেন কবিগুণী-জনে।

আমি নারী দীন-হীন নাহি মোর ধন-জন-মান ;
না আছে বাহন দাস না আছে গো কোন ধূমধাম।

মলয়। কি!—নাহি একটি দাস ?

মালতী। দাসীও একটি মোর নাই!
ভূতলে শয়ন করি শুধু কিছু ফল-মূল খাই।

মলয়। তবু কৃপা করি যদি—

মালতী। শোন বলি, আমি পারিব না।

মলয়। যদি মোরে—

মালতী। শোনো বলি, একা আমি—বিধবা ললনা।

মলয়। না চাহি অপর কিছু —থাকিব ও চরণের নীচে

মালতী। অসম্ভব, অসম্ভব ; কেন এই অনুরোধ মিছে ?

মলয়। মিটিল না মন-সাধ নিতান্তই অদৃষ্ট বিমুখ ;
মালতীর গৃহে যাই দেখি যদি সেথা মেলে সুখ।

মালতী। (স্বগত) কি বলিল ?—করে যে গো মালতীর নাম!
যদি গিয়া করে পুন আমারি সন্ধান ?

মলয়। শুনিনু যা' তব মুখে, তাহার বুঝিনু এই সার
—না পাব রাখিতে আমি ও-পদে এ জীবনের ভার।
কি আর বলিব বল,- সব আশা হ'ল মোর হত ;
ভাল, কিছু নাহি পার পরামর্শ দিবে কি অন্তত ?
আছে এক নারী কোন কাশীধামে—লোক-মুখে শুনি,
এড়ায় কাহার সাধ্য তাহার সে শকতি মোহিনী!
একটি কটাক্ষে তার কি যেন কি মন্ত্রগুণ-বলে
বিহ্বল হইয়া সবে লুটাইয়া পড়ে পদতলে!
তোমারি মতন সেগো পাণ্ডুবর্ণ—সুন্দর আকৃতি ;
—যেরূপ বর্ণনা শুনি— আর তার নামটি মালতী।
আরো, লোকে বলে এই— কাটে তার জীবন বিলাসে ;
মিশিতে আমোদে তারি নিশি-দিন কত লোক আসে।

সঙ্গীত-রসজ্ঞ সে যে— লোক-মাঝে আছে গো বিদিত ;
বিশেষ, নিপুণ হস্তে বীণা যদি হয় গো বাদিত।
বলিতেছিলাম তাই যাব আমি তাহার নিকটে,
দেখি যদি সেথা গিয়া ভাগ্যে কিছু সুখ মোর ঘটে।
তাহার প্রাসাদে গিয়া করিব গো দাসত্বের বৃত্তি
—দাসত্ব ভাবিলে কিন্তু বিদ্রোহী হইয়া উঠে সমস্ত প্রবৃত্তি—
আরো, শুনি লোক-মুখে অপূর্ব্ব সে রূপের প্রকাশ ;
থাকিলে তাহার পাশে বিষাক্ত হয় গো নিঃশ্বাস !
তাই মোর ভয় হয় ; —বল তবে, কি করি এখন ?
—তোমারি উপরে আমি করিয়াছি বিশ্বাস স্থাপন ?
করিলেও প্রত্যাখ্যান— করিয়াছ মধুর বচনে,
মনে হয়—ই স্তুতঃ করিছ এখনো মনে মনে।
কি জানি কিসের লাগি এ বিশ্বাস করে মোর প্রাণ
—আমার উপরে তব আছে যেন একটুকু টান।
তাই মনে হয় মোর —উপদেশ তব মুখ-হতে
সুখ-শান্তি দিবে আনি এই মোর জীবনের পথে।
কি আদেশ বল তবে —বল, তাই করিব এখন
যাব কি যাবনা আমি সেই সেথা—মালতী-ভবন ?

মালতী। (স্বগত) বুঝিলাম সব ; ওযে ফিরিয়া আসিবে কাল হেথা ;
—ওই পান্থ যেগো মোর হৃদয়ের নিভৃত দেবতা ;
—অজানা অতিথি ওই যারে হেরি' বিগলিত
হৃদয় আমার,
বিধির বিপাক-বশে আমারি নিকটে ফিরি'
আসিবে আবার ?
মূর্ত্তিমান সুখ মোর আহা চলি' যায় হেথা হতে।
—যাই ওর পিছে পিছে ; না না তা' হবে না কোন মতে।
কিন্তু যে পারিনে আর চাপিতে এ গোপন বাসনা ;
ইচ্ছা হয় এখনই গো—

মলয়।　　　　　　　　　　　　　কি কারণে নীরব বল না ?
মালতী। (স্বগত)　এ যদি গো পাপ হয়　—এ পাপ তো ঘটাইছে বিধি !
(প্রকাশ্যে) ইচ্ছা হইতেছে তব　যাইতে সেথায় ?—ভাল, যদি—
মলয়।　যাব কি সেথায় তবে ?
মালতী। (কিছুকাল নীরব থাকিয়া, পরে চেষ্টার বলে) যেওনা গো যেওনা সেথায় ;
না না না, যেওনা সেই　পাপিনীর পাপের বাসায়।
তুমিতো বুঝনা কিছু　তুমি অতি সরল-হৃদয়,
এটুকুও নাহি জ্ঞান　সেথা কত বিপদের ভয়।
না পারিনু আমি বটে　করিবারে কিছুমাত্র
তব উপকার ;
নাাবমু আশ্রয় দিতে　—কুটীরে পেয়েছ যাহা
তুমি কত বার ;
আর কিছু নাহি পারি　আমি ফেলিব না তোমা
বিপদের হাতে ;
তুমি যে বনের শিশু　—চলিয়াছ প্রতিধ্বনি
জাগাতে জাগাতে
কেমন স্বাধীনভাবে　অরণ্যের বিহঙ্গের মত'
—চলন্ত জলদ-সম　—যেন কোন নির্ঝরিণী-স্রোত।
পাপিয়া কোকিল-সম　গাও তুমি বনের গভীরে,
কপোলটি আর্দ্র তব　প্রভাতের বিমল শিশিরে ;
সেই তুমি পাপিনীর　পাপ-গৃহে করিবে প্রবেশ ?
—জ্বলন্ত উৎসব যেথা　নিশীথেও নাহি হয় শেষ।
ও-তব কোমল ওষ্ঠ　সুবিমল শিশুর সমান
ম্লান হবে, পাত্র হতে　উচ্ছিষ্ট মদিরা করি' পান ?
ও-নেত্র-কমল তব　শুষ্ক হবে রাত্রি-জাগরণে ?
তরুণ মুখের বর্ণ　ম্লান হবে পাপের কিরণে ?
যাবে মালতীর গৃহে ?　—না-না সেথা পাবে না যাইতে ;
সত্য বটে গাহি' গান　পাবে সেথা থাইতে—থাকিতে।

কিন্তু দেখ ভাবি' মনে — সে গৃহটি কাহার ভবন,
কাহার উচ্ছিষ্ট তুমি — সেথা গিয়া করিবে ভোজন।
বলিনু কঠোর কথা — —করিবে গো আমারে মার্জ্জনা;
বলিনু—কেননা আমি — করি তব মঙ্গল কামনা।
না-না ওগো থাকো তুমি — অরণ্যের বিহঙ্গের মত'
ভ্রমর-গুঞ্জন-সম — বীণাটি বাজাও অবিরত।
নৈশ গগন যদি — ছায় কভু গভীর তিমিরে
আশ্রয় লইও গিয়া — কোন এক চাষার কুটীরে।
প্রভাত হইলে পুন — আবার ভ্রমণে হয়ো রত;
কোন গ্রামে গিয়া যদি — দ্যাখ কোন কন্যা মনোমত
—সুশীলা লাজুক মেয়ে— — আর যদি ঘটে গো মিলন,
তাহলেই চিরকাল — সুখে তব কাটিবে জীবন।

মলয়। পালিব তোমার আজ্ঞা; — কিন্তু দেখ, নহে অসম্ভব
—মালতীর নামে রটে — এই সব মিথ্যা জনরব।
তার ভবনের কথা — আমি যাহা করেছি শ্রবণ
তাতে তো না মনে হয়, — তার গৃহ ঘৃণিত এমন!
তাও বলি, আমি কভু — যেতাম না তাহার ওখানে
যদি আমি জানিতাম—

(মালতীর মুখে কষ্টের ভাব লক্ষ্য করিয়া)

ঘা দিনু কি বেদনার স্থানে?
মার্জ্জনা করিবে মোরে— — বুঝিয়াছি আমি অনুমানে,
বিচ্ছেদ-অনল কোনো — এখনো গো জ্বলে তব প্রাণে।
বুঝিবা মালতী সেই — তোমা-হতে করেছে হরণ
ভাই কি বল্লভ কোন — যে তোমার ছিল প্রিয়তম!
তাহাই নহে কি সত্য? — —এতক্ষণে বুঝিলাম

করিবে মার্জ্জনা—

মোর তরে নহে শুধু — —নিজেরো লাগিয়া তব

হয়েছে ভাবনা।

মালতী। (অতীব বিষণ্ণভাবে)

না গো না বুঝেছ ভুল,　　　　সত্য নহে তোমার সন্দেহ,
তাই কি বল্লভ কোন　　　　এ সংসারে নাহি মোর কেহ।
তবে যে দেখিছ তুমি　　　　মুখে মোর কষ্টের লক্ষণ
—সে শুধু মালতী-তরে　　　　ব্যথায় ব্যথিত মোর মন।
জানি আমি মালতীরে　　　　সময়-বিশেষে পারে
হ'তে সে উদার
সরল নির্দ্দোষ-মতি　　　　যুব-জনে হয় তার
দয়ার সঞ্চার ;
কিন্তু এই ভাব তার　　　　স্থায়ী নাহি হয় বহুক্ষণ,
লালসার বশে পুন　　　　নিজ মূর্ত্তি করয়ে ধারণ।
যাও তবে, এ বিশ্বাস　　　　থাকে যেন তোমার অন্তরে,
যা দিলাম উপদেশ　　　　তোমারি সে মঙ্গলের তরে।
করিনু কর্ত্তব্য মোর　　　　নিষেধিয়া আমি গো তোমায়,
এখন—এখন তবে　　　　যাও চলি লইয়া বিদায়।

(মনের কষ্ট চাপিয়া) আমি যে বলিনু তোমা　　　　না যাইতে মালতীর স্থানে
জান না গো তুমি পান্থ　　　　কি কষ্ট হয় মোর প্রাণে,
তুমি কি বুঝিবে বল ?　　　　বোঝো তুমি—সে ইচ্ছাও নাই,
এইটুকু জেনো মাত্র　　　　তোমারি মঙ্গল শুধু চাই।

(স্বগত) এই শেষ—আর নয় ;　　　　আহা যদি বুঝিত গো
আমিই সে জন!

মলয়। যাইব না আমি তথা　　　　তুমি যবে দুষ্টা বলি,
করিছ বর্ণন।
বিদায় হই গো তবে ;　　　　ভ্রমণে যে হ'ত সুখ
আর আমি তাহা পাইব না ;
বুঝিয়াছি, এখানেই　　　　সুখ-শান্তি সব মোর
—কিন্তু তারো নাহি সম্ভাবনা।

লয়ে যাইতেছি সঙ্গে অস্পষ্ট একটু শুধু
সুখের আভাস;
এই প্রত্যাখ্যানে, তব কিছু যেন আর্দ্রভাব
দেখিনু প্রকাশ।
যদিও নিঠুর হয়ে না করিলে পরাণের
বাসনা পূরণ,
একটু কষ্টও যদি হয়ে থাকে মোর তরে
—দাও নিদর্শন।

মালতী। (আবেগ-ভরে একটি অঙ্গুরী প্রদান)
এই লও রাখ তুমি, এই অঙ্গুরীটি দেখি'
হইবে স্মরণ—

মলয়। না না ঠাকুরাণি, আমি লইব না ও অঙ্গুরী
মূল্যবান অতি,
দুর্লভ সামগ্রী ও যে, বৃহৎ হীরক-খণ্ড
উদ্‌গারিছে জ্যোতি।
না না না—ও অঙ্গুরীটি কিছুতেই আমি লইব না;
ও গো! তুমি তবে নাকি দীন হীন বিধবা ললনা?

মালতী। (স্বগত)
কে আমি—কিছু কি তার পাইয়াছে ইঙ্গিৎ আভাস?
জীবন-কাহিনী মোর ইহাতে কি হইল প্রকাশ?
জানিতে পারিল কি ও কোথা হতে পেনু আমি
জঘন্য এই উপহার?
আছে গো নীরব হয়ে, —ওর ওই চাহনিতে
নত হয় আঁখি যে আমার!
(প্রকাশ্যে) কি চাহ বল গো তবে—কি তোমারে করিব প্রদান?

মলয়। স্মৃতি চিহ্ন শুধু চাহি—নহে কোন ভিক্ষা সারবান।
একটু সামান্য কিছু —যে সামগ্রী নিতান্তই
নিজস্ব তোমারি—

বিমর্ষ ফুলটি ওই   যাহা তব কেশ-পাশে
আছে যেন মরি' !

মালতী। (ফুলটি দান করিয়া)

আচ্ছা দিনু, লহ তুমি,   দেখিবে গো কালিকে প্রভাতে
শুখায়েছে গোলাপটি   থাকিয়া তোমার হাতে-হাতে।
আমি চাহি যেন এই ফুলের মরণে
মোর উপদেশ, তব আসে গো স্মরণে।
আর দ্যাখ, শুকাইলে   এই ফুল, ভুলিও আমায়।

মলয়। (সবেগে মালতীর নিকট গমন, মালতীর পশ্চাতে অপসরণ)

আর একটি কথা আছে   —তাহা বলি' হইব বিদায়।
চলিনু অনন্ত পথে   —ভয়ে তাই হই কম্পমান ;
এ পথে আর তো আমি   —না পাইব শান্তির আরাম।
বল কোন্ পথে যাব,   তুমিই তো নেতা মোর
—কর উপদেশ।
সেই দিকে যাব আমি   যে দিকে করিবে তুমি
অঙ্গুলী নির্দ্দেশ।

মালতী। (ইতিপূর্ব্বেই সিঁড়ির কতক ধাপ উপরে উঠিয়া ছিল—এক্ষণে বারাণসী নগরীর বিপরীত দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া)

যাও তবে পান্থবর   —যাও চলি একেবারে
পূর্ব্ব দিক পানে।

(মলয় মালতীর দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হওয়ায়, মালতী হস্তের ইঙ্গিতে তাহাকে নিবারণ করিয়া, ও নৈরাশ্যের ভাব মুখে ব্যক্ত করিয়া, সহসা প্রস্থান)

৩ দৃশ্য।

মালতী। (বারান্দায় কিছুক্ষণ থাকিয়া, গরাদের উপর কুনুই রাখিয়া, যতক্ষণ দৃষ্টি যায় মলয়কে অবলোকন—পরে মলয় দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, হতাশ হইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ)

কন্দর্পের হোক্ জয়! অশ্রু পুন দেখা দিল
এ পোড়া নয়ানে!

সমাপ্ত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সুন্দরী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বাহিরে রৌদ্র উঠিল। বাগান হইতে ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। হরিহর বাবু পুনরায় সংবাদপত্র হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। পড়িতেছিলেন না—শুধু অন্যমনা হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন এবং পাতা উল্টাইতেছিলেন। সীতানাথ ভাবিতে লাগিলেন, এখনও ত আসল কথা উত্থাপিত হইল না—বাবু আবার সংবাদপত্র হইতে অন্য প্রসঙ্গ না পাড়িয়া বসেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেয়েটি আপনার কত বড় হল ?"

হরিহর বাবু সংবাদপত্র নামাইয়া বলিলেন—"আমার মেয়ে ? এই মোটে দশ বছরে পড়েছে।" সীতানাথ বাবু বলিলেন—"ওঃ—তা হলে ত বালিকা।"

"বালিকা বৈ কি ! এখনও বিবাহের কিছুই তাড়াতাড়ি নেই।"

সীতানাথ একটু আশ্বস্ত হইলেন, ইহা তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুকূল। একবার ভাবিলেন, বাল্যবিবাহ যে কিরূপ দোষাবহ, তাহার আলোচনা করি। তাহার পর মনে হইল, সেটা অত্যন্ত অদ্ভুত শোনাইবে। আসিয়াছি বিবাহের সম্বন্ধ করিতে—এ অবস্থায় ও প্রকার কথা কহিলে হরিহর বাবুর মনে হঠাৎ সন্দেহের উদয় হইতে পারে—তিনি ভাবিতে পারেন আমার মনে বুঝি কিছু মৎলব আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাদের নবগোপালকে দেখেছেন ?"

"দেখেছি, সম্প্রতি দেখিনি। তিন চার বৎসর হল, একবার কলকাতায় কান্তির সঙ্গে তাকে দেখেছিলাম।"

সীতানাথ বলিলেন—"খাসা ছেলে, যেন কার্ত্তিক।" হরিহর বাবু এই

পৌরাণিক উপমা শুনিয়া একটু মৃদু হাস্য করিলেন। বলিলেন—"আজকাল দেনা পাওনা নামক একটা নূতন উপসর্গ বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। সে সম্বন্ধে কান্তিচন্দ্র তোমাকে কিছু বলেছেন?"

"তা বলেছেন বৈ কি! আপনি বড় ঘরের ছেলে, নজর উঁচু, অলঙ্কার, দান সামগ্রী টাকা কড়ি সম্বন্ধে আপনি স্বেচ্ছায় বিচার করে যা দেবেন, তাই তাঁর গ্রহণীয়। সে বিষয়ে কিছু বক্তব্য নেই। শুধু তাঁদের একটা কৌলিক প্রথা আছে, কিছু ভূসম্পত্তি যৌতুকস্বরূপ জামাতাকে দিতে হবে।"

হরিহর বাবু বলিলেন—"সে উত্তম কথা। কিছু ভূসম্পত্তি জামাতাকে যৌতুক দেওয়ার কল্পনা অনেকদিন থেকে আমারও মনে আছে। তার জন্যে আটকাবে না।"

সীতারাম মনে মনে ভাবিলেন—আটকায় কি না দেখা যাবে। অথচ একটু আশঙ্কাও হইল। বলিলেন—"আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন।"

হরিহর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রকম ভূসম্পত্তি কান্তিবাবুর মনোমত তার কিছু আভাষ দিয়েছেন?"

"তা দিয়েছেন বৈ কি!

"কি?"

"তিনি চান, আপনি সুন্দরবনে আপনার জমিদারীর অংশটা জামাতার নামে লেখাপড়া করে দিন।" বলিয়া সীতানাথ সোৎসুক দৃষ্টিতে হরিহর বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

হরিহর বাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"সুন্দরবনের জমিদারিটা আমার কত বিঘের জান?"

সীতানাথ বিলক্ষণ জানিতেন। জমিদারীর বিস্তৃতি, তাহার আয়ের পরিমাণ, গভর্ণমেন্টকে দেয় খাজনা প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার নখাগ্রে

ছিল। কিন্তু মিথ্যা করিয়া, বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন—"না, তা ত জানিনে।"

"আচ্ছা, একটা আন্দাজ কর দেখি।"

সীতানাথ ভাবিতে লাগিলেন। মুখের ভাবটা অত্যন্ত বোকার মত করিয়া বলিলেন—"কত? হাজার বিঘা হবে কি?"

"হাজার বিঘে হলে আমি তা জামাইকে লেখাপড়া করে দিতে ইতস্ততঃ কর্‌তাম না।"

এ কথা শুনিয়া সীতারায়ের মনে উৎসাহের সঞ্চার হইল। ভরসা হইল। বলিলেন—"ওঃ—তা হলে বিস্তর বিষয় বোধ করি!"

"আট হাজার বিঘে।"

"অ্যাঁ! বলেন কি! আট হাজার বিঘে?"

"আট হাজার বিঘে।"

"অত হবে তা জান্‌তাম না। আমাদের কান্তিবাবুরও সুন্দরবনে প্রায় হাজার দশ বিঘের জমিদারী আছে কি না। খুব লাভের বিষয়।"

"এখন আর কি লাভ? ক্রমে জঙ্গল সাফ করিয়ে, প্রজা বসিয়ে চাস বাসের বন্দোবস্ত করতে পারলে পরে অনেক লাভ দাঁড়াতে পারে বোধ হয়।"

"তা সে রকম বন্দোবস্ত কিছু হাতে নিয়েছেন না কি?"

"নিয়েছি বৈ কি,—এর জন্যে বিস্তর টাকা ফেলেছি।"

এ সমস্তই সীতারায় অবগত ছিলেন। সে সমস্ত চাপিয়া বলিলেন—"তাই ত!"—অর্থাৎ ভাবটা যেন—"তা হলে আর কি করে দেবেন!"

হরিহর বাবু শেষে বলিলেন—"কান্তি বাবু যদি ভূসম্পত্তি চান তা হলে অন্য কোনও একটা তালুক আমি নবগোপালের নামে লেখা পড়া করে দিতে প্রস্তুত আছি। কোনও একটা ভাল তালুক যেমন পলাশ কি বারভুঁই কি কাটিয়ারি যেটা তাঁর ইচ্ছা হয়।"

সীতানাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ ! সুন্দরবনের জমিদারীটা হাতছাড়া করা তা হলে নিতান্তই আপনার অনভিমত। তা ত হতেই পারে। অতটা বিষয়—বিশেষ যখন অত টাকা ফেলেছেন !"

হরিহর বাবু বলিলেন—"সেইটি কান্তিকে বুঝিয়ে বোলো। শুধু অতটা বিষয় বলে যে তা নয়। আমার ঐ এক মেয়ে, ছেলে পিলে নেই,—আমার বিষয়ের অধিকাংশই আমার মেয়ে জামাই পাবে আমার অবর্ত্তমানে। সুন্দরবনেরও বিষয় এক সময় আমার জামাই পাবে, তা না হয় এখুনি দিতাম। কিন্তু ঐ বিষয়টার উন্নতি করার জন্যে আমার মাথায় অনেক কৌশল আছে, তার জন্য ঢের টাকা খরচ করেছি, ঢের টাকা আরও খরচ করব। এখন যদি ও বিষয় আমি হস্তান্তর করি, তা হলে আমার যা সব মৎলব আছে সে আর কিছুই পূর্ণ হবে না। যা আরম্ভ করেছি, তা শেষ হবে না—সব পণ্ড হয়ে যাবে।"

হরিহর বাবুর এই উক্তির মধ্যে একটা স্থান তীক্ষ্ণবুদ্ধি সীতা রায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। হরিহর বাবু ক্ষান্ত হইবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল্লেন যে অধিকাংশ বিষয়ই আপনার মেয়ে জামাই পাবে, আপনার যদি আর সন্তানাদি ঈশ্বর না দেন, তা হলে ত সব বিষয়ই আপনার মেয়ে জামাইয়ের পাবার কথা,—অধিকাংশ কেন ?"

হরিহর বাবু হাসিয়া বলিলেন—"সে আমার একটা কল্পনা আছে।"

সীতানাথ বলিলেন—"বলতে বাধা আছে কি ?"

হরিহর বাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"বাধা কিছুই নাই। আমার ইচ্ছা আছে, আমার বিষয়ের কিয়দংশ বিক্রী করে, কোনও একটা দেশহিতকর কার্য্যের জন্যে ব্যয় করে যাব।"

সীতা রায় শুনিয়া সম্ভ্রমের স্বরে বলিলেন—"এ খুব সাধু সংকল্প। আপনি অতি মহাত্মা লোক। কি রকম কার্য্যের জন্যে ব্যয় করবেন

"না,—তা এখনও স্থির করিনি। তবে কি রকম কার্য্যের জন্যে ব্যয় করব না—তা স্থির আছে।"

কৌতূহলের সহিত সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রকম ?"

"কোনও দেব সেবায় নয়। ব্রাহ্মণ সেবায় নয়। মঠের মোহন্তের সেবায় বা আর কোনও ঐ রকম কার্য্যের জন্যে নয়।"

সীতানাথ হাসিয়া বলিলেন—"কেন দেবতারা কি অপরাধ করলেন? তাঁদের প্রতি অত বিমুখ কেন ?"

"অপরাধ কিছু করেন নি। এতদিন বরাবর জাতীয় দানশীলতার বেশী অংশ তাঁরাই পেয়ে এসেছেন। তাঁরা এখন বড় লোক—ঘি দুধে বেশ হৃষ্ট পুষ্ট। দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রজচ্ছেশ্বরে ধনম্! নরলোকের অভাব বিস্তর। আমার যা দু চার পয়সা আছে—তারই থেকে কিছু আমি তাদের অভাবের পূরণার্থে দিয়ে যাব। আমার দানে যে তাদের অভাব মোচন হয়ে যাবে তা নয়,—তবে যৎসামান্য যা একটু হয়। আমাদের দেশের অপুত্রক ধনী লোকেরা, দত্তক পুত্র গ্রহণ না করে যদি এই রকম দেশের অভাব মোচনের জন্যে তাঁদের ধন বিতরণ করে যান, তা হলে কত কায হয়। তা ত তাঁরা করবেন না। পোষ্যপুত্র গ্রহণ করবেন—ব্যাপার কি,—না বংশ বজায় থাকবে—নাম বজায় থাকবে। যদিও নাম বজায় থাকবে কি নাম ডুববে তার কিছুমাত্র স্থিরতা থাকে না। সে ছেলে যে এর পরে কত বড় মাতাল বদমায়েস হয়ে দাঁড়াতে পারে,—তাঁর প্রজাদের কি রকম উৎপীড়ন করে নাস্তানাবুদ করতে পারে,—তাঁর বিষয় ওড়াতে পারে,—তা তাঁরা কখনও ভাবেন না।"

সীতানাথ বলিলেন—"আপনি যে সব আশঙ্কার কথা বল্লেন, তা ত স্বাভাবিক পুত্র সম্বন্ধেও সমান খাটে।"

হরিহর বাবু উৎসাহের সহিত বলিলেন—"তা খাটে বৈ কি।

ইউরোপে অনেক চিন্তাশীল মহাত্মা,—নির্ব্বিচারে পুত্রের পিতৃধনে উত্তরাধিকারী হওয়ার বিরুদ্ধে মত ঘোষণা করেছেন।”

“ও মত কেউ কার্য্যে পরিণত করে বিশ্বাসের সম্মান রক্ষা করেছেন?”

“কত লোক। এই ত শোনা যাচ্চে বহুকোটিপতি কার্ণেগি নিজের সন্তানদের জন্যে যৎসামান্য কিছু রেখে,—বাকী সমস্ত ধন পৃথিবীর উপকারার্থ দিয়ে যাবেন।”

“খুব ত্যাগ স্বীকার ত!”

“ওর চেয়েও বেশী ত্যাগ স্বীকার লোকে এই মতের জন্যে করেছে। শেলি বলে ইংলণ্ডে একজন মহাকবি জন্মে ছিলেন। তাঁরও এ বিষয়ে এই রকম মত ছিল। কোন কারণে তিনি তাঁর আত্মীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হন। তিনি খুব দরিদ্র অবস্থায়, অন্ন বস্ত্রের ক্লেশে জীবন যাপন করছিলেন। এই সময় তাঁর পিতামহ বলেন,—তোমাকে বাৎসরিক দু হাজার পাউণ্ড—অর্থাৎ ত্রিশ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি এখনি দিচ্চি, কিন্তু এই সর্ত্তে যে তুমি তোমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে সে সমস্ত মূল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যাবে। শেলি বল্লেন—কি! আমি যাকে জানিনে—সে যেমন মনুষ্যসমাজের ভূষণও হতে পারে,তেমনি তার কলঙ্ক স্বরূপ হয়ে দাঁড়াতেও কিছুমাত্র আটক নেই—এত সম্পত্তি—পরিশ্রমের উপর এতটা প্রভুত্ব,—আমি তাকে দিয়ে যেতে প্রতিশ্রুত থাকব!—শেলি ঘৃণাভরে তাঁর পিতামহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।”

সীতারাম মনে মনে ভাবিলেন “আচ্ছা আহাম্মুখ ত!” প্রকাশ্যে বলিলেন “হ্যাঁ, তা ত বটেই তা ত বটেই। এ সব খুব উচ্চনীতির কথা। তবে আমাদের দেশাচার সম্বন্ধেও একটা কথা বলি। আপনি যে বল্লেন বংশ রক্ষা কিম্বা নাম বজায় করবার জন্যে লোকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে যায়, তা ঠিক নয়, ওটা একটা উদ্দেশ্য বটে কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য তা নয়। প্রধান উদ্দেশ্য হচ্চে; পোষ্যপুত্রও ঠিক পুত্রের স্থান

অধিকার করে কি না—পিণ্ডদানের অধিকারী হয়। পরলোক ভেবেই এটা করা। তা সে সব কথা যাক্, সুন্দরবনের জমিদারীটা তা হলে আপনার হস্তান্তর করবার অভিপ্রায় নয় এই শেষ কথা ?"

"শেষ কথা। তবে এ কথাটাও কান্তিকে বোলো ঐ যা বল্লাম যে কোনও একটা ভাল তালুক তাঁর জমিদারীর সংলগ্ন চান—যেখানে চান—আমি নবগোপালকে যৌতুক দিতে প্রস্তুত আছি। যে রকম তাঁর অভিমত হয়, আমায় যেন চিঠি লিখে জানান।"

সীতারায় একবার ভাবিলেন কান্তিকে গিয়া তাহাই বলিবেন। আবার ভাবিলেন, নাঃ অগ্নির শেষ, শত্রুর শেষ, রাখিতে নাই, এ হাঙ্গামা একেবারেই মিটাইয়া যাওয়া ভাল। শেষে যদি হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের মত হইয়াই যায়। মানুষের মন, কিছু ত বলা যায় না। সুতরাং বলিলেন—"কান্তি বাবুকে গিয়ে আমার বলবার আর আবশ্যক হবে না। তাঁর শেষ কথা নিয়েই আমি এসেছি।"

"কি ?"

"ঐ পণে ভিন্ন পুত্রের বিবাহ দিতে তিনি অক্ষম।"

"অক্ষম ?"

"একেবারেই অক্ষম।"

হরিহর বাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন "আচ্ছা তা আর কি করা যাবে, তা হলে আমায় অন্যত্র চেষ্টা দেখতে হবে।"

সীতানাথের মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল—কিন্তু মুখের ভাবটা অত্যন্ত বিষণ্ণ করিয়া রহিলেন।

সীতানাথ সেই দিনই আহারাদি করিয়া হরিহর বাবুর নিকট বিদায় লইলেন, কারণ আশঙ্কা যদি ইতিমধ্যে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তনই উপস্থিত হয়। সাবধানের বিনাশ নাই। [ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

নেটিভ-পীড়ন।

অতি অল্প কয়েক মাসের মধ্যে কয়েকবার উপর্য্যুপরি ফিরিঙ্গী বা ইউরোপীয়ের হস্তে দেশীয়গণের নিগ্রহের কথা সংবাদপত্রে পাঠ করা গিয়াছে; এবং যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে অনুমান হয়, সাহেবলোকের এই রোগটা প্রতিদিনই বাড়িয়া উঠিতেছে। দুই একবৎসর পূর্ব্বেও এই রোগের আতিশয্য এমন প্রবল ছিল না; কদাচিৎ কখন শুনা যাইত, কোন নীল-কর বা চা-কর তাঁহার অধীনস্থ কোন কুলির দুর্ব্যবহারে ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সবুট পদাঘাতে তাহাকে যমমন্দিরে প্রেরণ করিয়াছেন, কিম্বা কোন সদাগর আফিসের বড় সাহেব দুরন্ত ভারতীয় গ্রীষ্মের প্রবল আক্রমণে গলদ্‌ঘর্ম্ম হওয়ায়, মধ্যরাত্রে তন্দ্রাপীড়িত স্খলিত-রজ্জু-হস্ত পাখা-কুলির প্লীহা বিদীর্ণ করিয়া মানসিক উষ্ণতা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়াছেন। কিন্তু বৃটীশ ধর্ম্মাধিকরণের সূক্ষ্ম বিচারে সে জন্য সেই সকল কুলিহন্তা যে কোন দিন কোন প্রকার কঠোর দণ্ড লাভ করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই; ফৌজদারী বিচারের বিপণিতে প্রতিশোধ প্রদানে অক্ষম কুলির জীবনের মূল্য সাহেব প্রভুর সহিষ্ণুতার মূল্য অপেক্ষা অত্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া বরাবরই নির্দ্ধারিত হইয়া আসিয়াছে।

সে জন্য প্রজাসাধারণ আমরা কোন প্রকার অধীরতা বা আক্ষেপ প্রকাশ আবশ্যক জ্ঞান করি নাই, সংবাদপত্রে আমরা সেই সকল পাশবিকতার বিবরণ অব্যাকুল চিত্তে পাঠ করিতাম, এবং সন্ধ্যাকালে পাশার আড্ডায় বা বন্ধু সম্মিলনীতে বসিয়া দেশী তাম্রকূট কিম্বা বিলাতি সিগারেট-ধূম্র উদ্গীরণ করিতে করিতে সেই প্রকার হৃদয়হীন পশ্বাচারকে দৈবদুর্ঘটনা মাত্র প্রমাণ করিয়া আন্তরিক শান্তি লাভ

করিতাম ; শেষে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের কোন গাড়ীতে ফিরিঙ্গী 'টিকিট চেকার' প্রবেশ করিয়া দেশীয় রমণীর প্রতি বীভৎস অত্যাচার করিলে দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট নামমাত্র দণ্ডে যে দিন সে দুর্ব্বৃত্ত নর-পশুকে অব্যাহতি দান করিয়া তাঁহার অনিন্দ্য সুন্দর বিচারমহিমা প্রকটিত করিলেন, সেই দিন হইতে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ-জীবন অত্যন্ত গৌরবপূর্ণ ও সুরক্ষিত বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম !

এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল, নেটিভদিগের ধৃষ্টতা দেখিয়া ক্ষমতা-দর্পিত ইতর প্রকৃতির ইংরাজগণ ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল; নেটিভের জুতা তাহাদের অসহ্য হইতেছিল, নেটিভের মাথায় ছাতা দেখিয়া তাহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠিত, নেটিভকে ঘোড়ার পিঠে সোয়ার হইতে দেখিয়া তাহারা তাহাকে ঘোড়া হইতে নামাইয়া বেতের ভয় দেখাইয়া সেলাম আদায় করিত, এবং সেলাম প্রদানে নেটিভকে কৃপণতা প্রকাশ করিতে দেখিলে, প্রহারে তাহার প্রাণবিহঙ্গকে দেহ পিঞ্জর হইতে মুক্তি দান করিতেও যে সঙ্কুচিত হইত না তাহার দৃষ্টান্তও সাহেবী অত্যাচারের ইতিহাসে দুর্লভ নয়।

ক্রমে যখন তাহারা বুঝিতে পারিল নেটিভ বধ করিলে বিশেষ বিপদে পড়িবার আশঙ্কা নাই, নেটিভকে লাঞ্ছিত করিলে কিছু অর্থ দণ্ড দিয়াই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারা যায়, তখন তাহাদের হাত পা ক্রমেই অধিক অসংযত হইয়া উঠিল ; শেষে একদিন প্রভাতে শুনিলাম ধর্ম্মতলার মোড়ে শরৎ চক্রবর্ত্তী নামক একটি বাঙ্গালী যুবক ট্রামের গাড়ীতে একটা ফিরিঙ্গী যুবকের ঘুঁসিতে নিহত হইয়াছে। বাঙ্গালী যুবকটির অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর, সে তাহার ক্ষণভঙ্গুর হৃৎপিণ্ড লইয়া এই ফিরিঙ্গীটার সহিত বচসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল ! আদালতে সাক্ষী-প্রদানের ভয়ে অনেক বাঙ্গালী সাক্ষীই গা ঢাকা দিলেন, কেহ কেহ 'বাঙ্গালী হইয়া সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করিতে যাওয়া বড়ই আহাম্মকি,'

এই বিজ্ঞজনোচিত মন্তব্য প্রকাশপূর্ব্বক আফিসে রুজি বজায় রাখিতে চলিলেন, ততোধিক কাপুরুষেরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকাই অস্বীকার করিল, পাছে কোন ফেসাদে পড়িতে হয়! কেবল সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজগুলা কালী কাগজ অপব্যয়পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিল, এই অত্যাচারের সুবিচার হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, গোঁয়ার ফিরিঙ্গীর উদ্ধত ব্যবহারের দমন না হইলে দেশীয়গণের জীবন নিরাপদ হইবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। যথাকালে আদালতে মামলা উঠিল, সাহেব ডাক্তার বাইবেল ছুঁইয়া সাক্ষী দিলেন, শরৎ চক্রবর্ত্তীর হৃৎপিণ্ডটা এত বিপুলায়তনবিশিষ্ট ছিল যে, যে কোন মুহূর্ত্তে তাহার পতন ও মৃত্যু হইতে পারিত। এতদিন যে সে মরে নাই ইহাই আশ্চর্য্য! কিন্তু অন্য সাক্ষীর মুখে প্রমাণ পাওয়া গেল শরৎ চক্রবর্ত্তী একজন রীতিমত পালোয়ান ছিল, ব্যায়ামে অনেকে তাহাকে ওস্তাদ বলিয়া মানিত; কিন্তু সে সকল কথা নিতান্তই অগ্রাহ্য, কারণ সাহেব ডাক্তারের সাক্ষী, তাহা যতই অসম্ভব ও সত্যের বিরোধী হউক, কিছুতেই অবিশ্বাস্য হইতে পারে না, সুতরাং কয়েকদিনের মধ্যে সুবিচার হইয়া গেল; আসামী ফিরিঙ্গীটা পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া খিদিরপুর ডকের মিস্ত্রী-খানায় প্রবেশ করিল; সকলে বুঝিতে পারিল, ভারতবর্ষে নেটিভের প্রাণের মূল্য পঞ্চাশ টাকার অধিক নহে। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম বিচারালয়ের রায়কে অনেক সাহেবই নজীররূপে গ্রহণ করিবার সুবিধা পাইল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে সলিভান নামক একটা গোরা কেল্লার একজন দর্জ্জীকে বিনা দোষে গুলি করিয়া কুকুরের মত বধ করিল, নিশানা ঠিক করিবার জন্য কি বন্দুকের মরিচা দূর করিবার জন্য কিম্বা একটু নির্ম্মল আনন্দ উপভোগের জন্য সে দর্জ্জীর প্রাণবধ করিল তাহা ঠিক বুঝিতে পারা গেল না, সুতরাং প্রমাণ হইল সলিভান

পাগল, অতএব মনুষ্য বধ করিয়া সে দণ্ডলাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। শুনিয়াছি একবার এক বিলাতি সিভিলিয়ান উড্ডয়নে অক্ষম পাল্কির বেহারাকে গুলি করিয়া পাগল সাজিয়াছিলেন, তাহার পর তাঁহাকে ভারতের টাকায় বিলাতের কোন পাগলাগারদে পাঠান হয়। দর্জীঘাতক সলিভানের উদ্ধারের জন্ত দেশীয় করদাতাগণের অর্থের সেরূপ সদ্ব্যবহার হইয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ আমরা জানিতে পারি নাই।

সহসা দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইল, কলিকাতায় যে বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইয়া সুবিচারের শিশির-সম্পাতে ও আত্মীয়বাৎসল্যের ধারাপাতে অঙ্কুরে পরিণত হইয়াছিল, কয়েক মাসের মধ্যে তাহা মহামহীরুহে পল্লবিত ও কুসুমিত হইয়া উঠিল। ইতর শ্বেতাঙ্গের স্পর্দ্ধা ও সাহস এতই বর্দ্ধিত হইল যে, তাহারা ভদ্র, অভদ্র, সম্ভ্রান্ত, অসম্ভ্রান্ত সকল দেশীয় ব্যক্তিকেই কুকুরের ন্যায় দেখিতে লাগিল; ডাক্তার সুরেশ চন্দ্র বারাকপুরে গোরার জুতার কঠিন আঘাতে কি শোচনীয় রূপে নিহত হইয়াছিলেন তাহা আমরা না ভুলিতেই, কাপ্তেন জ্যাক্‌সন নামক একটি আসামগামী গোরা সৈনিক চাঁদপুর রেলওয়ে ষ্টেসনে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় একজন বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে মুষ্ট্যাঘাতে ও পদাঘাতে কিরূপ ক্ষতাঙ্গ করিয়াছিল সংবাদপত্রে তাহার বিবরণ পাঠ করিলাম। বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেও বাঙ্গালী, গোরার সহিত দ্বিতীয়-শ্রেণীর কামরায় তাঁহার ভ্রমণাধিকার নাই, ডেপুটিবাবু শিক্ষা ও পদের গৌরবে সে কথা বিস্মৃত হইয়া সাহেবের সহিত এক কামরায় ভ্রমণের জিদ করিয়াছিলেন এ ত্রুটী কথনই ক্ষমার্হ নহে এবং কাপ্তেন সাহেব তাহা ক্ষমা করিতে পারেন নাই। কিন্তু ডেপুটীবাবুকে প্রহার পূর্ব্বক তাঁহার নাসিকা বা ওষ্ঠ বিদীর্ণ করার পক্ষে কাপ্তেন সাহেবের যতই অমোঘ যুক্তি থাক, প্রহৃত ডেপুটি মহোদয়ের আদালতে উপস্থিত

হইয়া অজাযুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিবার কোন আবশ্যক ছিল না, কারণ তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন কাপ্তেন জ্যাকসন দুঃখিত হইয়া এপলজি করিলে সেই এপলজি গ্রহণ পূর্ব্বক সাহেবকে ক্ষমা না করিলে তাঁহার উপায়ান্তর নাই। সকলেই জানেন ডেপুটীবাবু তাঁহার ওষ্ঠের ক্ষত শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই স্পর্দ্ধিত কাপ্তেনের ব্যবহার ক্ষমা করিয়া মামলা উঠাইয়া লইয়াছিলেন। রেলের গাড়ীতে বিনা অপরাধে প্রহার খাইয়া এতখানি ক্ষমাশীলতা কেবল সেই দেশের লোকেই দেখাইতে পারে, যাহারা জুতার বদলে জুতা ও ঘুঁসির বদলে ঘুঁসি দিয়া নরপশু-গণের চৈতন্যদানে অসমর্থ।

বুদ্ধিমানেরা বলিবেন, ডেপুটীবাবু মামলা উঠাইয়া লইয়া ভালই করিয়াছেন; যে দেশে গোরার ঘুঁসিতে নেটিভের প্রাণ বাহির হইলে গোরার বিশ পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হয়, সে দেশের বিচারালয়ে কাপ্তেন জ্যাক্‌সনের ডেপুটীপ্রহার অপরাধে বড় জোর দশ টাকা অর্থদণ্ড হইত, তাহাতে গোরা কাপ্তেনের বিশেষ কিছু অনিষ্ট হইত না, মধ্যে হইতে ডেপুটীবাবুর হৃদয়ের অনুদারতা প্রকাশিত হইয়া পড়িত। অতি বুদ্ধিমানের মত কথা সন্দেহ নাই; যে অক্ষমগণের ক্ষমা করা ভিন্ন উপায় নাই, তাহারা রক্তাক্ত কলেবরে 'মেরেছ মেরেছ কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না'—এই নীতিবাক্য অনুসারে কাজ করিয়া মনে কি পরিমাণ শান্তি লাভ করে বলিতে পারি না, কিন্তু চৈতন্য-দেবের Sublime আদর্শকে তাহারা Ridiculous না করিয়া ছাড়েনা, এবং তাহাতে একালের জগাই মাধাইগুলির অনেক বৈষ্ণবের মস্তক চূর্ণ ও টিকি উৎপাটন করিবার প্রলোভন সম্বরণ করা একান্ত দুরূহ হইয়া উঠে।

কিন্তু আজকাল অসহায় কেরাণীগণ উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীগণ কর্তৃক প্রতিনিয়ত যে ভাবে নিপীড়িত হইতেছে এবং সেই সকল

অত্যাচারের যেরূপ বিচার হইতেছে তাহা পাঠ করিয়া কোন তেজস্বী সহৃদয় ভদ্রলোকই অবিচলিত থাকিতে পারেন না। এই উৎপীড়ন প্রবৃত্তি রেলের অশিক্ষিত পশুপ্রকৃতি ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারীগণের মধ্যেই ইদানীং সংক্রামিত দেখা যাইতেছে; সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান মিলিটারী বা অন্য বিভাগের ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীগণের মধ্যে এ দোষ অত্যন্ত বিরল। অধীনস্থ ক্ষুদ্র কেরাণীগণ কখন অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারে না এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া যাহারা তাহাদের পৃষ্ঠে স্ব স্ব দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের পরিচয় প্রদান করে, তাহাদের চরিত্রের হীনতা ও প্রকৃতির দুর্ব্বলতা মনে করিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না, উচ্চ মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইলে তাহারা কখন এ ভাবে আত্মাবমাননা করিতে পারিত না, তাহাদের অন্তরাত্মাই এরূপ অত্যাচারের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইত; কিন্তু এই সকল ইউরেসিয়ান বা নিম্ন সমাজে বর্দ্ধিত শিষ্টাচারসংস্পর্শশূন্য ইউরোপীয়ান কর্ম্মচারীগণের আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান একেবারেই নাই, পদের গৌরবে ও ক্ষমতার বাহুল্যে তাহারা মনুষ্যকে মনুষ্য জ্ঞান করেনা, তাহারা অসঙ্কোচে সমস্ত ইংরাজজাতির মুখে চুন কালী লেপিয়া মনে করে তাহারা অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের কর্ম্ম করিতেছে। কিন্তু নিরীহ কেরাণীর পৃষ্ঠে সেই সাহস ও বীরত্ব অঙ্কিত না করিয়া যদি তাহারা বুয়র-ভূমিতে বুয়র-জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে নামিয়া তাহার পরিচয় দিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে কাহারও কাপুরুষ বলিবার অধিকার থাকিত না।

কেরাণীগণের প্রতি রেলোয়ের শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীগণের অত্যাচারের কথা তুলিলে খড়্গপুরের বেলি নামক সাহেবটির বাবু যশোবন্ত গোপালের পৃষ্ঠে চাপরাসীদ্বারা জুতা চাপাইয়া দেওয়ার কথা সর্ব্ব প্রথমে মনে পড়ে; বাবু যশোবন্ত গোপাল ব্রাহ্মণসন্তান, তাঁহার

অপরাধ তিনি তাঁহার উপরওয়ালা বেলি সাহেবের সম্মুখে জুতা পায়ে দিয়া গিয়াছিলেন, এই অপরাধে চাপরাসী সাহেবের হুকুমে যশোবন্ত গোপালের জুতা তাঁহার পৃষ্ঠেদেশে স্থাপন করিয়া প্রভু-আজ্ঞা পালন করে, এবং এই উপায়ে যশোবন্ত গোপালকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়। মেদিনীপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মরে যশোবন্ত গোপালের অভিযোগের বিচার করিয়া মিঃ বেলির কুড়ি টাকা অর্থদণ্ড করেন, ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, মিঃ, বেলির কোন দুরভিসন্ধি ছিল না, তিনি যশোবন্ত গোপালকে শিষ্টাচার শিখাইবার জন্যই ইহা করিয়াছিলেন। শিষ্টাচারের কি বিরাট আদর্শ! একজন ভদ্রলোককে শিষ্টাচার শিখাইবার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি তাঁহার পিঠে জুতা চাপাইতে পারে, তাহার শিষ্টাচারের নমুনা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না, এ দেশ কিম্বা ইংলণ্ড কোনদেশেই বোধ করি ভদ্রসমাজে শিষ্টাচারের এমন শিষ্ট প্রয়োগ আর কখন দেখা যায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে হাইকোর্ট এই ব্যাপারটাকে অতি তুচ্ছ মনে করিয়া এই লঘুদণ্ডে হস্তক্ষেপন করিলেন না, এবং কোন ভারত-হিতৈষী ইংরাজ পার্লিয়ামেণ্টে এই কথা তুলিলে ভারতের বর্ত্তমান বিধাতা ষ্টেট্ সেক্রেটারী মহাশয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টই এ বিষয়ের উপযুক্ত বিচারক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ষ্টেট্ সেক্রেটারীর এই মন্তব্যে আমরা কোন দোষ দেখিতে পাই না, কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, যখন দেখা যাইতেছে, এ বিষয়ে সমান উদাসীন, তখন উৎপীড়িতগণের প্রতিকার লাভের কোন ন্যায়সঙ্গত পথ মুক্ত আছে বলিয়া বোধ হয় না।

কিন্তু অত্যাচার উৎপীড়ন এমন পদার্থ যাহা দীর্ঘকাল অপ্রতিহত বেগে চলিতে পারে না; বাষ্পের আধিক্যবশতঃ ষ্টীম এঞ্জিনও ফাটিয়া যায়, সুতরাং অন্যায় উৎপীড়ন-স্রোত যখন অত্যন্ত প্রবল হইবে ও

অত্যাচার অসহিষ্ণু উৎপীড়িতের দল স্বহস্তে প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই থাকিবে না। জড়-প্রকৃতি হইতে মানবপ্রকৃতি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সহনশীলতার একটা সীমা আছে, ইহা প্রকৃতির ধর্ম্ম, দণ্ডবিধি আইনের ভ্রূভঙ্গী এই ধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে, কেন বলিতে পারি না, এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে দেখা যাইতেছে না; এই ঔদাসীন্য যতই কূটনীতি-প্রসূত হউক, কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই নীতির সমর্থন করিতে পারিবেন না, কারণ সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই; কতকগুলি বিষয়ে সমাজশাসনের ভার আইনের হস্তে সমর্পিত আছে, আইন যখন বিচারকের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকা হইয়া তাহার ভার বহনে অক্ষমতা জানায় তখন সমাজ অগত্যা স্বহস্তে সেই ভারগ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু উত্তেজিত মনুষ্যমণ্ডলীর সমষ্টিস্বরূপ সমাজ স্বহস্তে আত্মরক্ষার ভারগ্রহণ করিলে কেবল আত্মরক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে নানা অমঙ্গলের সৃষ্টি করিয়া তোলে, ইতিহাসে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং সামাজিক শান্তি রক্ষণ করিতে আইন পরিচালকগণকে কঠোর কর্ত্তব্যে রত হইতে হয়।

কিন্তু এ দেশের অনেক ইংরাজ বিচারক স্বজাতি-বাৎসল্য বশতঃ হউক বা দেশীয়গণের উৎপীড়ন তেমন গুরুতর বা অস্বাভাবিক বিষয় বলিয়া ধারণা করিতে পারেন না বলিয়াই হউক, ইংরাজ অপরাধীগণের প্রতি উপযুক্ত দণ্ডদানের সামথ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছেন, গোরার অত্যাচার বৃদ্ধির কারণ যে তাহাই, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যশোবন্ত গোপালের মামলার বিচারে যে এইরূপ দেখিলাম তাহা নহে; আরও দৃষ্টান্ত আছে—নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

মিঃ ইয়ং মান্দ্রাজের মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্কের একজন এসিষ্টাণ্ট

পদস্থ কেরাণী ভিন্ন আর কিছু নহেন, ব্যাঙ্কের কোন মুহুরী একজন দেশীয় মুন্সী একদিন খাতাঞ্জীর আদেশে কোন কার্য্যের জন্য হিসাব বিভাগে উপস্থিত হন, সেখানে ইয়ং সাহেব বসিয়াছিলেন, মুন্সীকে দেখিয়াই ইয়ং সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, বিনাকারণে এরূপ ধৈর্য্যচ্যুতির দৃষ্টান্ত আজকাল সাহেবলোকের মধ্যে বিরল নহে; সাহেব মহাক্রুদ্ধ হইয়া মুন্সীকে অবিলম্বে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিতে বলিলেন, মুন্সী সাহেবের ক্রোধ শান্তি করিবার অভিপ্রায়ে সংযতভাবে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে তিনি কোন কুমতলবে সেখানে যান নাই, আফিসের কাজেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সাহেব মুন্সীর এই সঙ্গত কথা অসহ্য বোধ করিলেন, মুন্সীর সেখানে কি কাজ তাহা জিজ্ঞাসা করিবার আর তাঁহার অবসর হইল না, সামান্য একটা কালা নেটিভ তাঁহার ন্যায় স্থূল বেতনভোগী গৌরাঙ্গের কথার প্রতিবাদ করিল ভাবিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিনি মুন্সীর পৃষ্ঠে সবলে পদাঘাত করিলেন, দুর্ব্বাক্য প্রয়োগেও ক্রটী করিলেন না। মুন্সী অগত্যা ফৌজদারী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, বিচারক দয়া করিয়া নেটিভের পৃষ্ঠে পদাঘাতের মুল্য স্থির করিয়া দিলেন, ইয়ং সাহেবের দশ টাকা অর্থদণ্ড হইল; কিন্তু কে বলিবে সেই উদ্ধত সাহেবটি এই সামান্য দণ্ডে চৈতন্য লাভ করিবে?

তাহার পর বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের ডোঙ্গারগড় ষ্টেসনে এক জন দেশীয় সিগনালারের উপর একটা ফিরিঙ্গী গার্ডের অত্যাচার। সিগনালার বেচারী তার ঘরে বসিয়া 'টরে টকা টরে টরে' করিতেছিল, আসিষ্টাণ্ট ষ্টেসন মাষ্টার সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন সময় বক্ষ্যমাণ টুপিওয়ালা গার্ড আসিয়া তাহার একটা 'প্রাইভেট মেসেজ' তারে তুলিবার জন্য সিগনালারকে আদেশ করিল। সিগনালারের দুরদৃষ্ট, সে বলিল, 'সাহেব আগে টাকা ফেল, টাকা না দিলে আমি মেসেজ

পাঠাইতে পারিব না।' সাহেব খাঁটি বৃষের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল, 'আমার হুকুম তামিল কর, দেখিতেছ আমার রঙ'? (কত সাদা?) সিগনালার সাহেবের রঙ দেখিয়াও তাহার কর্ত্তব্য ভুলিল না, পুনর্ব্বার ক্ষীণ স্বরে টাকার কথা জানাইল। জনবুলের এদেশী বাচ্চা ইহাতে ক্রোধ সংবরণে অসমর্থ হইয়া সিগনালারটিকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিল, আসিষ্টাণ্ট ষ্টেসন মাষ্টারটি অদূরে কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া সেই রণপয়োধির লহরী গণিতে লাগিলেন, তাঁহার অধীনস্থ উৎপীড়িত কেরাণীটিকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা করিতেও তাঁহার সাহস হইল না, পাছে শিলাবৃষ্টির ন্যায় অবিশ্রান্ত বর্ষিত কিল ঘুঁসির দুই চারিটা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার নাসাকর্ণের বিলোপ সাধন করে। ভ্রাতার ন্যায় একজন সহযোগী কর্ম্মচারীকে একটা দুর্বৃত্ত ক্রমাগত প্রহার করিতেছে, যাহারা ইহা দেখিয়াও বিচলিত হয় না, তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে না, পাছে কোন ফ্যাসাদে পড়ি, চাকরী হারাইয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া অনাহারে মরিতে হয় ভাবিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হয়, তাহারা রক্তমাংসের দেহবিশিষ্ট মানুষ না কলের পুতুল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, তাহাদের চাকরী থাকা বা যাওয়া, জীবন ও মৃত্যু সমাজের পক্ষে উভয়ই সমান। আমাদের দেশে এই প্রকার কাপুরুষের সংখ্যা প্রতিদিন গড্ডলিকা প্রবাহের স্থান অধিকার করিতেছে বলিয়াইত নরপিশাচেরা আমাদের চক্ষুর উপর আমাদের মাতা, স্ত্রী, ভগিনী কন্যার অপমান করিতে সাহসী হয়; তখন আমরা নিষ্ফল ক্রোধ, ক্ষোভ ও মনস্তাপে দগ্ধ হইতে থাকি, তাহার পর উকীলের বাড়ী উপস্থিত হইয়া অসামান্য ভাষানৈপুণ্য প্রকাশপূর্ব্বক 'আরজি' নির্ম্মাণে মনঃসংযোগ করি, এবং যথাকালে আদালতে সুবিচারের অভাব হইলে বন্ধুমণ্ডলীতে উপস্থিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া মরি।

যাহা হউক, গরীব সিগনালার প্রহার লাভ করিয়া আর আদালতে যাইতে সাহসী হইল না, তাহা ব্যয় সাধ্য, বিপদের সম্ভাবনাও যে তাহাতে নাই এরূপ বলা যায় না। সিগনালার তাহার প্রভু ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক সুপারিন-টেনডেণ্টের নিকট টেলিগ্রামে সকল কথা জানাইল। ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিকের কর্ত্তা বিস্তর বুদ্ধি ব্যয় করিয়া যে সূক্ষ্ম রায় প্রকাশ করিলেন, নিম্নে তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিবার, প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না, তিনি লিখিলেন, "The Signaller is chiefly to blame in this case as it is not his duty to refuse any message but for me to decide afterwards if they are private, and if so I make the party to pay who send them. It was a needless use of the wire, his telegraphing to me might have been done by letter. He will have to pay the full cost of the message. I cannot, however, overlook guards' conduct in striking the staff, but taking into consideration the trouble he was in, I will let him off with ***a fine of one Rupee.***"—সুতরাং দেখা যাইতেছে এই গোরা ট্রাফিক সুপারিন-টেনডেণ্টটি জয়েণ্ট হাকিম মিঃ মারের অপেক্ষাও উচ্চ শ্রেণীর ধর্ম্মাবতার, টেলিগ্রাম-কোডের কোনস্থানে এমন কথা নাই যে সিগনালার কোম্পানীর কোন কর্ম্মচারীর প্রাইভেট টেলিগ্রাম পাঠাইয়া পরে তাহার দাম আদায়ের জন্য ট্রাফিক সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে রিপোর্ট করিবে, তথাপি ট্রাফিক সুপারিনটেনডেণ্ট বাহাদুরের বিচারে সিগ-নালারই অপরাধী হইল; বেচারী প্রাণের দায়ে টেলিগ্রামে তাহার উৎপীড়ন সংবাদ প্রভুর গোচর করিয়াছিল, সেজন্য টেলিগ্রামের ব্যয় ভার তাহাকেই বহন করিতে হইল, এবং সকল অনিষ্টের মূল গার্ডটা এক টাকা জরিমানা দিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিল। আদালতের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র এমনই বিচার চলিতেছে!

কিন্তু এই প্রকার পীড়ন ভারতের এক প্রদেশে আবদ্ধ নহে, সমগ্র ভারতেই ত ইহা সম্প্রসারিত দেখা যাইতেছে; কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে 'কাটিবার টাইমস্' সেই দেশের রেলোয়ের এক কেরাণী-পীড়নের কাহিনী নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। স্থানীয় 'ইম্পিরিয়াল ল্যান্সারস' নামক সৈন্যদলের কাপ্তেন ট্যালবট গত ২০এ এপ্রিল বি, জি, জে, পি, রেলোয়ের রাজকোটপুরা ষ্টেসনের মালবাবু মিঃ মাণিকলালকে গুরুতর প্রহার করেন। শুনা যায় মিঃ মাণিকলাল সাহেবের 'সামান' ওজনে গাফিলি করিয়াছিলেন। মিঃ মাণিকলাল রেল কর্তৃপক্ষকে এ বিষয় পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করিয়া অবশেষে অগত্য কাপ্তেনসাহেবের নামে হালারের 'প্রান্ত' সাহেবের কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করেন; উভয় পক্ষেই সুযোগ্য ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।"—কিন্তু ব্যারিষ্টারের যোগ্যতায় সাহেব অপরাধীর প্রতি উপযুক্ত দণ্ড বিহিত হয় না, গুরুতর প্রহারের অপরাধে কাপ্তেন ট্যালবটের কুড়িটি টাকা মাত্র অর্থ দণ্ড হইল। মিঃ ট্যালবট ও মিঃ বেলী দুইজন সাহেব ভারতের দুইপ্রান্তে গুরুতর অপরাধ করিয়া দুই বিভিন্ন বিচারকের নিকট দণ্ডলাভ করিলেন, কিন্তু দণ্ডের কি অপূর্ব্ব সমতা!

হয়ত এই সমতা লক্ষ্য করিয়া কেহ বলিবেন, নেটিভের পৃষ্ঠে জুতা স্থাপন ও নেটিভের নাসিকায় মুষ্ট্যাঘাত এ উভয় অপরাধে কুড়ি টাকা অর্থদণ্ডই যথেষ্ট। কিন্তু সে কথা কিরূপে স্বীকার করা যায়? একজন মেথর একজন সাহেবকে জুতা মারিয়া যদি পঞ্চমুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তবে তাহাই তাহার পক্ষে গুরুতর দণ্ড বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ সেই পাঁচ টাকাই তাহার এক মাসের অন্নের সংস্থান। কিন্তু মিঃ বেলি বা কাপ্তেন ট্যালবট্ অনায়াসে পকেট্ হইতে 'ঝনাৎ' করিয়া কুড়ি টাকা ফেলিয়া দিবে, তাহার পর যে কোন

দিন আবার কোন ভদ্র দেশীয়কে জুতা মারিবে। এরূপ লঘুদণ্ডে দণ্ডের উদ্দেশ্য এইরূপে ব্যর্থ হয়।

এই প্রসঙ্গে, আমরা অনেকগুলি মামলার উল্লেখ করিলাম, এখন আর একটি মামলার কথা বলিব যাহার পরিণাম ফল শুনিয়া পাঠক হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী সেরাজ-উল-হক্ মহাশয়ের এজলাসে রেলির বাড়ীর একজন কেরাণীবাবু গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় রেলির হৌসের একজন আসিষ্টাণ্ট সুপারিণটেন্‌ডেণ্টের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। অভিযোগের মর্ম্ম এই যে গোবর্দ্ধনবাবু একদিন আফিসে বসিয়া আফিসের কাজ করিতেছেন, এমন সময় আসিষ্টাণ্ট সুপারিণটেনডেণ্ট মিঃ ডব্লু, এফ্, চ্যাপম্যান সহসা তাঁহার সমীপস্থ হইয়া তাঁহার কাজ পরীক্ষা করিতে চাহেন, পরীক্ষান্তে সাহেব অত্যন্ত খুসী হইয়া গোবর্দ্ধন মহাশয়ের গণ্ডে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেন। শ্বেত করতললব্ধ সেই সুবিরাট চপেটাঘাতে অভিভূত হইয়া প্রতিকার প্রার্থনায় হাকিমের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সূক্ষ্মদর্শী দেশীয় বিচারক বলিলেন, বিচার আচারের হাঙ্গামা অপেক্ষা এ গোলযোগ আপোসে মিটাইয়া ফেলাই উচিত। আদালতের এই পরামর্শ দান শেষ হইলে আসামী মিঃ চ্যাপম্যান ফরিয়াদী গোবর্দ্ধন বাবুর হাত ধরিয়া করুণাবিগলিতকণ্ঠে বলিলেন, 'দোষের ভাবিয়া ত আমি তোমাকে প্রহার করি নাই (did not mean any offence) তোমাকে পুত্রবৎ ভালবাসি, তাই পুত্র বাৎসল্যবশতঃ তোমাকে তরিবৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমার গণ্ডে মৃদু আঘাত করিয়াছিলাম।' সাহেবের পুত্র-বাৎসল্যের নূতন পরিচয় পাইয়া গোবর্দ্ধনবাবু গলিয়া জল হইয়া গেলেন, তখন মিঃ চ্যাপম্যান জলবৎ তরল গোবর্দ্ধন বাবুকে নিজের গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া বিচারালয় ত্যাগ করিলেন।

ঘটনাটি সে সময়ে প্রকাশ্য আদালতে অনেকের কৌতুহল উদ্রেক

করিয়াছিল। কোন কোন বুদ্ধিমান প্রবীনব্যক্তি মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিতেছিলেন, ‘এমন সদাশয় উপরওয়ালা একালে বড় দেখা যায় না, তরিবৎ শিখাইবার জন্য সাহেব যদি গোবর্দ্ধনবাবুকে একটা চড় চাপড় মারিয়াই থাকেন, তবে কি নালিশ করিতে আসা উচিত? সাহেব অন্নদাতা, ও সকল তুচ্ছ অপমানকে অপমান জ্ঞান করিতে নাই, উপরওয়ালার কাছে লাথি খাইয়াও তাহা সহ্য করিতে হয়, এরকম ‘স্পিরিট’ দেখান নির্ব্বোধের কর্ম্ম, চাকরীর বাজার যে চড়া! বিশেষতঃ সাহেবটিকে ত বড় ভদ্রলোক দেখা গেল, গোবর্দ্ধনবাবুকে সাহেব নিজের গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া গেল, একি অল্প অনুগ্রহ!’ প্রবীন ব্যক্তিগণের এ কথার উত্তর দিতেও ঘৃণা বোধ হয়; উপরওয়ালা মিঃ চ্যাপম্যান তাঁবেদার কেরানী গোবর্দ্ধনবাবুকে নিজের গাড়ীতে বসাইয়া আদালত ত্যাগ করিলেন ইহা গোবর্দ্ধনবাবুর প্রতি অসাধারণ সম্মান প্রকাশক হইতে পারে, কিন্তু সাহেবরা তাহাদের কুকুরকেও সাধারণতঃ এভাবে সম্মানিত করিয়া থাকে। গোবর্দ্ধনবাবুর তরিবতের কি অভাব হইয়াছিল জানিনা, সাহেব গোবর্দ্ধনবাবুর কাজ পরীক্ষা করিতে গিয়াই পরীক্ষাফলে এই চপেটাঘাত দান করেন, কিন্তু আদালতে আসিয়া তিনি প্রকাশ করিলেন, গোবর্দ্ধনকে তরিবৎ (discipline) শিক্ষা দেওয়ার জন্যই পুত্রবাৎসল্যবশতঃ তিনি চপেটাঘাত করিয়াছিলেন! আজ কাল নেটিভকে তরিবৎ শিক্ষা দেওয়া অনেক গোরা উপরওয়ালার প্রহারের একটি প্রধান হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মিঃ বেলি যশোবন্ত গোপালকে তরিবৎ শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়েই তাঁহার পৃষ্ঠে জুতা স্থাপন করিয়াছিলেন, কাপ্তেন ট্যালবটেরও বোধ করি মাণিকলালকে প্রহার করিবার এই সুমহৎ উদ্দেশ্য ছিল। কাপ্তেন জ্যাকসন যে ডেপুটি বাবুটীকে মুষ্ট্যাঘাতে ও পদাঘাতে রক্তাক্ত কলেবর করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার সেরূপ মহৎ উদ্দেশ্য ছিল কিনা

জানিতে পারি নাই, তবে তরিবতের কথাটা আজ কাল বড় ঘন ঘন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু অপমান হইতে আত্মরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে প্রহৃত নেটিভেরা যদি আদালতে আসিবার পূর্ব্বে প্রহারককে কিঞ্চিৎ তরিবৎ শিখাইবার অবসর পায়, তাহা হইলে ফৌজদারী মামলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট বিরল হইয়া আসে, এবং সাহেবদেরও তরিবৎ শিখাইবার উৎসাহ ক্রমে বিরল হইতে পারে। যাহা হউক, গোবর্দ্ধনবাবু চ্যাপমান সাহেবের পুত্র-বাৎসল্যের পরিচয় কতদিন পাইয়াছেন না জানিলেও আমরা আশা করি বাৎসল্যের এই আকস্মিক উচ্ছ্বাস পুনর্ব্বার চপেটাঘাত বা মুষ্ট্যাঘাতে পরিণত হইবে না এবং গোবর্দ্ধনবাবুকে সেজন্য আদালতের দ্বারস্থ হইতে হইবে না।

সুবিজ্ঞ বিচারক এই মামলা আদালতের বাহিরে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার এই অনুরোধের মধ্যে কোন প্রকার আত্ম-প্রবঞ্চনার আভাস ছিল কি না অন্যের পক্ষে তাহা অনুমান করা কঠিন, কিন্তু তাঁহার এ কথাটি বিবেচনা করা উচিত ছিল, যে প্রকাশ্যে মার খাইলে, গোপনে তাহাকে মিটমাট করিতে অনুরোধ করিলে উৎপীড়িতের প্রতি অবিচার করা হয়। বিশেষতঃ, এরূপ মিটমাটে বা এপলজিতে প্রহারকর্ত্তা আইনের নাগপাশ হইতে অনায়াসে উদ্ধার লাভ করে বটে, কিন্তু তাহার চৈতন্যসঞ্চার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। ভরসা করি কোন উদ্ধত সদাগরসাহেব তাহার দারোয়ানের হাতে লগুড়াঘাত খাইয়া কখন মৌলবীসাহেবের এজলাসে নালিশ করিতে উপস্থিত হইলে তিনি সে মামলাও আদালতের বাহিরে মিটাইবার জন্য অনুরোধ করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

গত ১৩ই জুলাই তারিখের বেঙ্গলী পত্রে মিউনিসিপালিটীর একজন ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক কয়েকজন উৎকল ব্রাহ্মণের প্রতি যে দুর্ব্ব-

ব্যবহারের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোমাঞ্চকর; দেশীয়দিগের কাপুরুষতার তাহা সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কলিকাতার নেবুতলা লেনে রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ ধুমধাম হইয়া থাকে, সেখানে অনেক রথের সমাগম হয়, অনেক দোকানী ও বিস্তর দর্শকও জুটিয়া থাকে। সংকীর্ত্তন ও বাদ্যধ্বনিতে উৎসব-মুখর পল্লী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। রঘুনাথ পাণ্ডা নামক একজন উৎকলদেশীয় ব্রাহ্মণের একখানি রথে তাহার গৃহ-বিগ্রহ জগন্নাথ দেব স্থাপিত হইয়াছিলেন, কিন্তু জনতা ভেদ করিয়া রথ অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, গলির মধ্যেই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল। সেই সময়ে একটি বেত্রহস্ত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ভৈরব হুঙ্কারে সমাগত দর্শক মণ্ডলীকে সন্ত্রস্ত করিয়া সবেগে সেই রথের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কয়েকজন পাণ্ডার পৃষ্ঠে বেত্রদণ্ড প্রচণ্ডবেগে প্রয়োগ করিয়া কৃষ্ণচর্ম্মের ঘাতসহত্ব পরীক্ষা পূর্ব্বক পাণ্ডাদের কাছে লাইসেন্স দেখিতে চাহিল,—যেন পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত না করিলে মুখের কথায় লাইসেন্স দেখাইতে বলা যায় না! যাহা হউক, পাণ্ডারা লাইসেন্স দেখাইতে পারিল না, কারণ তাহাদের লাইসেন্স লইবার কোন আবশ্যক ছিল না, পুলিশ কমিসনরের আদেশ অনুসারে ধর্ম্মতলার উত্তরে সমস্ত পথেই বিনা লাইসেন্সে রথ চলিতে পারিত। কিন্তু সাহেব এই যুক্তি-সঙ্গত কথায় কর্ণপাত না করিয়া অধিকতর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া, তাহার পর পাণ্ডাদের অতি কদর্য্য ভাষায় গালি দিতে দিতে রথে পদাঘাতপূর্ব্বক প্রস্থান করিল এবং দুই নম্বর ডিষ্ট্রীক্ট অফিস হইতে আট দশ জন চাপড়াসী পাঠাইয়া হেড্ পাণ্ডা ও তাহার সহযোগীগণকে সেখানে ধরিয়া লইয়া গেল; সেখানেও তাহাদিগকে অল্প নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় নাই। মিউনিসিপালিটীর এই কর্ম্মচারীর লাইসেন্স দেখিবার কোন অধিকার ছিল কি না জানি না, কিন্তু যে সাধারণ উৎসবে লাইসেন্স গ্রহণের আবশ্যক নাই, সেই

উৎসবে লাইসেন্সের জন্য এ ভাবে নিরীহ লোকের উপর বেত্রপ্রয়োগ, হিন্দুর রথে পদাঘাত কেবল অবিবেচনা নহে অতি ইতরের কার্য্য হইয়াছে, কিন্তু এদেশের অনেক ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারীই এই ভাবে স্ব স্ব পদের প্রভাব প্রকাশ করিতে লজ্জিত হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সে দিন রথের নিকট বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত থাকিতেও একজন ফিরিঙ্গী বিনা অপরাধে কতকগুলি নিরীহ লোককে এ ভাবে বিড়ম্বিত করিয়া গেল, আর সকলে তাহা নির্ব্বাক ভাবে চাহিয়া দেখিল— মানুষের চিত্তবৃত্তি কখন এরূপ অসাড় ভাব ধারণ করিতে পারে এ ধারণা আমাদের ছিল না, অন্ততঃ জগন্নাথের মত মানুষের হাত আত্ম-রক্ষার শক্তি হইতে বঞ্চিত না হইলে কেহ এ ভাবে বেত হজম করিতে পারে না; এখন মিউনিসিপালিটীর সুযোগ্য চেয়ারম্যান মিঃ গ্রিয়ার এ বিষয়ের কোন অনুসন্ধান করেন কি না, এবং কিরূপ বিচার করেন তাহাই দেখিবার জন্য বহুলোক উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

বস্তুতঃ ফিরিঙ্গীর হাতে ধনঞ্জয় খাইয়া খবরের কাগজে আর্ত্তনাদ করা আমাদের একটা ফেসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে দিন দেখিলাম কুমিল্লার 'প্রতিনিধি' পত্রে একজন ভদ্রলোক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, তিনি এবং বহু সংখ্যক ভদ্রলোক নারায়ণগঞ্জ হইতে কিলবর্ণ কোম্পানির 'ভামো' ষ্টীমারে আজবপুর যাইতেছিলেন; ভৈরব বাজার নামক ষ্টেসনে ল্যাম নাম ধারী এক ফিরিঙ্গী জাহাজ ইনেস্‌পেক্টর সেই ষ্টীমারে উঠে, সে উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগকে অসঙ্কোচে ড্যাম শুয়ার প্রভৃতি সম্বোধন করিতে লাগিল, কেবল তাহাই নহে, অনেকে সাহেবের হস্তে গলাধাক্কাও খাইল। বাবুটি আরও লিখিয়াছেন, "আমরা সে দিন উক্ত ইনেস্‌পেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছি। আমাদের সঙ্গে কয়েকটা ট্রাঙ্ক ছিল, তিনি আদেশ করিলেন প্রত্যেককে কাঁধে ট্রঙ্ক লইতে হইতে এবং এক হাতে টিকিট দেখাইয়া

হিয়া ষ্টীমার হইতে নামিতে হইবে। * * * আমরা ঘাটে নামিলে ট্রাঙ্কের ওজন সম্বন্ধে বৃথা সন্দেহ করিয়া তিনি সেগুলি হাতে শূন্যে তুলিয়া তুলিয়া নিতান্ত তুচ্ছ পদার্থের মত মাটিতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে আমাদের ভগ্ন-প্রবণ মূল্যবান জিনিসাদি কতক নষ্ট হইয়াছে।”

কর্ণ পীড়ন, অর্দ্ধচন্দ্র, আর্থিক ক্ষতি সকল অপমান ও অসুবিধা অসীম ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়া অবশেষে ইহাঁরা এই কথা সংবাদপত্রে ঘোষণা পূর্ব্বক নিজের কাপুরুষতা, নিজের অপদার্থতা দেশের সর্ব্ব সাধারণের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে প্রচারিত করিতে একটুও লজ্জিত হইলেন না! আমরা এতই অধঃপাতে গিয়াছি, আমাদের মনুষ্যত্ব ও আত্মসম্ভ্রম এতই হ্রাস হইয়াছে! ষ্টীমারের উপর যে শতাধিক ভদ্রলোক ছিলেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আর কিছু না করুন, সেই ফিরিঙ্গীটাকে ষ্টীমারের কাছি দিয়া গ্যাংওয়ের একটা থামে ঘণ্টা কতক বাঁধিয়া রাখিয়াও যে এই প্রকার অত্যাচার ও অপকারের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিতেন; এতটুকু সাহস, বুদ্ধি, একতা ও তেজস্বিতা যাহাদের নাই, তাহারা প্রতিদিন এই ভাবে লাঞ্ছিত হইয়া ছিন্নকর্ণ ও ভগ্ননাসিকা লইয়া ঘরে ফিরিবে, তাহার পর মহা উৎসাহে সংবাদ পত্রে আর্ত্তনাদ করিবে। অন্য দেশে রমণীর পক্ষেও যাহা ঘৃণিত, এদেশের পুরুষেরা প্রাণের ভয়ে, বিপদের আশঙ্কায় অনায়াসে তাহা সমর্থন করিয়া যায়, তাহার পর ছাপার অক্ষরে সেই কলঙ্ককে মূর্ত্তিমান করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করে। ধিক্!

শান্ত হিন্দু।

কিছুদিন হইল সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, বিগত রথযাত্রা উপলক্ষে এক সাহেব হাজার হাজার হিন্দুর মধ্যে একাকী উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার নিগারভোগ্য বাক্য ও হস্ত পদাদি প্রয়োগে আপ্যায়িত করেন। হিন্দুগণ হিন্দুজনোচিত সহিষ্ণুতা সহকারে অবনতমস্তকে সাহেব হয়ত হাতে পায়ে ব্যথা পাইতেছেন, বুঝি এই ভাবিয়া সাহেবের প্রত্যঙ্গব্যবহারপন্থা হইতে দূরে অপসরণ করিতেছিল। উপয়ান্তর না দেখিয়া সাহেব রথের উপর পদাঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও সাহেবের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না; তিনি হিন্দুদিগকে অপমানিত করিতে পারিলেন না। 'তৃণাদপি সুনীচ,' 'তরোরিব সহিষ্ণু,' অমাণিনাং মানদ' হিন্দুর মান বহুস্তর ত্বকের নিম্নে; তাই 'ধর্মপ্রমাণ আধ্যাত্মিক' হিন্দুর নিকট এসকল পার্থিব উৎপাৎ নিতান্ত তুচ্ছ। ইহারই নাম 'mild Hindu.'

একজন বিদেশী হাজার হাজার লোককে এরূপ ভাবে নিগৃহীত করিতে পারে; এ দৃষ্টান্ত এজগতে হিন্দুসমাজ ভিন্ন বোধ হয় অন্য কুত্রাপি মিলিবেনা। সুধু তাহাই নয়, দেবারূঢ় রথে পদাঘাতও ইহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে নাই। রাত্রিন্দিব স্থানে অস্থানে নিজেদের আধ্যাত্মিকতার গভীরতা কার্ত্তনে, ও ধর্ম্মপ্রাণতার প্রকাণ্ড-ধ্বজা সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টিপথবর্ত্তী সমুচ্চগগণে উড্ডয়নে অক্লান্তভাব, হিন্দুর তুল্য অন্য কোন সম্প্রদায়ের দেখি না। কিন্তু সেই বাক্যবাগী-শব্দের পশ্চাতে যদি বিন্দুমাত্র ধর্ম্মবিশ্বাস থাকিত, তবে দেবতার ঈদৃশ অপমান কখনও সম্ভব হইত না। ধর্ম্ম সাহেব অপেক্ষাও প্রবল এবং সাহেবের হাত হইতেও ধর্ম্মরক্ষণ করিতে পারেন, এই বিশ্বাস হিন্দুর

মনে থাকিলে, সহস্র সহস্র উপাসকের সম্মুখে সাহেব উপাস্যদেবের আসনে পদাঘাত করিতে পারিত না, করিলে তন্মুহূর্ত্তেই সে পদ পঙ্গু হইত। বস্তুতঃ বর্ত্তমান হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণতা অপেক্ষা ভিত্তিহীন উপকথা অল্পই আছে।

ধর্ম্মের আর কোন গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, অন্ততঃ উপাসককে নিজ সেবায় ও মর্য্যাদারক্ষায় রত করিবার শক্তি ধর্ম্মের আছে। যে দিন হিন্দুর ধর্ম্ম ছিল, সেদিন শিখগুরু মুসলমান বাদসাহকে শির দিয়া ছিলেন, তবু ধর্ম্ম দেন নাই। যে দিন হিন্দুর ধর্ম্ম ছিল, সেদিন চৈতন্যদেব হরির নামে মুসলমান রাজ-প্রতিনিধিকে নিরস্ত্র করিয়াছিলেন। যে ম্লেচ্ছদিগকে আমরা আধ্যাত্মিকতাবিহীন ঐহিক.ন্ধ বলিয়া পতিতজনোচিত আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা করি, সেই ম্লেচ্ছ ক্র্যান্মার যে হস্তে লিখিয়া ধর্ম্মমত প্রত্যাহার করিয়াছিলেন, সেই কলুষিত হস্তকে 'this hand hath offended' বলিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন। অপর ম্লেচ্ছ প্ল্যাটিমার ধর্ম্মের জন্য অগ্নিদগ্ধ হওয়ার প্রাক্কালে সগর্ব্বে ও সতেজে বলিয়াছিলেন—'আজ যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিব, অনন্তকালে তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।' এতই ধর্ম্মের তেজ। সে ধর্ম্ম হিন্দুর নাই; নাই বলিয়াই সে দেবতার অপমানেও নির্ব্বিকার এবং তাই তার ধর্ম্মের চাৎকার এত বেশী। কারণ শূন্যপাত্রই অধিকতর শব্দায়মান হয়।

ধর্ম্মবিশ্বাস যে হিন্দুর নাই তাহা চারিদিকেই প্রত্যক্ষীভূত। যে জাতি স্বীয় আরাধ্য, অবতারজ্ঞানে পূজিত বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণের পবিত্র বেশ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সাগ্রহে বারবিলাসিনীদিগকর্ত্তৃক রঙ্গালয়ে কলুষিত হইতে দেয়, এবং যে জাতির অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও বলিতে লজ্জিত হন না, যে নাট্যশালার দেববেশভূষিতা, নবযৌবনা গণিকাগণের লোল কটাক্ষ ও বিলাসবিভ্রম দর্শন এবং

উন্মাদক সঙ্গীত শ্রবণের উদ্দেশ্য শুধু ধর্ম্ম, সে জাতির ধর্ম্মের চিতাভস্ম পর্য্যন্ত শীতল হইয়া গিয়াছে।

একবার ফ্রান্সদেশে মহাপুরুষ মহম্মদকে কোন নাটকের নায়করূপে রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ করার প্রস্তাব হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তুরস্কের সুলতান ও তাঁহার ফ্রান্সদেশস্থিত দূতের ঘোর আপত্তিকে ফরাসিদিগকে সে আমোদ উপভোগের আশা ত্যাগ করিতে হয়। মহম্মদকে নায়ক করিতে ইচ্ছা করিয়া এদেশীয় দুই একজন নাটককারকেও বেশ জব্দ হইতে হইয়াছে। মহম্মদ মুসলমানদের দেবতা নহেন, ঈশ্বরের বার্ত্তাবহ মাত্র; তথাপি তাঁর প্রতি এই সম্মান! আর আমাদের দেবতাগণকেও আমরা বেশ্যাদেহে আবির্ভূত করি!

হিন্দু দেবতাদিগকে অতি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, নিজেরাও সেই হারে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুর দেবতা দিবাভাগে জাগ্রত থাকেন, এবং রাত্রিতে নিদ্রা যান। শয়নকালে দেবতারও ঠিক মানুষেরই ন্যায় শিয়রের ও পাশের বালিশ দরকার হয়। শীতকালে দেবতা লেপ তোষকাদি ব্যবহার করেন, গ্রীষ্মকালে ফোয়ারার জলে তাঁহার শৈত্য সম্পাদিত হয়। স্বনামধন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় রথারূঢ় বামন দেখিয়া হৃদয়াবেগে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

'একাভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া।
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ॥
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ।
স্মারং স্মারং স্বগৃহ চরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥'

বস্তুতঃ আমরা দেবতাকে দেবত্ববিহীন করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের দেবতাদিগের মধ্যেও জাতিভেদাদি প্রবল। নীচ-জাতীয় হিন্দুর স্বগৃহস্থ দেবগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু সে ব্রাহ্মণ বাড়ীর দেবালয়ে

প্রবেশ করিতে পারে না; করিলে, দেবতা অশুদ্ধ হইয়া যান, তাঁহাকে 'শোধন' না করিলে চলে না। ব্রাহ্মণেতর কাহারও বিগ্রহস্পর্শের অধিকার নাই! কার্য্যতঃ দেখিতে পাই অধিকাংশ হিন্দুরই দেবপূজারও অধিকার নাই। দেবতারা ব্রাহ্মণের অন্নব্যঞ্জন ভোজনে আপত্তি করেন না। কিন্তু অপরাপর জাতিগণ পুরোহিত প্রতিনিধিদ্বারা যে দেবতা পূজা করে, তিনি তাহাদের হস্তস্পৃষ্ট জলগ্রহণে অনেক সময়ে অসম্মত নন বটে, কিন্তু তাহাদের পক্ক অন্ন তাঁহার অগ্রাহ্য! ইহার পরও যদি ব্রাহ্মণাদি দুই একটী উচ্চজাতি ব্যতীত অপরাপর হিন্দুগণ আপনাদিগকে জগজ্জননীর সপত্নী-সন্তান ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারে, তবে বহুভাগ্য বলিতে হইবে।

হিন্দুর ধর্ম্ম থাকিবে কিরূপে? 'পার্থিব ভোগসুখে রত' ইংরেজ পুরোহিত ক্র্যান্মার ও ল্যাটিমারের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই 'আধ্যাত্মিক' জাতির পুরোহিতগণের আধ্যাত্মিকতা সকদলী তণ্ডুলসংগ্রহেই পর্য্যবসিত। অনেক পুরোহিতঠাকুর পাঠশালার ত্রিসীমায়ও কোন দিন পদার্পণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। যে সংস্কৃত মন্ত্র আওড়াইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাহার শব্দগুলি শুদ্ধরূপে বুঝা দূরে থাকুক, উচ্চারণও করিতে পারেন, এমন পুরোহিত অল্পই দেখিয়াছি। তার পর জলনারায়ণের ব্রতে শ্রাদ্ধের মন্ত্র ও কার্ত্তিক পূজায় সূর্য্যস্তব দিয়া কাজ সারেন, এরূপ পুরোহিতেরও সংখ্যা নাই। লক্ষ্মীপূজার ন্যায় পর্ব্বে অবকাশাভাবে পুরোহিতঠাকুরেরা উপবীতধারী আত্মীয়ের সাক্ষাৎ পাইলেই তাঁহাকে নিজ প্রতিনিধিত্বে বরণ করিয়া থাকেন। হয়ত ইঁহাদের সাত পুরুষের মধ্যেও কেহ মন্ত্র তন্ত্র জানেন না; কিন্তু তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ, নিরক্ষর শূদ্র,—বাড়ে কামার, কুমার, প্রভৃতির বাড়ীতে সকলেই নীরবে ওষ্ঠ নাড়িয়া দেবতাকে ফাঁকি দিয়া নির্ব্বিঘ্নে ফিরিতে পারে।

হিন্দুর আর এক উপদেষ্টা গুরু। গুরু জীবনে একদিন কর্ণে ফুংকার দিয়া যান, তাতেই নাকি সকলের মোক্ষলাভ হয়। অনেক গুরু আছেন, যাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি শিষ্যের এক আনা থাকিলেও সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম। কোন কোন গুরুমহাশয়ের 'কারণ' করার প্রবৃত্তিও বিলক্ষণ, অবিদ্যায়ও অরুচি নাই। শিষ্যেরা যে তাহা একবারে জানে না, এমন নয়। তথাপি সমাজশাসনে এই সকল গুরুর নিকটই মন্ত্র লইতে হইবে; অন্যথা পতিত হইতে হয়। মন্ত্র লওয়ার পরিণামও বিলক্ষণ কৌতুকাবহ। গুরু যখন ঘন ঘন শিষ্যগৃহে পদধূলিদানে তাহার স্বর্গের পন্থা কণ্টকবিহীন করিতে আরম্ভ করেন, তখন অনেক শিষ্যকেই বলিতে শুনা যায় যে গুরুদেবের কৃপা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, আর পারা যায় না। কারণ, গুরুপদধূলি রজতমূল্যে ক্রয় করিতে হয়।

বঙ্গদেশে যে ব্যক্তি স্ফীতবক্ষে হুঙ্কার করিয়া বলিতে পারে যে, আমাদের সমাজবন্ধনের একমাত্র লক্ষ্য ধর্ম্ম, তাই পার্থিব উন্নতিকর কোন কোন বিষয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, শ্রোতৃবর্গ হইতে তাহার প্রশংসাসূচক অবিরাম করতালি-ধ্বনিতে পথিকের পর্য্যন্ত কর্ণবধির হয়। কিন্তু প্রকৃত কথাটা এই যে আমাদের সমাজ-বন্ধনের ফলেই আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে। হিন্দু সমাজ নিম্নশ্রেণীকে অজ্ঞ রাখিয়াছে। এমনই সমাজগঠন, এবং এমনই শিক্ষা যে তাহাদের জ্ঞানের প্রয়োজনও নাই। অজ্ঞকে তৃপ্ত করা অতি সহজ। তাই গুরু পুরোহিতদিগকেও জ্ঞানধর্ম্মে উৎকর্ষের জন্য তত চেষ্টা করিতে হয় না। কাজেই তাঁহাদের অবনতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজের অবনতি।

বিদ্যালয়ের বালকেরা গণিতশাস্ত্রে নিজেদের অপটুতা অতি সহজেই বুঝিতে পারে; কিন্তু ইংরেজীসাহিত্যে অপটুতা সেরূপ বুঝিতে পারে না।

তাই দেখা যায় অনেক ছাত্র নিজেদের গণিতে জ্ঞানাভাব দেখিয়া সাহিত্যে অধিকারাধিক্য অনুমান করিয়া লয়। হয়ত তাহারা গণিত অপেক্ষাও সাহিত্যে অধিকতর অপক্ক, কিন্তু তাহাদিগকে তাহা বুঝান যায় না। গণিতে অপটুতার অনুপাতেই অনেক সময়ে তাহারা সাহিত্যে পটুতার দাবী করে। বোধ হয় সেইরূপ বালকোচিত ভাবদ্বারা পরিচালিত হইয়াই হিন্দুগণ আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রাণতায় বিশ্বাস করে। আমাদের কিছুই নাই—স্বাধীনতা নাই, শৌর্য্য-বীর্য্য নাই, শিল্প নাই, বাণিজ্য নাই, নাই বলিতে কিছুই নাই। তবে কি আমরা এতই হীন? আপনার সম্বন্ধে এত হীনতার ধারণা কে পোষণ করিতে পারে? তাই মনে হয় আমাদের এ সকল নাই বটে, কিন্তু আর কিছু আছে। এ সকল যে আমাদের নাই ঠিক তা নয়, এ সকল আমরা উপেক্ষা করিয়াছি—করিয়াছি ধর্ম্মের জন্য, আমাদের ধর্ম্ম আছে, আমরা নিতান্তই ধর্ম্মপ্রাণ।

ধর্ম্মবিশ্বাসের ন্যায় হিন্দু আত্মশক্তিতে বিশ্বাসও হারাইয়াছে। মেষশাবকেরাও উত্যক্ত হইলে আততায়ীকে সতেজে আক্রমণ করে। কিন্তু সহস্র হিন্দু একজন ইংরেজ কর্ত্তৃক নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়াও তাহার অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে সাহসী বা ইচ্ছুক হয় নাই। প্রতিকার সম্ভাবনা নিতান্ত সাধ্যাতীত বোধ না হইলে কেহই তাদৃশ লাঞ্ছনা মাথার মুকুট করিয়া লয় না। এতগুলি লোক একজন বিদেশীয়ের অসঙ্গত অত্যাচার হইতেও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারিলে ইহাদের আত্মশক্তিতে যে বিন্দুমাত্র আস্থা নাই, এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হয়। হিন্দুর নিজের প্রতি বিশ্বাস নাই, তাই নিজ ভ্রাতার প্রতিও বিশ্বাস নাই। ভ্রাতার প্রতি বিশ্বাস থাকিলেও একজন সাহেবের সম্মুখে এত গুলি লোক আপনাদিগকে একান্ত নিঃসহায় ও নিরুপায় ভাবিতে পারিত না।

হিন্দুজাতির এই শোচনীয় কাপুরুষতার কারণ সকল হিন্দুরই গভীর

চিন্তার বিষয়। দীর্ঘকালের রাজনৈতিক পরাধীনতাই ইহার কারণ বলিয়া প্রথমতঃ মনে হইতে পারে। রাজনৈতিক পরাধীনতা যে অন্যতম কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রীস্, ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশও কোননা কোন কালে পরাধীন হইয়াছিল; কোন কোন দেশ অতিদীর্ঘকাল—আমাদের অপেক্ষাও দীর্ঘকাল—দাসত্বভার বহন করিয়াছে। কিন্তু কোথাও ত এমন অমানুষোচিত অপদার্থতা প্রসূত হয় নাই। বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের গঠনের বিশেষত্ব-বশতঃ ইয়ুরোপীয় জাতিদের অপেক্ষা হিন্দুর রাজা ও শাসনপ্রণালীর সহিত সম্পর্ক অনেক কম। তাই রাজনৈতিক পরাধীনতা হিন্দুর এই দুর্গতির মূলীভূত বলিয়া বোধ হয় না।

তবে ইহার কারণ কি? কারণ প্রধানতঃ দুইটী—এক হিন্দুর অদৃষ্টবাদ, অপর হিন্দুর সমাজ। অদৃষ্টবাদ কোন প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা বা অপমানকেই যথোচিতরূপে অনুভূত হইতে দেয় না; তাহার প্রতিকার-প্রবৃত্তির সমধিক উদ্রেকেরও বাধা জন্মায়। অদৃষ্টে পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলে দুঃখদুর্দ্দৈবে স্বভাবতঃই মনে হইবে তৎসমুদয় অদৃষ্টের ফল, কিছুতেই খণ্ডিবার নয়; কাজেই প্রতিকার চেষ্টাও নিতান্ত নিরর্থক। ইহাতে দুঃখেও কতকটা সান্ত্বনা পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্টবাদী ক্রমেই অধিকতর নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ, জড়প্রকৃতি, সংক্ষেপতঃ মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত হইয়া পড়ে। কারণ, যাহার উপর আমার হাত নাই, তাহার জন্য শোচনা করিয়া ফল কি? তাহা নীরবে সহ্য করাই শ্রেয়ঃকল্প। আর চেষ্টাতেও যদি দুঃখ না ঘোচে, তবে চেষ্টাই বা করি কেন? সে সুখের অন্বেষণ অপেক্ষা 'সোয়াস্তি'ই ভাল। ফলতঃ অদৃষ্টবাদ হিন্দুজাতির যে কি গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে, কুতার্কিক ব্যতীত আর সকলেই তাহা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

তারপর হিন্দুর সমাজ। গৌরীদানের ফলে অধিকাংশ হিন্দুর জন্ম অপক্ববীজে; তাই তাহারা চিরকাল অপক্ক দেহই থাকে। আহারের ব্যবস্থা এই যে, যাহাতে শোণিতের একটুকু উষ্ণতা সম্পাদিত হয়, তাহাই হিন্দুর অখাদ্য। তারপর সমাজের কৃপায় কৈশোরেই যে একটী গৌরী ঘরে আসিয়াছেন, তাহার সাহায্যে শ্মশ্রূদ্গমের অব্যবহিত পরে বা পূর্ব্বেই পুন্নামনরকের ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়াছি; পঞ্চবিংশতিবর্ষ অতীত হইতে না হইতেই 'ষষ্ঠীঠাকুরাণী' হইয়া দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু তখনও অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা জন্মে নাই; অহর্নিশ হা অন্ন, হা অন্ন, করিয়া বস্তুতঃই হৃদয়শোণিত শুষ্ক হইতেছে। তখন কাহারও শত পদাঘাত সহ্য করিয়াও দিনান্তে মুষ্টিভিক্ষা মিলিলে পরম সৌভাগ্য জ্ঞান হয়; দারুণ জঠরজ্বালা পদাঘাতের অপমানকরত্ব ঘুচাইয়া দেয়। শুভাদৃষ্ট বা দুরদৃষ্টক্রমে একটী সুবিধাজনক চাকরী জুটিলে পাছে কেহ স্ত্রীপুত্রসহ উদর পূরিয়া আহার করে, এই ভয়ে সমাজ এমনি বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে যে তখন দলে দলে পিতৃ মাতৃ উভয়কুলের অন্ততঃ ৫।৭ পুরুষ ব্যবধান আত্মীয় আত্মীয়াগণের পর্য্যন্ত সুখসমাগম হইতে থাকে। ইচ্ছা করিলেও যে ইহাদিগকে সহজে এড়াইব, সে স্বাধীনতাটুকুও আমার নাই। কলিকালের বাঙ্গালীর অদৃষ্ট ধ্যানযোগে জানিয়াই কি শাস্ত্রকার লিখিয়াছিলেন 'ভরণং পোষ্যবর্গস্য উত্তমং স্বর্গসাধনম্?' কেননা, বাস্তবিকই ত অনেক বাঙ্গালী পোষ্যবর্গের ভরণচিন্তায় অতি অল্পবয়সে স্বর্গলাভ করেন। পোষ্যগণ তাঁহাদিগকে বেশীদিন ভবযন্ত্রণা ভুগিতে দেন না। এইভাবে স্বর্গের পন্থা এত সুগম করিয়াই কি হিন্দুসমাজ আপনার একমাত্র লক্ষ্য, ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করে? যাহা হউক এতটার পরও যাঁহার হৃদয়ে তেজ থাকে, তিনি অলৌকিক মনুষ্য; সাধারণ দুর্ব্বল মানবের নিকট তাহা আশা করা যায় না।

আর একটী কথা মনে হইতেছে। প্রাণভয়ে হিন্দুর হৃদয় সদা কম্পমান। কিন্তু সে কি শুধু নিজ প্রাণের মায়ায়? হিন্দুযুবক জানে যে, যে কিশোরী পত্নীর জীবন তাহার জীবনের সহিত অনুস্যূত হইয়াছে, সে মরিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ, তিনি চিরজীবন অকুলসাগরে ভাসিবেন। পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী কাহারও তাঁহার সে দুঃখ অপনোদন বা লঘুতর করিবার সাধ্য নাই। যদি স্বামীর মৃত্যুরপরও হিন্দুরমণীর কোন পন্থা হইতে পারিত, যদি আবশ্যক বোধ করিলে তিনি পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিতে পারিতেন, তবে স্বামীর মৃত্যুভয় এত গুরুতর হইত না। ফলতঃ বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে হিন্দুর প্রাণ-ভয় অর্দ্ধেক কমিয়া যাইত। তাহা নিষেধ করিয়া আমাদের সমাজ আমাদের কাপুরুষত্বের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়াছে।

হিন্দুসমাজের আর এক কঠিন নিগড় জাতিভেদ। তুমি নমঃশূদ্র, তুমি অস্পৃশ্য। যদিও অন্যান্যের ন্যায় তোমারও ইন্দ্রিয়াদি বর্ত্তমান, তথাপি তুমি অধম; অন্যথা তুমি কেন নমঃশূদ্র হইলে? অতএব তুমি কদাপি উচ্চ আশা পোষণ করিও না; আমাদের পদতলই তোমার যোগ্য স্থান, সেইখানেই থাক। যদি তাহাতে সম্মত না হও, আমাদের হাতে এমনি সমাজ-যন্ত্র আছে, যাহাদ্বারা তোমাকে নিষ্পেষিত করিব। তুমি শূদ্র, সাবধান তুমি জ্ঞানোপার্জ্জন করিও না। কারণ, তুমি জ্ঞানোপার্জ্জন করিলে তোমাকে যে পদতলে রাখা যায় না। যদি পাঠশালায় ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসিতে চাও, তোমাকে শূলে দিব। আর যদি নিতান্ত তাহা না পারি, পরলোকে তুমি অগ্নিদগ্ধ হইবে। তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, বিচার করিয়া স্বীয় বিবেচনামত কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে চাও। কিন্তু সে অবিমৃষ্যকারিতায় প্রবৃত্ত হইও না। যাহা প্রাচীনেরা পাঁজিপুঁথিতে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তোমার পক্ষে উত্তম, তাহাই তোমাকে মানিতে হইবে। বিদ্রোহী হও,

তোমাকে তাড়াইয়া দিব; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমাজের পদলেহনে বিন্দুমাত্র অপ্রবৃত্তি প্রকাশ করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষমা করিব না। এই হিন্দুসমাজের আদেশ। এবং এই আদেশ রাজাজ্ঞা অপেক্ষাও কঠোরতার সহিত প্রতিপালিত।

এইরূপে পদে পদে সমাজকর্ত্তৃক প্রতিহত ও নানা ভাবে নিষ্পিষ্ট হইতে হইতে হিন্দুর হৃদয়ের তেজ সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। সমাজ কখনও তাহার শক্তি প্রযুক্ত হইতে দেয় নাই, তাই তার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মে নাই। সে সমাজের দাস, তাই দাসবৎ ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেও তত আঘাত পায় না; এবং তাই অত্যাচারীর প্রতিরোধ করিতেও তার তত প্রবৃত্তি জন্মে না। আজ যদি ইংলণ্ডেশ্বরের পরিবর্ত্তে কোন হিন্দুকে ভারত সিংহাসনে আসীন করা যাইত, তথাপি এই অন্ধ সমাজের সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন না হইলে হিন্দুর স্বাধীনতালাভ হইত না; সে যে দাস, সে দাসই থাকিত।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঋণ পরিশোধ।

শোভাবতীর বিবাহের পর দেখিতে দেখিতে ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে নবঘনর সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

ইষ্ট্‌কোষ্ট্‌ রেলওয়ে লাইন কনকপুর জেলার মধ্য দিয়া যাওয়াতে রেলওয়ে কোম্পানির পক্ষ হইতে অনেক জমি খরিদ করা হইয়াছে। তাহাতে নবঘন একথোকে দশ হাজার টাকা পাইয়াছেন। আর রাস্তা প্রস্তুতের জন্য শালকাঠ ও পাথর বিক্রয় করিয়াও তিনি অনেক টাকা লাভ করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ অভিরামের পরামর্শমতে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; অভিরামকেই এই সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছেন। কেবল এই কার্য্য নহে, এখন তাঁহার জমিদারী-সংক্রান্ত সকল বিষয়েরই তত্ত্বাবধানের ভার অভিরামের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। অভিরাম প্রথমতঃ কাঠের কারবারে লাভের অংশ গ্রহণ করিতেন, এখন তাঁহার মাসিক ১০০৲ টাকা মাহিয়ানা ধার্য্য হইয়াছে। অভিরামের তত্ত্বাবধানে আমলাগণের চুরি ও প্রজাপীড়ন একেবারে থামিয়াছে। নবঘন জানেন অল্প বেতনে আমলা রাখিলে, তাহাদিগকে প্রকারান্তরে চুরি করিবার ইঙ্গিত করা হয়। তাহার ফলে, সেই সকল আমলা হয় মনিবের মাথায় হাত বুলায়, নতুবা প্রজার মাথায় বাড়ি দেয়। সুতরাং পরিণামে তাহাতে লোকসানই ঘটে। সেইজন্য নবঘন তাঁহার আমলাদিগকে বেশী বেশী বেতন দিয়া থাকেন। নবঘনর শাসনাধীনে প্রজাগণ সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। তিনি বেশী বেতন দিয়া ম্যানেজার, নিযুক্ত করিয়া থাকিলেও আমলা-

দিগের কার্য্য নিজে খুঁটিনাটি করিয়া পরীক্ষা করেন। মধ্যে মধ্যে গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়া প্রজাদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখেন ও তাহাদের ওজর আপত্তি শুনিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। খোড়দহ অঞ্চলে অনেক গ্রামে ভূমিতে জলসেচনের জন্য কূপ খনন করা আবশ্যক। সে জন্য তিনি নিয়ম করিয়াছেন, রাজসরকারের ব্যয়ে প্রতি বৎসর ২০টী করিয়া কূপ খনন করা হইবে। এইরূপে ৫ বৎসরে তাঁহার এলাকার প্রতি গ্রামে এক একটী কূপ হইবে ও ক্রমে আরও কূপ সংখ্যা বাড়িবে। এই ছয় বৎসরে সদর খাজনা ও প্রয়োজনীয় খরচ পত্র বাদে জমিদারীর আয় হইতেও তাঁহার অনেক টাকা মজুদ হইয়াছে। তাহা না হইবেই বা কেন? তাঁহার জমিদারীর বার্ষিক আয় চল্লিশ হাজার টাকা, তাহার মধ্যে সদর খাজনা মাত্র ১০ হাজার টাকা বাদ যায়। উপযুক্তরূপে শাসন সংরক্ষণ করিলে অনেক টাকা মুনাফা থাকিবার কথা। শুদ্ধ এই সম্পত্তির আয় হইতেই তিনি সমস্ত খুচরা দেনা শোধ করিয়াছেন। মোট কথা নবঘনর এখন খুব স্বচ্ছল অবস্থা। তাঁহার এই সুখ সমৃদ্ধির মধ্যে একটু দুঃখের কালিমা লাগিয়া রহিয়াছে। তাঁহার মাতা চন্দ্রকলা দেয়ী, স্বামীর মৃত্যুর এক বৎসর পরেই পরলোক গমন করিয়াছেন।

নবঘন আজ এক বৎসর হইল একটা নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। সেটী বৈঠকখানা ও অন্দর মহালের মধ্যস্থলে হইয়াছে। কোঠাটী দোতলা। উপর তলায় মধ্যে একটী প্রকাণ্ড হল ও তাহার চারিদিকে চারিটী ঘর। সকল ঘরই নানাবিধ মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত। শোভাবতীর দুইটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাদের কলহাস্যে এই অট্টালিকা সর্ব্বদা মুখরিত।

এখন বেলা ২টা বাজিয়াছে। শীতকাল, রৌদ্রের তেজ মন্দ হইয়া

সেই রৌদ্র পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে টাঙ্গান বড় বড় ছবিগুলির উপরে পড়িয়া মেঝের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে। হলের উত্তরভাগে দুখানা বড় তক্তপোষ, তাহার উপর গালিচা পাড়া। তাহার দক্ষিণে একখানা সিশুকাঠের বার্ণিশ করা বড় গোল টেবিল ঝক্ ঝক্ করিতেছে। তাহার চারিদিকে পাঁচ খানা কৌচ ও এক খানা আরাম চৌকী। টেবিলে শ্বেত-প্রস্তর ও মাটির নানাপ্রকার খেলনা ও অন্যান্য জিনিস সাজান রহিয়াছে। শোভাবতী তক্তপোষের উপরে বসিয়া এক খানা চিঠি লিখিতেছেন। তাঁহার পরিধানে এক খানা ঈষৎ পীতবর্ণের রেসমী সাড়ী ও নীল ফ্লানেলের একটী বডিস্। হাতে সোণার বালা, কঙ্কন, চুড়া ও অনন্ত; গলায় এক ছড়া মুক্তার মালা ও চিক; কানে ইয়ারিং। তাঁহার পায়ে সোণার নূপুর; তিনি এখন রাণী হইয়াছেন বলিয়া পায়ে সোণার গহনা পরিয়াছেন।

হলের দক্ষিণ ধারে একটী প্রশস্ত বারান্দা আছে। সেখানে বসিয়া দুইটী শিশু খেলা করিতেছে। বড়টীর বয়স পাঁচ বৎসর তাহার নাম রণজিৎ ওরফে রণু। ছোটটীর নাম বেণু; সে কেবল আড়াই বছরে পড়িয়াছে। দুইটী বালকই খুব উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, উত্তম অঙ্গসৌষ্ঠব-সম্পন্ন। দুইটীরই ভ্রূ আকর্ণবিস্তৃত। বড়টীর চুল খুব ঘন, কপাল ঢাকিয়া পড়িয়াছে। ছোটটীর চুল কিছু পাতলা ও সরু, কোঁকড়া, খুব লম্বা, তাহা পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত থোপা থোপা হইয়া পড়িয়াছে। এই চুলের জন্য তাহাকে খুব সুন্দর দেখায়। এই দুইটী দিব্যকান্তি শিশু দেখিয়া বোধ হয় যেন ইহারা কোন দেবলোক হইতে নামিয়া আসিয়াছে। ঐ যে হলের দেওয়ালে টাঙ্গান এক খানি বিলাতি ছবিতে দুইটী দেব শিশু যাশুখ্রীষ্টের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদেরই ন্যায় এই শিশুদ্বয়ের মুখশ্রী হইতে নির্ম্মল পবিত্রতার আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

রণুর এক খানা ধুতি পরা, গায়ে একটা কাল চেক ফ্লানেলের কোট। বেণু একটা ফ্লানেলের পেনিফ্রক্ পরিয়াছে। উভয়েরই গলায় সোণার হার ও হাতে সোণার বালা।

এখন রণু খুব গম্ভীরভাবে বসিয়া একটী গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত আছে। সে একখানা বেতের অগ্রভাগে এক গাছা লম্বা দড়ী বাঁধিয়া চাবুক প্রস্তুত করিয়া তাহা দিয়া ঘোড়দৌড় খেলে। অর্থাৎ কখনও নিজে ঘোড়া হইয়া সেই চাবুক দিয়া নিজের গায়ে আঘাত করিতে করিতে দৌড়ায়, আবার যখন বেণুর উপর অনুগ্রহ হয় তখন তাহার মুখে এক গাছা দড়া দিয়া লাগাম লাগাইয়া এক হাত দিয়া ধরে ও অন্যহাতে সেই চাবুক লইয়া তাহার পিছে পিছে ছোটে। ইহাতে বেণুও নিজকে কৃতার্থ মনে করে ও হাসিতে হাসিতে ঘোড়ার মত মুখ ভঙ্গী করিয়া দৌড় দেয়। এখন তাহাদের সেই ঘোড়ার খেলা শেষ হইয়াছে, রণু আর একটী নূতন খেলা উদ্ভাবন করিতেছে। বেণু তাহার নিকটে বসিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা দেখিতেছে ও তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করিতেছে। রণুর এক খানা ছোট রেলের গাড়ী আছে, এখন সে সেই গাড়ী চালাইবে। গাড়ীখানা তাহার সম্মুখে রহিয়াছে। সে সেই চাবুক হইতে দড়ী খুলিয়া লইয়া এক টুকরা লাল কাপড় সেই বেত্রখণ্ডের সঙ্গে বাঁধিতেছে। ইহা হইবে রেলের গাড়ী চালাইবার নিশান। যদি সেই রেলের গাড়ী চলিতে চলিতে কোন একটা নিশান দেখিয়া না থামিল তবে সে আবার কিসের রেলগাড়ী? বেণু মনোযোগের সহিত সেই নিশান প্রস্তুত-প্রণালী দেখিতেছে বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাহার কোষ্ঠীতে লেখে না। সে থাকিয়া থাকিয়া সেই গাড়ী ধরিতেছে, আর রণু তাহাকে ধমক দিতেছে।

"কি? দুষ্টু!—মা—এই দেখ্ বেণু আমার গাড়ী ভাঙ্গছে।"

বেণু ভয়ে হাত টানিয়া লইতেছে। মা চিঠি লিখিতে লিখিতে চেঁচাইয়া বলিতেছেন—

"এই আমি যাচ্ছি! দুষ্টামি ক'রো না—খেলা কর।"

কিন্তু মা বুঝেন না যে তিনি যাহাকে দুষ্টামি বলেন, বেণুর অভিধানে তাহারই মানে খেলা!

রণুর নিশান প্রস্তুত হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল ও একবার সেই নিশান ধরিয়া নাড়িয়া দেখিল কেমন দেখায়। এখন সে নিশান ধরিবে কে? যে গাড়ী চালায় সে কখনও নিশান ধরে না এটা ধ্রুব কথা। অতএব বাধ্য হইয়া বেণুকেই সেই নিশান ধরিবার ভার দিতে হইল। রণু বলিল—

"দেখ্ বেণু! তুই এই নিশান ধরিয়া আগে আগে চল্ আমি গাড়ী চালাই। দেখিস্ খুব সাবধান।"

বেণু মাথা নাড়িয়া "হুঁ" বলিল ও প্রফুল্ল চিত্তে নিশান ধরিল। দাদা তাহাকে খেলার ভাগ দিতেছে, ইহাই তাহার আনন্দের কারণ।

রণু গাড়ীর চাবি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল ও নিজে মুখ দিয়া "ছুঁ-উ-উ" শব্দ করিতে করিতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যে গাড়ীতে "ছুঁ-উ" শব্দ হয় না, সে আবার কিসের রেলগাড়ী?

গাড়ী একটু দূরে গিয়াই থামিল। বেণু তখন নিশান ধরিয়া আছে। সে মনে করিল, গাড়ী যখন দুষ্ট ঘোড়ার মত থামিল, তখন তাহাকে আবার চালাইবার জন্য কিঞ্চিৎ প্রহার করা আবশ্যক। আর প্রহারের জন্য সেই ভূতপূর্ব্ব চাবুকই ত তাহার হাতে রহিয়াছে। সে যখন ঘোড়া হয়, ও চলিতে চলিতে থামে তখন তাহার দাদাও ত তাহাকে চালাইবার জন্য এই চাবুক দিয়া প্রহার করে। সেই চাবুকই যে এক টুকরা লাল কাপড় সংযোগে সম্পূর্ণ আর একটী পদার্থে পরিণত হইয়াছে তাহা সে কি প্রকারে বুঝিবে? তাই গাড়ী থামিতে দেখিয়াই

সে নিশানরূপী চাবুক দিয়া তাহাকে খুব জোরে আঘাত করিল। আঘাতমাত্রেই সেই গাড়ীর একটা চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি রনু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ও বেনুর হাত হইতে নিশান কাড়িয়া লইয়া তাহাকে একঘা বসাইয়া দিল।

তখন দুইজনেরই কান্না। মা উভয়েরই কান্না শুনিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলিয়া উঠিলেন—

"এই বার আমি যাচ্ছি! দুষ্টু ছেলেরা, খেলা করবে, তা' না মারামারি করছে।"

কিন্তু তিনি তাঁহার কার্য্যে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে শীঘ্র উঠিয়া আসা তাঁহার ঘটিল না।

বেণুকে মারিয়া রণুর মনে অনুতাপ হইল। বিশেষ মা আসিয়া পাছে তাহাকে মারেন সেজন্য একটু ভয়ও হইল। তাই সে বেণুর দোষ ভুলিয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল, এবং নিজে কাঁদিতে কাঁদিতে সস্নেহে বেণুর চোখের জল তাহার নিজের কাপড় দিয়া মুছিয়া দিল। পরে এক হাতে সেই ভাঙ্গা গাড়ী লইয়া বেণুকে কোলে করিয়া মায়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

এবার মায়ের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন।

"কিরে রণু! দুষ্টু সয়তান! বেণুকে মারলি কেন?"

বেণুর ফোঁস্ ফোঁস্ থামিয়াছে। তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়াছে। তাহার নিবিড়কৃষ্ণ চক্ষুর মধ্য হইতে সকৌতুক সরলতার উজ্জ্বল আভা বাহির হইতেছে। সে বলিল—

"আমি গালি বাঙ্গলো।"

রণুরও তখন কান্না থামিয়াছে। সে এতক্ষণ আসামীর কাঠরায় দাঁড়াইয়াছিল। বেণুর স্বীকারউক্তি (confession) তে তাহার মোকর্দ্দমা

জিত হইয়াছে ও মাতৃ-হস্তে আর প্রহারের আশঙ্কা নাই ভাবিয়া সেই নিশানঘটিত বৃত্তান্ত মাকে বুঝাইয়া দিল।

শোভাবতী টেবিলের উপর হইতে একটা কমলালেবু লইয়া উভয়কে ভাগ করিয়া দিলেন। তাহারা মেঝের উপর দাঁড়াইয়া লেবু খাইতে লাগিল।

এই সময়ে সিঁড়িতে খট্ খট্ করিয়া জুতার শব্দ হইল এবং নবঘন উপরে উঠিয়া আসিলেন। তিনি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াই হাত পা ছড়াইয়া আরামচৌকীতে বসিয়া পড়িলেন, রণু ও বেণু "বাবা—বাবা" বলিতে বলিতে তাঁহার কাছে দৌড়িয়া আসিল। রণু চৌকী ধরিয়া দাঁড়াইল, বেণু খাতিরজমা হইয়া তাঁহার কোলে উঠিয়া বসিল।

তাহাদের মাতা চিঠি লেখার ভান করিয়া নীরবে রহিলেন। নবঘন বলিলেন—

"আজ যে চিঠি লেখায় ভারি মনোযোগ? কোথায় চিঠি লেখা হচ্ছে?"

শোভাবতী মুখ ভার করিয়া বলিলেন "তোমার সে খবরে কাজ কি? তুমি নিজের কাজ দেখ গিয়ে। কাজ আর ফুরায় না?" ইত্যবসরে শোভাবতীর দোয়াতের লাল কালী ঢালিয়া বেণু দুই হাতে ও মুখে মাখিতেছে। মা তাহা দেখিয়া বেণুর হাত হইতে দোয়াত কাড়িয়া নিলেন। "ছেলেটা ভারি দুষ্টু হয়েছে। একটা না একটা দুষ্টামি করা চাই!" ইহা বলিয়া তাহার গালে ক্ষুদ্র একটি কিল দিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। তাহার মুখের লালরঙ্ শোভাবতীর গালে লাগিয়া গেল।

নবঘন বলিলেন "এই বেশ হয়েছে! এতক্ষণ কথা না বলার শাস্তি!"

শোভাবতী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "দোষ কার—কে শাস্তি পায়?"

"কেন দোষটা আমার কিসের ?"

শোভাবতী আয়নায় মুখ দেখিতে দেখিতে বলিলেন—

"তোমার কাজ পড়লে আর কিছু জ্ঞান থাকে না। এত পরিশ্রম করলে অসুখ হবে। আজ একটুও বিশ্রাম করলে না কেন ?"

ইহা বলিয়া আয়না টেবিলের উপর রাখিয়া, এক খানা গালিচা আসন মেজের উপর পাতিলেন এবং একখানা রূপার থালায় করিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফল এবং রূপার গেলাসে করিয়া জল আনিয়া দিলেন। এই গালিচা আসন শোভাবতীর নিজের হাতের তৈয়ারি। মিষ্টান্নও তিনি নিজে তৈয়ার করিয়াছেন।

নবঘন রণু ও বেণুকে লইয়া আহারে বসিলেন। তিনি একটা লেবু ভাঙ্গিয়া মুখে দিয়া বলিলেন—"বাস্তবিকই আজ খুব খাটিয়াছি। আজ একটা বড় গোলযোগ পরিষ্কার করিলাম। একটা অনেক দিনের হিসাব মিটাইলাম। রেলওয়ে কোম্পানির সহিত আমাদের যে কাঠের কারবার চলিয়া আসিতেছে তাহাতে কত টাকা মুনাফা দাঁড়াইল, আজ তাহা ঠিক করিলাম। আজ তোমাকে একটা কথা বলিব মনে করিয়াছি।"

শোভাবতী পান সাজিতে সাজিতে বলিলেন "কি ?"

"বল দেখি কি ?"

"আমি কিছু বলিব না। যদি ঠিক না হয় তবে তুমি হাসিবে।"

"আচ্ছা, আমিই বলিতেছি—তুমি শুন। বিবাহের সময় আমি তোমার পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করিয়াছিলাম। এখন আমার টাকা হইয়াছে, সে টাকা পরিশোধ করিব।"

শোভাবতী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি ? আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা ? কোন কালেই আমার টাকা ছিল না।"

"তোমার বাপ তোমাকে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছিলেন সেই টাকা।"

"সে টাকা আমার কেন? সে ত তোমার টাকা।"

"না—সে তোমার টাকা—তোমার স্ত্রীধন।"

"স্ত্রীধন আবার কি? স্ত্রার ত স্বামীই ধন? আমার স্ত্রীধন ত তুমি।"

"তবে আমাকে বুঝি তোমার গহনা গাঁটরির সামিল করিতে চাও?"

"ঠাট্টা ছাড়। সে টাকা বাস্তবিকই তোমার।"

"তোমার বাপ তোমাকে যে টাকা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমি কেবল দায় ঠেকিয়া ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয় করিয়াছিলাম। এখন তোমার টাকা আবার তোমাকে দিব।"

"কি? আবার সেই কথা? আমি যথার্থই বলিতেছি আমি সে টাকার কোন দাবি রাখি না। আমি তাহা কোন ক্রমে গ্রহণ করিব না। আর আমার টাকা তোমার টাকা এ সব কথার অর্থ কি? তোমার টাকা কি আমার নহে? তোমার এই রাজগী কি আমার নহে? আচ্ছা সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি আমার প্রাপ্যই হয়, তবে তুমি তাহা কাহার টাকা দিয়া শোধ করিবে? যে টাকা দিয়া শোধ করিতে চাও, তাহা বুঝি আমার নয়, তোমার একলার?"

ইহা বলিয়া শোভাবতী পান সাজা শেষ করিয়া সোণার বাটায় করিয়া বেণুর হাতে পান দিলেন। নবঘন আহার শেষ করিয়া ও আচমন করিয়া চৌকীতে বসিলেন। বাটা হইতে একটী পান লইয়া বেণু তাঁহার মুখে দিল। তিনি বলিলেন—

"দেখ, তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক। কিন্তু আমি বাবাজির নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে তোমার এই টাকা আমি এক সময়ে পরিশোধ করিব। আমি লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তাই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য।"

শোভাবতী বলিলেন—"আমি তাহার কিছুই জানিনা, বাবাজী আর তুমি জান। কিন্তু আমি সে টাকা কোন ক্রমেই লইব না।"

"আমিও সে টাকা কোন ক্রমেই রাখিব না। মর্দ্দরাজ সাওের অর্জ্জিত টাকায় আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তাঁহার সে টাকা আত্মসাৎ করিলে আমি পাপভাগী হইব।"

শোভাবতী একটু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ—সে টাকা বাবা যে ঠিক ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে রোজগার করিয়াছিলেন একথা আমিও বলিতে পারি না। তাহা গ্রহণ করিলে তোমার পাপ হইবে তুমি যদি মনে কর, তবে তুমি এক কাজ কর।"

"কি ?"

"সে টাকা দিয়া, বাবার যাহাতে পরকালের কল্যাণ হয়, এরকম একটা সৎকাজ কর।"

নবঘন হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—"আচ্ছা বেশ, এ খুব ভাল পরামর্শ। একথা তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। আচ্ছা তুমি কি রকম কাজ করিতে বল ?"

"তাহা আমি কি বলিব ? বাবাজীকে জিজ্ঞাসা কর। একদিন তাঁহাকে আসিতে বল, আজ কতদিন তাঁহাকে দেখি নাই।"

"আচ্ছা তাঁহাকে কাল আসিবার জন্য আজই চিঠি লিখিয়া দিতেছি। শুভস্য শীঘ্রং—ঐ দেখ—দেখ—বেণু তোমার চিঠিখানার উপর কালী মাখাইতেছে।"

শোভাবতী দৌড়িয়া গিয়া বেণুকে ধরিলেন ও "লক্ষ্মীছাড়া দুষ্টু ছেলে" বলিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন—

"চম্পাকে চিঠি লিখিতেছিলাম, চিঠি খানা নষ্ট হইল। আচ্ছা অভিরামবাবু চম্পাকে এখানে আনেন না কেন ? সে কিন্তু আসিবার জন্য ভারি ব্যস্ত হইয়াছে, কতদিন তাহাকে দেখি নাই।"

নব। আমাদের দেশের কুপ্রথা। কোন সম্ভ্রান্তকুলের মহিলার বিবাহের পর ঘরের বাহির হইবার জো নাই। এমন কি স্বামীর

কর্ম্মস্থানেও যাইতে পারে না। তবে পারে কেবল জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য পুরীতে যাইতে।

শোভা। কিন্তু অভিরামবাবু ত আর সকল দেশাচার মানেন না—এটাও না হয় না মানিলেন। ফলকথা আমার বিশেষ অনুরোধ চম্পাকে তিনি খুব শীঘ্র এখানে লইয়া আসুন।

নব। আচ্ছা, তাহার রাণীর হুকুম আমি তাহাকে জানাইব।

শুনিয়া শোভাবতী হাসিলেন। নবঘন রণু ও বেণুকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন।

পরদিন অপরাহ্নে নরোত্তমদাস বাবাজী আসিলেন। শোভাবতী ও নবঘন তাঁহাকে সেই টাকার কথা জানাইলেন। বাবাজী বলিলেন—

"মা! তোমার এইরূপ উচ্চহৃদয় দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমার পিতার আত্মার কল্যাণের জন্য দান দুঃখী লোকের সেবাতে এ টাকা দান করাই অতি উত্তম সঙ্কল্প।"

নব। তবে কি ভাবে দান করিলে এই কীর্ত্তিটা চিরস্থায়ী হয় তাহাই বিবেচনা করুন।

বাবাজী। বাবা! তোমার বোধহয় মনে আছে আমরা যখন পুরীর শ্রীমন্দিরে মণিনায়ককে দেখিলাম, তখন সেই গরিব কৃষকের মুখে তাহার মহাজনের অত্যাচারের কথা শুনিয়া আমি তোমাকে বলিলাম 'বাবা! তোমার হাতে টাকা হইলে যাহাতে এই সকল গরিব কৃষকের উদ্ধার হইতে পারে তাহার একটা উপায় করিবে'। তুমি তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে।

"আজ্ঞে, তাহা আমার খুব স্মরণ হইতেছে এবং আমিও আমার সেই প্রতিশ্রুতি পালনের উপযুক্ত সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছি।"

"বাবা! এই তাহার উৎকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত! মা শোভাবতীর ইচ্ছা যে এই ৫০ হাজার টাকা তাঁহার পিতার পারলৌকিক কল্যাণের

জন্ত দীন দুঃখীকে দান করা হয়। আবার তুমিও ঋণভার প্রপীড়িত দরিদ্র কৃষককুলকে উদ্ধার করিবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। আমি এরূপ একটী সদনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিতেছি যাহাতে তোমাদের উভয়ের সাধু সঙ্কল্পেরই শুভ মিলন হইবে। তাহা কি? না এই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া একটী কৃষিভাণ্ডার স্থাপন। বাবা! আমাদের এই নিয়ত দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে কৃষকের চেয়ে আর দীন দুঃখী কেহ নাই! এই টাকা দিয়া একটী কৃষিভাণ্ডার স্থাপন করিলে শত শত কৃষকপরিবার ঋণদায় হইতে মুক্ত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিবে, এবং মুক্ত-কণ্ঠে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে ও মর্দ্দরাজ সাণ্ডের কল্যাণ কামনা করিবে। ইহাতে দেশের একটা স্থায়ী মহোপকার সাধিত হইবে। অবশ্য আমাদের দেশে এবং শাস্ত্রে এই টাকাগুলি এক দিনেই কোন একটা ক্ষণস্থায়ী উৎসবে কিম্বা অনুষ্ঠানে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা যথেষ্ট রহিয়াছে। এবং আমাদের দেশে এইরূপ উৎসবে ও অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু বাবা! সে গুলি হইতেছে রাজসিক ও তামসিক দান। তাহার ফল ক্ষণস্থায়ী। ২।৪ বৎসর পরেই লোকে তাহার কথা ভুলিয়া যায়। যাহা দ্বারা কোন স্থায়ী উপকার সাধিত না হয়, তাহা সাত্ত্বিক দান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তাই আমার মতে এই টাকা দ্বারা একটী স্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করিলে তোমাদের নাম চিরস্মরণীয় হইবে, তোমরা সহস্র সহস্র লোকের কল্যাণ ভাজন হইবে।”

নব। আপনার যুক্তি অতি উত্তম। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমাদের উভয়েরই সম্মতি আছে। কিন্তু এই কৃষিভাণ্ডার স্থাপনের ভার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

বাবাজী। বাবা! আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। আমার সময় থাকিতে এরূপ অনুষ্ঠান হইলে আমি অতি আনন্দের সহিত ইহার

সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতাম। কিন্তু এখন আর পারি না। আমার কর্ম্ম শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন আমার হৃদয়-বল্লভ আমাকে অতি তীব্র আকর্ষণে টানিতেছেন। আহা! শ্রুতি বলিয়াছেন "রসো বৈ সঃ"—সেই রস-স্বরূপের প্রেম-রসে একবার ডুবিলে, তিনি ভিন্ন আর কোন্ বস্তুই মনকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। দান, সেবা, পরোপকার, ব্রত, নিয়ম এ সকলের কিছুতেই মন থাকে না। সেই প্রেমময়ের বিরহ ক্ষণকালের জন্যও অসহ্য বোধ হয়। বাবা! সেই প্রেমময় যেমন সব বিষয়ে মহৎ অপেক্ষাও মহান্, তাঁহার প্রেমাকর্ষণও আবার সমস্ত আকর্ষণ অপেক্ষা তীব্র। আমি এখন সেই আকর্ষণে মন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছি। আমার উপযুক্ত শিষ্য মাধবানন্দের হস্তে মঠের সদাব্রতের ভার অর্পণ করিয়া আমি এখন সেই প্রেমময়ের অবিচ্ছিন্ন সহবাসে জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন কাটাইব। তাই বলিতেছি আমার এখন আর অবসর নাই। আরো এক কথা বলি। এত অধিক টাকার কারবার কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে ন্যস্ত করা যুক্তি-সঙ্গত মনে করি না। আমাদের দেশে কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম।

নব। তাহা হইলে এই টাকা গবর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

বাবাজি তাহাতে অভিমতি প্রকাশ করিলেন। শোভাবতী রণু ও বেণুকে আনিয়া বাবাজীর কোলে দিলেন ও তাঁহার পদধূলি লইয়া তাহাদের মাথায় দিলেন। বাবাজী তাহাদিগের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এই কথাবার্ত্তার পরদিনই রাজা নবঘন হরিচন্দন বীরভদ্র মর্দ্দরাজের নামে একটী কৃষিভাণ্ডার স্থাপনের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তাব করিয়া কালেক্টার সাহেবের নিকট পত্র লিখিলেন। সাহেব তাঁহার প্রস্তাব ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্টে চিঠি লিখিলেন।

এইরূপে নবঘন শোভাবতী ও নরোত্তমদাস বাবাজী উভয়েরই ঋণ পরিশোধ করিলেন।

পরিশিষ্ট।

অভিরাম রাণীর হুকুম অনুসারে চম্পাবতীকে গড় চন্দ্রমৌলিতে আনিয়াছেন। এইরূপে রাণী ও তাঁহার সখী আবার মিলিত হইলেন।

মণিনায়ক তাহার নীলকণ্ঠপুরের বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া রাজার এলাকায় আসিয়া বাড়ী করিয়াছে। নীলার বিবাহ হইয়াছে। শোভাবতী তাহাকে ভুলেন নাই। মধ্যে মধ্যে তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া আদর করেন।

পুরীর আদালত হইতে বাড়ী ফিরিয়া গিয়াই পঙ্কজসাহুর জ্বর হয়। সেই জ্বরে ৭ দিন ভুগিয়া তিনি মরিয়াছেন। সকলে বলে জগন্নাথ মহাপ্রভুর প্রসাদ ছুঁইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বিম্বাধরই এখন তাঁহার বিত্তবিভবের একমাত্র উত্তরাধিকারী। বিম্বাধর লম্পটস্বভাব ও নেশাখোর; সে টাকাগুলি এখন উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টায় আছে। কৃপণের সঞ্চিত অর্থের চিরদিনই এইরূপ সদ্গতি হইয়া থাকে।

সূর্য্যমণি চক্রধরের পরামর্শে সেই উদয়নাথকেই পোষ্যপুত্র রাখিয়াছেন। এখন বস্তুতঃ পক্ষে চক্রধর পট্টনায়কই মর্দ্দরাজের সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন। সূর্য্যমণির অন্তঃকরণ এখনও শোভাবতীর প্রতি অপ্রসন্ন—ঈর্ষা ও ঘৃণায় জর্জ্জরিত।

নবঘন সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা কৃষিভাণ্ডার স্থাপনের জন্য দান করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছেন। বেল্‌ভেডিয়ার প্রাসাদের এক সভাতে মহামান্য ছোটলাট বাহাদুর তাঁহাকে এই উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়া, তাঁহার বহুবিধ গুণের ভূয়সী প্রশংসাপূর্ব্বক অবশেষে বলেন—

"I earnestly trust that the noble example of this most enlightened and public-spirited Prince of Orissa will be followed by all Maharajas, Rajas, Zeminders and other wealthy people for the amelioration of the poor agricultural class."

সমাপ্ত।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ইতালীর নবজীবন।

ম্যাটজিনি।

ইতালীর পুনর্জীবন কিরূপে লাভ হইল, তাহা জানিবার পূর্ব্বে ইতালীর তৎপূর্ব্ব অবস্থা কিরূপ ছিল ও তাহার সহিত অন্যান্য দেশের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা লিখিবার প্রয়োজন বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

জড়জগতের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মবীর, ফরাশীরাজ্যের সম্রাট ও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনানায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৭৯৬ সাল হইতে ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত ইতালীর ভাগ্য-নিয়ন্তা হইয়াছিলেন। এই অষ্টাদশ বৎসরের মধ্যেও ক্রমান্বয়ে চারিবার প্রজাতন্ত্র প্রথা প্রচলিত হয়। পরিশেষে ১৮০৫ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট স্বয়ং ইতালীরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে নেপোলিয়নের সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইতালীর অন্তর্গত নেপল্‌সের রাজপদে বরিত হইয়াছিলেন।

যখন ভাগ্যচক্রের বশবর্ত্তী হইয়া নেপোলিয়নের পতন হয় তখন এই ইতালীরাজ্যের পুনর্বিভাগ আরম্ভ হইল।

মেটারনীচ, যিনি নিজ কূট-বুদ্ধি-বলে নোপোলিয়নকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন তিনিই তখন ১৮.৫ খ্রীঃঅব্দে অষ্ট্রীয়ার রাজমন্ত্রী। ইতালীর অভিভাবক কেহ নাই দেখিয়া তিনি ইতালীকে হাপ্‌স্‌বর্গ ও বুর্‌বোঁ রাজবংশের কতকগুলি লোককে ভাগ করিয়া দিলেন। অষ্ট্রীয়ার তৎকালীন সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস লম্বার্ডী ও ভিনিস নিজের দখলে রাখিলেন। অষ্ট্রীয়ার আর্চডচেস্‌ এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মেরী লুই পার্মাতে বরিত হইলেন। অষ্ট্রীয়ান রাজবংশের তৃতীয় ফার্দ্দিনান্দকে টস্কাণী দেওয়া হইল। তাঁহার পুত্র ফ্রান্সিস্‌ মডিনারাজ্যে স্থাপিত হইলেন। পোপ সপ্তম পায়স্‌ পুনর্ব্বার তাঁহার দেবত্র জমীর স্বত্বাধিকারী হইয়া নিজ জমীদারীতে প্রবেশ করিলেন। এবং বুর্‌বোঁবংশের ফার্দ্দিনান্দ নেপলসের ও সিসিলী দ্বীপের রাজা হইলেন। কেবল একমাত্র প্রজাতন্ত্রশাসন প্রণালীযুক্ত সান্‌মেরিনোরাজ্য আদ্রিয়টিক জলরাশির উপর বিরাজমান হইয়া অতি মলিনভাবে মধ্যকালের ইতালীর পরিচয় দিতে লাগিল। বলা অনাবশ্যক যে মধ্যকালের ইতালী যদিও ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল কিন্তু পরকরতলগত ছিল না।

এইত গেল ইতালীর শারীরিক বিভাগ। এখন নেপোলিয়নের সময়ে ও তাহার পরে ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা দেখা যাউক্‌।

বোনাপার্ট যখন ইতালীতে সংস্কারক ও রক্ষক স্বরূপে উপস্থিত হয়েন তখন ইতালী একরকম মোহ নিদ্রায় সুপ্ত ছিল। নেপোলিয়ন রূঢ় ব্যবহারে ইতালীর নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। তিনি ইতালীর গৃহবিবাদ ও কুসংস্কারসকল পদদলিত করিয়া সমস্ত ইতালীর পঞ্চদশ খণ্ড

ভূমি কেবলমাত্র তিনখণ্ডে পরিণত করিলেন। একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনের সুবিধার জন্য অতি সুন্দর সুন্দর রাস্তা ও মধ্যে নদী থাকিলে পুল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এইরূপে স্থানসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ ঘনীভূত হইল।

নেপোলিয়ন ইতালীর পুরাতন ও বিশৃঙ্খল রীতি নীতি হতগ্রাহ্য করিয়া নূতন শক্তিবিশিষ্ট সামাজিক নীতির ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ফরাসী দণ্ডবিধি, সমাজবিধি, এবং ফরাসীদেশীয় সমস্ত আইনের দ্বারা ইতালীর পরস্পর বিরোধী আচার ব্যবহার ও আইনকানুনের স্থান অধিকার করাইলেন। প্রজার উপর বিধিমত ও ন্যায়সঙ্গত কর স্থাপন করা হইল। বোনাপার্ট জমীদার ও প্রজা সকলের পক্ষে সমান বিচারের ব্যবস্থা করিলেন, এবং বহুশতাব্দী পরে দস্যুবর্গ হইতে ইতালীর প্রজা-বর্গকে রক্ষা করিলেন। প্রায় সমস্ত ইতালীতে অতি সুশৃঙ্খল-ভাবে ও অতি সুন্দর ব্যবস্থায় রাজ্য পরিচালনা হইতে লাগিল। নেপোলিয়নের আগমনে জেসুইটদল পলায়ন করিল এবং ইতালীবাসীরা সম্ভবমত শিক্ষালাভ করিয়া ও মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া যথার্থ মানবের ন্যায় কাজ করিতে ও চিন্তা করিতে শিখিল। এবং প্রধানতঃ এই সমস্ত সুব্যবস্থা ও সুশিক্ষা ইতালীবাসীদিগকে বহুশতাব্দী পরে তাহাদের জাতীয় একতা ও পুনর্জীবনের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর দান করিল।

বহুশতাব্দী ধরিয়া ইতালীবাসীদিগের মনোমধ্যে তাহাদের জাতীয় একতার কথা একেবারেই মনে হয় নাই। ইতালীর জাতীয় ঐক্যের কথা কালের গভীর গর্ভে নিমগ্ন ছিল, এমন কি লোকে ইতালীর নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিত না, তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই হইত না। সত্য বটে মধ্যকালে ইয়ুরোপীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইতালীর কতকগুলি পৌররাজ্য বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিল। ভিনিস্, জেনোয়া, মিলান, ফ্লোরেন্স, পিসা এবং রোম এই কয়টী পৌররাজ্য মধ্য-ইতালীতে

বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু সমস্ত ইতালীবাসীকে 'ইতালী-জাতি' বলিয়া কেহ জানিত না, কিম্বা 'ইতালীজাতি' এই শব্দই কেহ শুনে নাই। ভৌগোলিক চিহ্নমাত্রে ইতালীর একতা পর্য্যবসিত ছিল, জাতীয় একতা না থাকায় পরস্পর সহানুভূতি ছিল না। খণ্ড খণ্ড স্তূপাকার কাষ্ঠ রাশিকে যেমন জাহাজ বলা যাইতে পারে না সেইরূপ তৎকালীন সমস্ত ইতালীবাসীকে ইতালীজাতি বলা যাইত না। ক্রমে আরও পরে উক্ত পৌররাজ্য সকলও লোপ পাইতে লাগিল এবং সমস্ত ইতালীময় অরাজকতা ও অত্যাচার ব্যাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিদেশীয় রাজাদিগের লুণ্ঠনক্ষেত্রে পরিণত হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর পরার্দ্ধভাগে ইতালীর জীবন অতি শান্তিময় ছিল, তাহারা শান্তি ব্যতীত আর কিছুই জানিত না। কিন্তু তা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, এই শান্তি, সুখস্বচ্ছন্দতার ফল। এই শান্তি, ঘৃণাজনক জড়তার বিষময় ফল, অনুদ্যোগের চিহ্ন,—কর্ম্মহীন, বলহীন, তেজোহীন কাপুরুষের শান্তি। হাপ্‌স্‌বর্গ ও বুর্‌বোঁবংশের ক্রীড়াভূমি ইতালী তাহাদের অত্যাচারে নৈরাশ্য ও নিশ্চেষ্টতার আধিপত্যে স্তম্ভিত হইয়া কালযাপন করিতেছিল। এমন সময় নেপোলিয়নের শুভ পদার্পণ।

১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে যখন ইতালী পুনর্বিভক্ত হইয়া ঐ দুই রাজবংশের লোকেদের করতলগত হয়, তখন ইতালীর অন্তর্গত পীড্‌মণ্ট্‌ রাজ্যের অবস্থা বিশেষরূপে বর্ণন করিতে হইবে। কারণ এই পীড্‌মণ্টই সময়ে ইতালীর স্বাধীনতা, জাতীয়জীবন ও একতার আধারভূমি হইয়াছিল। এবং এইখান হইতেই জাতীয় স্বাধীনতা-পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া সমস্ত ইতালীকে আচ্ছন্নকরতঃ ইতালীকে ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে স্যাভয় প্রদেশের ডিউকেরা পীড্‌মণ্ট অধিকার

বলম্বী হইতে দেয় নাই ; তাহার ফল এই হইল যে তাঁহারা ১৮০০ শতাব্দীতে অতি কষ্টে বিপুল সাহসসহকারে সামনীতি আশ্রয় করিয়া পীড্‌মণ্ট্‌ ও স্যাভয় রাজ্যের সঙ্গে সার্দ্দিনীয়া রাজ্য সংযুক্ত করিয়া লইতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এবং যখনই কোন ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ সূচনা ও সন্ধি প্রস্তাব হইয়াছিল, স্যাভয়ের ডিউকেরা সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া লোম্বার্ডীর কতকগুলি সহরকে শনৈঃ শনৈঃ গ্রাস করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। ১৮১৫ সালে জেনোয়ার প্রজাতন্ত্র শাসন ধ্বংস হইলে ইহাও স্যাভয়ের ডিউকদের রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া তাঁহাদের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মেটারনীচের কথামত ইতালী কেবলমাত্র ভৌগোলিক অস্তিত্বে পরিণত না থাকিয়া কিঞ্চিৎ সামান্যরূপে আপনার প্রকৃত অস্তিত্বও প্রকাশ করিতেছিল। ১৮১৫ খ্রীঃষ্টাব্দের ইতালী নেপোলিয়নের পূর্ব্বের ইতালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যে কেমন করিয়া ইতালী স্বাধীন হইয়াছিল সেই চিত্র উদ্‌ঘাটন করা, এবং সেই স্বাধীনতা-যুদ্ধে কোন্‌ কোন্‌ মহাত্মা নশ্বর জীবন একেবারে উৎসর্গ করিয়া জননী জন্মভূমির সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদের চরিত্র বর্ণন করা। যদিও তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, কিন্তু আমি বর্ত্তমানে কবিবর দান্তে বা আলফেরীর কথা বা তাঁহাদের যে কাব্যের দ্বারা তৎকালীন সুপ্ত ইতালীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, কিম্বা দাজীগলি ও বোসেটী মানজোনীর কার্য্যের বিষয় কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া শুধু তিনটিমাত্র কর্ম্মবীরের নাম উল্লেখ করিব। তাঁহারা ম্যাটজিনি, কাভুর এবং গ্যারিবল্ডী। যে মহাপুরুষ একীকৃত স্বাধীন ইতালীর রাজা হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, সাহস, অবিচলিত ন্যায়পরতা, অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতা এই তিন মহাত্মাদিগকে পরস্পর সামঞ্জস্য ও সাহায্য করিতে

শিক্ষা দিয়াছিল—তাঁহারও কথা মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিতে ভুলিব না। তাঁহার নাম ভিক্টর ইমানুয়েল। যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ইতিহাস থাকিবে, মনুষ্যজাতি থাকিবে, ততদিন এই মহাপুরুষদিগের নাম অত্যুজ্জ্বল বর্ণে ইতালীর শিরোদেশে অঙ্কিত রহিবে।

এক এক করিয়া লওয়া যাউক। প্রথমতঃ মহামতি ম্যাটজিনি। ইনি ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে জেনোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইনি ইতালীর যে ভাগটুকু স্বাধীন সেখান হইতে উৎপন্ন। ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে যখন নেপোলিয়নের পতন হয় তখন ইহাঁর বয়স ১০ বৎসর। যদিও সেই সময়ে অষ্ট্রীয়ার রাজমন্ত্রী মেটারনীচ ইতালীরাজ্যের সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ক্রীড়াপুত্তলিগণ ইতালীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভোগ করিতেছিলেন, তথাপি ইতালী নেপোলিয়ানের নিকট হইতে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা ভুলে নাই। ম্যাটজিনির মনে অতি বাল্যকাল হইতেই জাতীয় অবনতির ও দুর্দ্দশার কথা অতি গভীররূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। ভিয়েনার সামনীতিজ্ঞগণ যতই জ্ঞানী হোন না কেন তাঁহারা সময়ের গতি ফিরাইতে অক্ষম ছিলেন। স্থানে স্থানে তাঁহারা অষ্ট্রীয়ান ও বুরবোঁ রাজবংশের লোক রাখিয়া ইতালীর পুরাতন প্রজাতন্ত্র ও রাজ্য দেশ নষ্ট করিয়া ইতালীতে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন সত্য, তাঁহারা ইতালীর পুরাতন সীমা নষ্ট করিয়া আপনার অভিপ্রায় ও সুবিধামত নূতন সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইতালীজাতির মনোমধ্য হইতে তাহাদের নবজীবনের যে অঙ্কুর নেপোলিয়ান জন্মাইয়া দিয়াছিলেন তাহা নষ্ট করিতে পারেন নাই। ইতালীয়েরা যে পূর্ব্বে অতি মহাবল-শালী, পরাক্রান্ত, সুদক্ষ জাতি ছিল সেই জ্ঞান এবং সেই অবস্থা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য যে আকাঙ্খা তাহা ধ্বংস করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সঙ্গীনের গুঁতোতেই ইতালীজাতির নবজীবনের আশা উন্মূলিত না

হইয়া ক্রমে আরও বদ্ধমূল হইতেছিল। ম্যাটজিনির নিজের কথাতেই তখনকার অবস্থা অলোচনা করা যাক্। তিনি সার জেমস্ গ্রাহামকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই—"লোম্বার্ডীতে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক বাস করে। তাহাদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে অবিনশ্বর আত্মা অবস্থিত। তাহারা সকলেই ধীমান্, শক্তিমান্, বুদ্ধিমান্; সকলেই উদার; সকলের হৃদয় প্রবল উদ্দাম বেগে বহিতেছে। সকলেই স্বাধানতা-প্রয়াসী, সকলেই পূর্ব্বপুরুষদিগের আদর্শে নীত হইতে ইচ্ছুক, সকলেই অন্যান্য লক্ষ লক্ষ ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে একত্র হইয়া জাতীয় একতা ও জাতীয় জীবন পাইবার জন্য সমূহ উৎসুক। তাহারা তাহাদের একমাত্র প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে অপর এক কোটী সত্তর লক্ষ ভ্রাতৃবর্গের সহিত তাহাদের সামাজিক কর্ত্তব্য করিতে যত্নবান। এই সমস্ত লোকের ভাষা এক, তাহাদের জন্মভূমি এক, তাহারা বাল্যে এক সঙ্গে লালিত, পালিত, বৰ্দ্ধিত। যৌবনে তাহারা একই তেজে বীর্য্যবন্ত, অভিন্ন স্মৃতিতে উত্তেজিত এবং একই শাস্ত্রগ্রন্থের শিক্ষায় উদ্দীপিত। তাহাদের দেশ, স্বাধানতা, ভ্রাতৃভাব সকলই তাহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল বিকলীকৃত, সংরোধিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সংকীর্ণ সীমা মধ্যে অবস্থিত করান হইয়াছে। যাহারা কিছুমাত্র তাহাদের আচার, নীতি, সংস্কার, ইচ্ছা ও অভাব জ্ঞাত নহে সেই বিদেশীয় অষ্ট্রীয়ান রাজপুরুষদের দ্বারাই তাহাদের চিরন্তন প্রথাসমূহ ঘৃণিত ও অবহেলিত হইতেছে। তাহাদের অবিনশ্বর আত্মা ভায়েনার সিংহাসনাধিরূঢ় ব্যক্তির ইচ্ছা, খামখেয়ালি ও দুর্নীতির বশীকৃত হইয়াছে। আর তোমরা উদাস ও নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছ যে এই সব লোকেরা কি খাইতেছে, তাহার মূল্য কত? তাহা যতই হউক সে মূল্য বড় বেশী, কারণ এই লোকেরা নিজেরা তাহার ব্যবস্থা করিতে পারে না। সেই

খাদ্য মহার্ঘই হউক আর সস্তাই হউক তাহা অশ্রুজলে সিক্ত, কারণ দাস জাতির আবার খাদ্য কি ?”

উপরিউক্ত পত্র পাঠ করিলে ম্যাটজিনির মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ইতালীর অবস্থা কতকটা বুঝা যায়।

ম্যাটসিনি বাল্যকাল হইতে মাতৃভূমির শোক-চিহ্নের স্বরূপ কাল পোষাক পরিধান করিতেন এবং অতি বাল্যকাল হইতেই চিন্তাশীল ও বৃদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন।

এখন ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ইতালার বিদ্রোহের বিষয় কিছু না বলিলে ম্যাটসিনির চরিত্রের বিষয় সম্পূর্ণ বলা হইবে না।

মেটারনীচ অষ্ট্রীয়া হইতে যাহা আদেশ করিয়া পাঠাইতেন ইতালীর ক্রীড়াপুত্তলি রাজগণ তাহা করিতে বাধ্য হইতেন, বস্তুতঃ তাঁহারা যেন কলের পুত্তল এবং মেটারনাচ তাঁহাদের ক্রীড়ক, তিনি সূত্র ধরিয়া টান দিলেই ইতালীর শাসনকর্ত্তারা উঠিতেন, বসিতেন। ১৮২০খ্রীঃ, স্পেন দেশে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া রাজার কাছ হইতে কতকগুলি উদার ব্যবস্থা আদায় করিয়া লয়, এবং সেই দৃষ্টান্ত দক্ষিণ ইতালীর নেপল্‌সে্‌র প্রজারা অনুসরণ করে, এবং তাহাদের রাজার নিকট হইতে ঐরূপ কতকগুলি উদার ব্যবস্থা প্রার্থনা করে। রাজা তখন বুরবোঁ বংশের ফার্দ্দিনান্দ। তিনি আন্তরিক মনোভাব গোপন রাখিয়া অতি ঔৎসুক্যের সহিত প্রজাদের প্রাথনা পরিপূরণ করেন এবং প্রজাদের নিকট ঘোষণা করেন যে পরমেশ্বরের কৃপায় এই বৃদ্ধবয়সে প্রজাবর্গকে যে তিনি খুসী করিতে পারিয়াছেন তাহাতে তিনি বিশেষ আনন্দিত ও দেশের নিকট কৃতজ্ঞ। কিছু দিন পরে রাজার প্রতিজ্ঞা দস্তুরমত ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া মন্ত্রীসমাজের ও প্রজাবর্গের সমক্ষে পঠিত হইল। তৎপরে উপরে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুসের প্রতি দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া তিনি বলিলেন, “হে অন্তর্যামিন্ ভগবান্ তুমি আমার হৃদয় জানিতেছ,

ভবিষ্যৎ জানিতেছ, তুমি সর্ব্বজ্ঞানময়, যদি আমি কখন কোন দিন আমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, হে ভূতভাবন কংস দৈত্যারি মধুসূদন সেই মুহূর্ত্তেই তুমি আমায় ধ্বংস করিও।" রাজার পরে তাঁহার পুত্রেরাও ঐরূপ শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, নূতন উদার ব্যবস্থা রাজ্যময় ঘোষিত হইল।

মন্ত্রীপ্রবর মেটারনীচ ও তাঁহার মিত্রবর্গ দেখিলেন যে দক্ষিণ-ইতালী উন্নতির দিকে অগ্রসর। তাঁহারা কিছু ব্যস্তও হইলেন। কারণ তাঁহার জীবন্ত, ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট ক্রীড়াপুত্তলিগণ তাঁহার বিনানুমতিতে কার্য্য করিবে বা প্রজাবর্গকে উদার ব্যবস্থা মঞ্জুর করিবে ইহা মেটারনীচের কোনকালে অভিপ্রেত ও অনুমোদিত নহে। ভায়েনার কংগ্রেসে দক্ষিণ ইতালীর রাজন্যবর্গকে লক্ষ্য করিয়া মেটারনীচ গোটাকতক কথা বলিলেন। যে ক্রীড়া পুত্তলিগণ মেটারনীচের অঙ্গুলী হেলনে বিকম্পিত, ত্রস্ত ও স্তম্ভিত তাহারা সেই কংগ্রেসে মেটারনীচের বাক্যগুলি শুনিয়া একেবারে দমিয়া পড়িলেন এবং সকলের অভিমতে একটী সভায় তাঁহারা সমবেত হইলেন। প্রথমে ট্রপুয়া নামক স্থানে এই সভা হয়, পরে লেবাচের সভায় রাজন্যবর্গ সমবেত হন। এইখানে সেই বুরবোঁ বংশীয় ফার্দ্দিনান্দের বিচিত্র প্রহসন সংঘটিত হয়! ফার্দ্দিনান্দ যেমনি নিজরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া লেবাচের দিকে অগ্রসর হইলেন সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তাঁহার বন্ধু রাজন্যবর্গকে লিখিলেন যে—"আমি প্রজাবর্গকে নিজ ইচ্ছায় উদার ব্যবস্থা অঙ্গীকার ও দান করি নাই। তাহারা জোর পূর্ব্বক আমার নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়াছে এবং আমি আমার সকল দানকেই সংপ্রতি নামঞ্জুর করিতেছি।" লেবাচে এইরূপে অধার্ম্মিক, ভীরু, রাজকুল-চণ্ডাল ফার্দ্দিনান্দের কি কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল!

এখন মেটারনীচ মহানন্দ, তিনি যাহা চান্ তাহা পাইলেন, এবং সেই

মুহূর্ত্তেই একদল অষ্ট্রীয়ান সৈন্য নেপল্‌সে পাঠাইয়া দিলেন। নেপ্‌ল্‌সের প্রজা-সৈন্য হারিল ও পলাইল। ফার্দ্দিনান্দ সভয়ে পুনর্ব্বার রাজ্যে ফিরিয়া সিংহাসনে বসিলেন এবং সেই প্রতিজ্ঞা-পত্র ও অঙ্গীকার-পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া বিধিমতে নিজ চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন! প্রজাদের মধ্যে দলপতিরা কেহ জেলে গেলেন, কেহ বা তৎক্ষণাৎ ফাঁসিকাষ্ঠে প্রলম্বিত হইয়া নরকরূপী ফার্দ্দিনান্দকে দেখা-পাপ হইতে মুক্ত হইলেন; এবং মেটারনীচ অতি আনন্দের সহিত ইতালীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অষ্ট্রীয়ার বন্ধনরজ্জু প্রাণপণে কসিয়া নিজের আশা মিটাইলেন।

ইতালীর অপর অপর নৃপতিবর্গ যেমন মেটারনীচের অঙ্গুলি দর্শনে উঠিতেন বসিতেন পীড্‌মণ্ট্‌ অবশ্য তেমন ছিল না। পীড্‌মণ্ট্‌ মেটারনীচের বড় একটা তোয়াক্কা রাখিত না, তবে মনে মনে একটু ভয় করিত। পীড্‌মণ্ট্‌বাসী উদারনীতির দলস্থ লোকেরা যেমন দেখিল যে অষ্ট্রীয়ার সৈন্যদল ফার্দ্দিনান্দকে সিংহাসনে বসাইতে নেপ্‌ল্‌স অভিমুখে যাত্রা করিল, তখনি মনে করিল এই এক মহাসুযোগ উপস্থিত, এই সুযোগে ইতালীকে স্বাধীন করিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। এই ভাবিয়া তাহারা লোম্বার্ডীর কতকগুলি অসন্তুষ্ট, অত্যাচারপ্রপীড়িত প্রজা আপনার দলে আনিয়া অষ্ট্রীয়ার সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিল। এই কাজটী প্রধানতঃ কার্ব্বোনারী দলের। তাহারা তৎকালীন রাজা প্রথম ভিক্টর ইমানুয়েলকে কিঞ্চিৎ ভীত দেখিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "আমরা আপনার বিশ্বস্ত প্রজা, আপনার কোন ভয় নাই; কিন্তু আপনি কুপরামর্শে চলেন, আমরা সেই কুপরামর্শকারীদিগের হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চাই। এই যুদ্ধ অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে; স্পেনে যেমন রাজা তাঁহার প্রজাদের উদার ব্যবস্থা অঙ্গীকার করিয়াছেন— আমাদের প্রার্থনাও তাই।"

ভিক্টর ইম্যানুয়েল যদিও উদার ব্যবস্থা অঙ্গীকার করিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না, কিন্তু তিনি মেটারনীচকে আন্তরিক ভক্তি ও ভয় করিতেন, সুতরাং অতিশয় দুঃখের সহিত ১৮২১খ্রীঃ, অব্দে নিজকনিষ্ঠ ভ্রাতা চার্লস ফেলিক্সকে রাজসিংহাসন দিয়া নিজে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে বিদ্রোহী দলে বিশৃঙ্খল হওয়ায়, তাহারা অষ্ট্রীয়ার সৈন্যদল কর্ত্তৃক পরাজিত হইল, তাহাদের দলপতিরা ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যে দিকে পারিল সে সেদিকে চলিয়া গেল। নূতন রাজা চার্লস্ ফেলিক্স্ দূরে ছিলেন। একদল বিদ্রোহী প্রজা ফেলিক্সকে চায়, আর একদল তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা চার্লস্ অ্যালবার্টকে চায়, এইরূপে আপোষে বিবাদ আরম্ভ হইল। তাহার ফলে অষ্ট্রীয়া আবার দশ গুণ অত্যাচার লোম্বার্ডীতে বাড়াইয়া—অতি আনন্দ সহকারে রাজ্য করিতে লাগিল। জেলখানায় বন্দীদিগের বাহুল্যে স্থানাভাব হইল, এবং প্রত্যেক ইতালীবাসীর জন্য রাজ-চর নিযুক্ত হইয়া তাহাদের কার্য্যের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অশেষবিধ অমানুষিক যন্ত্রনায় জর্জ্জরিত হইয়া ইতালীবাসী অনেক অকথ্য কথাও প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতে লাগিল। এইটী ১৮২১ সালের ইতালীর প্রথম বিদ্রোহ।

এই সময়ে ম্যাটজিনির বয়স ১৬ বৎসর, তিনি এই বয়সেই আপনার কর্ত্তব্য ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্যক জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই সময়ে এক দিন তিনি তাঁহার মাতার একটী বন্ধুর সহিত রবিবারে জেনোয়ার রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন। এমন সময়ে একটী দীর্ঘাকৃতি, কৃষ্ণশ্মশ্রুধারী কঠোরদৃষ্টি, বিদ্যুত-বর্ষী-কটাক্ষলোচন, তেজঃপুঞ্জকলেবর একটী লোক দেখিতে পাইলেন। সেই মহাত্মা একটী রুমাল বাহির করিয়া বলিলেন "ইতালীর বিদ্রোহীদলের বিপন্নদিগের জন্য।" এই ঘটনাটী যদিও সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর তথাপি ম্যাটজিনি জীবনে ইহা কখন ভুলেন নাই এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ইহা গভীর হইতে

গভীরতর হইয়া অঙ্কিত হইয়াছিল। তাঁহাকে যে সময় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল সেই সময় সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও দেশহিতৈষী ইতালীবাসীরা যদি নৈরাশ্য-সাগরে নিমগ্ন হইতেন তবে তাহা কিছুই আশ্চর্য্য হইত না। কিন্তু তাঁহারা তাহা হন নাই। আবার সেই সময়ে যত মহাত্মা জন্মিয়াছিলেন এবং ১৮৪৮ খ্রীঃ পূর্ব্বে যে যে মহাত্মা ইতালীর দুর্দ্দশা, অবনতি, ও দুর্ভাগ্য দেখিয়া তাহা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে যে মহাপুরুষগণ ব্যাকুল অন্তরে জননী জন্মভূমির মর্ম্মভেদী স্বর শুনিয়া মাতৃসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা অতি দীনভাবে ও দৃঢ়মনা হইয়া ইতালীর কাজে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই জোসেফ ম্যাটসিনির ন্যায় এই সুমহান্ সংকল্প সাধনে যত্নবান ও পবিত্র স্বর্গীয় উৎসাহে উৎসাহিত ছিলেন না। উক্ত ১৮২১ সালের বিদ্রোহের পরই যে ঐ দৃশ্যটী তিনি দেখেন সেই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেন, যে "আমার স্বদেশে জন্মভূমিতে, অন্যায় অত্যাচারের বিষয় যখনই আমি জানিতে পারিলাম সেই মুহূর্ত্তেই এই চিন্তা আমাতে আসিল যে, এই অত্যাচার নিবারণ করা সকল ইতালীবাসীর পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং আমিও অবশ্য এই পবিত্র কার্য্যে যোগ দিব। এই সংকল্প ভবিষ্যতে আমাকে কখনও ত্যাগ করে নাই। যখন সেই মহাপুরুষকে আমি রুমাল হাতে ইতালীর বিপদাপন্ন লোকদিগের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শুনিলাম সেই মুহূর্ত্তেই এই চিন্তা আমাকে ঘিরিল। সেই সকল আপন্ন ব্যক্তিরা—যাঁহাদের মধ্যে উত্তরকালে অনেকে আমার বন্ধু হইয়াছিলেন—তাঁহাদের স্মৃতি আমি যেখানে যাইতাম সেইখানে আমাকে অনুসরণ করিত এবং রাত্রিকালে স্বপ্নযোগেও সেই স্মৃতি আমাকে ভুলিত না। সেই সকল লোকদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইবার জন্য পৃথিবীতে অদেয় আমার কিছুই ছিল না। আমি তাঁহাদের নাম ও

ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম, অতিশয় মনোযোগ সহকারে সেই যুদ্ধের বিবরণ পাঠে নিযুক্ত হইলাম এবং নিরতিশয় যত্নসহকারে পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।"

ম্যাটসিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কার্বোনারী দলে প্রবেশ করিলেন এবং এইরূপে রাজনৈতিক আন্দোলনে জীবনযাপন করিবেন তাহা নিশ্চয়রূপে স্থির করিলেন। এই কার্বোনারী দলে প্রবেশ তাঁহার প্রথম আত্মবলি। তিনি বাল্যকাল হইতে শাস্ত্র আলোচনায় জীবনযাপন করিবেন এইটাই ইচ্ছা ছিল। তিনি বলিতেন, "আমার মনশ্চক্ষের উপরে সহস্র সহস্র নাটকের ও নবন্যাসের দৃশ্য প্রতিভাত হইত। কিন্তু জাতীয় দুর্দশা আমাকে আমার স্বাভাবিক বৃত্তি অনুশীলন করিতে না দিয়া এই পথে আসিতে বাধ্য করিয়াছিল।" ম্যাটজিনি অতি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে সে সময়ে সাহিত্য বা কাব্যানুশীলন বিপজ্জনক, সমস্ত মনোযোগ আবশ্যকীয় রাজনৈতিক সমস্যা পূরণ করিতে দিতে হইবে। তিনি বলিতেন— সকল পরাধীন জাতির পক্ষেই যে কথা খাটে—"যাহাদের দেশ নাই, যাহাদের স্বাধীনতা নাই, যাহারা দাস, তাহাদিগের মধ্যে কচিৎ দুই একটী কল্পনাবিশিষ্ট সিদ্ধপুরুষ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে অধীন! কল্পনা কখনই মর্ম্মস্পর্শী হয় না। সেইজন্য আমাদের সকলের উচিত যে সর্ব্বত্যাগী হইয়া "আমরা স্বদেশকে নিজের করিতে পারিব কি?" "আমাদের দেশ কি আমাদের হবে?"—এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাবজ্জীবন সকলেরই জীবন উৎসর্গ করা। এই রাজনৈতিক প্রশ্নের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সতত অগ্রসর হইতে হইবে। যদি আমরা কৃতকার্য্য হই, তবে আমাদের বংশধরেরা আমাদের সমাধি মন্দিরের উপরে স্বাধীন ইতালীর স্বাধীন কাব্য, কলা, নাট্য বিকসিত করিয়া পত্র পুষ্প ও শাখায় সমৃদ্ধিশালী করিবে।"

"ইতালীজাতি তাহার দেশ পাবে কি?" এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ম্যাটজিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ম্যাটজিনি প্রথমতঃ যেরূপে ও যে উপায়ে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি এবং ম্যাটজিনি নিজেও তাহা ছিলেন না। কার্ব্বনারীর নিশীথ সভাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। কিন্তু যে সময়ে তিনি স্বদেশের কার্য্য আরম্ভ করেন সেই সময়কার অবস্থা বিচার করিলে উপায়ান্তর ছিল না দেখা যায়। সেই সময়কার একজন কবি গাহিয়াছিলেন—"আজ 'ইতালা' এই নাম উচ্চারণ করাই ইতালীবাসীর পক্ষে মৃত্যুর সমান।"

১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে জুলাই মাসে রাষ্ট্র বিপ্লব হয়। তাহার কিছুদিন পরে ম্যাটজিনি যখন কারবোনারী দলের একটী সামান্য আদেশ পালন করিতেছিলেন সেই সময়ে তিনি রাজনিযুক্ত একটী গুপ্তচর দ্বারা পাশবদ্ধ হন এবং ধৃত ও বন্দীকৃত হইয়া সাভোনা দুর্গে নীত হন। রাজপুরুষেরা তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, "যে বুদ্ধিমান যুবকদের চিন্তার বিষয় শাসনকর্ত্তারা জ্ঞাত নহেন তাহারা কখন রাজপুরুষের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন না।" ছয় মাসের পর তিনি মুক্ত হন। কিন্তু স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর মাত্র।

ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বহু অমানুষ-মধ্যে
পুরুষোত্তম পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

গত ২রা অগাষ্ট শিয়ালদহের দ্বিতীয় শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী তাঁহার সহযোগী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের সহিত একত্র একটা ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেছিলেন; এই বিচারের সময় অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হরিশ বাবু সহসা কল্পনা করিলেন আসামী পক্ষের উকীল বাবু হেমেন্দ্র নাথ মিত্র আদালতের অপমান করিয়াছেন। বাবু হেমেন্দ্র নাথ মিত্র হাইকোর্টের উকীল, অবৈতনিক বিচারকগণ স্থানীয় মোক্তারগণের নিকট যে প্রকার স্তবস্তুতি ও আরাধনা লাভ করেন, হেমেন্দ্র বাবু বোধ করি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে তাহা প্রদান করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত আত্মসম্মানবিশিষ্ট ব্যক্তি আদালতের অপমান করিবেন তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না, এবং এখন যে সকল ঘটনা সাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়াছে তাহা হইতে আদালত-অবমাননার কোন প্রসঙ্গ আবিষ্কার করিতে পারা যায় না। যাহা হউক, মানুষ নানা রকমে প্রসিদ্ধি লাভ করে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত অবৈতনিক হাকিম বাবু হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীও প্রসিদ্ধিলাভের সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না, তিনি আদালত-অবমাননার অভিযোগে প্রথমে হেমেন্দ্র বাবুকে হাজতে পাঠাইতে প্রস্তুত হইলেন, অবশেষে কি ভাবিয়া জানি না, তাঁহার পাঁচ টাকা জরিমানা করিলেন; এই মামলার কাহিনী বর্ণনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

হেমেন্দ্র বাবুর ন্যায় একজন সম্ভ্রান্ত হাইকোর্টের উকীল যে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের দুর্দ্দমনীয় প্রতাপে অভিভূত হইয়া পড়েন, সেই হাকিমের নিকট আদালতের সাধারণ মোক্তারগণকে কতদূর লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় তাহা অনুমান করিবার জন্য অধিক কল্পনা

পরিচালনের আবশ্যক নাই। আমাদের দেশের লোক উদরান্ন সংগ্রহের জন্য সকল প্রকার হীনতাই নতশিরে বহন করিতেছে, এবং অনেকে এরূপ নির্লজ্জ যে অনায়াসে সাধারণের নিকট অসঙ্কোচে ও বিশেষ গৌরবের সহিত প্রকাশ করিয়া বলিতেছে, 'কি করিব বল পেটের দায়ে ইহা করিতেছি।'—সকল শ্রেণীর মধ্যেই এরূপ বেহায়া লোক আছে। শিয়ালদহের বৈতনিক ও অবৈতনিক হাকিমগণের নিকট হইতে বিবিধ অপমান লাভ করিয়াও মোক্তারগণ অনন্যোপায় হইয়া এত দিন তাহা সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, সেই সকল অপমানের ধারাবাহিক বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্যও এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে।

যাহা হউক, হেমেন্দ্র বাবুর ন্যায় একজন সম্ভ্রান্ত সহযোগীকে এ ভাবে অবমানিত হইতে দেখিয়া শিয়ালদহের মোক্তারগণ আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না, তাঁহারা এবং কোন কোন উকীল প্রতিজ্ঞা করিলেন হরিশ বাবুর এজলাসে আর তাঁহারা মামলা করিতে যাইবেন না। সপ্তাহ কাল এই প্রতিজ্ঞা অনুসারেই কাজ চলিল, হরিশ বাবু স্থানীয় ডেপুটী মৌলবী বজলল করিমের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, হরিশ বাবুর ফাইলে বহু সংখ্যক মামলা স্তূপাকারে পড়িয়া থাকিল। কিন্তু তাহা ডেপুটী হাকিম কিম্বা তাঁহার সহযোগীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না।

কিন্তু এভাবে দীর্ঘকাল কাজ চলিতে পারে না। ১১ই আগষ্ট সোমবার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মৌলবী বজলল করিম মহাশয় মোক্তার-দিগের এই আত্মসম্মান জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ক্রোধে অন্ধ হইলেন, তিনি মোক্তারগণের এই যোটবন্ধনকে গাড়োয়ানের ধর্ম্মঘটের সহিত তুলনা করিয়া তাহার প্রতি মৌলবী-জনোচিত ঘৃণা প্রকাশ করিলেন, এবং যে সকল মোক্তার এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করেন নাই বলিয়া স্বীকার করিলেন, কেবল তাঁহাদেরই দরখাস্ত গ্রহণে সম্মত হইলেন। সোমবারে মৌলবী সাহেবের রুদ্ধ ক্রোধ তাঁহার অন্তর্নিহিত থাকিয়া

মঙ্গলবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার পেস্কারকে আদেশ করিলেন, যে সকল মোক্তার ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে তাহাদের দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে না। কেবল তাহাই নহে, সেইদিন মৌলবী সাহেব এজলাসে প্রবেশ করিয়াই জলদগম্ভীর স্বরে প্রকাশ করিলেন, যে সকল মোক্তার নিয়োগীবাবুর নিকট মামলা করিতে অসম্মত, তাহাদের দরখাস্ত ফেলিয়া দেওয়া হইবে।

এই আদেশে মোক্তারগণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল, অনেকেই পেটের দায়ে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, নিজের সম্মান, সংকল্প, প্রতিজ্ঞা, সৎসাহস সকলই ডেপুটী সাহেবের এই কঠোর আদেশরূপ বন্যার জলে ভাসিয়া গেল। লালা পুন্নিলাল একজন বৃদ্ধ মোক্তার, এ স্রোতে তাঁহাকেই প্রথমে হাল ছাড়িয়া দিতে হইল। মৌলবী সাহেব তাঁহাকে এজলাসে সমাগত দেখিয়া ক্রোধান্ধচিত্তে হিন্দীর উৎস উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "তোম্‌ভি ইস্‌মে হ্যায়?" অর্থাৎ তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান এতই লোপ পাইয়াছে যে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য, লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত এতবড় দুষ্কর্ম্মটা করিয়া বসিয়াছ? লালাজি চতুর্দ্দিকে সর্ষপ-পুষ্প নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ধর্ম্মঘটে তিনি যোগ দিয়াছেন সে কথা অস্বীকার করিতে পারেন না, আবার তাহা স্বীকার করিবার সাহসও তাঁহার হইল না, যদি দিন্ দুনিয়ার মালিক ডেপুটী সাহেব তাঁহার ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করেন! অনাহার ও অকাল মৃত্যুর করালছায়া অদূরে নিরীক্ষণ করিয়া লালাজীর সাহস ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান বিলুপ্ত হইল, তিনি মৌলবী সাহেবের নিকট যে কৈফিয়ৎ প্রদান করিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে, আমি ত ইংরাজী জানি না, অন্য মোক্তারেরা আমাকে যাহাতে সহি করিতে বলিয়াছে আমি তাহাতে সহি করিয়াছি; অর্থাৎ ধর্ম্মঘট আমি করি নাই, তাহার কথাও আমি জানি না, কতকগুলি

মোক্তারের কুপরামর্শে পড়িয়া মনের ভুলে তাহাদের প্রতিজ্ঞাপত্রে একটা সহি করিয়া ফেলিয়াছি মাত্র, আমার অসৎ উদ্দেশ্য কিছুই ছিল না। যাহারা নিজের দায়িত্ব এভাবে পরের স্কন্ধে চাপাইয়া ভাল মানুষ সাজিতে চাহে তাহাদের সংখ্যা পৃথিবীতে অল্প নহে, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের এ হতভাগ্য দেশে তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এরূপ নির্লজ্জতা ও ভীরুতা প্রদর্শন করিতে এ দেশের অনেক ভদ্র নামধারী শিক্ষিতাভিমানী দ্বিপদগণের কিছুমাত্র কুণ্ঠা নাই! যাহা হউক, মৌলবী সাহেব বৃদ্ধ লালার কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তিনি এই চাতুর্য্য বুঝিতে পারিয়া লালা মোক্তারকে উপদেশচ্ছলে বলিলেন, "তোম বুড্ঢা আদ্‌মি হোকে এসা কাম কিয়া! তোমারা দরখাস্ত নেহি লেগা।" বৃদ্ধের জ্ঞান নেত্র অবিলম্বে উন্মোচিত হইল, তিনি বুঝিলেন এতখানি আত্মসম্মান লইয়া মোক্তারী ব্যবসায় চালান বিড়ম্বনা মাত্র, তিনি 'মান যাক্ প্রাণ থাক্' এই নীতি অবলম্বনীয় জ্ঞান করিলেন, তিনি কাতর বাক্যে ডেপুটী সাহেবের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিলেন। তখন অন্যান্য মোক্তারেরা অনন্যোপায় হইয়া 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'র অনুসরণ করিলেন, বড় বড় মোক্তারেরা ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া, তাঁহাদের নিজের সম্মান, প্রতিজ্ঞা, মনুষ্যত্ব পদদলিত করিয়া মৌলবীর পদলেহনে প্রবৃত্ত হইলেন, স্বকৃতকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শিয়ালদহ ফৌজদারী আদালতে একতা, তেজস্বিতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের ত্রিবর্ণাঙ্কিত পতাকা উড্ডীন হইয়া স্বাধীন মোক্তারী ব্যবসায়ের বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল!

কিন্তু এই মোক্তারযূথের মধ্যে একজন সে দিন বাঙ্গালী নামের সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন, নিজের প্রতিজ্ঞা হইতে তিনি বিচলিত হন নাই, পেটের দায়ে হীনতার পঙ্ক সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত করেন নাই। এই মোক্তারের নাম শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ; পূর্ণবাবু প্রবীনও নহেন

প্রাচীনও নহেন, অপেক্ষাকৃত নবীন মোক্তার। অতিরিক্ত বৈষয়িক বুদ্ধি তাঁহাকে কাপুরুষ করে নাই, ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে, এ চিন্তা তাঁহাকে অধীর করে নাই। এরূপ লোক এ দেশে সহস্রের মধ্যে দশজন থাকিলে আমরা বাঙ্গালী বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারি; আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়া আমরা পুলকিত হইতে পারি; যাহারা এখন আমাদিগকে অসঙ্কোচে পাদুকা প্রহার পূর্ব্বক অনুগ্রহ করিতেছে, তাহারা কিঞ্চিৎ সম্মান করিতে শিখে।—যখন অন্যান্য মোক্তারগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া গড্ডলিকাপ্রবাহের সৃষ্টি করিলেন, তখন পূর্ণ বাবু তাঁহার মক্কেলের পক্ষে একটা বর্ণনা দাখিল করিবার জন্য মৌলবীর কোর্টে অগ্রসর হইলেন, তাঁহাকে সন্নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মৌলবী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এই ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছ?" পূর্ণ বাবু তাহা অস্বীকার করিলেন না, মিথ্যা কথা বলিয়া নিজের অর্থোপার্জ্জনের পথ অক্ষুণ্ণ রাখিলেন না, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অপদার্থতার পরিচয় দিলেন না। পরিপূর্ণ সাহসে বলিলেন, "হাঁ যোগ দিয়াছি।" মৌলবী সাহেব বোধ করি বাঙ্গালী মোক্তারের নিকট এতখানি স্বাধীনচিত্ততা দেখিবার প্রত্যাশা করেন নাই, তিনি সরোষে বলিলেন, "লে যাও, লে যাও, নেহি লেগা।"—মোক্তার পূর্ণবাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি বলিলেন, "মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিতে হুকুম দেন।" মৌলবী সাহেবের সে সাহস ছিল না, যাহারা অন্যায় হুকুম জাহির করে তাহারা সাধারণতঃ কাপুরুষ হয়, এবং সেই কাপুরুষতায় আঘাত করিলে তাহারা একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠে, পূর্ণবাবুর ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনায় সেই বিচারনিধানের ক্রোধসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কনষ্টেবল নিকাল দেও নিকাল দেও, বৃটীশ রাজত্বে ধর্ম্মঘট!"—কনষ্টেবল ও চাপরাশীগণ ধর্ম্মাবতারের আদেশ পালনে অগ্রসর হইল দেখিয়া পূর্ণবাবু

স্বয়ং আদালত গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরে আসিলেন। এজলাসের পার্শ্ববর্ত্তী একটি কক্ষ হইতে অবৈতনিক বিচারক হরিশ বাবু এই অভিনয় সন্দর্শন পূর্ব্বক বিলক্ষণ মজা অনুভব করিতেছিলেন। অন্যান্য মোক্তারগণ, যাঁহারা ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়া অবশেষে উদরান্নে ভস্ম নিক্ষিপ্ত হয় দেখিয়া প্রাণের ভয়ে হাকিমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বোধ হয় পূর্ণবাবুকে এবারে অবমানিত হইতে দেখিয়া উৎসাহ ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন! পূর্ণবাবু তাঁহাদের চক্ষে কাণ্ডজ্ঞানহীন, বৈষয়িক-বুদ্ধিশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন।

কিন্তু পূর্ণবাবু ইহাতেও বিচলিত হইলেন না। ১৬ই অগাষ্ট তাঁহার এটর্নি মেসার্স লেসলি এণ্ড হাইণ্ডস্ তাঁহার পক্ষে উক্ত মহামহিম বিচারপতি মৌলবী বজলল করিমের উপর এক নোটীস্ দিয়া জানাইয়াছেন মৌলবী সাহেব যদি তাঁহার অবিবেচনা ও ধৃষ্টতার জন্য পূর্ণবাবুর নিকট প্রকাশ্যভাবে ক্ষমা প্রার্থনা না করেন তাহা হইলে তাঁহার নামে খেসারতের মামলা উপস্থিত করা হইবে।

মৌলবী সাহেব এ নোটীসের কি উত্তর দিয়াছেন তাহা জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মোক্তারকে তাঁহার সৎসাহস ও মনুষ্যোচিত দৃঢ়তার জন্য সাধুবাদ না দেওয়া আমাদের অকর্ত্তব্য। যেখানে তাঁহার অগ্রণীগণ একে একে রণে ভঙ্গ দিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন, সেখানে তিনি একাকী অন্যের সহায়তা ও সহানুভূতি বঞ্চিত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত অন্যায় ও যথেচ্ছাচারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, এ দৃশ্য দেখিলে ধন্য বোধ করিতে হয়। বিষয়জ্ঞান-সম্পন্ন অতিসতর্ক বহু অমানুষ মধ্যে পুরুষোত্তম পূর্ণবাবু একাকী কর্ত্তব্য জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়া মোক্তার সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

শরতের আবাহন।

ওরে প্রবাসি তোর প্রবাসের কাজ
তাড়াতাড়ি সেরেনে ;
ঐ ছাখ্ তোর গৃহের দুয়ারে
আসিয়া দাঁড়াল কে।
স্নেহ-কম্পিত পুরাতন স্বরে
ডাকিয়া তোদের বারবার ক'রে
বরষের পরে ফিরে তোর দ্বারে
আসিয়া দাঁড়াল কে--
তোর প্রবাসের কাজ তাড়াতাড়ি সেরেনে।

গলিত স্বর্ণরঞ্জিত-বাস মণ্ডিত চারু কায়
চরণ ফেলিতে শত শতদল ফুটে' উঠে পায় পায়
শুভ্র সুহাস শান্ত অধরে
মোহন সুষমা অঙ্গে না ধরে
বরষের পরে আজি তোর দ্বারে
হাসিয়া দাঁড়াল কে—
* প্রবাসের কাজ তাড়াতাড়ি সেরনে।

আকাশ তাহারি মাধুরি মাখিয়া হাসিছে হরষ-রসে
নিশ্বাসে তার বিশ্ব শিহরে পুলক-রস-পরশে
শেফালির মালা জড়াইয়া কেশে
ললিত রাগিণী গাহি' উল্লাসে
বৎসর শেষে সুধাহাসি হেসে
কে ঐ আসি রে--

* * কাজ তাড়াতাড়ি সেরেনে।

শরৎ তোদের ডাকিতে এসেছে আয়রে ফিরিয়া ঘরে
শত ম্লান আঁখি চেয়ে আছে যেথা
কত আগ্রহ ভরে।
পিতার শান্তি, মাতার তৃপ্তি
ভাই বোনেদের হরষদীপ্তি
গৃহের শরৎলক্ষ্মী যেথায়
দুয়ারে দাঁড়ায়ে রে—
* * * তাড়াতাড়ি সেরেনে—
ওরে প্রবাসি তোর প্রবাসের কাজি
তাড়াতাড়ি সেরেনে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

গর্জ্জন-সরস্বতী-সংবাদ।

গর্জ্জন। হ্যা দেখ-ভারতী, তোমাকে ভারতবর্ষ ছাড়তে হবে। ওঠ, আমার সঙ্গে চল।

সরস্বতী। বৎস তুমি কে?

গর্জ্জন। আমি ভারতবর্ষের রাজা, অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি। ও একই কথা। আমি নামে প্রতিনিধি, কাজে রাজা, আর যিনি নামে রাজা, তিনি কাজে—থাক্ সে সব ঢের কথা,—বল্‌তে গেলে দিন ফুরিয়ে যায়। Constitutional monarchy ও benevolent despotism এর যে কি প্রভেদ অর্থাৎ আমাদের রাজ্যতন্ত্র যে কি জিনিষ তা বুঝ্‌তে হলে অনেক ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও খৃষ্টধর্ম্ম জানা চাই। চিরজীবন ঐ নিয়ে যে না পড়ে আছে, সে তার মর্ম্মগ্রহণ করতে পারে না। এক কথায়, অমনটি আর হয় না।

সর। ভারি আশ্চর্য্যত! শুধু দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম নিয়ে রাজনীতি?

গর্জ্জন। আমাদের জাতকে অত বোকা ঠাউরো না। তুমি যা ভাবছ ঠিক তার উল্টো। আমাদের রাজনীতি কেন, সকল নীতির মূল হচ্ছে অর্থনীতি,—তবে দর্শন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের নামে সব চলে।

সর। অর্থাৎ তোমরা আসলে বেনে, ব্রাহ্মণ বলে' শুধু নিজেদের পরিচয় দেও। তোমাদের দেখছি সবই বেনামী চলে। তা ভাল, আমি তর্কের খাতিরে মেনে নিচ্ছি তুমি এদেশের রাজা,—কিন্তু তাই বলে' যে তোমার হুকুমে আমাকে দেশ ছাড়তে হবে, এ কোন্ কথা? সরস্বতীত রাজার অধীন নয়।

গর্জ্জন। তোমার দেখছি আজও সেকেলে সব ভুল ভাঙ্গেনি। চোখে না দেখ্‌লে, হাতে হাতে প্রমাণ না পেলে তোমরা দেখছি কোন কথা মেনে নিতে পার না। দু'দিন পরে, যদি বেঁচে থাক ত দেখতে পাবে আমার ইচ্ছায় ইন্দ্রজালে ইন্দ্রপ্রস্থ আবার কবর থেকে গাঝাড়া দিয়ে উঠেছে। সেখানে অপূর্ব্ব বিরাট রাজসূয় যজ্ঞের অভিনয় হচ্চে, রাজা মহারাজাদের সব পুতুল নাচ হচ্চে। সে যে কি ব্যাপার হ'বে, বর্ণনা করলে প্রত্যয় করবে না। তোমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হবে। অধিক কথা কি, আমার কাছেই দিল্লীর অভিষেক একটা স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ও বিষয়ে

রাত্তিরে স্বপ্ন দেখি, দিনে স্বপ্ন দেখি। রাজত্ব করা কা'কে বলে, ভারতবাসী এবার তা জানতে পাবে। তোমার বিশ্বাস তুমি রাজার অধীন নও। তোমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে একবার গেলে তোমার মুখ দিয়ে ও কথা আর বের হবে না।

সর। সে কোথায়?

গর্জ্জন। সিমলেয়।

সর। সিমলে কোথায়?

গর্জ্জন। হিমালয়ে।

সর। অলকার কাছাকাছি? সেত কুবেরের রাজ্য। সেখানকার লোক ত আমার ধার ধারে না। আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে কার কি লাভ? এবে অতি অদ্ভুত খেয়াল। আমার সঙ্গে রসিকতা করছ বুঝি?

গর্জ্জন। রসিকতা আমার ধাতে নেই। কেউ বল্‌তে পারবে না যে আজ পর্য্যন্ত আমার মুখে কেউ একটা সরস বাক্য শুনেছে। আমি কাজের লোক। আমি বর্ত্তমান কর্ম্মযুগ মূর্ত্তিমান। আমি সব নূতন করব। কিছু যদি মাথা থেকে বার করতে পারি তাহ'লে যা' পুরণো আছে তাই উল্টে দেব। আমার মস্তিষ্কে খেয়াল্ নেই। আছে শুধ্ প্রতিভা।

সর। পুরাতন উল্টে দেওয়াই যদি তোমার নূতনত্ব হয়, তাহ'লে তুমি দেখ্‌ছি যা অতি পুরাতন তাই ফিরে আনবে।

গর্জ্জন। তা' হতে পারে। কিন্তু আমি স্থির করেছি, যা আছে তা' রাখ্‌ব না। যা' আছে তাই যদি থাকেত হ'ল কি? তাহলে আমি রইলুম কোথায়? আমি করব বদল, তা'তে হবে কি সে পরের ভাবনা, সে অপরের ভাবনা। আমি আমার জন কর্ত্তক অধীন ও অনুগত লোককে, সরস্বতীকে নিয়ে কি করা যায় তাই স্থির করবার ভার দিয়েছিলুম। তারা পরামর্শ দিয়েছে তোমাকে সিমলের কয়েদে রাখতে হবে।

সর। আমার অপরাধ?

গর্জ্জন। তুমি একেবারে অধঃপাতে যাচ্ছিলে। তোমাকে নিয়ে সকলে একটা বারোয়ারির ব্যাপার করে তুলেছে। তোমার মন্দির দ্বিতীয় শ্রীক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, ছত্রিশ জাতের জন্য তার অবারিত দ্বার। এই সব দেখে শুনে আমরা তোমাকে স্থানান্তর করাই সিদ্ধান্ত করেছি। অতি উচ্চ, অতি পবিত্র স্থানে নিয়ে যাচ্ছি।

সর। তোমরা আবার জাতিভেদ মান না কি?

গর্জ্জন। তোমাদের ভাবে নয়। আমরা শুধু দুই জাত জানি, শুধু দুই জাত মানি, ধনী আর নির্ধনী। আমাদের জতিভেদের গোড়ায় হিসেব আছে, তোমাদের নেই। তোমার দুয়োরে এত দরিদ্র এসে ভিড় করেছ, সে উৎপাৎ আর সহ্য হয় না।

সর। এত লোক আমার মন্দিরে কেন ছুটে আস্‌ছে সেটা কি একবার ভেবে দেখেছ ?

গর্জ্জন। ওত ভাবুবার দরকার নেই—অতি সোজা কথা। হতভাগারা তোমাকে অন্নপূর্ণা বলে' ভুল করে বোলে।

সর। আহা, বেচারাদের পেটে ক্ষিধে ও পিঠে অপমানের বোঝা। ধনং দেহি মানং দেহি বলেই যদি আমার পুজো করতে আসে তা'তে তাদের প্রতি মায়া হওয়া উচিত, রাগ করা উচিত নয়।

গর্জ্জন। রাগ হবেনা ? যে উদ্দেশ্যেই আসুক, তোমার সঙ্গে অল্প পরিচয় হ'লেই তারা আর কপালে বিশ্বাস করে না, নিজের দুরবস্থার জন্যে আমাদের দোষ দিতে সুরু করে। সুতরাং তোমার মন্দিরে আর গরীব ঢুকতে দেওয়া নয়।

সর। আমিত জানতুম আমার রাজ্যে দারিদ্র্য পাপ বলে' গণ্য নয়। বরং লক্ষ্মীর বরপুত্রেরাই আমার ছায়া মাড়ান না।

গর্জ্জন। তাই নাকি ? হাতে হাতে তোমার ভুল দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি লক্ষ্মীর বরপুত্র। কিন্তু তুমি আমাদের দেশের সরস্বতীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই জান্‌তে পাবে তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ।

সর। তুমি তাঁরও বরপুত্র নাকি ?

গর্জ্জন। না ; তিনি আমার সেবাদাসী।

সর। বাছা, বাক্ তোমার রসনায় অধিষ্ঠাত্রী হয়েছেন অস্বীকার করবার যো নেই, তবে তিনি দেবী কি না সে স্বতন্ত্র কথা। নিজের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন বল দেখি সিমলেই আমার কি ব্যবস্থা হল ?

গর্জ্জন। আমার কথা ছেড়ে দেবে কি ? এখন থেকে আমাকে বাদ দিয়ে তোমার আর অস্তিত্ব থাকবে না। সিমলেতে Prospect Hillএর উপর তোমার জন্যে ছোট একটি মন্দির করে দেব,—আমি হব তার প্রধান পাণ্ডা। তোমার মন্দিরে পশ্চিম দিকে একটি ছোট দুয়ার থাকবে, যিনি তোমার উদ্দেশে সিমলে পর্য্যন্ত উঠতে পারবেন, তিনি আমাদের অনুমতি নিয়ে তোমার দর্শন পেতে পারবেন। তাঁকে বেশ ভালরকম

দর্শনী দিতে হবে। পূজা চল্‌বে আমার মতে, আমার নিয়মে। যাত্রীদের দীক্ষা হবে আমার কাছে, আমি তাদের কাণে মন্ত্র দেব, তাই তাদের ইহজীবন জপ্‌তে হবে। শুধু রাজা হয়ে আমি আমার সব বিদ্যে দেখাতে পারিনে, আমি উপরন্তু গুরু হ'তে চাই; একাধারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দেখাতে চাই।

সর। আর বৈশ্যটা বাদ যায় কেন? ছ'ই ভুলে যাই ওত তোমাদের আসল জাত।—মন্দিরের পূজরী হবে কা'রা?

গর্জ্জন। বেশীর ভাগ সাদা; দু'চারটি কালো। এক কথায়, যারা উপযুক্ত, অর্থাৎ আমাদের মনোমত।

সর। তবে দেখছি মন্ত্র পড়া হবে শুধু ইংরেজীতে। সংস্কৃত আর কাণে শুনতে পাব না।

গর্জ্জন। সংস্কৃত থাকবে বই কি? কিন্তু সেও ইংরেজের মুখে।

সর। কেন?

গর্জ্জন। সংস্কৃতের মান আমি বাড়াতে চাই। সেই জন্য সংস্কৃত অধ্যাপকদের বেশী ধন দেওয়া চাই।

সর। সুতরাং অধ্যাপকও ইংরেজ হওয়া চাই?

গর্জ্জন। এ দেশের লোকদের একটা রোগ আছে, যে আমাদের কোন কথার ঠিক অর্থ না বুঝতে পারলেই, অমনি ধরে' নেয় যে তার ভিতর একটা কুমৎলব আছে। এটা তারা ভুলে যায় যে, কার্য্যের ফলাফল যে কি হচ্ছে বা হবে তাই বিচার করবার অধিকার তাদের আছে, কর্ত্তাদের মনোভাব কারও বিচারাধীন নয়। উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের তফাৎটা কি, তা' তারা জানে না। উদ্দেশ্য মন্দ ও অভিপ্রায় ভাল, এ যে হ'তে পারে, এ তাদের ধারণার বহির্ভূত। আমাদের আইন না জান্‌লে motive ও intentionএর প্রভেদ কেউ বুঝতে পারে না। আমাদের অভিপ্রায় নিয়ে টানাটানিতে তোমাদের কোন লাভ নেই। ষাঁড়ের সঙ্গে ঝগড়া করা ঝকমারি। আসল কথা, এবার নূতন ধরণে সংস্কৃত চর্চ্চা হবে। তাই সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপকদের, ইংরেজীতে যাকে বলে critical scholarship, তাই থাকা চাই। উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে উচ্চতর সমালোচনার (higher criticismএর) যোগ থাকা চাই।

সর। সে কি ব্যাপার? শুনে যে ভয় হচ্চে।

গর্জ্জন। কি করে' বেদ, পুরাণ আগম নিগম সব অপ্রমাণ করতে হয়, সেই সব

বিদ্যে থাকা চাই। এই নূতন অধ্যাপকরা প্রমাণ করিবেন যে, হিন্দুর ধর্ম্ম ছেলেমী, হিন্দুর দর্শন পাগলামী, সংস্কৃত সাহিত্য গ্রীকের অনুকরণ, এ দেশের জ্যোতিষশাস্ত্র ও বেদ্যশাস্ত্র ইউরোপ হ'তে চুরি। তাঁরা আরও প্রমাণ করতে পারবেন যে, তোমরা যে সব শাস্ত্র অনাদি মনে কর, সে সব খৃষ্ট জন্মাবার পরে লেখা। এরকম পাণ্ডিত্য এদেশে নেই বলে' আমাকে বাধ্য হয়ে বিলেত থেকে বিদ্বান আনতে হবে।

সর। বিলেতী পণ্ডিতরা কি সংস্কৃত ভাষায় এতদূর সুপণ্ডিত?

গর্জ্জন। আমিত ভাষায় কথা বলিনি, আমি শাস্ত্রের কথা বলছি। Critical Scholarshipএর সঙ্গে ভাষা জানার সঙ্গে কি সম্বন্ধ? ইউরোপিয়েরা সংস্কৃত ভাষা ভাল বুঝতে পারেন না, কিন্তু শাস্ত্রের সমালোচনায় তাঁরা অদ্বিতীয়।

সর। ওঃ বুঝেছি। তোমার দেশের পণ্ডিতেরা যে বিষয় যত কম জানেন, সেই বিষয়ে তত ভাল সমালোচনা করেন। বাছা, তুমি কি কখন কোন বিষয়ে ভাল সমালোচনা করে থাক?

গর্জ্জন। তুমি দেখছি সংবাদ পত্র পড় না। নইলে এ প্রশ্ন করতে না। কোন্ বিষয়ে আমি ভাল সমালোচনা করিনি ও করিনে এ কথা কেউ জিজ্ঞেস করলেও একটা বোঝা যায়।

সর। আমার বিষয়ে বোধ হয় তুমি সমালোচনা করেছ?

গর্জ্জন। শুনলে অবাক হবে, আমি এদেশে পদার্পণ করতে না করতে তোমার সমালোচনা আরম্ভ করেছি। তারপর আজ তিন বৎসর ধরে' তোমার বিষয় খুব ভাল ভাল সমালোচনা করে' আসছি। তোমাকে অত উঁচুতে নিয়ে যাওয়া আর গবর্ণমেণ্টের অধীন করা, এ বুদ্ধি কার মাথা হতে বেরিয়েছে? আমার!

সর। তবে যে বলছিলে সে বুদ্ধি অন্য কে কে দিয়েছে?

গর্জ্জন। হাঁ, অন্যে দিয়েছে বটে, কিন্তু সে চাঁদ যেমন আলো দেয়। সূর্য্যের আলো চাঁদের উপর পড়ে, সে আলো চাঁদ নিজের ভিতর টেনে নিতে পারে না, গাপ্ করে' ফেলতে পারে না, কাযেই ফিরিয়ে দেয়। অজ্ঞ লোকে মনে করে আলো চাঁদেরই।

সর। তোমার এই মন্ত্রী ক'টি কে কে?

গর্জ্জন। প্রথমতঃ Raw-law—

সর। তিনি কে?

গর্জ্জন। তিনি একজন scientific lawyer।

সর। এ অদ্ভুত জীবটি কি?

গর্জ্জন। অর্থাৎ তিনি scientistও নন lawyerও নন, সেইজন্য আমরা তাঁকে scientific lawyer বলে' থাকি। যেমন sweet bread, Welsh rabbit, এও সেই রকম।

সর। ব্যাপারখানা কি তা' স্পষ্ট হ'ল না। তা' যাকগে, এদের ভিতর দেশী লোক কেউ ছিল?

গর্জ্জন। ছিল বৈকি; একজন মুসলমান—বিলগ্রামী, একজন হিন্দু,—রঘুদাস।

সর। ভাল, মুসলমানটি কি বল্লেন?

গর্জ্জন। তিনি বল্লেন "সোভানাল্লা"।

সর। আর ব্রাহ্মণ সন্তানটি?

গর্জ্জন। যেমন বাঙ্গালীর স্বভাব, বেসুরো ধরে' বস্লেন।

সর। অর্থাৎ তোমাদের গলার সঙ্গে গলা মেলাননি?

গর্জ্জন। হাঁ, তাই।

সর। যাহোক্, সেও অনেকটা সান্ত্বনা।

গর্জ্জন। তোমার কৌতূহল ত নিবৃত্ত হয়েছে, এখন ওঠ। বসে' বসে আর ভাব্‌ছ কি?

সর। আমি ভাব্‌ছি, এদেশে আমার এত ভক্ত আছে, তারা কি আমাকে সিমলের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না?

গর্জ্জন। তোমার ভক্তেরা যদি মানুষ হবে তাহলে তোমার এত দুর্দ্দশা কেন? তারা ত দেখ্‌তে পাই নিজেদের উন্নতির একমাত্র উপায় বার করেছে নাকে কান্না। সব দেশেই স্ত্রীলোকের চোখের জলে শক্তি ও সৌন্দর্য্য দুই আছে। কিন্তু কোন দেশেই নাকের জল যে পুরুষের ভূষণ এবং অস্ত্র তাত জানতুম না।

সর। কিন্তু তারা মানুষ হতে চায় বলে'ই ত আমাকে চায়।

গর্জ্জন। শুধু চাইলেই যদি পাওয়া যেত তাহলে আর ভাবনা থাক্‌ত না। ভারতবাসীদের "চাই চাই" একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের চাওয়া বন্ধ ক'রবার জন্যইত তোমাকে দেশছাড়া করা। কিন্তু চল, সিমলেতেও তোমার দেশের ভক্ত অনেক জুটিয়ে দেব।

সর। তারা কারা বল দেখি?

গর্জ্জন। দেশের ধনী সন্তান।

সর। লম্বশাট পটাবৃত মূর্খের দল? হাতের গোড়ায় থাকতেই যারা আমার দিক দিয়ে ঘেঁস্‌লে না? তারা অত দূরে অত উঁচুতে আমার আরাধনা করতে যাবে! কি ভ্রান্তি! প্লেগ, ম্যালেরিয়া ও ধনীর সন্তান অত উচ্চুতে উঠতে পারে না।

গর্জ্জন। আমি তাদের ক্রমান্বয় বক্তৃতা দিচ্ছি যে খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে মূর্খের আর ভদ্রসমাজে স্থান নেই, সুতরাং বিদ্যাচর্চ্চা করতেই হবে।

সর। তুমি যাই বক্তৃতা দেওনা কেন, তারা বেশ জানে এ যুগে সরস্বতীর চাইতে লক্ষ্মীর মান বেশি।

গর্জ্জন। আচ্ছা, সে ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে দেখা যাবে। তোমার ভক্তেরা তোমার পিছনে সিমলে পর্য্যন্ত যেতে পারুক্ আর নাই পারুক, তোমাকে সেখানে যেতেই হবে।

সর। যেতে যদি হয়ত যাব। তবে কবে যেতে হবে?

গর্জ্জন। এখনই এই মুহূর্ত্তে।

সর। সেকি কথা? অবস্থাটা ভাব্‌বারও দু'দিন সময় দেবে না?

গর্জ্জন। না, আমার motto হচ্ছে "ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বে।"

সর। তাহলে একটা কথা বলি। আমার মন্দিরটে সিমলের চাইতেও আর একটু উচ্চু জায়গায় প্রতিষ্ঠা করতে পার না?

গর্জ্জন। কোথায়? মারিতে? (Murree)

সর। না। আসমানে।

গর্জ্জন। ক্রমোন্নতির ফলে শেষে দাঁড়াবে তাই।

সর। যখন সকল দেবদেবতাই একে একে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেছেন। লক্ষ্মীও অন্তর্ধান হয়েছেন, তখন আমিই বা একা পড়ে' থাকি কেন? চল যাই। দেবতাদের মধ্যে এ দেশে বাকি থাকলেন শুধু একদিকে প্রজাপতি, আর উল্টদিকে শীতলা, ওলাবিবি ও সেই বংশের যাঁরা যাঁরা নূতন এসেছেন।

গর্জ্জন। আমিওত তাই বলি। যে দেশে লোকের কাজ হচ্ছে শুধু জন্মানো ও সে দেশে তোমার বাঁচা শুধু বিড়ম্বনা।

স্যাভেজ (বেঙ্গল) ল্যাণ্ডর।